অকারাদি বর্ণক্রমে নবম কল্পের প্রথম ভাগের সূচী পত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে
প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম
বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা
সম্বৎ ১৯২১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬। ১ চৈত্র সোমবার

Registered No 52.

নবম কল্প

প্রথম ভাগ

বৈশাখ ১৭৯৭ শক

৩৮: সংখ্যা ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৬

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

সাংখ্য-দর্শন।

ঔপদেশিক-জ্ঞান ও উপদেশ।

ঔপদেশিক-জ্ঞানের নামান্তর শাব্দ-জ্ঞান, ও শাব্দী-প্রমা ইত্যাদি, আর উপদেশের নামান্তর শাস্ত্র, শব্দ, বাক্য প্রভৃতি।

কাষ্ঠ লোষ্টে আঘাত করিলেও শব্দ হয়, আবার আত্ম-প্রযত্নে মানব-কণ্ঠ হইতেও শব্দ নির্গত হয়, কিন্তু তদুভয় প্রকার শব্দের কার্য্যকারিত্ব এক রূপ নহে। উক্ত উভয় জাতীয় শব্দের প্রয়োজন, ব্যবহার, ও কার্য্যকারিত্ব, সমস্তই অত্যন্ত বিভিন্ন। এতদ্দৃষ্টে দার্শনিক পণ্ডিতেরা শব্দের দুইটি জাতি কল্পনা করিয়া থাকেন। এক জাতি ধ্বন্যাত্মক—অপর জাতি বর্ণাত্মক। ধ্বন্যাত্মক শব্দকে আমরা অব্যক্ত-শব্দ বলিয়া ব্যবহার করি, স্থল-বিশেষে অনুকরণ শব্দ বলিয়াও থাকি। আর, বর্ণাত্মক শব্দকে ব্যক্ত শব্দ, বাক্য ও কথা প্রভৃতি বহুবিধ নামে উল্লেখ করিয়া থাকি।

শব্দ মাত্রেরই স্বভাব এই যে, উহা শ্রবণেন্দ্রিয়গত হইবা মাত্র ইন্দ্রিয়-অধিষ্ঠাতার নিকট আত্ম রূপ প্রকাশ ও কোন না কোন জ্ঞানের আধান করিবে। তন্মধ্যে, যে সকল শব্দ কেবল মাত্র শোক, হর্ষ, আবেগ প্রভৃতি বৈকারিক ভাবের আধায়ক হয়, যাহাতে কোন প্রকার অর্থের সংস্রব থাকে না, অর্থাৎ যাহা মানব মনে কোন প্রকার পদার্থের ছবি সংলগ্ন করিতে পারে না, সেই সকল শব্দ এক জাতীয়। এই জাতীয় শব্দের নাম ধ্বনি বা অনুকরণ। মুরজ, মৃদঙ্গ, কাংস্য, করতাল, তূরী, ভেরী প্রভৃতির শব্দ এই ধ্বনি জাতীয়। অস্মদাদির পক্ষে পাশব শব্দও এই জাতীয়। মনুষ্য-কণ্ঠ-বিনির্গত শব্দও যদি বুদ্ধি পূর্ব্বক বা সংস্কার পূর্ব্বক নির্গত না হয়, তাহা হইলে সে শব্দও পাশব শব্দের ন্যায় ধ্বনি জাতীয় হইবে। যথা অতি বালক, অত্যুন্মত্ত ও অতি রোগগ্রস্ত মনুষ্যের হ্যাঁ—হুঁ—জ্ঞ্যাঁ—জ্ঞুঁ প্রভৃতি শব্দ। যে শব্দ বুদ্ধি পূর্ব্বক মানব কণ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হয় এবং যে শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ-সংস্রব আছে, অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা মানব মনে বস্তুর আকার সন্নিপতিত হয়, সেই সকল শব্দকে বর্ণ শব্দ বা ব্যক্ত শব্দ বলা যায়। এই অসীম-মহিমান্বিত বর্ণ শব্দ দ্বারা কবিরা গ্রাম, নগর, পল্লী ও বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার

এবং সুখ, দুঃখ, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি বহুবিধ মানসিক ভাবের ছবি অন্যের মনে আহিত করিয়া থাকেন। বস্তুর বর্ণনা সিদ্ধ হয় বলিয়া এই জাতীয় শব্দের নাম বর্ণ শব্দ। চক্ষু দ্বারা যেমন বস্তুর আকার প্রকার উপলব্ধি হয়, বাক্য দ্বারাও তেমনি অবগত হওয়া যায়,বরং চক্ষু-অপেক্ষা বাক্যের গতি অধিক ব্যাপক। চক্ষু-দ্বারা সুখ দুঃখাদি অন্তঃপদার্থের গ্রহ হয় না, কিন্তু তাহা বাক্য দ্বারা হয়। চক্ষু দ্বারা অন্যের অন্তরে বস্তুর আকার প্রবিষ্ট করান যায় না, কিন্তু বাক্য দ্বারা তাহা করান যায়। চক্ষু কেবল নিজ অধিষ্ঠাতার অনুগত, কিন্তু বাক্য নিজ অধিষ্ঠাতার ন্যায় অন্যেরও অনুগত। বাক্য যদি স্ব-পর সাধারণকে সুখ দুঃখের ভাগী না করিত, তাহা হইলে লোকে আপনার গানে বা আপনার বক্তৃতায় আপনি অনুরক্ত বা বিরক্ত হইত না। বেদে একটি মন্ত্র আছে—

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙপশ্যতি নান্তরাত্মন্"

ইন্দ্রিয়গণ পরের অনুগত হইল দেখিয়া স্বয়ম্ভু (পরমাত্মা) তাহাদিগকে হিংসা করিয়াছিলেন, তদবধি তাহারা আর অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা কেবল বাহ্য দর্শন সিদ্ধ হয়, অন্তঃপদার্থের দর্শন সিদ্ধ হয় না। কিন্তু—

"বাক্ বৈ সর্ব্বং বিজানাতি সর্ব্বমেতৎ বাচো বিভূতিঃ।"

জগতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ যে কিছু বস্তু আছে,তৎসমস্তই বাক্যের ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বাক্য দ্বারা সমস্ত পদার্থেরই উপলব্ধি সিদ্ধ হয়(১)। পূর্ব্ব কালের ঋষিরা যে গুরুর নিকট হইতে আত্ম-সাক্ষাৎ কার লাভ করিতেন, সে লাভ তাঁহারা বাক্য দ্বারাই করিতেন। আমরা যে সংসার চক্রে ঘূর্ণমান হইতেছি, তাহাও বাক্যের অধীন হইয়া। অতএব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ন্যায় বাক্যেও অখণ্ডনীয় প্রামাণ্য আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

সাংখ্যাচার্য্য ঈশ্বর-কৃষ্ণ বলিয়াছেন "দেখা গেল না বলিয়া বস্তুর অভাব নিশ্চয় করা উচিত নহে; কারণ, অনেক সময়ে আমরা প্রত্যক্ষের অগোচর পদার্থকে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ করিয়া থাকি।" যুক্তির অধিকারে আসিল না বলিয়াও অভাব-অবধারণ করা সঙ্গত নহে; কারণ, যুক্তি যাহার ছায়া স্পর্শ করিতেও পারে না, ঈদৃশ কত শত পদার্থ আমরা কত কত সময়ে এক মাত্র বিশ্বস্ত বাক্য দ্বারা লাভ করিয়া থাকি(২)।

যদি কোন ভ্রম-প্রমাদ-বিবর্জিত সত্য-বক্তা পুরুষ আমাদিগকে বলেন যে "অমুক স্থানে অমুক বস্তু নিপতিত আছে।" এবং আমাদিগেরও যদি সেই বস্তুতে আবশ্যক থাকে এমত হয়, তাহা হইলে অবশ্য আমরা সেই বস্তু আহরণের নিমিত্ত ধাবিত হইব। অতি বিশ্বস্তা জননী যদি বলেন "জাও! অমুক স্থানে ভোজনীয় প্রস্তুত হইয়াছে।" জননী এই কথা বলিলে, তৎকালে যদি আমাদের বুভুক্ষা থাকে, তাহা হইলে আমরা তদ্দণ্ডে তদীয় উপদিষ্ট স্থানে গমন করিব; কেন না ঐ বিশ্বস্ত বাক্য শুনিবা মাত্র আমাদিগের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, "বস্তু অবশ্য নিপতিত আছে"—"ভোজ্য এই রূপ অবশ্য প্রস্তুত আছে।" বাক্য শ্রবণের পূর্ব্বে আমাদের ঐ জ্ঞান জন্মে নাই, জন্মিবার

(১) বাহ্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বাক্যের বিষয় অধিক, অন্তরিন্দ্রিয়ের অপেক্ষা নহে। যাহা মনের বিষয় নহে, তাহা বাক্যেরও বিষয় নহে। মন যে কিছু নির্ম্মাণ করিতে পারে, সে সমস্তই বাক্য প্রকাশ করিতে পারে, অন্য ইন্দ্রিয় পারে না, এই মাত্র বলা ইহার উদ্দেশ্য।

(২) "অচাক্ষুষাণামনুমানেন বোধো ধূমাদিরিব বহ্নেঃ" (কাপিল সূত্র) "অতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ। তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্" (ঈশ্বর-কৃষ্ণ)

সম্ভাবনাও নাই। কারণ ঐরূপ স্থলে ঐরূপ জ্ঞান জন্মাইবার অধিকার কি ইন্দ্রিয়, কি যুক্তি, কাহারও নাই। এই মুহূর্ত্তে দিল্লীতে কি রূপ ঘটনা উপস্থিত আছে, তাহা প্রত্যক্ষ বা যুক্তি দ্বারা নির্ণয় করিতে পারে এমন সাধ্য কাহার আছে? যদি মানব জাতির স্বভাবতঃ সে সাধ্য থাকিত, তাহা হইলে আর লিখন পঠন পদ্ধতির উদয় হইত না, বর্ত্তমান সংবাদ পত্রেরও আবশ্যক থাকিত না। অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ও তৎসম্বদ্ধ যুক্তির ন্যায়, সত্য বাক্যও একটি যথার্থ জ্ঞানের কারণ।

বাক্যের প্রামাণ্য থাকা যদি স্বীকার্য্য হইল, তবে তাহার সত্যাসত্যের রূপ নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। যেহেতু বাক্য মাত্রই সত্য হইতে পারে না, বা বাক্য সমুত্থ জ্ঞান মাত্রই যথার্থ জ্ঞান হইতে পারে না। ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের মধ্যে ও যৌক্তিক জ্ঞানের মধ্যে, যেমন শত শত ভ্রম লুক্কায়িত থাকে, শাব্দ জ্ঞানের (বাক্য জন্য জ্ঞানের) মধ্যেও তেমনি থাকিতে পারে। সুতরাং ইন্দ্রিয় ও ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের ন্যায়, এবং যুক্তি ও যৌক্তিক জ্ঞানের ন্যায়, শব্দ ও শাব্দ জ্ঞানের [illegible] করা আবশ্যক। [illegible] করিতে হইলে প্রথমতঃ [illegible] নির্দ্দেশ করাও অত্যাবশ্যক। এজন্য কাপিল শাস্ত্রে এই রূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।"—উপদেশাত্মক আপ্ত বাক্যের নাম শব্দ, সেই শব্দ-শ্রবণের সমনন্তর যে জ্ঞান জন্মে, তাহা অব্যভিচারী ও অভ্রান্ত।

বাক্যের আপ্ততা কি?—

কাপিল-মতানুসারীরা বলেন, যে বাক্যে ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি জৈবিক দোষের আশঙ্কা নাই, তাহাই আপ্ত বাক্য।

সেশ্বর সাংখ্য ও ঔপনিষদ আচার্য্যেরা বলেন, আপ্ততা বাক্যের নহে, আপ্ততা পুরুষের। ভ্রম, প্রমাদ, ইন্দ্রিয়াপাটব, প্রতারণেচ্ছা প্রভৃতি সাধারণ জৈবিক দোষের অভাব যে পুরুষে আছে, সেই পুরুষই আপ্ত পুরুষ, তদীয় বাক্যের নাম আপ্ত বাক্য। আপ্ত পুরুষ যাহা উপদেশ করেন, তাহা অভ্রান্ত ও অব্যভিচারী। আপ্ত পুরুষ যে কিছু বলেন, তৎসমস্তই সত্য বটে, কিন্তু তন্মধ্যে যে অংশ উপদেশাত্মক, প্রামাণ্য সেই অংশেই বাস করে; অপরাংশ তাহার অনুগত হইয়া সেই প্রামাণ্যের উত্তেজনা করে।

তাদৃশ আপ্ত পুরুষ কে?—

সেশ্বর সাংখ্য ও ঈশ্বরানুগত অন্যান্য দার্শনিক পুরুষেরা বলেন, এক আপ্ত পুরুষ ঈশ্বর, আর আপ্ত পুরুষ যোগজ-সামর্থ্যবান্ উৎকৃষ্ট-সত্ব যোগী পুরুষ। ইহাঁদের উপদেশ কদাচ অসত্য হয় না। ইহাঁদের উপদেশের উপর সম্পূর্ণ আস্থার নির্ভর করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক মনুষ্যের উপদেশের উপর কখনই সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। [illegible]রের বাক্যই

নৈয়ায়িকেরা [illegible] পুরুষের বাক্যই হউক, যে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা-অনুসারে উচ্চারিত না হয়, এবং যাহার কোন তাৎপর্য্য দৃষ্ট হয় না, সে বাক্যের আপ্ততা কস্মিন্ কালেই নাই। আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা,—এই সম্বন্ধত্রয় ও তাৎপর্য্য যে কোন ব্যক্তির বাক্যে থাকিবে, তাহারই বাক্য আপ্ত বাক্য হইবে, তাহারই বাক্যে বিশ্বাস নিক্ষেপ করা যাইবে, নচেৎ উক্ত-সম্বন্ধত্রয় রহিত, তাৎপর্য্য শূন্য ঈশ্বরের বাক্যেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

আকাঙ্ক্ষা,—একটি শব্দ উচ্চারিত হইলে, তাহার অর্থ সম্পূরণের নিমিত্ত যে শব্দান্তরের সংযোজন করার আবশ্যক হয়, সেই আবশ্যক-ভাবের নাম আকাঙ্ক্ষা। যথা

'রাম' বা 'রামের' এবম্প্রকার শব্দ উচ্চারণ করিলে,রাম বা রামের কি?—এই জিজ্ঞাসার পূর্ত্তি করিবার নিমিত্ত, ঐ উচ্চারিত বাক্যের অবয়বে 'আছেন' বা 'পুত্র' প্রভৃতি শব্দের সংযোজন করা আবশ্যক হয়। কখন কখন ঐরূপ শব্দ যোজনা বাহিরে প্রকাশ পায় না, বা আবশ্যক হয় না, মনে মনে উদয় হইয়াই আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিয়া থাকে।

আসক্তি,—যত গুলি শব্দ উচ্চারণ করিয়া একটি বাক্য নির্ম্মাণ করিতে হইবে (কোন এক বস্তু প্রকাশ করিতে হইবে) তত গুলি শব্দের পরস্পর সম্বন্ধ রাখিয়া, উত্তরোত্তর বিনা বিলম্বে উচ্চারণ করিতে হইবে। নচেৎ, আজ্ বলিলাম 'রাম' আর কাল বলিব 'আছেন' এরূপ ব্যবহিত উচ্চারণ কোন অর্থের প্রকাশক হইবে না।

যোগ্যতা,—আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি-অনুসারে শব্দ উচ্চারণ করিলেই কোন না কোন অর্থের প্রকাশ পাইবে, কিন্তু সেই প্রকাশ্যমান অর্থ যদি যোগ্য না হয়, তাহা হইলে সে বাক্যে যোগ্যতা নাই। বিবেচনা করিতে হইবে যে বাক্যে যোগ্যতা থাকে না, লোকে তাদৃশ বাক্যকে অযোগ্য বাক্য বলিয়া ব্যবহার করে।

কি হইলে যোগ্য অর্থ হয়?—আর কিম্বিধ হইলেই বা অযোগ্য অর্থ হয়?—

যে অর্থ প্রত্যক্ষ বা যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে, সেই অর্থই যোগ্য অর্থ; যথা—এই স্ত্রী বন্ধ্যা, আর যে অর্থ প্রত্যক্ষ বা যুক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ, সেই অর্থই অযোগ্য অর্থ, যথা—"এই ব্যক্তির জননী বন্ধ্যা"।

তাৎপর্য্য,—বক্তার অভিপ্রায় অর্থাৎ মনোগত ভাব বিশেষকে শাস্ত্র লেখকেরা তাৎপর্য্য নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই তাৎপর্য্যই শাব্দ-জ্ঞানের প্রধান অঙ্গ। কেন না, যে বাক্যের তাৎপর্য্য-গ্রহ হয় না, সে বাক্য আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চারিত হইলেও কার্য্যকারী হয় না। কিন্তু এক মাত্র তাৎপর্য্যের বলে যোগ্যতা বিহীন বাক্যও সমাদৃত হইতে পারে। 'ইহার জননী বন্ধ্যা'—এই বাক্য নিতান্ত অযোগ্য হইলেও, বক্তার যদি ঐরূপ বলিবার কোন তাৎপর্য্য থাকে, তাহা হইলে, ঐ বাক্য কদাচ অগ্রাহ্য হইবে না; বরং উহা কোন উৎকৃষ্ট ভাবের প্রকাশক হইবে। অতএব তাৎপর্য্যই বাক্যের সার; তাৎপর্য্য বোধই ঔপদেশিক জ্ঞানের প্রাণ। তাৎপর্য্য-ব্যতিরেকে বাক্যের উৎপত্তিই হইতে পারে না। অতএব, আকাঙ্ক্ষা, আসক্তি, যোগ্যতা ও তাৎপর্য্য, এতচ্চতুষ্টয়-যুক্ত যে বাক্য, সেই বাক্যই আপ্ত বাক্য; তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার আপ্ত-বাক্য এ জগতে নাই।

"আপ্ত বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক"—এতদ্ঘটিত তিনটি মত বলা হইল। এতৎসম্বন্ধে আরও মত আছে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। ফল, আপ্ত বাক্যের লক্ষণ ঘটিত যতই কেন মত থাকুক না, সকল মতেই বাক্যের আপ্তত্ব স্বীকার করা আছে। এমন কি,তৎসমস্ত বেদের নামমাত্রে শিরোনমন করিতেন।

ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদিগের বুদ্ধি যতই তীব্র থাকুক্, যতই সূক্ষ্ম বস্তুর-গ্রহণ ক্ষমা হউক্, বেদের নিকট তাঁহাদের সেই উর্জস্বিনী বুদ্ধি কুণ্ঠিত হইয়াছিল বলিতে হয়। বেদের নিকট তাঁহাদের বুদ্ধি কেন কুণ্ঠিত হয়?—তাঁহারা বেদ বাক্যকে অভ্রান্ত বাক্য স্বীকার করেন কেন? এসকল বক্তব্য হইলেও এস্থলে তাহা পরিহার করা গেল। কারণ এই যে, তাঁহাদিগের সেই বিস্তৃত তর্ক সম্বলিত মত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে, কিছু কাল ব্যাপিয়া কেবল তাহাই

লিখিতে হয়, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ ঋষিরা যে প্রকারে ও যে হেতু বশতঃ বেদের অভ্রান্তত্ব স্বীকার করিতেন, সে পদ্ধতি ও সে সকল হেতু প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত লেখনী ক্ষয় করিবার সময় আর নাই; তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ঋষিদিগের বিশ্বাস ছিল "বেদ অপৌরুষেয়—বেদ অস্মদাদির ন্যায় কোন প্রাকৃতিক মনুষ্যের রচনা বাক্য নহে।"

আশ্চর্য্য! অস্মদাদির মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিরুদ্ধে যে সকল তর্কের উদয় হয়, ঋষিদিগের মনেও সেই সমস্ত বিতর্কের উদয় হইয়াছিল; তথাপি তাঁহারা আমাদের ন্যায় বেদের পৌরুষেয়ত্ব শঙ্কা করেন নাই; প্রত্যুত পৌরুষেয়ত্ব পক্ষ খণ্ডন করিয়া অপৌরুষেয়ত্ব পক্ষই সুস্থির করিয়া গিয়াছেন।

ঋষিদিগের মনে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-বিরুদ্ধে যে সকল বিতর্ক ভাবের উদয় হইয়াছিল, তত্তাবতের মধ্য হইতে দুই চারিটি আশঙ্কা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

'বেদ অপৌরুষেয় নহে'—'কঠাদি ঋষিরাই উহার প্রণেতা'—'বৈদিক মন্ত্র বা ব্রাহ্মণ-গুলি যখন ঋষিদিগের নাম-ধাম-কার্য্য কলাপাদি ঘটিত, তখন ঋষিরাই বেদের রচয়িতা'—'ঋষিরা সময়ে সময়ে যে সকল আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, ও আধিদৈবিক ঘটনা বা ব্যাপারানুসারী মনোভাব সকল বর্ণন করিতেন, কালক্রমে সেই সমস্ত বর্ণনা বাক্য বেদ নামে পরিগণিত হইয়াছে, সুতরাং বেদ পুরুষ নির্ম্মিত, কদাপি অপৌরুষেয় নহে'—অপিচ 'বেদ যখন কতকগুলি বাক্যের সমষ্টিমাত্র, তখন উহা বাগিন্দ্রিয়বান মনুষ্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই, বাক্য ঈশ্বর হইতে উচ্চারিত হয় না, বা স্বয়ং উচ্চরিতও হয় না'—বিশেষতঃ বেদের মধ্যে বহুতর প্রলাপ বক্য আছে, বেদ অভ্রান্ত হইলে তাহাতে প্রলাপ বাক্য থাকিবে কেন?'—'যে সকল যাগ যজ্ঞ, যে সকল ক্রিয়া কলাপ, যে যে ফলের নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিতে বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, সম্যক্ প্রকারে অনুষ্ঠান করিলেও তাহার একটিতেও ফল-সংযোগ দৃষ্ট হয় না, সুতরাং বেদ আপ্ত বাক্য নহে ইত্যাদি (৩)।

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস।

৩৭৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৯২ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বকালে এদেশে রসায়নানুশীলনের যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন পূর্ব্ব পত্রিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতেও যিনি সন্তুষ্ট না হয়েন, তাঁহার নিমিত্ত তৎসম্বন্ধীয় আরও দুই একটি প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতেছে। ইউরোপ প্রভৃতি যে সকল দেশে রসায়ন শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছে, তত্তৎ দেশে যেমন বিবিধ রূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা নানা প্রকার শিল্প কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে, অস্মদ্দেশেও তদ্রূপ দুই

---

(৩) "বেদাংশ্চৈকে সন্নিকর্ষং পুরুষাখ্যাঃ" (জৈমিনি) "পৌরুষেয়াশ্চোদনা ইতি বক্ষ্যামঃ,—সন্নিকৃষ্টফলাঃ কৃতকা বেদা ইদানীন্তনাঃ,—কথং পুনঃ কৃতকা বেদাঃ?—যতঃ পুরুষাখ্যাঃ,—পুরুষেণ হি সমাখ্যায়ন্তে বেদাঃ—কাঠকং, কালাপকং, পৈপ্পলাদকং, মৌদ্গল্যং ইত্যেবমাদি,—কর্ত্তা শব্দস্য পুরুষঃ কার্য্যঃ শব্দঃ,—(মীমাংসা দর্শন) "অনিত্য দর্শনাচ্চ" (জৈমিনি) জনন-মরণ বন্তুচ বেদার্থাঃ,—'ববরঃ প্রাবাহণিরকাময়ত' 'কুসুরুবিন্দু-রৌদ্দালকিরকাময়ত' ইত্যেবমাদয়ঃ, উদ্দালকস্যাপত্যং গম্যতে ঔদ্দালকিঃ, যদ্যেবং, প্রাক্ ঔদ্দালকি-জন্মনো, নায়ং গ্রন্থো ভূতপূর্ব্বঃ,—(শবর-স্বামী) "বনস্পতয়ঃ সত্রমাসত, সর্পাঃ সত্রমাসত," ইত্যাদি বাক্যমুন্মত্ত-বাক্যসদৃশঃ কথম্? "জরদ্গাবো গায়ন্তি মত্তকানি" কথন্নাম জরদ্গাবো গায়েৎ? কথং বা বনস্পতয়ঃ সর্পা বা সত্রমাসীরন্?" (মীমাংসা দর্শন) "ন নিত্যত্বং বেদানাং কার্য্যত্বশ্রুতেঃ" 'কৃত্বা সম্বন্ধং ব্যবহারার্থং কেন চিদ্বেদাঃ প্রণীতাঃ'—"অনিয়তঃ শব্দঃ, কর্ম্মকালে ফলাদর্শনাৎ" (জৈমিনি ও শবর স্বামী)।

একটি ব্যবহারোপযোগি শিল্প অতি প্রাচীন কাল হইতে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে। এদেশে রজকেরা যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা কার্পাস, রেসম ও লোমজ বস্ত্র সকল ধৌত ও পরিষ্কৃত করে, শৌণ্ডিকেরা যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা সুরা প্রস্তুত করে, গোপেরা যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা দধি ছানা ইত্যাদি প্রস্তুত করে, এবং এখানকার কোন কোন লোকে যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা কার্পাস, রেসম ও পশম সূত্র ও বস্ত্র সকল বিবিধ রূপ পাকা বর্ণে রঞ্জিত করে, তৎসমুদায়ই রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এই সকল শিল্পের প্রক্রিয়া গুলি যদি এরূপ সঙ্কীর্ণ প্রস্তাবে সন্নিবেশিত করিবার সম্ভাবনা থাকিত,তাহা হইলে সকলেই দেখিতে পাইতেন যে সে সমুদায় সামান্য রসায়নানুশীলনের ফল নহে। উক্ত শিল্প কয়েকটিকে কেহই আধুনিক বলিতে পারেন না, কারণ বেদ, মনুসংহিতা প্রভৃতি সমুদায় প্রাচীনতম গ্রন্থেই তাহাদিগের উল্লেখ আছে।

রাসায়নিক কার্য্যের অনুষ্ঠান জন্য অস্মদ্দেশে বক যন্ত্র, দোলা যন্ত্র, পাতাল যন্ত্র প্রভৃতি কয়েক প্রকার যন্ত্রও প্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সে সমুদায়ের গঠন-সৌষ্ঠব অধিক সুন্দর নহে বটে, তথাচ তদ্দ্বারাই একাল পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশীয়দিগের সমুদায় রাসায়নিক প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। তাহাদিগের আকার প্রকার কি রূপ, তত্তাবতের যথা-সম্ভব প্রতিকৃতি পরে প্রকাশ করা যাইবে। প্রাচীন কালে এদেশে রসায়নানুশীলনের এরূপ স্পষ্টতর প্রমাণাদি সত্ত্বেও কোন কোন ইউরোপীয় মহোদয় বলেন যে আরব প্রভৃতি দেশেই রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম সূত্রপাত ও অনুশীলন হইয়াছিল, ইহাতে আমরা যার পর নাই বিস্মিত হইয়াছি। যাঁহারা এরূপ বলেন,তাঁহাদিগকে আমরা অসংকুচিত চিত্তে এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহারা হয় আরবের পক্ষপাতী, না হয় প্রাচীন ভারত বর্ষের কিছুই তাঁহারা বা তাঁহাদিগের আত্মীয় স্বজনেও জানেন না। যদি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখেন, তাহা হইলে সকলেই স্বীকার করিবেন যে এদেশে প্রায় ৩২৭৪ বৎসর পূর্ব্বে যখন বেদ সকল সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং প্রায় ৩১০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন মনুসংহিতা লিখিত হইয়াছিল, তখন যেমন আরব,গ্রীস,মিসর প্রভৃতি কোন দেশেই সভ্যতার সূত্রপাত হয় নাই, সেই রূপ এদেশে যখন রসায়ন, জ্যোতিষ্ ও গণিত শাস্ত্রের সূত্রপাত হয়, তখন ঐ সকল দেশের মধ্যে কোন স্থানেই তাহার প্রয়োজনও অনুভূত হয় নাই।

যে দেশে যে সময়ে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলন আরম্ভ হয়, সেই দেশে শুদ্ধ মাত্র যে নানা প্রকার যোগ বিয়োগাত্মক কার্য্যই সম্পন্ন হইতে থাকে, ঐ শাস্ত্র সম্বন্ধে আর কিছুই হয় না, এমত নহে; সেই দেশীয় পণ্ডিতগণ তখন আবার পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকেই যৌগিক স্থির করিয়া তত্তাবতের মূলগত রূঢ় পদার্থ সমুদায়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন। পূর্ব্ব কালে নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ এই রূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নানাবিধ রূঢ় ভূত এবং প্রত্যেক রূঢ় পদার্থের অভ্যন্তরে অনু এবং পরমাণুর অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। যে দেশে এই রূপ কোন গবেষণা হয় নাই, সে দেশে শুদ্ধ মাত্র দুই চারিটি যোগ বিয়োগাত্মক কার্য্য সম্পাদিত হইলেই যে তথায় প্রকৃত পক্ষে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলন হইয়াছিল, ইহা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না। গ্রীস, মিসর, আরব ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন দেশে

রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস

রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা ইতি পূর্ব্বে অনেক প্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়াছি, তাহার মধ্যে কোন্ দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোন্ সময়ে প্রোক্ত রূঢ় পদার্থের অনুসন্ধানে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। যে কয়েকটি দেশের নাম উল্লিখিত হইল, পূর্ব্ব কালে তৎসমুদায়েতেই পার্থিব যৌগিক পদার্থ মাত্রের মূলগত রূঢ় পদার্থের অনুসন্ধান করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সকল দেশে তাহা এক সময়েও হয় নাই এবং সকল দেশে তাহাতে এক রূপ ফলও উৎপন্ন হয় নাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশের অন্তর্গত মিলটান্ নগর বাসী থেলিস নামক পণ্ডিত স্থির করেন যে মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি হইতে পৃথিবীর সমুদায় যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। তিনি আবার বলেন যে জলই ঐ চারিটির মধ্যে আদি ভূত। তাঁহার পর ঐ দেশে বহুকাল পর্য্যন্ত যে সকল পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সকলেই যাবতীয় পদার্থের মূলে উক্ত চতুর্ব্বিধ রূঢ় পদার্থ স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু কেহ অগ্নি, কেহ বায়ু এবং কেহ থেলিসের ন্যায় জলকে আদি ভূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। খৃষ্ট জন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসের অন্তর্গত ক্লাজোমিল নগরবাসী এনাক্সেগোরাস্ নামক পণ্ডিত স্থির করিলেন যে, সৃষ্টির আদিতে বিভিন্ন জাতীয় পরমাণু সকল বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থিত ছিল, পরে ঐ সকল পরমাণু ঈশ্বর কর্তৃক পরিচালিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ জাতিতে সম্বদ্ধ হইল এবং তাহাতেই নানা জাতীয় পদার্থের সৃষ্টি হইল। এনাক্সেগোরাসের পরে ডিমক্রিটস্ নামক জনৈক পণ্ডিত স্থির করেন যে শুদ্ধ নানা জাতীয় পরমাণু বিশৃঙ্খলাবস্থায় থাকিলেই যে বিভিন্ন রূপ পদার্থ জন্মিতে পারে এমত নহে; তদ্ভাবতের ইতস্ততঃ বিচরণ নিমিত্ত শূন্য স্থানেরও প্রয়োজন। তিনি বলেন যদি কেবলই পরমাণু থাকিত, আর তাহাদিগের মধ্যে মধ্যে শূন্য স্থান না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেও পারিত না এবং স্বজাতি অন্বেষণ পূর্ব্বক তাহার সহিত মিলিত হইয়া কোন পদার্থ রূপেও পরিণত হইতে পারিত না। সুতরাং ডিনক্রিটসের মতানুসারে শূন্য স্থান ও পরমাণু হইতেই সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

গ্রীসে আদি ভূত সম্বন্ধে এই রূপ নানা প্রকার সিদ্ধান্ত হইবার পরে এবং খৃষ্ট জন্মের ৩৮৫ বৎসর পূর্ব্বে এরিষ্টটেল্ নামক মহা পণ্ডিতের জন্ম হয়। তিনি প্রচার করিলেন যে মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি ও ব্যোম বা ইথার হইতেই সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তিত মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নির সহিত তিনি কেবল মাত্র ব্যোমেরই নূতন প্রচার করিলেন। তাঁহার পর প্রাচীন গ্রীস দেশের আর কোন পণ্ডিত রূঢ় পদার্থের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আর কোন প্রকার নূতন সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই।

মিসর দেশ গ্রীসের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী; এই হেতু গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই তথায় গমনাগমন করিতেন। মিসর দেশীয় পণ্ডিতেরাও সর্ব্বদা গ্রীসে যাতায়াত করিতেন। এই রূপ ঘনিষ্টতা নিবন্ধন গ্রীস দেশে যখন্ যে বিষয়ের যেরূপ মত প্রচলিত হইত, মিসরেও তখন সেই বিষয়ের প্রায় তদ্রূপ মতই প্রচারিত হইয়া পড়িত। গ্রীস ও মিসর দেশের সভ্যতা প্রায় সমকালীয়; সুতরাং রূঢ় ভূত সম্বন্ধে মিসরের কোন

প্রকার মতামতের উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এস্থলে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে মিসর দেশীয় পণ্ডিতগণ কখন কখন গ্রীক পণ্ডিতদিগের মত কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া গ্রহণ করিতেন।

প্রাচীন কালে আরব দেশে রাসায়নিক যোগ বিয়োগ সম্বন্ধীয় কোন কোন কার্য্য সম্পাদিত হইত বটে, কিন্তু তৎকালে তথায় সকলের মূল-গত ভৌতিক পদার্থের যে অধিক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত হইয়াছে। আরব দেশীয়েরা যখন মিসর দেশ অধিকার করিলেন, তখন তাঁহারা তথা হইতে গ্রীস, মিসর উভয় দেশীয় পণ্ডিতদিগের পরিশ্রমের ফল লাভ করিয়া উন্নত হইলেন। এই রূপে তাঁহারা মিসর হইতে অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিলেন, তাহা তাঁহারা স্বীয় অধিকার গত স্পেন দেশে বিবিধ রূপ বিদ্যালয়াদি স্থাপন দ্বারা ইউরোপের অধিকাংশ স্থানে প্রচারিত করিয়াছিলেন। আরবেরা মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে প্রায় কোন বিষয়েই অধিক উন্নতি লাভ করিতে পারেন নাই। মহম্মদও অধিক প্রাচীন কালের লোক নহেন; কারণ তাঁহার মদিনায় পলায়ন হইতে যে হিজরী শক চলিয়া আসিতেছে, তাহা বর্ত্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ ১২৯১ বৎসর মাত্র হইবে। যদি পূর্ব্বোক্ত থেলিস্ নামক গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতের সহিত মহম্মদের তুলনা করা যায়, তাহা হইলে মহম্মদ যে কত দূর আধুনিক হইয়া পড়েন, তাহা বলা যায় না। থেলিস্ যখন খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে চারিটি রূঢ় পদার্থ নির্দ্ধারণ করেন, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দের ২৪৭৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি গ্রীসে রসায়ন শাস্ত্রের অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই রূপ পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় কেহই আরব দেশীয়দিগকে গ্রীক্ পণ্ডিতদিগের শ্রম-ফল-ভাগী বলিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। যখন আরবেরা গ্রীকদিগেরই অনুকরণকারী, তখন তাঁহাদিগের রূঢ় পদার্থ সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানের বিষয় আর পৃথক্ রূপে বলা বাহুল্য।

অতঃপর প্রাচীন ভারতবর্ষে উল্লিখিত আদি ভূত রূঢ় পদার্থের কত দূর অনুসন্ধান হইয়াছিল, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। অস্মদ্দেশের বেদ ও মনুসংহিতা অতীব প্রাচীন গ্রন্থ। ঐ দুই গ্রন্থেই মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও ব্যোম এই পঞ্চবিধ পদার্থ, আর আর সমুদায় পদার্থের মূল স্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই পঞ্চবিধ পদার্থের মধ্যে আবার ব্যোমই অপর চারিটির আদি বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ব্যোম শব্দে কেহ শূন্য বুঝিবেন না, উহার প্রকৃত অর্থ সর্ব্ব স্থান ব্যাপী এক প্রকার অদৃশ্য সূক্ষ্ম পদার্থ বুঝায়। ইউরোপীয় ভাষায় উহার নাম ঈথার (Ether)। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতদিগের ন্যায় আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও এক্ষণে ব্যোমের অস্তিত্ব স্বীকার করেন *, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার তাহাকে সকল পদার্থের আদি ভূত বলিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না। ভারতীয় পণ্ডিতদিগের এই রূপ পাঞ্চভৌতিক মত যে কত পুরাতন, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। ইতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে পণ্ডিতবর কোলব্রুক সাহেবের গণনা অনুসারে বেদ সমুদায়ের সংগ্রহ খৃষ্ট জন্মের ১৪০০ বৎসর

* আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সর্ব্বব্যাপী ব্যোম বা ঈথারের অস্তিত্ব ও কার্য্যকারিতা স্বীকার না করিয়া পোলারিজেশন্ অব্ লাইট এবং রেডিয়েণ্ট হীট্ অব্ দি সান্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয় সকলের কোন প্রকার মীমাংসাই করিতে পারেন না।

পূর্ব্বে এবং পণ্ডিতবর সার উইলিয়ম জোন্স সাহেবের গণনা অনুসারে মনুসংহিতার রচনা খৃষ্ট জন্মের ১২২৫ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এই রূপ সিদ্ধান্ত যখন সাধারণের অনুমোদিত, তখন বোধ হয় অবাধে বলা যাইতে পারে যে যে গ্রীসের অনুশীলন-ফল লইয়া মিসর ও আরব উন্নত হইয়াছিল, তাহার বহু কাল পূর্ব্বেই এই ভারত ভূমিতে প্রস্তাবিত আদি ভূত রূঢ় পদার্থ সকলের তৎকালোচিত অনুসন্ধান হইয়াছিল।

এদেশের যে দুই খানি প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ করিলাম, তাহাতে এবং ন্যায় দর্শনাদি গ্রন্থে পরমাণু ও তাহাদিগের আকর্ষণ শক্তিরও যথাসম্ভব উল্লেখ আছে। তৎসমুদায়ের মতের সারাংশ এই যে কি আদি ভৌতিক, কি মিশ্র পদার্থ, সকলই অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া সংযত হইলেই প্রত্যেক আদি ভৌতিক ও যৌগিক পদার্থ অবয়ব-বিশিষ্ট হয়। অতএব যখন গ্রীস প্রভৃতি সকল দেশেরই পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আদি ভৌতিক পদার্থ, পরমাণু ও আণবিক আকর্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের বিলক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল, তখন এখানে যে অতি প্রাচীন কালেই রসায়ন শাস্ত্রের রীতিমত অনুশীলন আরম্ভ হয়, তাহা কে না স্বীকার করিবেন? ইউরোপে এক্ষণে রসায়ন শাস্ত্রের যত দূর সূক্ষ্ম অনুশীলন হইতেছে, তাহার সহিত তুলনা করিলে কি গ্রীস কি ভারতবর্ষ সকলেরই প্রাচীন অনুশীলন সমুদায় অতীব স্থূল ও সামান্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু সেই কালের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে তখনকার সকল আবিষ্ক্রিয়াই যথেষ্ট বলিতে হয়। যাহা হউক, যদি কেহ পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল আলোচনা করিয়া এই রূপ অনুমান করেন যে এখানকার পাঞ্চভৌতিকাদি মতই ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া গ্রীসে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা হইলে তাঁহাকে সহজে কেহ অন্যায়বাদী বলিতে পারেন না। কিন্তু সম্পূর্ণ আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল ইউরোপীয় মহোদয় রসায়ন শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব বা মাতৃত্ব স্বীকার করা দূরে থাকুক, উপযুক্ত স্থলে তাহার নাম উল্লেখ পর্য্যন্ত করিতেও ভাল বাসেন নাই। অতএব স্বদেশীয় পাঠকগণের নিকট আমাদিগের নিবেদন এই যে তাঁহারা ইউরোপীয়দিগের রচিত ইতিহাসাদিতে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা লিখিত থাকে, তাহা বিশেষ রূপে পরীক্ষা না করিয়া যেন বিশ্বাস করেন না।

ঈশ্বর-প্রেম অনির্ব্বচনীয়।

সএষঃ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

পরমাত্মার সহিত আমাদের যে প্রীতি-সম্বন্ধ, তাহা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহা মনুষ্য-কর্তৃক বিরচিত নহে। যাহা স্বাভাবিক তাহার ভাব স্বতন্ত্র এবং যাহা মনুষ্য-বিরচিত তাহার ভাব স্বতন্ত্র। আপনার পুত্রের সহিত পিতার যে সম্বন্ধ তাহা স্বাভাবিক; পোষ্য-পুত্রের সহিত পিতার যে সম্বন্ধ তাহা মনুষ্য-বিরচিত। শাদ্বল-ভূমির তৃণ-আস্তরণের যেমন পারিপাট্য, লালিত্য এবং নয়ন-স্নিগ্ধকর হরিৎ বর্ণ; ইন্দ্রধনুর যেমন সুরাগ-মাধুর্য্য; সরোবর-শায়ী পদ্মের যেমন সুধাময় বিকাশ, মনুষ্যের শিল্প-চাতুরী তাহার নিকট মস্তক অবনত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। শরীর মন যেমন যত্ন পূর্ব্বক আত্মাকে পোষণ করিতেছে কোন্ কৃপণ ব্যক্তি তেমন যত্ন পূর্ব্বক চির

সঞ্চিত ধন রক্ষা করিয়া থাকে? স্বভাবের ভাবই স্বতন্ত্র,—পুষ্পের গন্ধের সহিত তাহার সৌন্দর্য্যের কেমন অবিসংবাদী যোগ; আম্র-ফলের শোভার সহিত তাহার আস্বাদের কেমন মিল! পিতার যেরূপ অনিবার্য্য-হিতৈষণা, মাতার যেরূপ সুকোমল স্নেহ, শিশুর যেমন সুগভীর নির্ভরের ভাব, ভ্রাতার যেমন প্রাণতুল্য সৌহার্দ্দ, পতি-পত্নীর যেমন অবিচ্ছেদ্য প্রণয়-বন্ধন, তেমন কি আর কোথাও দেখা যায় না শুনা যায়! সকলি আশ্চর্য্য! পরমাত্মার সহিত আত্মার যে প্রীতি-সম্বন্ধ তাহা তেমনিই স্বাভাবিক; কিন্তু তাহা এমনি গভীর-তম, এমনি ঘণিষ্ঠ, যে তাহার সহিত আর কাহারো তুলনা হয় না। সেই অতলস্পর্শ-গভীর অন্তরতম প্রেম-সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে গিয়া কোন পূর্ব্বতন মহর্ষির হৃদয় হইতে এই রূপ বাক্য উচ্ছ্বসিত হইয়াছে যে "সএষঃ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা" অন্তরতম এই যে পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয় বিত্ত হইতে প্রিয় এবং আর আর সমুদায় বস্তু হইতে প্রিয়। কিন্তু উক্ত রূপ কথা কয় ব্যক্তি বলিতে পারেন? ওরূপ প্রীতি কয় ব্যক্তি অন্তরে অনুভব করিয়া থাকেন? নানা রূপ সাধনের কথা শুনা যায়—কিন্তু ওরূপ সাধন কে করিয়া থাকেন? ইহা দূরে থাকুক —আমারদের চতুর্দ্দিকে এরূপ এক মোহ কুজ্ঝটিকা উত্থিত হইয়াছে যে, শত শত ব্যক্তি যথার্থই মনে করেন যে, ক্ষুধা তৃষ্ণা যেমন স্বাভাবিক, মাতৃস্নেহ যেমন স্বাভাবিক, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ যেমন স্বাভাবিক, ঈশ্বর-প্রীতি সেরূপ স্বাভাবিক নহে, তাহা মনুষ্য বিরচিত, তাহা কৃত্রিম! পরিবারের মধ্য হইতে মাতৃ-স্নেহ, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ বা পিতৃ-ভক্তি বা দাম্পত্য-প্রেম যদি কোন কারণ-বশতঃ উন্মূলিত হয়, তাহা হইলে পরিবারের যেমন শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, সমাজ-হইতে স্বদেশানুরাগ উন্মূলিত হইলে সমাজের যে রূপ ভগ্ন-দশা উপস্থিত হয়, আত্মা হইতে ঈশ্বর-প্রীতি উন্মূলিত হইলে আত্মার সেই রূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। কি স্বাভাবিক এবং কি অস্বাভাবিক তাহা যদি আমরা হৃদয়-দ্বারা অনুভব না করি, তবে বিদ্যাদ্বারা তাহা স্থির করা অতীব কঠিন হইয়া উঠে। বধির ব্যক্তি সহস্র বৎসর সঙ্গীতের ব্যাকরণ পড়িলেও সঙ্গীতের এক বর্ণও শিক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু কর্ণ থাকিতেও যে ব্যক্তি সঙ্গীত-মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারে না তাহার সে রোগের ঔষধ কি? তাহার ঔষধ এই যে তাহাকে এমন একটি স্থানে লইয়া যাওয়া হয় যেখানে দিবারাত্র শ্রুতি-কটু, কর্কশ, এবং যৎপরোনাস্তি অপ্রিয় শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ কর্ণ-গোচর হয় না। যাঁহারা পিতৃ-দ্বেষী তাঁহাদিগকে এমন একটি স্থানে লইয়া যাওয়া হয় যেখানে সকলেই তাহার অহিতাকাঙ্ক্ষী; যাঁহারা ভ্রাতৃদ্বেষী তাঁহাদিগকে এমন একটি স্থানে লইয়া যাওয়া হয় যেখানে কেহ তাঁহাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে না, সকলেই মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়; যাঁহারা ঈশ্বর-বিদ্বেষী তাঁহাদের সে ভয়ানক রোগের ঔষধ কি? যেখানে প্রেম-সূর্য্যের প্রকাশ নাই, আনন্দ নাই, মুক্ত-ভাব নাই, উন্নতির স্পৃহা নাই, কৃতজ্ঞতা নাই, ভক্তি নাই, যেখানে কেবলি মোহ-কোলাহল, কেবলি অহঙ্কার অভিমান আত্মম্ভরিতা দ্বেষ-হিংসা ও বৈরিতা, যেখানে জ্ঞান প্রেম স্বাধীনতা ভক্তি উন্নতি এসকল কিছুরই আদর নাই, এক কথায় এই যেখানকার সকলেই কায়মনো-বাক্যে নাস্তিক, এমন একটি স্থানে কিছু দিন বাস করাই তাহার সে রোগের ঔষধ।

যেখানে চন্দ্র-সূর্য্য উদয়াস্ত হয়, যেখানে হিমালয় হইতে গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়, যেখানে উপনিষদ্ শাস্ত্র ধ্বনিত হয়, যেখানে পুনঃসুখ-জনন ষড় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে বিচরণ করে, যেখানে জ্ঞানের প্রেমের স্বাধীনতার ভক্তির উন্নতির কিছু মাত্র আদর আছে, এমন স্থানে বাস করিতে তাঁহাদের লজ্জা বোধ করা উচিত। বন্ধুর বিচ্ছেদে যেমন বন্ধুতার মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়, সেই রূপ যে স্থানে এরূপ মনে হয় যে "এখানে বুঝি পরমাত্মা নাই" এমন স্থানে মুহূর্ত্ত-কাল বাস করিলেই নাস্তিক ব্যক্তির চেতন হয়। বিখ্যাত ফরাশীশ-বিদ্রোহের প্রারম্ভে যাঁহারা নাস্তিক ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই উক্ত বিদ্রোহের উপসংহার কালে দেখিয়া শুনিয়া চেতন-লাভ করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করিয়া বলেন যে, আমার কিছুরই অভাব নাই, তাঁহার হৃদয়ের পূর্ণতা অবলোকন কর, এবং যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বলেন যে, আমার কোন অভাব নাই, তাঁহার হৃদয়ের শূন্যতা অবলোকন কর, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাইবে। পরমাত্মাকে যদি ছাড়িলে, তবে শ্রীকে ছাড়িলে, হ্রীকে ছাড়িলে, শান্তিকে ছাড়িলে, কল্যাণকে ছাড়িলে,—পাইলে কি? না অকল্যাণ অশান্তি মোহ প্রমাদ শ্রী-ভ্রংশ! স্বস্তি স্বস্তি এই রূপ কথা যেখান হইতে বাহির হইবে সে মুখ বন্ধ হইয়া গেল, নাস্তি নাস্তি এই রূপ কথাই তোমার জীবনের সম্বল হইল—একি দুর্দ্দশা! মনুষ্যের মুখ হইতে কোথায় "স্বস্তি স্বস্তি" "শান্তিঃ শান্তিঃ" এই রূপ, অভয়-বাণী নির্গত হইয়া দশ দিক্ পবিত্র করিবে, না কোথায় নাস্তি নাস্তি এই রূপ অশ্রাব্য শ্রুতি-কটু কর্ম্ম-নাশী বাক্য উত্থিত হইয়া ধর্ম্মের মর্ম্মে বিষাক্ত বাণ বিদ্ধ করিতে লাগিল—কি ভয়ানক দুর্দ্দশা, কি ভয়ানক অন্ধকার, কি হৃৎকম্প জনক হৃদয়-বিদারক রুধির-শোষক অবস্থা! এরূপ অবস্থাও যে মনুষ্যের কখন কখন ঘটে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কুটিল বুদ্ধির কুমন্ত্রণা। বুদ্ধির নিকটে মঙ্গলও সত্য, অমঙ্গলও সত্য। অমঙ্গল যে বাস্তবিক কোন সৎ পদার্থ নহে ইহা বুদ্ধি বুঝিতে পারে না। উচ্চ জ্ঞানের মঞ্চে আরোহণ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঙ্গলই সৎ, অমঙ্গলই অসৎ, মঙ্গলই বাস্তবিক, অমঙ্গল অবাস্তবিক। দুদিনের কষ্টকে বুদ্ধি অমঙ্গল বলিয়া স্থির করিয়া বসে; কষ্টের অবসান যে কি মধুময় তাহা দেখিতে পায় না। পথের ধূলিতে সর্ব্বাঙ্গ ধূসরিত হইলে, তখন গঙ্গা স্নান যে কি মধুময় ইহা যে জানিয়াছে সেই জানিয়াছে; কণ্টকময় মৃণাল হইতে পদ্ম-পুষ্প কেমন মনোহর-রূপে উন্মীলিত হয়, রজনীর অন্ধকার হইতে অরুণ-জ্যোতি কেমন দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বাহির হয়, বুদ্ধি তাহা দেখিয়াও দেখে না। বুদ্ধি বলে যে, এক বিন্দু কষ্টও প্রার্থনীয় নহে। ইহার উত্তর এই যে, কষ্ট প্রার্থনীয় নহে বলিয়াই তাহা স্থায়ী নহে। কষ্ট-মাত্রেরই প্রতিবিধান আছে। রোগা ব্যক্তি সহস্র কষ্ট ভোগ করিলেও সে এমন কষ্ট কখনই ভোগ করে না যে তাহার অন্ত নাই। ঈশ্বরের এমনি মধুময় নিয়ম যে কষ্ট নিতান্ত অসহ্য হইলেই অমনি মৃত্যু আসিয়া তাহাতে অমৃত বর্ষণ করে, এ নিয়মের একটিও ব্যভিচার নাই। কষ্ট প্রার্থনীয় নহে বলিয়া তাহা স্থায়ী নহে, মঙ্গল প্রার্থনীয় বলিয়া তাহা স্থায়ী। এমন কি, যাহা স্থায়ী এবং উন্নতিশীল তাহা মঙ্গল হইবেই হইবে, কেবল যাহা অস্থায়ী এবং আত্মঘাতী তাহাই অমঙ্গল রূপে প্রতিভাত হয়,—অমঙ্গল আপনিই আ-

পনার প্রতিবিধান করে। অতএব ঈশ্বর অমঙ্গলের সৃষ্টি করিলেন কেন—এ কথার কোন অর্থ নাই। ঈশ্বর মঙ্গলেরই সৃষ্টি করিয়াছেন, অমঙ্গলের সৃষ্টি করেন নাই। তিনি ক্রমোন্নতি-পরায়ণ মঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্যই ক্রম-ধ্বংশ-পরায়ণ অমঙ্গল আমাদের দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। নৌকা ধাবিত হইলে যাত্রী যেমন মনে করে যে তটদেশ পশ্চাদ্দিকে ধাবিত হইতেছে, সেই রূপ মঙ্গলের বৃদ্ধি দেখিলেই মনে হয় যে অমঙ্গল হ্রাস পাইতেছে, আলোকের উদয় দেখিলেই মনে হয় যে অন্ধকার পলায়ন করিতেছে; তাহা বলিয়া অন্ধকার কি আলোকের ন্যায় সৎ পদার্থ না অমঙ্গল মঙ্গলের ন্যায় সৎ পদার্থ। অতএব যাঁহারা বলেন যে ঈশ্বর যখন সকলেরই স্রষ্টা তখন তিনি অমঙ্গলেরও স্রষ্টা, তাঁহারদের কি মতি-ভ্রম! অমঙ্গল কিছুই নহে, যাহা কিছুই নহে তাহার সৃষ্টি কি রূপ? আলোকেরই সৃষ্টি হইতে পারে অন্ধকারের সৃষ্টি কি রূপ? ঈশ্বর চির-উন্নতিশীল মঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহার আশ্রয়-স্বরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া চির-অবনতিশীল অমঙ্গল আমাদের চক্ষে প্রকাশ পায়, এই মাত্র; তাহা বলিয়া অমঙ্গল বাস্তবিক হইতে পারে না। অতএব কুটিল বুদ্ধির কুমন্ত্রণা দূরে ফেলিয়া দেও।

সকল জ্ঞানের জ্ঞান, সকল প্রেমের আকর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণ, আত্মার অন্তরতম আত্মা যে পরমাত্মা তাঁহাকে হৃদয় মনঃ প্রাণ দিয়া প্রীতি কর, তাহা হইলেই জগৎ সংসার সমস্তই প্রেম-পূর্ণ জ্ঞান-পূর্ণ মঙ্গল-পূর্ণ দেখিবে, সকলি সুধাময় জ্যোতির্ম্ময় এবং শোভাময় দেখিবে, এবং যখন আনন্দ উচ্ছ সিত হইয়া উঠিবে তখন বলিবে যে "স এষঃ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

ভারতবর্ষীয় নীতি-শাস্ত্র।

রাজনীতি-প্রকরণ।

(পূর্ব্ব পত্রিকার অনুবৃত্তি)

"অবৃদ্ধসেবী শাস্ত্রজ্ঞো নৃপঃ শত্রুবশো ভবেৎ।
তস্মাচ্ছাস্ত্রমধিষ্ঠায় ভবেদ্রাজা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥"

কেবল শাস্ত্রজ্ঞ হইলে মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হয় না। বৃদ্ধগণের (বহুদর্শী সজ্জনগণের) সঙ্গ গ্রহণ আবশ্যক। অবৃদ্ধ-সেবী রাজা শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও শত্রুর বশীভূত হন, অতএব শাস্ত্র ও বৃদ্ধ এতদুভয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয় বিজয় করিবেন।

"এবং করণসামর্থ্যাৎ সংযম্যাত্মানমাত্মনা।
নয়ানয়নবিদ্রাজা কুর্ব্বীত হিতমাত্মনঃ॥"

ইন্দ্রিয়ের অধীন না হইয়া, ইন্দ্রিয়দিগকে অধীন করিতে পারিলে, মন আপনা আপনি সংযত হয়। মন সংযত হইলে (সুস্থির হইলে) কিরূপে নীতির আনয়ন করিতে হয়, তাহা জানিতে পারা যায়। অতএব রাজা, বশীকৃত ইন্দ্রিয়-নিচয়ের সাহায্যে মনঃ সংযমন পূর্ব্বক নীতির অনুসরণ করত আপনার হিত সাধন করিবেন।

"জিতেন্দ্রিয়স্য নৃপতের্নীতিশাস্ত্রানুসারিণঃ।
ভবন্ত্যুজ্জ্বলিতা লক্ষ্ম্যঃ কীর্ত্তয়শ্চ নভস্পৃশঃ॥"

যে রাজা জিতেন্দ্রিয় হন—নীতি শাস্ত্রের অনুসরণ করেন, তাঁহার শ্রী-শোভা সকলই উজ্জ্বল হয়, বিশেষতঃ গগন-স্পর্শি কীর্ত্তি লাভ হয়।

"জ্ঞানবৃদ্ধাং স্তপোবৃদ্ধান্ বয়োবৃদ্ধান্ সুদক্ষিণান্।
সেবেত প্রথমং বিপ্রানসূয়াপরিবর্জিতান্।"

যাঁহারা জ্ঞান বৃদ্ধ (পরিপক্ক জ্ঞান-সম্পন্ন)—তপো বৃদ্ধ (যাঁহারা অনেক বিধ পুণ্য কর্ম্ম করিয়া তত্তাবতের ফলাফল বুঝিতে পারিয়াছেন)—বয়ো বৃদ্ধ (যিনি অনেক কাল জীবিত থাকিয়া জগতের গতি

পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন)—সুদক্ষিণ (যিনি সর্ব্বদাই অনুরক্ত)—অসূয়া বর্জিত (অন্যের উৎকর্ষে যাঁহার দ্বেষ হয় না)—এবম্বিধ বিপ্র অর্থাৎ মেধাবি ব্যক্তির সেবা (এবত্র বাসাদি) করিতে হয়।

"তেভ্যশ্চ শৃণুয়ান্নিত্যং বেদশাস্ত্রে বিনির্ণয়ম্।
যদ্ব্রূয়ুস্তে চ তৎ কার্য্যং প্রাজ্ঞৈশ্চৈতন্নৃপশ্চরেৎ।"

তাদৃশ ব্যক্তিরা যাহা উপদেশ করেন তাহার অনুষ্ঠান করিবেন—এবং তাঁহারা যেরূপ আচার-পদ্ধতিতে চলেন সেই রূপ চলিবার অভ্যাস করিবেন—অপিচ, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বদাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবেন।

"পঞ্চেন্দ্রিয়াণি পঞ্চাশ্বাঃ শরীরং রথ উচ্যতে।
আত্মা রথী কশা জ্ঞানং সারথির্মন উচ্যতে।"

ইন্দ্রিয় পাঁচটিকে পাঁচটি অশ্ব—শরীরকে রথ—আত্মাকে রথী—জ্ঞানকে কশা (অশ্ব তাড়নার্থ চর্ম্ম-রজ্জু বিশেষ)—আর মনকে সারথি করিয়া বলিয়াছেন।

"অশ্বান্ সুদান্তান্ কুর্ব্বীত সারথিঞ্চাত্মনো বশম্।
কশা ভূপ! দৃঢ়া কার্য্যা শরীরস্থিরতা তথা॥"

ইন্দ্রিয় রূপ অশ্ব গুলি যাহাতে সুদান্ত হয় তাহা করিতে হইবে—মনোরূপ সারথিকে রথীর অনুগত রাখিতে হইবে—জ্ঞান রূপ কশাকে সুদৃঢ় করিতে হইবে—এবং শরীর রূপ রথ খানি যাহাতে অল্প কালে ভগ্ন না হয় এরূপ করিতে হইবে।

"অদান্তাংস্তু সমারুহ্য সৈন্ধবান্ স্যন্দনী যথা।
অশ্বানামিচ্ছয়া গচ্ছন্নুৎপথং প্রতিপদ্যতে।"

রথী পুরুষ যদি অশিক্ষিত সিন্ধু-দেশীয় অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করেন, আর সেই সকল অশ্ব যদি স্ব-ইচ্ছায় গমন করে, তাহা হইলে তিনি উৎপথে (কুৎসিত পথে) পতিত হইয়া বিপন্ন হন।

"যত্রাবশঃ সারথিস্তু স্বেচ্ছয়া প্রেরয়ন্ হয়ান্।
নয়েৎ পরবশং সম্যক্ প্রথিতং বীরমপ্যুত।"

সারথি যদি রথীর বশীভূত না থাকে, আর সে আপন ইচ্ছায় অশ্ব চালনা করে, তাহা হইলে রথী পুরুষ সম্পূর্ণ বীর হইলেও তাঁহাকে শত্রুর বশ্যতাপন্ন হইতে হয়।

"ধৃতিঃ প্রাগল্ভ্যমুৎসাহো বাক্পটুত্বং বিবেচনম্।
দক্ষত্বং ধারয়িষ্ণুত্বঞ্চ দানং মৈত্রী কৃতজ্ঞতা॥"
"দৃঢ়শাসনতা সত্যং শৌচং মতিবিনিশ্চয়ঃ।
পরাভিপ্রায়বেদিত্বং চারিত্বং ধৈর্য্যমাপদি॥"
"ক্লেশধারণশক্তিশ্চ গুরু-দেব দ্বিজার্চ্চনম্।
অনসূয়া হ্যকোপিত্বং গুণানেতান্নৃপোঽভ্যসেৎ।"

রাজা হইলে তাঁহার এই সকল গুণ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ধৃতি (তুষ্টি ও ধারণা) প্রাগল্ভ্য (প্রৌঢ় ভাব), উৎসাহ (নানাবিধ কার্য্যে উদ্যম) বাক্‌ পটুতা (সদ্বক্তা হওয়া) বিবেচনা (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ) দক্ষতা (কার্য্য নিপুণ হওয়া) ধারয়িষ্ণুত্ব (ধারণা জন্মাইবার শক্তি) দান (বদান্যতা) মৈত্রী (সকলের সহিত মিত্র ভাব) কৃতজ্ঞতা (উপকার স্মরণ করা) দৃঢ়শাসনতা (অপ্রতিহত আজ্ঞা) সত্য, শৌচ (অন্তর ও বহিঃশরীরের নৈর্ম্মল্য সম্পাদন) মতি বিনিশ্চয় (মন্ত্রণা নির্ণয় করিবার শক্তি) পরাভিপ্রায় বেদিতা, চারিত্ব (চর ধর্ম্ম—গোপন ভাবে অনুসন্ধান লওয়া), আপদ্‌কালে ধৈর্য্য, ক্লেশ ধারণ শক্তি, গুরু দেবতা ও ক্রান্তদর্শী ব্যক্তির সম্মান করা, অসূয়া-জয় ও ক্রোধ-জয়।

"কার্য্যাকার্য্যবিভাগঞ্চ ধর্ম্মার্থৌ কামমেব চ।
দানস্য বিষয়ে সাম যোগমেবোপলক্ষ্যতে॥"
"সততং প্রতিবুধ্যেত কুর্য্যাদবসরেপি তৎ।"

রাজার এই কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যথা, ইহা কর্ত্তব্য ইহা অকর্ত্তব্য, (ইহা কার্য্য ইহা অকার্য্য), ইহা ধর্ম্ম ইহা অধর্ম্ম, ইহা প্রয়োজনীয় ইহা অপ্রয়োজনীয়, ইহার নাম সদভিলাষ, ইহার নাম অসদভিলাষ, এতদ্বিষয়ে এতদুপায়ের উপযোগ আছে (যথা, দান রূপ উপায়ের অধিকারে সাম রূপ উপায়ের উপযোগ আছে) ইত্যাদি প্রকার সাধনের প্রতি সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখি-

বেন—সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবেন—অবসর বুঝিয়া অভ্যাস করিবেন, প্রয়োগ করিবেন, ব্যবহারও করিবেন।

"সাম দানঞ্চ ভেদশ্চ দণ্ডশ্চেতি চতুষ্টয়ম্।
জ্ঞাত্বোপায়াংস্তু তৎস্থানে তানুপায়ান্ প্রয়োজয়েৎ॥"

প্রথমত সাম (মিত্রতা বন্ধন), দ্বিতীয় দান (কর বা উপহারাদি প্রদান গ্রহণ), তৃতীয় দণ্ড, চতুর্থ ভেদ (পরকীয় বলের মতি-বিপর্য্যয় করা), রাজাদিগের নিমিত্ত এই চারি প্রকার উপায় নির্ণীত হইয়াছে। রাজারা এই সকল উপায়কে উপযুক্ত স্থানেই প্রয়োগ করিবেন। যেখানে সাম রূপ স্বীকার করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, সে স্থলে দান করিবেন না। এই দানের অধিকারে দণ্ডের, দণ্ডের অধিকারে সাম, বা দান স্বীকার করিবেন না।

"সাম্নস্তু বিষয়ে ভেদো মধ্যমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দানস্য বিষয়ে দণ্ডো হ্যধমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

সাম-সাধ্য বিষয়ে সাম অবলম্বন করাই উত্তম, ভেদ মধ্যম, অন্য গুলি অধম। দান-সাধ্য কার্য্যে দানই ভাল, সাম তদপেক্ষা হীন,* দণ্ড অধম; অন্য গুলি অত্যধম।

"দণ্ডস্য বিষয়ে দানং তদপ্যধমমুচ্যতে।
সাম্নস্তু গোচরে দণ্ডো হ্যধমাদধমঃ স্মৃতঃ।"

দণ্ড রূপ উপায়ের অধিকারে দান পথ অবলম্বন করাও অধম; কিন্তু সামের অধিকারে দণ্ড প্রয়োগ অধম হইতেও অধম।

"সৌজন্যং সততং জ্ঞেয়ং ভূ-ভৃতো ভেদ-দণ্ডয়োঃ।
সাম্নো দানস্য চ তথা সৌজন্যং যাতি গোচরে॥"

ভেদ ও দণ্ডে রাজাদিগের পুরুষত্ব প্রকাশ পায় এবং ভেদিত ও দণ্ডিত ব্যক্তির সহিত সদ্ভাব চিরস্থায়ী হয়, যদি তাহা সুপ্রযুক্ত করিয়া উত্তীর্ণ হওয়া যায়, পরন্তু তদৃশ সৌজন্য সাম ও দানের অধিকারে জন্মিতে পারে না, জন্মিলেও দৃঢ়তা থাকে না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

* দানের উপযুক্ত স্থলে সাম অবলম্বন করায় আপাততঃ লাভ জ্ঞান হয় বটে (যেহেতু অর্থ ক্ষয় হইল না) কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী হয় না, যেহেতু তাদৃশ স্থলে বৈরতার বীজ লাভ-বিশেষের আকাঙ্ক্ষা বিনষ্ট না হইয়া অন্তরে অন্তরে থাকিয়া যায়।

নব-বর্ষ।

বিঘ্নবিনাশন পরমেশ্বরের প্রসাদে আমরা এক বৎসর অতিক্রম করিয়া আর এক বৎসরে পদ নিক্ষেপ করিতেছি। সেই অক্ষয় পুরুষের প্রশাসনে কালস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; তাঁহারই প্রশাসনে ঋতু সকল পর্য্যায়ক্রমে গমনাগমন করিতেছে; তাঁহারই প্রশাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। সেই জ্যোতির জ্যোতি, অমৃত এবং সকলের আয়ুর কারণ পরব্রহ্মের শাসনেই অহোরাত্র দ্বারা সম্বৎসর পরিবর্ত্ত হইয়া আসিতেছে। সেই মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের দ্বারা সুখ দুঃখ প্রভৃতি সকল ঘটনাই বিহিত হইতেছে। এক দিকে যেমন তিনি ধন, মান, যশ, প্রীতি প্রভৃতি সকল প্রকার সুখ জনক ঘটনা বিহিত করিতেছেন, তেমনি অন্য দিকে ভূমি কম্প, জলপ্লাবন, আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দুর্ভিক্ষ, মারী ভয় প্রভৃতি দুঃখজনক ঘটনাও বিধান করিতেছেন। কিন্তু আমরা যে সকল ঘটনা অমঙ্গল ঘটনা বলিয়া মনে করি, তাহা বস্তুতঃ অমঙ্গল ঘটনা নহে। দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য হয় না; দুঃখ ছদ্ম বেশধারী সুখ মাত্র।

"দুঃখ বেশ সুখ ধরে,
জীব না চিনিতে পারে,
সতত আছে তাঁহার মঙ্গল ছায়ায়।"

পরম কারুণিক পরমেশ্বর সকল ঘটনা বিহিত করিতেছেন কিন্তু তিনি নিজে তাহাদের অতীত। সেই অকাল পুরুষের উপর

কাল আপনার আধিপত্য প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি কাল-সমুদ্র-তটে উপবিষ্ট হইয়া আছেন; তাঁহার পদের নিম্ন দিয়া সেই সমুদ্রের প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু তাহা সেই পদ স্পর্শ করিতেও সক্ষম হইতেছে না।

অন্যান্য বৎসরের ঘটনা সকল যখন সেই অকাল পুরুষ দ্বারা নিয়মিত হইয়াছিল গত বৎসরের ঘটনা সকলও তাঁহা দ্বারা সেই রূপ নিয়মিত হইয়াছিল। গত বৎসরে আমাদিগের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু করুণাময় ঈশ্বরের প্রসাদে ও আমাদিগের সুযোগ্য রাজপুরুষদিগের প্রভূত যত্নে আশ্চর্য্য রূপে তাহা সেই দুর্ভিক্ষের করাল কবল হইতে বিমুক্ত হয়। পুরাবৃত্তে অধিক পরিমাণে কেবল মনুষ্যের পাপের বৃত্তান্তই দেখিতে পাওয়া যায়; পুণ্য কর্ম্মের পরিচয় অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের ইংরাজ রাজ-পুরুষদিগের পক্ষে ইহা অল্প গৌরবের বিষয় নহে যে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তে তাঁহাদিগের এই মহৎ কার্য্যটি উজ্জ্বল হিরণ্ময় অক্ষরে লিখিত হইবে। দুর্ভিক্ষ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ঘটনা গত বৎসরে ঘটিয়াছিল, এই পত্রিকা তাহা বাহুল্য রূপে বিবৃত করিবার উপযুক্ত স্থান নহে।

বর্ত্তমান বৎসরে কি সকল ঘটনা ঘটিবে তাহা সেই বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন। মনুষ্যের কি সাধ্য যে ভবিষ্যতের গাঢ় অন্দকার ভেদ করে? কম্পিত চিত্তে আমরা সেই সকল ঘটনা প্রতীক্ষা করিতেছি। কাহার সম্বন্ধে কি ঘটিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না কিন্তু আমরা এই মাত্র জানি যে সেই মঙ্গলময় পুরুষের অনুশাসনে সকল ঘটনা দ্বারা বিশ্বের মঙ্গলই সাধিত হইবে। আমাদিগের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য যে উদ্বিগ্ন চিত্ত না হইয়া প্রফুল্ল মনে সেই শুভার্থি পিতার প্রতি নির্ভর পূর্ব্বক ভাবী ঘটনা সকল প্রতীক্ষা করি।

আমাদিগের এই পত্রিকা সেই বিঘ্নবিনাশন পরমেশ্বরের প্রসাদে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আপনার জীবনের ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসরে পদ নিক্ষেপ করিতেছে। কিন্তু আমরা ইহা নিশ্চয় জানি যে আমাদিগের স্বদেশের লোকের মধ্যে অনেকে এই পত্রিকার শুভ কামনা করিয়া থাকেন। ইহার দীর্ঘ জীবনই তাহার জাজ্বল্যতর প্রমাণ। নব-বৎসরে এই পত্রিকার শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের শুভ কামনা করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাব শেষ করিতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

নামকরণ।

গত ২রা মাঘ ঘাটাল নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীরাম পালিতের পুত্র শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ পালিতের নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভা স্থলে উপাসনা, সংগীত এবং নিম্ন লিখিত বক্তৃতা হইয়াছিল।

"আমরা যেমন কোন পদার্থকে ধ্বংস করিতে না পারিয়া ঈশ্বরের সংহার-শক্তি স্বীকার করি, এবং কোন বস্তুর সৃষ্টি করিতে অক্ষম হইয়া তাঁহার সৃজন শক্তির পরিচয় পাই; তেমনি পালন শক্তি যে সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বরেরই নিজায়ত্ব, তাহা শিশু সন্তানে জাজ্বল্যমান প্রকাশিত দেখি। মৃণালবৎ নাভি-নাড়িকা দ্বারা রস প্রদান করিয়া গর্ভস্থ সন্তার পরিবর্দ্ধন, এবং প্রসবান্তে মাতৃ স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার তাঁহার অনুপম পালনী শক্তির স্পষ্ট প্রমাণ। মনুষ্য কি গর্ভস্থ সন্তার পোষণ করিতে সক্ষম হয়, অথবা ভূমিষ্ঠ শিশুকে দুগ্ধ বিনা বাঁচাইতে পারে? নর শিশুর প্রতি ঈশ্বরের করুণার কি সীমা আছে? অপোগণ্ড বালক মাতৃ ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হয় বলিয়া মাতৃ অঙ্গেই তাহার খাদ্য বিধান! মাতার বাহু যুগল বালকের উপাধান স্বরূপ, বালক যখন যে দিকে শয়ান থাকে তখন সেই দিকে মুখাগ্রেই স্তন প্রাপ্ত হয়! শিশু সুকোমল জিহ্বা ও ওষ্ঠ দিয়া অনায়াসে স্তন পানে সমর্থ হইবে বলিয়া স্তনাগ্র কেমন কোমল ভাবে নির্ম্মিত! আবার কি আশ্চর্য্য! এক দুগ্ধে তাহার ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই নিবা-

রণ হয়, এবং এক মাত্র দুগ্ধ পানে সে দ্রুতবেগে পুষ্ট হইতে থাকে। এক মাত্র যে দুগ্ধ বালকের প্রাণ ধারণের মূল, করুণাময় পরমেশ্বর সেই দুগ্ধে মনুষ্যের আহারের সমুদয় বস্তুর সার ভাগ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জল, লবণ প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ যোগে দুগ্ধ সংরচিত হইয়াছে, অথচ তাহা মুখপ্রিয় মধুরাধিক্য হইয়া শিশুর স্তন্যপান লালসা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে!

এই রূপে গর্ব্ভবাস হইতে স্তন্যপান কাল পর্য্যন্ত শিশুর প্রতিপালন ভার ঈশ্বর স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন; অন্নাশন দিবস হইতেই মনুষ্যের হস্ত তাহার আহার প্রদানে নিযুক্ত হইল। কিন্তু মাতার স্তন দুগ্ধ অবসানে বসুমাতা যে, ফল, শস্য প্রদান করিয়া মানবের পুষ্টি বিধান করেন; তাহাও তাঁহার কৃপা ভিন্ন নহে।

স্তন পান অবসানে অন্ন দেয় ধরা,
ঈশ্বরের সদাব্রতে সব আছে ধরা।

শিশুর সুখ ও সুবিধার নিমিত্ত পরমেশ্বর যেমন মাতৃ স্তনে দুগ্ধ বিধান করিয়াছেন, তাহার মঙ্গলের জন্য তেমনি মাতা ও পিতা উভয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন। একের অভাবে, অযত্ন ও অস্নেহ ঘটিলে, অন্যে সমধিক যত্ন ও স্নেহ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। পুত্রগত প্রাণ পিতা মাতার ত কথাই নাই, সাধারণ মানব মণ্ডলিও শিশুর প্রতি দয়াবান হয়েন। ইহা ঈশ্বরেরই কৃপার চিহ্ন।

" তাঁহার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম জননী হৃদয়ে করে বসতি "

হে জগৎ পিতা পরমেশ্বর! তোমার অপার করুণা-গগনের এক বিন্দুবৎ স্থান এই বালক অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বীজোদ্ভিন্ন দ্বিদল সহস্র রশ্মি দিবাকরের কত কিরণ আকর্ষণ করিতে পারে? কিন্তু যত তাহা শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইয়া উন্নত ও ফল পুষ্পে নিবিড় দর্শন হয়, ততই অধিক পরিমাণে সূর্য্যের কিরণ প্রাপ্ত হয়। যখন এই শৈশবাবস্থার অত্যল্প প্রয়োজনোপযোগী তোমার করুণা রাশি গণনা করা যায় না, বালকের বয়োবৃদ্ধি সহকারে যখন তোমার করুণা অবিরত অজস্রধারে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, এবং কেবল এ জন্মে নহে—এ পৃথিবীতে নহে, অনন্ত কালে, অনন্ত উন্নত লোকে তোমার করুণা ইহার আত্মা উপভোগ করিবে; তখন কি সে অপার করুণার অন্ত হইতে পারে? হে করুণাময়! তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব, তুমিত প্রার্থনার অপেক্ষা কর নাই। যেমন গর্ব্ভাবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মাণ করিয়া, এই বালককে কর্ম্ম-ক্ষেত্র পৃথিবীর যোগ্য করিয়াছ; তেমনি ইহাকে পৃথিবীতে রাখিয়া স্বর্গ লোক বাসের উপযুক্ত করিয়া দেও। ইহার বাল্যকাল সুলভ সত্য সরল নির্ম্মল ভাব যেন আজীবন রক্ষা পায়। ইহার সৎপ্রবৃত্তি সকল যেন সদ্‌গুরু ও সাধু সঙ্গ দ্বারা সমুন্নত হয়। হে দয়াসিন্ধো! তোমার কৃপায় এই বালক যেন চির সুহৃদ ভাবিয়া তোমার সহচর অনুচর হইয়া চির জীবন তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করে, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইয়া তোমার মহিমা কীর্ত্তন ও জয় ঘোষণা করিয়া জীবনের সার্থক্য বিধান করে।

"ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

শ্রাদ্ধ।

৩ ফাল্গুন শনিবার।

মাতার চতুর্থী শ্রাদ্ধ ক্রিয়াতে শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীর প্রার্থনা।

হে বিশ্ব জননী অখিল মাতা! তিন রাত্রি গত হইল আমার মাতা তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় এলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। তুমি যেমন তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া তাঁহার রোগ যন্ত্রণা শান্তি করিলে, সেই রূপ সেখানে তাঁহাকে আপনার অভিমুখে আনিয়া সংসারের পাপ তাপ হইতে নিস্তার কর। তাঁহাকে সত্য জ্যোতিতে ও মঙ্গল ভাবে ভূষিত করিয়া তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার প্রসাদে তোমার আশ্রয়ে তাঁহার আত্মা যেন অনন্ত কাল উন্নতি লাভ করে। আমি মাতৃ হীনা হইয়া সংসারের অনেক সুখে বঞ্চিত হইলাম। তাঁহার সেই কোমল শান্ত মূর্ত্তি আর এ পৃথিবীতে দেখিতে পাইব না এবং তাঁহার সেই স্নেহময় বাক্য আর শুনিতে পাইব না। তাঁহাকে যেমন সংসারের সকল সুখে সুখী করিয়া ছিলে, এখন তাঁহার আত্মাকে তোমার অমৃত ক্রোড়ে রাখিয়া আরও সুখী কর। জননী লোকান্তরে সুখী হইলেও আমি এখানে সুখী হইব। মাতা যেমন তোমার অনুরূপ হইয়া তোমার আজ্ঞানুসারে আমাকে এত দিন লালন পালন করিলেন এবং তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আমাকে আবার পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, হে ঈশ্বর! সেইরূপ তুমি তাঁহাকে তোমার শান্তি নিকেতনে লইয়া শান্তি প্রদান কর। হে পরমাত্মন্! তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক জগতের মঙ্গল হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

৭ চৈত্র শনিবার।

মাতার আদ্য শ্রাদ্ধে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রার্থনা।

হে বিশ্বপাতা পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আমার স্নেহময়ী মাতা এলোক হইতে অবসৃত হইলেন। তোমারই শুভ সংকল্প সাধন করিবার জন্য তিনি আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এখানে আর আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইব না, তাঁহার আহ্বান আর শুনিতে পাইব না। আমাদের স্নান ভোজনের একটুকু বিলম্ব হইলে তাহার প্রতিবিধানের জন্য তেমন আগ্রহ আর দেখিতে পাইব না। কোন বিষয়ে অনিয়ম করিলে তেমন মিস্ট ভৎসনা আর আমরা শুনিতে পাইব না। কোন প্রতিষ্ঠার কার্য্য করিলে তেমন উজ্জ্বল হাস্যমুখ আর দেখিতে পাইব না। পীড়ার সময় তেমন হস্তের স্পর্শ আর আমাদিগকে আরোগ্য প্রদান করিবে না। হে বিশ্ব জননী! তাঁহাকে যেমন রোগ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দিয়া গত-ব্যথ করিলে, সেই রূপ তাঁহার আত্মাকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া অক্ষয় আনন্দে প্লাবিত কর। নীরোগ শরীরে তাঁহার সমীপস্থ হইলে আমরা যেমন তাঁহার প্রসন্ন মুখ অবলোকন করিতাম, এবং তিনি যেমন আমারদিগকে তাঁহার নিকটে বসিতে বলিতেন, তিনি যেন সেই রূপ তোমার প্রসন্ন মুখ অবলোকন করিয়া সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হন, এবং তোমার অমৃতময় সন্নিধানে আনন্দে বিচরণ করেন। এখানে যেমন তাঁহার দয়া, হিতৈষণা ও ধর্ম্ম-নিষ্ঠা সকলের মন আকর্ষণ করিত, সেখানে তোমার প্রসাদে সে সকল হইতে যেন মধুময় ফল প্রসূত হইতে থাকে। আমাদের কৃতজ্ঞতা যেন চিরকাল তাঁহার প্রতি জাগরিত থাকে। তোমার প্রসাদে আমাদের এই বংশ যেন তোমার ধর্ম্ম পথে চিরকাল অবস্থান করে।

ওঁ মধু বাতাঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌ রস্তু নঃ পিতা মধুমান্ নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

ওঁ পুরুষোত্তমাদ্বলরামো বলরামাদ্ধরিহরো হরিহরাদ্রামানন্দো রামানন্দাম্মহেশো মহেশাৎ পঞ্চাননঃ পঞ্চাননাজ্জয়রামো জয়রামান্নীলমণি নীলমণে রামলোচনো রামলোচনাদ্দ্বারকানাথো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ং চ নোঽস্ত্বিতি। ওঁ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

REMINISCENCES OF RAMMOHUN ROY.

No. 3

Question. "The Omniscient God only exists in reality and the world appears as such to the imagination of men and has no substantial entity in itself. This is in just the same way as a piece of rope is sometimes mistaken for a serpent." Substance of Shankaracharya's comments on the second text of the Sharirika Mimansa of Vyasa.

Is not this Idealism? And is it not the system of philosophy taught in the Vedas?

Answer. The Gayatri, designated the mother of the Vedas, a most revered text of the Hindu Scriptures, with the Pranava and Vyarhiti preceding it and followed again by the Pranava, as it is daily repeated in the morning and evening prayers in this country, and most portions of the Upanishads clearly prove that Idealism forms no part of our most ancient creed but you must remember that Shankaracharya had to fight with Buddhism. The meaning of the above theory of this great commentator's Vedanta Darshana is that nothing exists but in God who pervades by his omnipresence the whole spiritual and material universe of which we can form any idea. There is nothing beside Him—nothing that has separate existence out of Him.*

* Ram Mohun Roy had never seen the philosophical works of Sir William Hamilton, but one of the lectures of this great philosopher of Great Britain strongly corroborates the Vedantic idea of creation.

[This passage of Hamilton was published in this journal as an extract. ED. T. P.]

He is in fact the supreme soul of the universe, all other souls, superhuman and human, being but shadows of Him.

Q. But is matter existent only in idea as Berkeley and other philosophers if England teach or has it any real *ens* as Reid and others endeavour to prove?

A. In answer to this question, Ram Mohun Roy repeated the following verses of the Bostan of Sadi.

"You must have seen in the fields and gardens after night-fall a little worm brilliant as a lamp. Some person once asked it—'What is the matter with thee that thou appearest not during day light?' Lo! What a clever answer the glow worm, born from the mist of the earth, gave to him! 'Both in the day and at night I am always to be found in the field, but I have no glare when the sun shines.'"

Matter is as great a reality as spirit owing their existence to the will of the Supreme Creator of the world. To say that the world exists not is to deny the power of God and to charge Him with falsehood and deception. You may as well say that you and I do not exist. A man, who sees every thing in God, sees nothing but God during divine contemplation. The glow-worm of the universe continues to exist at the will of the Supreme Brahma, but he, who loses himself in devotion to God, sees not the minor lights of the world, not even the solar orb which to him may be said to have no being whatever except when the Great Sun goes out of his mental ken.

Q. This then is what is called Pantheism?

A. It may be so, but what of that? The Vedas teach that the Supreme Being pervades eternal existences of every description, spiritual as well as material. He is in flue the Supreme Soul of the Universe. As the human soul permeates our body from one end to the other, so does God pervade all space and time and every thing contained in them.

Q. Is He not then a personal God?

A. God has as much personality as the soul of man. His laws, inscrutable as they are, create and rule the world. The Upanishads only deny that He is a walking and speaking God or a God thinking as a man does think. He does every thing by intuition as it were. He walks not and handles nothing and He does not speak. Our Shastras teach that He is the omniscient and omnipresent Being, the god of gods and the king of kings and sees through every thing and on all sides from eternity to eternity all at once.

Q. What then becomes of His moral government? Does He reward virtue and punish sin or does He live in bliss alone as the Being whose essence is truth, intelligence and happiness. "Shachchidananda Purusha."

A. His depth and breadth are unfathomable. The little we know of him we know through intuition only. The mind possesses consciousness and this consciousness, if it teaches anything, instructs us that we are existent and are existing independently of everything exterior to us, in fact, that we have separate independent existence of our own. This existence we feel had a beginning. Whence then did we derive our existence? Our parents were unconscious causes of our birth and were led on to occasion it by laws unknown to them. These laws must have a law-giver. Our existence must also have a purpose in view though we may not exactly know what that purpose is, and this object of our creation we must fulfil if the law-giver is omniscient and omnipotent. Coming to this point, we further see that our mind is

endowed with a conscience within it and this principle always warns us that we have duties to perform and responsibilities to undergo, and that these barriers cannot be passed over quite lightly at any time. In short that we live under laws of another kind distinct from those of our existence just above referred to. This atonce leads us to the consideration of the moral government of God, who must be not only a law-giver but also a moral and just governor of the world. For what else is the warning power of conscience given us if we toil for ourselves alone? God may be always present with us but He is with and in us as a monitor and witness merely. His eternal laws reward and punish us according to our merits. It is hardly necessary to enter into any proof to show that our mind has a power of activity that works through the body in perfect Independence of any thing else than our individual appetites and inclinations. These movements of our will cannot be but for both good and bad. Such is human nature. Reward and punishment, therefore, must be the inevitable consequences of our virtuous and vicious acts. This reasoning sufficiently proves that we live under the laws of a most merciful and most powerful all-pervading Providence. Such is the purport of the entire body of the Hindu Scripture.

Q. Is there not something irreconcilable in the two sets of doctrines designated Pantheism and the Moral Government of God?

A. It seems blasphemy to think that God has ordained hells for the punishment of man. Our hearts are our heavens and our hells, our Indralok and our Pandemonium. The soul of man is encased in the heart and is not consumed in fire or buried in the earth with our body. It exists after our present life.

[If my memory fails me not, such was the general purport of several conversations which I had with Ram Mohun Roy in 1827. These may not be the exact words he used but I have] faithfully given the purport as far as it has come to my recollection.]

C. S. D.

সংবাদ।

বিগত ৫ পৌষ শনিবারি বন্দুহাটী ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব-কার্য্য তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজ গৃহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেদীর কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্য কুমার মুখোপাধ্যায় ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমাধা করেন। সূর্য্য বাবু আধ্যাত্মিক যোগ সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন এবং বেচারাম বাবু উদ্বোধন, বক্তৃতা এবং উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। উপাসক সমূহে সমাজ গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল।

বিগত ২২ মাঘ বুধবার বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক মহোৎসবের কার্য্য সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃ সন্ধ্যা উভয় কালেই সে দিন তথায় ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে অনেক গুলি দীন দরিদ্রকে অর্থ দান করা হইয়াছে।

রাত্রি কালের উপাসনায় শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেচারাম বাবু উদ্বোধন ও বক্তৃতা করেন, দীননাথ বাবু উপাসনার অপর অঙ্গ সম্পাদন করিয়াছিলেন। সংগীত কার্য্য সুন্দর রূপে বিনির্ব্বাহিত হইয়াছে। প্রাতঃকালেও দীননাথ বাবু উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিয়া সকলের ঈশ্বর অনুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়াছিলেন।

রাত্রি কালের উপাসনায় বোধ হয় তিন চারি শত লোক একত্রিত হইয়াছিলেন। তত্রত্য ব্রাহ্মগণ বহরমপুর ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন, ইহা আমারদের বাঞ্ছনীয়।

বিগত ১০ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান সমাজের মহোৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। রাত্রিকালের উপাসনা কার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সমাধা করিয়াছিলেন। উপাসকগণে উৎসব-ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছিল। মুদ্রিত সংগীত গুলি উক্ত সমাজের সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় গান করিয়াছিলেন।

বিগত ২৪ ফাল্গুন রবিবার চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ গড়গড়ী মহাশয় সম্পাদন করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে ৮০ জন দীন দরিদ্রকে নূতন বস্ত্র প্রদান ও অর্থ সাহায্য করা হইয়াছিল।

রাত্রি কালের উপাসনা কার্য্য শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সমাধা করিয়াছিলেন। সমাজ আরম্ভ কালে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একটী প্রেম-পূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন, তৎপরে একটী সংগীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হয়। স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা হইলে একটী সংগীত হইয়াছিল। তাহার পর বেদী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্লোক তাৎপর্য্য সহিত পাঠ ও বক্তৃতা হইলে চন্দ্র বাবু নিম্ন হইতে একটী স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে যথা পদ্ধতি চারিটী সংগীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল। উপাসকগণে উৎসব-ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছিল।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ তাঁহাদিগের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

আগামী ২০ শে বৈশাখ রবিবার প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় নন্দন-বাগানস্থ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু দ্বারা অভিব্যক্ত। মূল্য ।০ আনা, ডাক মাশুল /০ আনা। আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

আয় ব্যয়।

ফাল্গুন ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ

আয়	২৪৫৸১০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৫৭২।৶১০
সমষ্টি	৮১৮।০
ব্যয়	৪২৬॥৵১৫
স্থিত	৩৯১॥/৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৭৮
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	১০১।৶১০
পুস্তকালয়	১৩॥৵০
যন্ত্রালয়	৪৩
গচ্ছিত	৯॥৶০
সমষ্টি	২৪৫৸১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১২০॥ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০৫ ।৫
পুস্তকালয়	২২ ৶১০
যন্ত্রালয়	৫১।৶১৫
ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার অধীন পরিব্রাজকের ব্যয়	৩৫
গচ্ছিত	৯২।৶০
সমষ্টি	৪২৬॥৵১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	২০
শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর মধ্যের দান ...	১৯
" যজ্ঞেশ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় ...	১০
" প্রেমচাঁদ বড়াল ...	৫
" প্যারীচাঁদ মিত্র ...	৫
" আশুতোষ ধর ...	৪
" তারকনাথ দত্ত ...	৩
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	২
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	২
" নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ...	২
" যাদবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় .	১
" জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ...	১
" জয়গোপাল সেন ...	১
" গোপালচন্দ্র মল্লিক ...	১

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধামোহন বসু ...	২
	৭৮

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩২। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬। ১ বৈশাখ মঙ্গলবার।

Registered No 52.
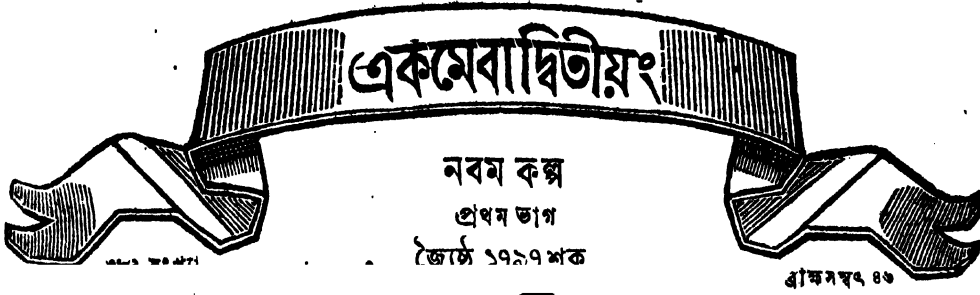
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে

বর্ষ-শেষের ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ চৈত্র ১৭৯৬ শক।

কতিপয় ঘণ্টা পরে আমরা এক বর্ষ অতিক্রম করিয়া আর এক বর্ষে পদ নিঃক্ষেপ করিব। বর্ত্তমান বর্ষে কত স্থানে হাস্যোল্লাস হইয়াছে; কত স্থানে শোকাশ্রু পতিত হইয়াছে; কত স্থানে কত চিত্ত হর্ষে উৎফুল্ল হইয়াছে; কত স্থানে কত চিত্ত নিরাশ পঙ্কে পতিত হইয়াছে। কতিপয় ঘণ্টা পরে বর্ত্তমান বৎসর ঐ সমস্ত সুখ দুঃখের সহিত, ঐ সমস্ত হাস্যোল্লাস ও শোকাশ্রুর সহিত, ঐ সমস্ত আশা ভরসা ও নিরাশার সহিত অনন্ত কাল সাগরে বিলীন হইবে।

অদ্যকার দিবসে আমাদের তিনটি কর্ত্তব্যের উদয় হইতেছে। প্রথমতঃ সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়া মৃত্যুকে স্মরণ করা; দ্বিতীয়তঃ বর্ত্তমান বৎসরে ঈশ্বরের নিকট যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা; তৃতীয়তঃ বর্ত্তমান বৎসরে আমরা যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহার জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।

বৎসরের গমনাগমন আমাদিগকে সংসারের অনিত্যতা ও মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যতই বর্ষ যাইতেছে, ততই আমরা মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হইতেছি। "গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হলো এত, বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে। এসব কথার ছলে কিম্বা ধন জন বলে, তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে।" জীবন কি অনিত্য! আমরা যে কয় জন এখানে উপস্থিত আছি, সকলেই কি আগামী বৎসরের শেষ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিব? আগামী বৎসরের শেষ দিন দূরে থাকুক, পরশ্ব সাপ্তাহিক উপাসনার দিবস—বুধবার উপাসনার সময় পর্য্যন্ত আমরা কি সকলে জীবিত থাকিব? পরশ্ব উপাসনার সময় দূরে থাকুক, কে এমন নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে যে, আমরা অদ্য সমাজ ভঙ্গের সময় পর্য্যন্ত সকলেই জীবিত থাকিব? এ বিষয়ে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্ব্বল। আমার বক্তৃতা শেষ না হইতে হইতেই আমার বাক্‌শক্তি একবারে চিরকালের মত নির্ব্বাণ হইতে পারে। এই ত গেল আমারদিগের নিজের কথা। প্রিয় ব্যক্তিদিগের কথা আর কি বলিব? মৃত্যুর হস্তে

প্রিয় ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার পালা, কখন কাহার আইসে তাহা বলা যায় না। এখনই এক জন দ্রুত বেগে আসিয়া তোমাকে বলিতে পারে যে তোমার অমুক প্রিয় ব্যক্তি মৃত্যু শয্যায় পতিত হইয়াছে। জীবন কি অনিত্য! কিন্তু সাংসারিক মোহে অভিভূত হইয়া আমরা মৃত্যুকে আদোবেই স্মরণ করি না। "আদিত্যস্য গতাগতৈর্‌ অহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং, ব্যাপারৈর্বহুকার্য্যকারণশতৈঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে। দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিয়োগমরণং ত্রাসঞ্চ নোৎপদ্যতে, পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ॥" "আদিত্যের গমনাগমনে জীবন অহরহ ক্ষয়িত হইতেছে; শত প্রকার কার্য্য কারণ ব্যাপারে কালের গতি অনুভূত হইতেছে না; জন্ম জরা বিয়োগ মরণ দর্শন করিয়া ত্রাসের উৎপত্তি হয় না; জগৎ মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত রহিয়াছে।" আমরা এই মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান করিয়া ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলিয়াছেন, "যদি মৃত্যু না থাকিত, মনুষ্য আদোবেই ঈশ্বরকে স্মরণ করিত না।" বস্তুতঃ যদি এমন কোন দৃশ্য থাকে যাহা উল্লিখিত প্রমোদ মদিরা পান জনিত মত্ততা দূর করিতে পারে, তাহা মৃত্যু দর্শন।

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টি হীন, নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর॥

এক জন ঘোর সংশয়বাদী আমাকে বলিয়াছিলেন, যে যখন এই গান তিনি প্রথম শুনিলেন, তখন তাঁহার আত্মার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। "সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ," এই বাক্য মৃত্যু ঘটনার চিত্রটি আমাদের সম্মুখে কেমন আনয়ন করিয়া দিতেছে। মহাত্মা রামমোহন রায় এস্থানে কি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন! কিন্তু মৃত্যু দর্শনে মনে যে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়, তাহা স্থায়ী হয় না। "শ্মশান বৈরাগ্য" এই বাক্য আমাদের দেশে প্রসিদ্ধই আছে। অতএব আমাদিগের কর্ত্তব্য যে, প্রতিদিবস কোন নির্দ্দিষ্ট সময়, মৃত্যু স্মরণে অর্পণ করি। তাহা হইলে উল্লিখিত বৈরাগ্য ভাব আমাদিগের মনে স্থায়ী হইতে পারে। পুরাবৃত্তে আমরা কোন রাজার বিষয় পাঠ করি, প্রতিদিবস প্রাতে যখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিত, "মহারাজ! আপনার সমাধিমন্দিরের জন্য আর একটি প্রস্তর খণ্ড চলিল," এবং সত্য সত্যই প্রত্যহ একটি প্রস্তর খণ্ড ঐ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য প্রেরিত হইত। কিন্তু বিষাদ ভাবের সহিত মৃত্যুকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য হয় না। নির্ভয় হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে তাহা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। যতই তুমি নির্ভয় হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে মৃত্যুকে স্মরণ করিতে সক্ষম হইবে, ততই জানিবে যে তোমার ধার্ম্মিকতা বৃদ্ধি পাইতেছে। বস্তুতঃ প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি মৃত্যুর দিবসে বিষণ্ণ হয়েন না; বরং তিনি মৃত্যুর দিবসকে উৎসবের দিবস জ্ঞান করেন। তিনি তাঁহার ক্রন্দনশীল পরিজনদিগকে বলেন, "তোমরা কেন ক্রন্দন করিতেছ? ক্রন্দন না করিয়া বরং অদ্য উৎসব কর, অদ্য পারলৌকিক আনন্দের সহিত আমার আত্মার পরিণয় কার্য্য সমাধা হইবে। অদ্য আমার গলদেশে পুষ্প মালা লম্বমান কর; অদ্য আমার শয্যাকে শোভন বস্ত্র দ্বারা শোভিত কর।"

বর্ত্তমান বর্ষে আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি তা-

হার জন্য অদ্য আমাদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অতি কঠিন কার্য্য। যখন প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাসে ঈশ্বরের করুণা দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তখন এমন ব্যক্তি কে আছে যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কার্য্যের শেষ করিতে পারে? প্রত্যেক শ্বাসে আমরা শোণিতের জীবনীশক্তি সাধন উপাদান শরীর মধ্যে পরিগ্রহ করি; প্রত্যেক প্রশ্বাস দ্বারা জীবনের অনিষ্টকর পদার্থ আমরা শরীর হইতে পরিত্যাগ করি। যখন প্রত্যক্ষ শ্বাসে ও প্রশ্বাসে আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, তখন কাহার সাধ্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। জল, বায়ু, জ্যোতি প্রভৃতি এই সকল সামান্য পদার্থ হইতে আমরা কতই উপকার প্রাপ্ত হইতেছি, কিন্তু উপকার গণনার সময় আমরা তাহা ধরি না, যেহেতু, সে সকল পদার্থ সামান্য। গ্রীক পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি নরকে অতি অদ্ভুত শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে ব্যক্তি তৃষ্ণায় কাতর, কিন্তু যখন সে জল পান করিতে যায় জল তাহার ওষ্ঠদেশ হইতে পলায়ন করে। আমাদের যদি ওইরূপ দশা হইত, তবে আমরা জলের মর্য্যাদা বুঝিতে পারিতাম। আমাদিগের পুরাণে কথিত আছে, কোন এক ঘটনা উপলক্ষে পবন এক সময় জগৎ একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই রূপ ঘটনা যদি যথার্থ ঘটে, তবে আমরা বায়ুর মর্য্যাদা বুঝিতে পারি। যদি সূর্য্যাস্ত সময়ে আকাশ-বানী হয় যে এই যে সূর্য্য অস্তমিত হইতেছে তাহা আর উদিত হইবে না, তখন জগতের সমস্ত লোক কি ব্যাকুলিত নয়নে সেই সূর্য্যের অস্ত দর্শন করে এবং কি কাতর চিত্তে তাঁহাকে জন্মের মত বিদায় দেয়! সূর্য্য, বায়ু, আকাশ সামান্য পদার্থ বলিয়া আমরা তাহাদের মর্য্যাদা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি ছয় মাস ব্যাধি শয্যায় পতিত থাকিয়া আরোগ্য লাভ পূর্ব্বক বাটী হইতে প্রথম বহির্গমন করিয়া ভ্রমণ করে, তাহাকে সূর্য্য, বায়ু, আকাশ এই সকল সামান্য পদার্থ কত সুখ প্রদান করে, তাহা সেই বলিতে পারে। বর্ত্তমান বৎসরে ঈশ্বরসৃষ্ট সামান্য পদার্থ সকল হইতে কতই উপকার না প্রাপ্ত হইয়াছি! বর্ত্তমান বৎসরে আমরা কত নির্দোষ ইন্দ্রিয় সুখ উপভোগ না করিয়াছি! বর্ত্তমান বৎসরে অমৃত ফলের আস্বাদ রসনেন্দ্রিয়কে কতই না পরিতৃপ্ত করিয়াছে! সুমিষ্ট বিহঙ্গ রব, সুমধুর সঙ্গীত স্বর কর্ণ কুহরে কতই না সুধা বর্ষণ করিয়াছে! সুগন্ধ মনোহর পুষ্প ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে কতই না প্রমোদিত করিয়াছে! সুমন্দ মারুত হিল্লোলে আমরা কতই না স্পর্শ সুখ অনুভব করিয়াছি! যে সৌন্দর্য্য জগৎস্রষ্টা জগতের উপর বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান বৎসরে আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়কে কতই সুখ না প্রদান করিয়াছে! সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত কালের আকাশের শোভন বিচিত্র বর্ণ, মনুষ্যের দেবতুল্য মুখ মণ্ডল, তাঁহার কৃত শিল্প সৌন্দর্য্য কি পর্য্যন্ত না আমাদিগকে আহ্লাদিত করিয়াছে! পূর্ণ চন্দ্র যখন আকাশে উদিত হইয়া সুকোমল রশ্মি দ্বারা জগৎকে রজত রঞ্জনে রঞ্জিত করিয়াছিল, তখন আমরা কতই না আনন্দিত হইয়াছিলাম! শিশুর সুন্দর মুখ মণ্ডল দর্শন করিয়া আমাদিগের চিত্ত কতই না আকৃষ্ট হইয়াছিল! পুষ্পের রমণীয় লাবণ্য দেখিয়া আমরা কতই না মোহিত হইয়াছিলাম! পূর্ণ চন্দ্র, শিশু ও পুষ্প যদি জগতে না থাকিত, তবে জগৎ মরুভূমিবৎ প্রতীয়মান হইত! বর্ত্তমান বৎসরে এক এক মনোবৃত্তি পরিচালনা জনিত সুখ কতই না আমরা সম্ভোগ করিয়াছি। যুক্তি ও বিচার

শক্তি পরিচালনা করিয়া যখন আমরা কোন তত্ত্ব স্থির করিয়াছি, তখন কি বিমলানন্দ আমাদের চিত্তকে পূর্ণ করিয়াছে! সুকল্পনা শক্তিকে তাহার নিজাধিকার রম্য প্রদেশে সঞ্চরণ করিতে দিয়া কি উল্লাস না প্রাপ্ত হইয়াছি! বর্ত্তমান বৎসরে বিদ্যানুশীলন জনিত আমরা কতই মহৎ সুখ সম্ভোগ না করিয়াছি। যে কবিতা আমাদের সৌন্দর্য্যানুভব শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া জীবনকে জ্যোতির্ম্ময় করে, সেই কবিতা পাঠ করিয়া আমরা কতই না সুখী হইয়াছি! পুরাবৃত্তে বিবৃত ঘটনাতে ঈশ্বরের হস্ত দেদীপ্যমান দেখিয়া কতই না আনন্দিত হইয়াছি! বিজ্ঞান হইতে আমরা কত আশ্চর্য্য সম্বাদ প্রাপ্ত না হইয়াছি এবং সেই কবির উক্তির যথার্থতা কতই না অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছি, যিনি বলিয়াছেন যে, "সত্য উপন্যাস অপেক্ষাও অদ্ভুত"! বর্ত্তমান বৎসরে স্নেহ প্রীতি জনিত কতই সুখ না আমরা সম্ভোগ করিয়াছি! কার্য্য স্থলে যখন আমরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে পরিশ্রম করিয়াছি, তখন সন্ধ্যা কালে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কতক্ষণে আমরা বন্ধুর সহবাস লাভ করিব, এই জন্য ব্যাকুল হইতাম; গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যখন আমরা বন্ধুর নিকট যাইয়া তাঁহার সহবাস লাভ করিয়াছি, তখন আমরা কি পর্য্যন্ত না আনন্দিত হইয়াছি! বর্ত্তমান বৎসরে শিশু সন্তানের অর্দ্ধস্ফুট ভাষা শ্রবণ করিয়া ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, পিতা মাতাকে ভক্তি করিয়া ভ্রাতা ভগিনী ও প্রতিবাসীকে স্নেহ করিয়া কতই না সুখী হইয়াছি। বর্ত্তমান বৎসরে অন্যের উপকার করিয়া কি পবিত্র আনন্দ না আমরা সম্ভোগ করিয়াছি! 'যখন দরিদ্র ব্যক্তি আমাদের কৃত উপকারের জন্য আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছে, তখন আমরা কি পর্য্যন্ত না আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি! বিশেষতঃ ঈশ্বর চিন্তা দ্বারা আমরা যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা কি প্রকারে বর্ণন করিব? ঈশ্বর চিন্তা কি মধুর! তাহার ন্যায় মধুর পদার্থ কি জগতে আর আছে? যদি দৈত্য নামক নিষ্ঠুর প্রকৃতি উপদেবতা যথার্থই থাকিত এবং আমাদিগের মানসিক বৃত্তি রোধ করিবার ক্ষমতা তাহার থাকিত, এবং সে যদি আমাদিগের ঈশ্বর চিন্তা একেবারে নিরোধ করিয়া ফেলিত, তবে কি আমরা তাহার পায়ে ধরিয়া অত্যন্ত মিনতি পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতাম না যে, এক মুহর্ত্ত নিমিত্তেও আমাদিগকে সেই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে দেও যে আমরা কৃতার্থ হই? আমরা বর্ত্তমান বৎসরে জগতের সামান্য পদার্থ হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি—যে সকল নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয় সুখোপভোগ করিয়াছি—মনোবৃত্তি সকল পরিচালনা করিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি,—বিদ্যানুশীলন করিয়া যে সকল সুখ প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্যকে স্নেহ ও প্রীতি করিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছি—অন্যের উপকার সাধন করিয়া যে পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিয়াছি, বিশেষতঃ ঈশ্বর চিন্তা করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? মানবীয় ভাষায় এমন শব্দ কি আছে, যে তদ্দ্বারা আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাব ব্যক্ত হইতে পারে? এ বিষয়ে নিস্তব্ধ থাকাই শ্রেয়ঃ।

গত বৎসরে আমরা যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহার জন্য অদ্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা আমাদের কর্ত্তব্য। যখন আমরা বিবেচনা করি, যে আমরা পাপে কি-পর্য্যন্ত মলিন, আর তিনি "অপাপবিদ্ধং" পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না,—যখন আমরা আমারদিগের জঘন্যতা ও

তাঁহার শুভ্র নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা অনুভব করি, তখন আমাদিগের আপনাদিগকে কি অধম বলিয়া বোধ হয়। আমরা কত বার প্রতিজ্ঞা করি যে পাপ করিব না, আবার পুনরায় পাপে লিপ্ত হই। যেমন অপবিত্র পদার্থ-ভোজী পশু অপবিত্র পদার্থ ভক্ষণ করিয়া আবার যখনই তাহা প্রাপ্ত হয় তখনই তাহা ভক্ষণ করে, তেমনি আমরা পাপ করিয়া পুনরায় যখন তাহা করিবার সুযোগ হয়, তখন তাহা হইতে নিবৃত্ত হই না। মনুষ্যের পাপের জন্য ঈশ্বর তাহাকে নিত্য শাস্তি প্রদান করেন, এ মতে আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোকেরা এই মতে যে বিশ্বাস করেন, তাহাতে আমি আশ্চর্য্য হই না, যেহেতু আমাদিগের অসাধুতা এতদ্রূপ যে তাহা কোন মতে ক্ষমার যোগ্য নহে। আমরা কোন মতেই ক্ষমার যোগ্য নহি তথাপি ঈশ্বরের কি করুণা! তিনি আমাদিগকে ক্ষমা করেন। কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষমা প্রাপ্ত হইবার একটি নিয়ম আছে নিয়ম এই যে যদি আমরা কৃত পাপের জন্য অনুতাপ করি ও তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি। "কৃত্বা পাপানি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে। নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে তু সঃ।" মন অনুতাপানলে দগ্ধ হইলে দেখা যায় যে ঈশ্বর করুণা করিয়া পরিশেষে সেই দগ্ধ আত্মার উপর আত্ম প্রসাদের অমৃত বারি সিঞ্চন করিয়া তাহাকে শীতল করেন। অনুতাপ না করিলে কখন আমরা ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হইতে পারি না। অনুতাপ রূপ জ্বলন্ত অগ্নিময় দ্বার দিয়া তাঁহার ক্ষমা রূপ গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু আমরা যদি কেবল অনুতাপই করি এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত না হই, তবে সে অনুতাপ বৃথা হয়। ঈশ্বরের নিকট অনুতাপ করিয়া পাপে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার সঙ্গে উপহাস করা মাত্র। যত বর্ষ গত হয়, ততই ধর্ম্মে উন্নত হওয়া আমাদিগের কর্ত্তব্য। যদি আগামী বৎসরের শেষ দিন আমাদিগকে অদ্য হইতে সাধুতর না দেখে তবে আমাদিগের ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বন বৃথা।

হে পরমাত্মন্! অনুতাপিত চিত্তে তোমার সিংহাসন সমীপে আমরা আগমন করিতেছি, বর্ত্তমান বৎসরে আমরা যে সকল পাপ করিয়াছি, তাহা তুমি তোমার করুণা গুণে মার্জ্জনা কর। আমরা পাপ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হইতেছি, এ দুর্গতি হইতে, হে নাথ! আমরা কবে নিস্তার পাইব? তোমার দীন হীন সন্তানদিগের প্রতি কৃপা বিতরণ কর। আমরা আর কার দ্বারে যাইব? কে আমাদিগের পাপ তাপ শান্তি করিবে? "কোথায় গিয়া হইব শীতল?" আগামী বর্ষ এ বর্ষ অপেক্ষা যেন আমাদিগকে সাধু স্বভাব দেখে। আমরা ক্রমাগত যেন ধর্ম্ম পথে উন্নতি লাভ করি। আগামী বর্ষে কাহার সম্বন্ধে কি ঘটনা ঘটিবে তাহা আমরা জানি না; কম্পিত চিত্তে আমরা তাহা প্রতীক্ষা করিতেছি। যাহা ঘটিতে পারে ঘটুক্ কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি যে যাহা ঘটিবে তাহাতে আমাদের মঙ্গলই হইবে। হে সুখ দুঃখের পরিমাপক! আমাদের সমস্ত সুখ দুঃখ তোমাকে অর্পণ করিতেছি। কে কত সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে তাহা তুমিই জান, আমরা কি প্রকারে তাহা জানিতে সক্ষম হইব?

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে

নব-বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ ১৭৯৭ শক।

বৎসরের এই প্রথম দিবসে আইস আমরা পিতা পুত্রে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বন্ধু-বান্ধবে মিলিত হইয়া পরম পবিত্র পরমে-

শ্বরের চরণে প্রণিপাত করি। তাঁহার অমোঘ প্রসাদ-লাভে গৃহ পবিত্র হউক, দেশ পবিত্র হউক, বৎসর পবিত্র হউক। যাঁহার প্রসাদে ঋতু-সকল ফল-ফুলে শোভিত হয়, যাঁহার প্রসাদে গৃহ-সকল ধন-জন-জীবনে পূর্ণ হয়, যাঁহার প্রসাদে দেশ-বিদেশ কৃষি-বাণিজ্যে ধন-ধান্যে সুখ-সমৃদ্ধিতে স্ফীত হয়, যাঁহার প্রসাদে আত্মা বিদ্যাতে শ্রীতে পুণ্যেতে উন্নত হয়, তাঁহার প্রসাদ-বারি আমাদের সম্বৎসরের সম্বল হইবে এই আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া আইস আমরা তাঁহার চরণে প্রণিপাত করি। গত বৎসর যিনি মাতার ন্যায় আমারদের সুখ-সম্পদ বিধান করিয়াছেন, এবং শোক-সন্তাপাশ্রু মার্জ্জনা করিয়াছেন, পিতার ন্যায় সংসার-সাগরের কাণ্ডারী হইয়া আমাদিগকে ভয়-বিপদে রক্ষা করিয়াছেন; গুরুর ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান-শিক্ষা দিয়াছেন; এবং পাপ-কলুষিত হৃদয়ে পুণ্য-জ্যোতি বিকীর্ণ করিবার জন্য উচ্চ নীচ কত প্রকার পথের মধ্য দিয়া সম্বৎসরের এই উদয়শিখরে আমাদিগকে আনয়ন করিয়াছেন, যেখানে ক্ষণকাল অক্ষুব্ধ চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদয় অতীত পথ পর্য্যবেক্ষণ করত গম্য-পথের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি; সেই রোগের ঔষধ, সন্তাপের বারি, বিপদের কাণ্ডারী, জ্ঞানের গুরু, পাপের মোচয়িতা, পুণ্যের পথ-প্রদর্শক, *একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের চরণে আইস* আমরা প্রণিপাত করি। সুখ-সমৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে প্রণাম করি, ভয়-বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি, শোক তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি, পাপ-গ্লানি হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করি, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহারি জন্য তাঁহাকে প্রণাম করি। *আমারদের কি ভয়!* কি অভাব! আমরা কি জানি না যে আমরা তাঁহার শিষ্য বলিয়া অন্যায়পথে গেলে তিনি আমাদের শিক্ষার জন্য দণ্ড বিধান করেন? আমরা কি জানি না যে, আমরা তাঁহার পুত্র বলিয়া তিনি আমাদিগকে মঙ্গলময় সুখ-সমৃদ্ধি প্রেরণ করেন? সকল অবস্থায় তিনি আমাদের সহায়—ইহা কি আমরা জানি না? অতএব নব বর্ষের প্রথম দিনে তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকে আমরা প্রণাম করিব? আর কে আমারদের হৃদয়ে অমৃত বারি বর্ষণ করিবে? তিনি আমারদের ভূতকালের অবলম্বন, বর্ত্তমানের আনন্দ এবং ভবিষ্যতের আশা ও উপজীবিকা। আমারদিগকে এই নব বর্ষে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া তিনি কি আমারদিগের নিকট হইতে চলিয়া যাইবেন? কোন কবি অদ্যাপি জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ কালেও জন্ম গ্রহণ করিবেন না, যিনি ঈশ্বর-বিচ্ছেদ যে কি ভয়ানক অবস্থা তাহা কল্পনাতে আনিতে পারেন; সে অবস্থার তুলনায় শত সহস্র মৃত্যু-পীড়া কিছুই নহে। অতএব ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে যে, এক মুহূর্ত্তও পরমাত্মার সহিত আত্মার বিচ্ছেদ নাই। মোহ কুজ্‌ঝটিকা আমাদের চক্ষুকে আবৃত করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অমৃত সন্নিধানকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না। পিতা মাতা যদিও সন্তানকে ভুলিয়া যান, বন্ধু যদিও হৃদয় বন্ধুকে ভুলিয়া যান, তথাপি পরমাত্মা আমারদিগকে *ভুলিবেন না—এ আশাতে কি আমারদের* মৃত শরীরেও প্রাণের সঞ্চার হইবে না? তিনি আমারদিগকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলি দিতেছেন ইহা কি আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি না? কাল যে নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে অনায়াসে এবং নিরুদ্বেগে অচিন্তনীয় দুরূহ কার্য্য-সকল ক্রীড়া-চ্ছলে নিষ্পন্ন করিতেছে, দুঃখ দুর্দিন অবসান করিতেছে, সুখ সৌভাগ্য স্থানান্তরিত করিতেছে, বাধা-বিঘ্নের ব্যূহ ভেদ করিয়া ধর্ম্মকে রাজ-সিংহাসনে আসীন

করিতেছে, কে সে কাল যে নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত-ভাবে সমুদায় জগৎ সংসারকে তরঙ্গিত এবং ঘূর্ণিত করিতেছে? কদাপি তাহা শূন্য কাল নহে, তাহা পরমেশ্বরের মঙ্গলময় হস্ত। সেই কল্যাণ-দাতার বরাভয় কর যদি এক মুহূর্ত্তও শি-থিল-প্রযত্ন হয়, তবে আমারদের এ স্ফূর্ত্তি কো-থায় থাকে? জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম কোথায় থাকে? শ্রী শোভা কোথায় থাকে। অতএব নব বর্ষের প্রারম্ভে সর্ব্বাগ্রে আইস আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি। হে পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বর! তোমার অমোঘ সাহায্যে আমারদের সকলকে বলীয়ান কর। তোমার আহ্বানে যাহাতে আমরা তোমার পথে চলি, এরূপ বল প্র-দান কর; তোমার আহ্বান যেন আমারদের হৃদয়ে মধু বর্ষণ করে। বিপদে সম্পদে সকল অবস্থাতে যেন আমরা তোমাকে দেখিতে পাই। তোমার চরণে প্রণত হইয়া আমরা যেন পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত শিরে তোমার আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত থাকি। তুমি প্রসন্ন হইয়া অদ্য যেমন আমারদের পূজা গ্রহণ করিতেছ, এই রূপ যেন বর্ষে বর্ষে উন্নত উ-ন্নত মঞ্চে উত্থান করিয়া তোমার চরণে পূজা আহরণ করিতে পারি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আ-মারদের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। হে আত্ম-বুদ্ধি প্রকাশক পরমেশ্বর! এই ভয়াবহ সংসা-রের মোহ পাশ হইতে মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মুক্তির ভাব।

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।

মনুষ্য হৃদয়ের অন্তরতম গভীর ভাব সূচক এই অমৃতময় বাক্যটি পুরাকালে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু কোন ঋষি-পত্নীর ধর্ম্মানুরাগোৎফুল্ল হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং।" যাহাতে আমি অমৃত পদ—মুক্তি পদ লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া কি করিব। যাহাতে আমার জীবনের সার্থকতা এবং পুরুষার্থ সাধন হইবেক না, সেই অচিরস্থায়ী অকি-ঞ্চিৎকর বিষয়োপভোগে কি লাভ? যাহাতে আমি মুক্তি লাভ করিতে পারি তাহাই আমার প্রকৃত প্রয়োজন।

যে সকল বিষয়াসক্ত ব্যক্তি সাংসারিক বিষয় ব্যাপারকে জীবনের সার পদার্থ ভাবিয়া তদনুসরণে বিমোহিত চিত্তে সর্ব্বদা ধাবমান রহিয়াছে, তাহারা এই অপূর্ব্ব চির সত্যটির প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণে সমর্থ হয় না। ইহ সংসারে কেহ পদ মর্য্যাদার আকাঙ্ক্ষায় অভিভূত, কেহ ধনোপার্জ্জন লালসায় লালা-য়িত, কেহ জীবনোপায় সংস্থানে অবিশ্রান্ত ব্যাপৃত, কেহ বা ইন্দ্রিয় সেবায় সদানুরক্ত; এই রূপে প্রায় সকলেই নিজ নিজ অভিলষিত সাংসারিক বিষয়ের অনুসরণে অহরহ ব্যস্ত সমস্ত রহিয়াছে। কিন্তু আপনার জীবনের সাফল্য সম্পাদন জন্য—আত্মার প্রকৃত উন্ন-তির জন্য—মুক্তি পদ লাভের জন্য একান্ত হৃদয়ে আগ্রহাতিশয় সহকারে চিন্তা ও যত্ন করেন এমন ব্যক্তি অতি বিরল। সংসারের মোহজনক ও আপাতত সুখ সেব্য বিষয় রসের অনুরোধে আমরা কেমন আত্ম বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি। সংসারই আমাদের সমুদায় চিন্তা, সমুদায় যত্ন, সমুদায় আয়াস, সমুদায় হৃদয়, সমুদায় অন্তঃকরণকে মায়ারূপ মোহিনী শক্তি সহকারে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। আমরা একবারও ভাবি না যে চির কালের যত্ন ও আয়াস সহকারে যে সাংসারিক সুখ সেব্য বস্তু সকল লাভ করিয়াছি, তাহা স্বপ্ন লব্ধ অমূল্য রত্নবৎ আমাদের হস্ত হইতে অন্তর্হিত হইবেক, যাহাকে অতি যত্নের ধন বলিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছি সে বস্তু হইতেও

বিচ্ছিন্ন হইতে হইবেক। এমন এক দিন উপস্থিত হইবে যখন ইহ সংসারের সমুদায় প্রিয় বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া এই ধরাধাম হইতে একাকী বিদায় লইতে হইবেক। সে ভয়ঙ্কর দিন কবে আসিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্ন বিষয় বাসনায় আপনার জীবনকে বিসর্জ্জন করিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই শেষ দিন কি মহাভয়ঙ্কর! তখন সে দেখিতে পাইবে যে পরম প্রীতিকর বলিয়া যে সকল কাম্য বস্তু লাভ করিবার জন্য চির জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল, জীবনের সার পদার্থ ভাবিয়া যে বিষয়-সুখে নিমগ্ন ছিল, তৎ-সমুদায়ই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন তাহার জীবনের অতীত ভাগটি অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন-নিশার ন্যায় নিরানন্দকর এবং তৃণ শূন্য রুক্ষ বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় একান্ত নিষ্ফল রূপে প্রতীয়মান হইবেক, তখন তাহার হৃদয় আপনা হইতেই বিষম অনুতাপের সহিত কহিতে থাকিবে, "হায়! আমি এই সুদীর্ঘ অমূল্য জীবনকে হেলায় হারাইয়াছি, আমি চির দিন বহু ক্লেশে যে ধন উপার্জ্জন ও রক্ষা করিলাম তাহা আমার প্রকৃত কার্য্যে আসিল না, যাহাকে আমি অমূল্য রত্ন জানিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলাম এক্ষণে দেখিতেছি তাহাই আমার সকল অনর্থের কারণ, এখন রিক্ত হস্তে শূন্য হৃদয়ে নিঃসম্বলে আমাকে এই সংসার হইতে গমন করিতে হইবে এখন কেহই আমার সহায় নাই।" ভোগ সুখাসক্ত ব্যক্তি যখন মৃত্যু শয্যায় সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতার নিতান্ত অসারবত্তা এই রূপে প্রত্যক্ষ করে, তখন মোহান্ধকার দুর হইয়া তাহার অন্তঃকরণ সেই অরণ্য-কুটীর-বাসিনী ঋষি-পত্নীর উন্নত সংসারাতীত ভাব-গর্ভ বাক্যের অনুবাদ করত আপনা হইতে কহিতে থাকে, "অনিত্য বিষয়ের অনুসরণে আমি চির জীবনকে নষ্ট করিলাম এক্ষণে আমার পরিত্রাণের উপায় কি!" "আমি অমৃত সাগরের উপকূলে উপস্থিত থাকিয়া ক্রীড়াসক্ত নির্ব্বোধ বালকের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর উপল খণ্ড সমূহ সংকলনে দিনপাত করিলাম কিন্তু অমৃত পান করিলাম না।"

বাস্তবিক জীবনের উদ্দেশ্য কি, সংসারের সহিত আত্মার কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহা না বুঝিয়া যে ব্যক্তি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয় সে সহজেই ঘোর মায়াময় সংসারের অশেষবিধ প্রলোভনে অভিভূত ও মুহ্যমান হইয়া পড়ে।

অর্ণব-যানের নাবিক ভূচিত্র ও দিক্ দর্শন যন্ত্র বিহীনে মহাসাগর মধ্যে দিঙ্‌নির্ণয় করণে অসমর্থ হইয়া, যেমন স্বীয় গন্তব্য স্থানাভিমুখে পোত চালনা করিতে পারে না। সেই রূপ সংসার সাগরে মনুষ্য হৃদয় রূপ ক্ষুদ্র তরণী লক্ষ-ভ্রষ্ট হইয়া প্রবল প্রলোভনের শ্রোতে পতিত, এবং পরস্পর বিরুদ্ধ বেগবতী প্রবৃত্তি সমূহের যুগপৎ উত্তেজনা রূপ বাত্যাহত হইয়া সহজেই যে পথ ভ্রান্ত ও বিপদাপন্ন হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি। অতএব আমাদের জীবনের সার উদ্দেশ্য যে মুক্তি লাভ—অমৃত লাভ, তাহার প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবেক। সেই মুক্তি লাভ কি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া দিয়াছেন।

যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনং॥

যে সময়ে এখানে সমুদায় হৃদয়-গ্রন্থি ভগ্ন হয়, তখনই জীব অমর হয়েন, এতাবন্মাত্র উপদেশ জানিবে।

যে সকল বস্তু হৃদয়ের উন্নত প্রশস্ত উদার ভাব সমূহকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় না তাহাই হৃদয়ের গ্রন্থি; যাহা হৃদয়কে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত রাখে তাহাই হৃদয় গ্রন্থি; যাহাতে হৃদয় কেবল ইহ সংসারের

বিষয় জালে জড়ীভূত ও আবদ্ধ হইয়া মুহ্যমান থাকে, তাহাই হৃদয়ের গ্রন্থি; যাহাতে হৃদয়কে অজ্ঞান ও কুসংস্কার তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া বিকৃত ভাবাপন্ন করে, তাহাই হৃদয় গ্রন্থি। সংসারাসক্তি, পাপাসক্তি, অজ্ঞান এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহের প্রাদুর্ভাব, এই সমুদায় হৃদয়কে কুণ্ঠিত, অপ্রশস্ত এবং মালিন্য-যুক্ত করিয়া মনুষ্যের উন্নত প্রবৃত্তি সকলকে নিস্তেজ ও দমন করিয়া রাখে। কিন্তু যে পরিমাণে হৃদয় এই সকল প্রবল অনিষ্টকর শক্তির হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাহার উন্নত প্রশস্ত মুক্ত ভাব প্রকাশিত হয়। যে পরিমাণে আত্মার উন্নত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও সাধু-ভাব পরিপোষিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে, যে পরিমাণে ক্রোধ দ্বেষাদি স্বার্থপর প্রবৃত্তি সকল বিবেক-বুদ্ধির বশীভূত হয়, যে পরিমাণে প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জন এবং নিঃস্বার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরাগ জন্মে, সেই পরিমাণেই আত্মা মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। জ্ঞানেতে, ধর্ম্মেতে, সাধু ভাবে ঈশ্বর-নিষ্ঠায় আত্মার যে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, তাহাই প্রকৃত মুক্তির ভাব। সেই মুক্তির পূর্ব্বাভাস মাত্র আমরা ইহ জীবনে অনুভব করিতে পারি; কিন্তু মনুষ্যের অনন্ত জীবনের অনন্ত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই মুক্ত ভাব ক্রমশ পরিণত হইতে থাকিবে। জ্ঞান ও বিবেক আমাদিগকে এই অমৃতময় মঙ্গলের পথে যাইবার জন্য এক দিকে আহ্বান করিতেছে আর এক দিকে প্রবৃত্তি সকল আশু লভ্য সুখাস্বাদনের প্রলোভন দেখাইয়া প্রবল বেগে আমাদিগকে সংসারের পথে—মৃত্যুর পথে আকর্ষণ করিতেছে। দুর্ব্বল মনুষ্য মোহান্ধ হইয়া আপাতত মনোহর বিষয় সুখের জন্য চির মঙ্গলের পথকে পরিত্যাগ করিতেছে।* অতএব সেই প্রবল বিষয়াকর্ষণকে যে পর্য্যন্ত প্রতিরোধ করিতে না পারা যায়, সে পর্য্যন্ত আত্মার প্রকৃত উন্নতি প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপায় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, "এক দিকে যেমন সংসারকে দেখিতেছ, আর এক দিকে তেমনি ঈশ্বরের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিবে। ঈশ্বর মনুষ্যের উপভোগের জন্য ইহ সংসারে যে অপর্য্যাপ্ত কাম্য বস্তু বিধান করিয়াছেন তাহা ভোগ কর, কিন্তু সেই ভোগ-সুখে মুহ্যমান হইয়া যাঁহার প্রসাদে সেই সকল উপভোগের বস্তু লাভ করিয়াছ তাঁহাকে বিস্মৃত হইও না। সংসারের সহিত তোমারদিগের স্বল্প দিনের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের সহিত তোমারদের অনন্ত কালের যোগ। ঈশ্বর তোমারদের এক মাত্র প্রভু ও চির কালের সখা। অতএব তাঁহাকে প্রীতি কর তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে যত্নবান হও, তাহা হইলেই সংসারাসক্তি আর তোমাদিগকে বিপথগামী করিতে পারিবে না।" বাস্তবিক সকল উপদেশের সার এই উপদেশ বাক্যটি যে পর্য্যন্ত না আমরা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তদনুসরণে যত্নবান হই, সে পর্য্যন্ত সংসারের মোহ পাশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। সে পর্য্যন্ত জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেকের দুর্ব্বল স্বর প্রবল রিপু দলের ভীষণ কোলাহলের মধ্যে আমাদের শ্রুতি গোচর হইবেক না।

ঈশ্বরের প্রসাদ বারি ব্যতীত সংসার-সন্তপ্ত হৃদয় কদাপি জীবন্ত ভাব ধারণ করিতে পারে না। ঈশ্বর-প্রীতি ও ঈশ্বর-নিষ্ঠা ব্যতীত সংসারাসক্তিকে পরাজয় করিবার উপায়ান্তর নাই। আমরা যে কার্য্যে যে কোন ব্যাপারে ব্যাপৃত হই ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার প্রীতিকাম হইয়া তৎসাধন করিব;—আমরা যেখানে থাকি যে কোন্ অবস্থায় পতিত হই এই উদ্দেশ্যটি যেন আমাদের হৃদয়াকাশে ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় সর্ব্বদা উজ্জ্বল রূপে দৃষ্টি গোচর থাকে। আমরা ঈশ্বরের দাস, তাঁহারই কার্য্য সাধন জন্য ইহ সংসারে তিনি আমাদি-

গকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালন ব্যতীত আমাদের আর শ্রেষ্ঠতর মহত্তর অধিকার কিছুই নাই। যাহা ঈশ্বরের আদেশ তাহা অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে যদি বিপদ ঘটে, সে বিপদ নহে পরম সম্পদ। যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে তাহা মহা সুখজনক হইলেও বিষবৎ পরিত্যজ্য। কি সুখের সময় কি দুঃখের অবস্থায়, সাংসারিক সকল ব্যাপারে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য এবং আত্মার শ্রেয়ঃ সাধনই যেন আমাদের স্থির সঙ্কল্প থাকে।

নিবিড় মেঘ ও ঘোর কুজ্ঝটিকা পরিবেষ্টিত ভূধর শৃঙ্গ যেমন সেই মেঘ ও কুজ্ঝটিকা ভেদ করত অটল ভাবে ঊর্দ্ধ আকাশে উত্থিত হইয়া নির্ম্মল প্রশান্ত জ্যোতি সূর্য্য রশ্মিতে পরিশোভিত থাকে। সেই রূপ ব্রহ্ম নিষ্ঠ সাধু ব্যক্তি এই মোহময় সংসার মধ্যে বাস করিয়াও অবিচলিত ভাবে ঈশ্বরের প্রতি পরকালের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে আনন্দ-মনে সাংসারিক সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি দুঃখ ক্লেশ বা দুরবস্থায় পতিত হইলে ধৈর্য্য হীন হইয়া মৃত্যু কামনা করেন না, কিন্তু সেই দুঃখকে অচিরস্থায়ী জানিয়া অপরাজিত চিত্তে বহন করেন, এবং সম্পৎ কালে সুখাসক্ত হইয়া চিরজীবী হইবার অভিলাষ রাখেন না।

"নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা।"

ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে সেই মত তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতি একান্ত নির্ভর স্থাপন করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করেন। ইহাই প্রকৃত বৈরাগ্য ভাব। এই বৈরাগ্য সাধন জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য বাসী হইবার আবশ্যক নাই। সংসারই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম ক্ষেত্র, সংসারই আমাদের একমাত্র কর্ম্ম ভূমি। এই সংসার মধ্যে থাকিয়া যিনি বিষয়াসক্তিকে পরাজয় করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বৈরাগ্য ধর্ম্ম সাধনে সক্ষম হইয়াছেন। তিনিই পুরুষার্থ সাধনের ও মুক্তি লাভের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছেন।

বিষয়াসক্তি যেমন আত্মার প্রকৃত উন্নতির ও মুক্তি লাভের প্রতিবন্ধক সেই মত পাপাসক্তি আত্মার একটি বিষম রোগ। সেই রোগে আক্রান্ত হইলে আত্মার আন্তরিক বল ও শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া প্রবৃত্তি সকল বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া যায়। হৃদয়ের পবিত্রতা ব্যতীত আত্মার শ্রেয়ঃ সাধনের উপায়ান্তর নাই। অতএব যাহাতে পাপ রূপ মালিন্য হইতে বিমুক্ত হইয়া হৃদয় পবিত্র হয়, যাহাতে পাপ চিন্তা, পাপালাপ ও পাপানুষ্ঠান হইতে আপনাকে সর্ব্বদা রক্ষা করা যাইতে পারে, এইটিতে যেন আমাদের নিয়ত ও একান্ত যত্ন হয়। পাপ চৌরের ন্যায় নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আসিয়া হৃদয় মন্দিরে প্রবেশ করে। পাপ বহু রূপী, সে যে কখন্ কোন্ মোহন মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমাদের চিত্তকে অসাবধানাবস্থায় আকর্ষণ ও বিমোহিত করিবে তাহার নিশ্চয় নাই। এই চির শত্রু কখন আমাদের হৃদয়স্থিত দুর্দ্দমনীয় রিপু সকলের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া বিবেক-বুদ্ধি, বল ও জ্ঞানকে এক কালে পরাভব করিয়া বল পূর্ব্বক হৃদয় রাজ্য অধিকার করিয়া বসে। কখন বা আপাতত নির্দোষ আমোদ প্রমোদ স্থলে সমাগত হইয়া আমাদের সহিত ঘনিষ্টতা ও আত্মীয়তা স্থাপনের চেষ্টা পায়। কখন বা আমরা বন্ধু বান্ধবের বিশেষ অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া অগত্যা বারেক মাত্র পাপকে স্পর্শ করিতে গিয়া তাহার কৌশলময় জালে চির কালের জন্য জড়ীভূত হইয়া পড়ি। কোন কোন সময়ে বিষয় বিশেষে আশু কোন লভনীয় ফলের

প্রত্যাশায় ব্যগ্র হইয়া স্বাদুতার সহিত পাপ গরলকে ভক্ষণ করি। এই রূপে সংসারের অশেষবিধ ঘটনায় ও নানা প্রকার অবস্থায় পাপ পিশাচ আসিয়া আমাদিগকে ছলনা দ্বারা বিমোহিত বা প্রবল প্রবৃত্তির উত্তেজনা সহকারে আক্রমণ করে। পাপ একবার হৃদয়ে প্রবেশ করিলে তাহাকে পরাজয় করা বিষম কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। এই জন্য বিপৎপাতের পূর্ব্বেই সতর্ক হওয়া উচিত। এই জন্যই সময়ে সময়ে বিষয় ব্যাপার হইতে অবসৃত হইয়া আত্ম পরীক্ষা ও আত্ম চিন্তা করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের পাপ কলুষিত চিত্ত কি প্রকারে পাপের ঘৃণিত হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পবিত্র হইবেক; কি উপায়ে আমাদের দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন হইবেক; কি রূপে আমাদের উন্নত ধর্ম্ম ভাব সকল প্রস্ফুটিত হইয়া আত্মাকে ধর্ম্ম বলে বলীয়ান করিবে; কিসে আমরা দিন দিন সত্যের পথে, ঈশ্বর-প্রেমের পথে, সাধুতা ও পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইয়া আমাদের পরকালের সম্বল রূপ অমৃত ধনকে লাভ করিতে পারিব, তদ্‌বিষয়ে আন্তরিক যত্ন সহকারে সর্ব্বদা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমরা সামান্য সাংসারিক বিষয় ব্যাপার সম্বন্ধে লাভালাভ নির্ণয় করিবার জন্য সময়ে সময়ে হিসাব লইয়া থাকি। কিন্তু ইহ জীবন রূপ গুরুতর মহত্তর ব্যবসায়ে কিরূপ উন্নতি লাভ হইতেছে মধ্যে মধ্যে তাহার পরিচয় লওয়া কি তদপেক্ষা সহস্র গুণ আবশ্যক নহে? আমরা অদূরদর্শী ব্যবসায়ীর ন্যায় আশু লভ্যের আশায় আমাদের মূল ধন ক্ষয় করিতেছি কি না; ধর্ম্ম রূপ অমূল্য রত্নের বিনিময়ে অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর সাংসারিক সুখ সম্পত্তি ক্রয় করিতেছি কি না; চির শান্তি ও পবিত্রতার পরিবর্ত্তে হৃদয় ভাণ্ডারে বিষ তুল্য ঘৃণিত জঘন্য পাপরাশি সঞ্চয় করিতেছি কি না; এই সকল বিষয় এক এক বার আলোচনা করিয়া নিজ অন্তঃকরণের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া দেখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব একাকী, নির্জ্জন স্থানে, সাংসারিক বিষয় ব্যাপার হইতে অবসৃত হইয়া, প্রশান্ত চিত্তে, সরল হৃদয়ে, ঈশ্বর সন্নিধানে, সাবধানের সহিত সেই আত্ম পরীক্ষা রূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। এই কার্য্যটি তোমারদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য জানিয়া পক্ষপাত শূন্য হইয়া তৎসাধনে যত্নশীল হইবে। মনুষ্য হৃদয়ের গতি অতি বিচিত্র; মনুষ্য অনেক সময়ে স্বীয় পাপাসক্তিকে আপনা হইতে গোপন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। যাহা সদাচার-বর্জ্জিত গর্হিত কার্য্য, আমরা তাহাকে বিশেষ কোন উপকার সাধক বলিয়া, অথবা তদ্দ্বারা ভাবি শুভ ফল উৎপন্ন হইবেক বলিয়া বিবেক বুদ্ধিকে স্তোক দিয়া তৎকার্য্যের প্রকৃত দূষ্য ভাবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। অতএব আত্ম পরীক্ষা কালে যেন এই সকল ছদ্মবেশী পাপাচার তোমাদের দৃষ্টি পথ হইতে অবসৃত হইতে না পারে। স্বার্থ হীন হইয়া ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আপন আপন প্রত্যেক কার্য্যের ঔচিত্য ও ঔদার্য্য বিষয়ে বিচার করিবে, হৃদয়ের প্রত্যেক প্রবৃত্তির প্রত্যেক আসক্তির প্রত্যেক অভ্যাসের গুণাগুণ ও স্বাভাবিক গতির পরীক্ষা করিবে। এই রূপে যে সকল পাপাচরণ ও পাপ প্রবৃত্তি হৃদয়কে বশীভূত ও কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে তন্নিরাকরণ করিয়া তাহার প্রতিবিধান জন্য যত্নবান হইবে। যাহাতে সেই পাপাসক্তির প্রতি তোমাদের একান্ত ঘৃণা ও দ্বেষ জন্মে, যাহাতে পাপাচার-লব্ধ বিষয় সকল হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করিতে পার, যাহাতে সেই পাপাচরণ হেতু আপনাদের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা জন্মে তজ্জন্য

একাগ্র চিত্তে অকপট হৃদয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বান্তর্যামী পবিত্র পরমেশ্বরের নিকট বিনীত ভাবে অনুতাপিত হৃদয়ে প্রার্থনা করিবে। যে পর্য্যন্ত সেই পাপ প্রবৃত্তিকে পরাজয় করিতে না পার, সেই পাপের বিষয়কে বিষবৎ দূরে নিক্ষেপ না কর, সে পর্য্যন্ত দীন ভাবে কাতর হৃদয়ে প্রার্থনা করিবে। সেই পাপাসক্তি হইতে মুক্তি পাইবার জন্য অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিবে। ঈশ্বর প্রসাদ ভিন্ন পাপীর পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতির নিকট পাপ মালিন্য কদাপি থাকিতে পারে না। সরল হৃদয়ে তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তিনি অবশ্যই তোমাদের প্রতি করুণা কটাক্ষ করিবেন, তোমাদের হৃদয় মালিন্য দূর করিয়া দিবেন; তখন আত্মা আপনা হইতেই নূতন বল নূতন জীবন ধারণ করিয়া পবিত্রতার পথে মঙ্গলের পথে মুক্তির পথে প্রবর্ত্তিত হইবে।

ঈশ্বর কৃপায় আমাদের এই অন্তর্দৃষ্টি যতই পরিষ্কার হইতে থাকিবে ততই হৃদয়ের পবিত্রতা, আত্মার উন্নত ভাব এবং জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য সকলের প্রতি আমাদের অধিকতর যত্ন হইবেক। এবং তদনুসারে সাংসারিক অনিত্য বিষয়ের অকিঞ্চিৎকর ভাব বুঝিতে পারা যাইবেক। তখন পাপাসক্তি ক্রমশ হ্রাস ও দুর্ব্বল হইয়া আসিবে এবং আত্মা জ্ঞানেতে ধর্ম্মেতে উন্নত হইয়া উত্তরোত্তর স্বাধীন ও মুক্ত ভাব ধারণ করিবে। তখন ইহ জীবন আত্মার অনন্ত জীবনের পূর্ব্বাভাস ও আরম্ভ স্বরূপে প্রতিভাত হইবেক। তখন সাংসারিক ক্ষতি বৃদ্ধি, সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ অতিক্রম করিয়া মনুষ্য অপরাজিত চিত্তে সকল অবস্থায় মঙ্গলময় ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে একান্ত তৃপ্তি লাভ করিবেক। তখন সমুদায় জগৎকে ঈশ্বরের রাজ্য, সমুদায় মানব মণ্ডলীকে ঈশ্বরের পরিবার বলিয়া বোধ হইবেক; সমুদায় সংসার সুধাময় আনন্দ ধাম হইবেক। তখন স্বার্থপরতা আর হৃদয়ে স্থান পাইবেক না, ঈশ্বরের মঙ্গল কার্য্যই মনুষ্যের এক মাত্র প্রিয় কার্য্য হইবেক। তখন আত্মার অমৃত ভাব—মুক্ত ভাব—প্রকৃত বৈরাগ্য ভাব উত্তরোত্তর প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ" তখন হৃদয় গ্রন্থি সকল ভেদ হইবেক, সকল সংশয় দূর হইবেক এবং মনুষ্য অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইবেক। অতএব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি সর্ব্বদা স্থির দৃষ্টি রাখিবে। ঈশ্বরের সহিত আমাদের চির সম্বন্ধ এবং সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া বিষয়ের আকর্ষণে মুহ্যমান না হইয়া প্রকৃত বৈরাগ্য অভ্যাস করিবে। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি এবং ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন মনুষ্যের সকল কর্ত্তব্যের সার কর্ত্তব্য জানিয়া নিয়ত সেই সাধনে রত হইবে, পাপাসক্তি হইতে আপনাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে, হৃদয় মনকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখিবে, তাহা হইলেই মুক্তির পথে অমৃতের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্মোপদিষ্ট এই মুক্তির সোপান কল্পনা-সিদ্ধ নহে। এই সোপান অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম পরায়ণ পুরাতন আর্য্য ঋষিগণ জীবন্মুক্তি লাভ ও পুরুষার্থ সাধন করিয়া স্বর্গ ধামে গমন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এই মুক্তির পথ—অমৃতের পথ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে সেই পথে লইয়া যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। তিনি এই বলিয়া ডাকিতেছেন; "হে সংসার-সন্তপ্ত সন্তানগণ! তোমরা আমার নিকট আগমন করিয়া শান্তি লাভ কর! হে পাপ ভারাক্রান্ত মনুষ্যগণ! তোমরা বিশ্বস্ত হৃদয়ে আমার আশ্রয় গ্রহণ কর, আমি তোমাদের পাপ ভার মোচন করিব। তোমরা আমার অমৃত

সরোবরে অবগাহন করিয়া পবিত্র হও, চির-শান্তি ও অনন্ত উন্নতির পথে উত্তীর্ণ হও। কিন্তু হায়! আমরা পাপ পিশাচের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সেই অমৃতময় আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়াও শুনিতেছি না। কবে সেই দিন উদয় হইবে যখন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের এই পবিত্র উপদেশ-বাক্যকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারিব! ঈশ্বর করুন্ যেন সেই মঙ্গলময় দিন শীঘ্র আগত হয়।

সাংখ্য-দর্শন।

ঋষিরাও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বিরুদ্ধে উক্তবিধ বহু বিতর্কের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এমন কি, কপিল ও মনু প্রভৃতি যাঁহারা আদিমতম ঋষি, তাঁহারাও ঐ সকল আশঙ্কার অবতারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা পৌরুষেয়ত্ব পক্ষ স্বীকার করেন নাই, প্রত্যুত বেদ অপৌরুষেয়, নিত্য ও স্বতঃপ্রমাণ বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা যে কি জন্য বেদের এত দূর পক্ষপাতী—তাহা কে বলিতে পারে? ফল, আর্য্য জাতির মধ্যে যাঁহারা ঋষি নাম ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে বরং দুই এক জন ঈশ্বরাপলাপ-কারী ঋষি পাওয়া যাইবে, তথাপি বেদের অবমাননা-কারী ঋষি এক জনও পাওয়া যাইবে না।

ঋষিরা বেদ-পুরুষের অভ্রান্ততা ও তদীয় বাক্য-প্রতীত অর্থের অব্যভিচারিতা স্বীকার করিতেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া যে তাঁহারা বেদের যথাশ্রুত অর্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন এরূপ বলা যায় না। অর্থাৎ, বেদ-বাক্য গুলি আবৃত্তি করিবা মাত্র যে অর্থের প্রতীতি হয়, সেই অর্থই যে ঠিক্, তাহা নহে। তাঁহারা বলেন, "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"—অগ্রে বেদ অধ্যয়ন কর—অধীত বেদ হইতে আপাত-লব্ধ অর্থের ধারণ কর—পশ্চাৎ সেই সকল অর্থের বিচার কর—বিচার করিলে, অন্তর্লীন অসত্যাংশের পরিহার হইবেক—অসত্যের পরিহার হইলেই সত্যাংশ প্রকাশ পাইবেক—সেই প্রস্ফুরিত সত্যাংশ যাহা বলিবে, তোমরা তাহাই করিবে। বিচার-পূত অর্থের অনুসরণ করিলে প্রতারিত হইতে হয় না, কিন্তু অবিচারিত অর্থের অনুগত হইলে অবশ্যই প্রতারিত হইতে হয় *।

বেদ-বাক্যই হউক, আর লৌকিক-বাক্যই হউক, কোন বাক্যই তুল্য ভঙ্গীর বা তুল্য পদ্ধতির অনুগত নহে। বাক্য মাত্রেরই ভঙ্গী, সামর্থ্য, গতি ও বিন্যাস-পরিপাটী পরস্পর বিভিন্ন। সেই ভিন্নতা-অনুসারে বাক্য-রাশিকে বিভিন্ন শ্রেণীর অনুগত করিয়া, অর্থ কল্পনা করিতে হয়। পশ্চাৎ তাহাতে তর্ক সংযোগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অর্থের সঙ্কলন ও ব্যবকলন করিতে হয়; তাহা হইলেই রাশীকৃত বাক্যের মধ্য হইতে সারার্থ গ্রহণের উপায় প্রকটিত হইতে পারে।

ঋষিরা বেদ-চর্চ্চা করিয়া যেরূপ পদ্ধতিতে বেদ-বাক্য সকলের বিভাগ করত অর্থ সংগ্রহ করিতেন, অন্তত তাহার কিয়দংশও বলা আবশ্যক হইতেছে। ঋষিদিগের বাক্য বিভাগ প্রণালী এই—

রাশীভূত বেদ-বাক্য সকল প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগের নাম বিধি, অপর ভাগের নাম অর্থবাদ। বিধি দুই প্রকার, প্রবর্ত্তক বিধি ও নিবর্ত্তক বিধি। প্রবর্ত্তক বিধি বিধান নামে, আর নিবর্ত্তক বিধি নিষেধ নামে বিখ্যাত (প্রবর্ত্তক বিধি-বাক্যের শক্তি বিধেয় পদার্থে মনুষ্যের প্রবৃত্তি জন্মায়। আর নিবর্ত্তক-জাতীয় বিধির শক্তি নিষিদ্ধ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে।)

* "অপরীক্ষ্য প্রবর্ত্তমানোঽর্থাদ্বিহন্যতে হ্যনর্থঞ্চাপ্নুয়াৎ।" (মীমাংসা ভাষ্য)

অর্থবাদও দুই প্রকার, স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ। (স্তুত্যর্থবাদ প্রবর্ত্তক-বিধির পোষকতা করে, আর নিন্দার্থবাদ নিবর্ত্তক-বিধির উত্তেজনা করে) এই অর্থবাদদ্বয়ের আবার তিন প্রকার ভেদ আছে। গুণবাদ, অনুবাদ, আর ভূতার্থবাদ। ইহার বিস্তার, সম্ভবতঃ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

প্রবর্ত্তক বিধি ও নিবর্ত্তক বিধি-বাক্যের যে অংশ উপদেশাত্মক, সেই অংশের নাম বিধি। তন্মধ্যে যে বিধি কার্য্য-প্রবৃত্তির উত্তেজক, সেই বিধি প্রবর্ত্তক-জাতীয়। যাহা নিবৃত্তির প্রযোজক, তাহা নিবর্ত্তক বা নিষেধ জাতীয়। "কুর্য্যাৎ" করিবেক,—"কুরু" কর,—"কর্ত্তব্যঃ" করা আবশ্যক,—"করং" করিবার যোগ্য,—"কৃতে শুভম্ভবতি" করিলে মঙ্গল হইবে,—ইত্যাদি প্রকার বাক্য জাত প্রবর্ত্তক বিধি-জাতীয়। আর "ন কুর্য্যাৎ" করিবেক না,—"ন কর্ত্তব্যঃ" করা অনুচিত,—"কৃতে নরকং প্রয়ান্তি" ইহা করিলে কষ্ট পাইবে,—ইত্যাদি প্রকার বাক্য সকল নিবর্ত্তক বিধি-জাতীয়।

স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ। "অর্থায় প্রয়োজনসিদ্ধয়ে বাদঃ কথনম্"—প্রয়োজন (উদ্দেশ্য) সিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া যে কিছু বলা যায়, যেই সকলের নাম অর্থবাদ। ইহারই বিভাগ স্তুত্যর্থবাদ ও নিন্দার্থবাদ। প্রশংসা বাক্য বা প্রশংসাবাদ আর ঐ স্তুত্যর্থবাদ, একই কথা। আর নিন্দা বচন ও নিন্দার্থবাদ তুল্য কথা। (আরোপিত গুণ কথনের নাম স্তুতি বা প্রশংসা,—আর আরোপিত দোষ কথনের নাম নিন্দা বা গর্হণা)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "স্তুত্যর্থবাদ গুলি প্রবর্ত্তক বিধির পোষকতা করে, আর নিন্দার্থবাদ গুলি নিবর্ত্তক বিধির পোষকতা করে।" ঐ পোষকতা যে কি রূপ পোষকতা, তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক।

বেদ-বাক্য রাজাজ্ঞা বাক্যের ন্যায় নহে। রাজা যেমন "ইহা কর"—"উহা করিও না" এই মাত্র বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, তৎকার্য্যের প্রতি লোকের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহার আর উপায়ান্তরের উদ্ভাবন করিতে হয় না, বাক্যান্তর ব্যয়ও করিতে হয় না, বেদ-বক্তার সম্বন্ধে সেরূপ নিয়ম খাটে না। বেদ-বক্তার সিপাই নাই শান্ত্রীও নাই, অথচ তাঁহার স্বোপদেষ্টব্য বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জন্মাইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা। "কর" বা "করিওনা" এই মাত্র বলিলে পাছে কেহ তাহা না শুনে, এই ভয়ে তিনি সমস্ত উপদেশ গুলিকে ফলাফল সংযুক্ত করিয়া স্তুতি নিন্দা বা পুরস্কার তিরস্কার পরিপূর্ণ করিয়া উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, বা অকর্ত্তব্য বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে, তত্তাবতের লিখিত ফলাফল যে সমস্তই ঠিক্ হইবে, এরূপ নহে। কেন না, উপদেষ্টব্য বিষয়ে ফলাফল সংযোগ করা কেবল লোকের তত্তৎ কার্য্যে রুচি জন্মাইবার নিমিত্ত মাত্র। মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন "রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ" মনুষ্যের কার্য্য-প্রবৃত্তিতা ও অকার্য্য-নিবৃত্তিতা সাধনের নিমিত্তই ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে।

"পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকম্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি ন ফলং তাবদেব তু॥"

পুত্রের আরোগ্যকামী পিতা যেমন নানাবিধ প্রলোভন দ্বারা বালককে তিক্তাস্বাদ ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত করান, প্রজাবর্গের কুশলকামী শাস্ত্রও তেমনি অজ্ঞান প্রজাদিগকে ফলাফলের লোভ দেখাইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত ও অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করান। তিক্ত ভোজন করা হইলে পিতা যেমন বালককে মোদক প্রভৃতি স্বীকৃত লোভ্য বস্তু প্রদান করেন না, শাস্ত্রও তেমনি উপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠাতাকে

যথোক্ত ফল প্রদান করেন না। যেমন পিতার ইচ্ছা পুত্র অরোগী হউক, তেমনি শাস্ত্রেরও ইচ্ছা প্রজা সকল শান্তি লাভ করুক। পিতার প্ররোচনায় তিক্তাস্বাদ ঔষধ সেবন করিলে পুত্র যেমন কেবল আরোগ্য লাভই করে, মোদক পায় না, তেমনি শাস্ত্রের প্ররোচনায় মনুষ্য শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক কোন প্রকার না কোন প্রকার কুশল লাভ করে, অন্য ফল পায় না। "প্রতিপদি কুষ্মাণ্ডং নাশ্নীয়াৎ" প্রতিপত্তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিবেক না। এইটি বিধি অর্থাৎ উপদেশাত্মক বাক্য। পাছে কেহ ঐ উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অকুশলী হয়, এই ভয়ে শাস্ত্র উহার গাত্রে একটি নিন্দার্থবাদ সংলগ্ন করিয়া দিলেন "কুষ্মাণ্ডে চার্থহানিঃ স্যাৎ" যে প্রতিপত্তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিবেক, তাহার অর্থ বিনাশ হইবে। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের অনুসারে বোধ হয় যে, এই অর্থবাদ বাক্যটি কেবল প্রতিপত্তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ হইতে লোককে নিবৃত্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, বাস্তবিক কুষ্মাণ্ড-ভোক্তার অর্থ বিনাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছে না। এতাবতা উক্ত উপদেশ বাক্যের মর্ম্ম এই যে, প্রতিপত্তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে বাস্তবিক কোন অপকার না হউক, ভক্ষণ না করিলে শারীরিক বা মানসিক কোন প্রকার না কোন প্রকার উপকার আছে। (প্রভুর আজ্ঞা বাক্যের উপর ভক্ত পুরুষের অচলা ভক্তি থাকে, সুতরাং শাস্ত্র-ভক্ত ব্যক্তিরা যেন উক্ত কথার উপর বিশ্বাস নিহিত করিয়া কুষ্মাণ্ড ভোজনে নিবৃত্ত থাকিলেন, কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রের অনুগত নহেন, তাঁহারা কেন নিবৃত্ত হইবেন? তাঁহারা এই বলিয়া শাস্ত্রকে অনুযোগ করিবেন যে, "শাস্ত্র উক্ত তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণাভক্ষণের দোষ গুণ অবগত আছেন কি না?—যদি থাকেন, গোপন করিবার প্রয়োজন কি?"—এই অনুযোগ বাক্য লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রের স্থানে স্থানে কটাক্ষ-ক্ষেপ দৃষ্ট হয়। ফল, খাদ্যাখাদ্যের সহিত শরীরের, মনের, জ্ঞানের, ও ধর্ম্মের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, সে সমস্ত প্রদর্শন করিতে হইলে স্বতন্ত্র একটি পুস্তক নির্ম্মাণ করিতে হয়, এ প্রস্তাবের মধ্যে পর্য্যাপ্ত হয় না।

লোক মধ্যে এই এক স্থির সিদ্ধান্ত আছে যে "ভাল লোকে যাহা বলে, তাহার কোন ভাল ফল আছে। আর যাহা নিষেধ করে, তাহার কোন মন্দ ফল আছে।" এই লৌকিক সিদ্ধান্তের অনুসারেই বৈদিক বাক্যের সিদ্ধান্ত হয়। মনুষ্যেরা যেমন লোককে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ ফলের উল্লেখ, ঘটনার আখ্যান, আখ্যায়িকার রচনা, দৃষ্টান্ত স্থলের উদ্ভাবন করেন; শাস্ত্রও ঠিক্ সেই রূপ করেন। উপদেশাত্মক অংশই যেমন লোক-বাক্যের সার, সেই রূপ শাস্ত্র-বাক্যেরও সার উপদেশ। বাক্য-রাশির মধ্যে উপদেষ্টব্য অংশের পোষকতাকারী ঘটনা প্রদর্শন বা আখ্যায়িকাত্মক বাক্যান্তর গুলি যেমন কদাচিৎ সত্যও হয়, কদাচিৎ মিথ্যাও হয়, বেদ-বাক্যেরও ঠিক্ সেই রূপ হয়। এই বিবেচনায় ঋষিরা, উপদেশাত্মক শাস্ত্র ভাগের উত্তেজক ঘটনাখ্যান, ইতিহাস-নির্ণয় বা বস্তুশক্তি কথন রূপ আর্থবাদিক অংশ ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় ও সত্যাসত্যের অবধারণ করিয়া থাকেন। এক প্রকার অর্থবাদের নাম গুণবাদ, দ্বিতীয় প্রকার অর্থবাদের নাম অনুবাদ, তৃতীয় প্রকার অর্থবাদের নাম ভূতার্থবাদ। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

গুণবাদ—"বিরোধে গুণবাদঃ স্যাৎ" যে অর্থবাদে প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ বা যুক্তি-বিরুদ্ধ পদার্থের ঘটনার বর্ণন দৃষ্ট হইবে, তাহার

নাম গুণবাদ। এই গুণবাদ-জাতীয় অর্থবাদের বর্ণনীয় অংশ অসত্য, কেবল উপদেশ্য বিষয়ের প্রশংসা করাই সত্য।

অনুবাদ—"অনুবাদোঽবধারিতে" যে অর্থবাদ বিজ্ঞাত বিষয়েরই কথা বলে, তাহার নাম অনুবাদ। এই অনুবাদ-জাতীয় অর্থবাদের লক্ষ্যাংশ ও বর্ণনীয় অংশ উভয়ই সত্য। বিজ্ঞাত বিষয়ের বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন, এ বিষয়ে যেখানে যেখানে তাদৃশ বর্ণনা আছে, সেই সেই স্থানে কোন প্রকার স্বতন্ত্র উপদেশ থাকা বিবেচনা করিতে হইবে।

ভূতার্থবাদ—"ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাৎ" যে অর্থবাদে প্রত্যক্ষ বা যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা নাই, বিজ্ঞাত বিষয়েরও প্রতিপাদন নাই, ঈদৃশ অর্থবাদের নাম ভূতার্থবাদ। এই ভূতার্থবাদ-জাতীয় অর্থবাদকে অসত্য বিবেচনা করা মূঢ় বুদ্ধির কার্য্য।

এই রূপ শাস্ত্র-বাক্যের বা লোক-বাক্যের বিবিধা গতি শাস্ত্রের স্থানে স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাক্যের সহিত অর্থের, অর্থের সহিত বাক্যের ও উভয়ের সহিত মানব মনের বা মানবীয় জ্ঞানের কিরূপ সম্বন্ধ,—বাক্যের শক্তি মনুষ্য মনে কত দূর প্রভুত্ব করিতে পারে, তাহাও বর্ণিত আছে। সে সকল উদ্‌ঘাটন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ফল, এতদপেক্ষাও সূক্ষ্মা গতি অবলম্বন করিয়া আর্য্যেরা বেদ বাক্যের তাৎপর্য্যাবধারণ করিতেন। তাহাতে যেরূপ জ্ঞান লাভ হইত, তাহাকে অব্যভিচারী মনে করিয়া তদনুসারেই চলিতেন। কদাচ তদ্বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন না।

বেদের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রস্তাব আছে, ঋষিরা বলেন যে, তত্তাবতের তাৎপর্য্য ছয়টি উপায়ে পরিদৃষ্ট হয়। উপক্রম ও উপসংহারের ঐকরূপ্য (১) অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উল্লেখ) (২) উপক্রান্ত পদার্থের অপূর্ব্বতা অর্থাৎ অজ্ঞাততা (৩) উপক্রান্তের সহিত ফল-সম্বন্ধ (৪) উপক্রান্ত পদার্থে রুচি জনক অর্থবাদ (৫) তর্ক দ্বারা উপক্রান্ত পদার্থের সংশুদ্ধি (৬)। যে পদার্থ লইয়া প্রস্তাবের আরম্ভ হইয়াছে, সমাপ্তি কালেও যদি সেই বস্তুর উল্লেখ থাকে,—প্রস্তাবের মধ্যে মধ্যে যদি সেই পদার্থের অনুবাদ হইয়া থাকে,—বারংবার উল্লিখ্যমান সেই পদার্থ যদি ফল-প্রদ বলিয়া বর্ণিত হয়,—এবং অর্থবাদ-বাক্য গুলি যদি তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া প্রবৃত্ত হইয়াছে এমত বোধ হয়,—তর্ক দ্বারা সেই পদার্থের সংস্কার হইয়া সিদ্ধান্ত হইতেছে এরূপ যদি প্রতীতি হয়,—তাহা হইলে সেই পদার্থের উপদেশ করাই সেই প্রস্তাবের তাৎপর্য্য বিবেচনা করিতে হইবে *।

এই সকল বিচার পদ্ধতি ও এতদ্ভিন্ন অনেকানেক বাক্‌-ভঙ্গি-প্রকাশ বৈদিক রচনার উপর দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি ও পুরাণের রচনারও উক্ত পরিপাটী ক্রমেই হইয়াছে। বেদের মধ্যে যেমন অনেক অসম্ভব গল্প-কথা আছে—পুরাণের মধ্যেও ঠিক্‌ সেই রূপ আছে। অসঙ্গত রচনা দেখিয়া পুরাণকে আমরা যেমন উপেক্ষা করি—তাদৃশ বা তদধিক অসঙ্গত সত্বেও ঋষিরা বেদকে অবজ্ঞা করেন নাই, প্রত্যুত বিচার মার্গ অবলম্বন করিয়া তাহার যাথার্থ্য নিরূপণ পূর্ব্বক সত্যাংশের আদান ও অসত্যাংশের অনাদর করিতেন, অসত্যাংশকে একেবারে হেয় জ্ঞান না করিয়া সত্যাংশের উপকারক বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ঋষিরা যেমন বেদ বাক্যের তাৎপর্য্য-গ্রহের নিমিত্ত ব্যাকুল, শ্রদ্ধাবান্‌ ও বিচার নিপুণ হইয়াছিলেন, আমরাও যদি সেই রূপ হইতাম, উপেক্ষাত্মক

* "উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্‌। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে।" (বেদান্ত বার্ত্তিক)

বুদ্ধি যদি আমাদের প্রবল না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, আমরাও পুরাণের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতাম।

"পুরাণ" এই শব্দটি বৈদিক শব্দ। অতএব, ব্যাস বা তদুত্তর-কালিক পণ্ডিতগণ হইতেই যে পুরাণের প্রচার হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত মনে রাখা অকর্ত্তব্য। ভঙ্গীবিশেষের ব্রাহ্মণাত্মক বেদ ভাগকে পুরাণ বলে। আধুনিক পুরাণ সকল তাহারই অনুকরণ মাত্র। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য রূপ বেদার্থের স্মরণাত্মক ঋষি-বিরচিত গ্রন্থের নাম স্মৃতি, আর বৈদিক পুরাণের পদ্ধতিতে লৌকিক ও বৈদিক উভয়বিধ ব্যাপার ঘটিত ঋষি বিরচিত গ্রন্থের নাম পুরাণ। (১)

সম্প্রতি ঔপদেশিক জ্ঞানের পরীক্ষা করিতে করিতে আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, অতএব এই স্থানেই প্রাসঙ্গিক বুদ্ধির শেষ করা যাউক।

আর্য্যশাস্ত্রের মতে, বিশেষত কাপিল শাস্ত্রের মতে, প্রমাণ নিচয়ের মধ্যে আপ্ত বাক্যই স্বতঃ প্রমাণ। এই প্রমাণ-পরিনিষ্ঠিত জ্ঞানের অব্যভিচারিতা সর্ব্ব কালেই আছে। বাক্যের আপ্ততা সম্বন্ধে যে কিছু মত আছে—সে সমস্ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ফল, সকল মতেই বেদ বাক্যের আপ্ততা স্বীকার আছে। বেদ-বাক্য বিচারের যে প্রকার পদ্ধতি প্রদর্শন করা হইল, তদনুসারে বিচারিত বেদ-বাক্য-সমুত্থ জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। লৌকিক বাক্যেও বিচার সংযোগ করার আবশ্যকতা আছে। তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তদনুসারে বিচারিত লৌকিক বাক্যও যথার্থ জ্ঞানের জনক। তবে প্রভেদ এই যে, লৌকিক বাক্য কেবল ঐহিক ব্যবহার যোগ্য পদার্থের প্রতিপাদন করে, আর বৈদিক বাক্য সকল ঐহিক পারত্রিক উভয়বিধ পদার্থের প্রতিপাদন করে।

বাল্যকাল হইতে শব্দের শ্রবণ, কার্য্যের দর্শন, ব্যবহার পদ্ধতির মনন, মনোনীত পদার্থের ধারণ করিতে করিতে মনুষ্য শব্দ রাশির বিচিত্র শক্তি অবগত হইতে পারে। শব্দে যে অর্থ প্রত্যায়ক বিচিত্র শক্তি আবদ্ধ আছে, তাহার পরিচয় পাওয়ার নাম ব্যুৎপত্তি। এই ব্যুৎপত্তিমান্ পুরুষই বিচারের অধিকারী(২)

(১) "যদ্ব্রাহ্মণানীতিহাসপুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসী"—(ঋগ্বেদ ভাষ্যধৃতা শ্রুতি) অমানব প্রাচীন ঘটনাবলির বিবরণাত্মক বেদ ভাগের নাম ইতিহাস—জগতের বা জগতীস্থ বস্তু জাতের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনাত্মক বেদ ভাগের নাম পুরাণ—যাগ যজ্ঞাদি ঘটিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের পদ্ধতি ও দোষ গুণ নির্ণয়াত্মক বেদ ভাগের নাম কল্প—প্রশংসা সূচক গাতব্য বেদ ভাগের নাম গাথা—মনুষ্য বৃত্তান্ত প্রতিপাদক বেদাংশের নাম নারাশংসী। এই রূপ বেদের মধ্যেই সমস্ত আছে, আধুনিক পুরাণাদির রচনা পদ্ধতি ও নামকরণ উক্ত বৈদিক পুরাণাদির অনুসারেই হইয়াছে। তবে কি না আধুনিক পুরাণ সকলে বৈদিক পুরাণ অপেক্ষা সমধিক বর্ণনা ও ভ্রুকুটি বিস্তর আছে।

(২) "ব্যুৎপন্নস্য বেদার্থপ্রতীতিঃ" "ত্রিভিঃ সম্বন্ধসিদ্ধিঃ" (কাপিল সূত্র) ব্যুৎপত্তি জন্মান একটি জ্ঞান সামান্যের কারণ। এমন জ্ঞান অনেক আছে যাহা কেবল ব্যবহারাধীন উৎপন্ন হইয়া দৃঢ় সংস্কারে আবদ্ধ হয়। ব্যবহারাধীন সমুৎপন্ন জ্ঞানের কতকগুলি ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানের মধ্যে, কতকগুলি যৌক্তিক জ্ঞানের মধ্যে, কতকগুলি বা ঔপদেশিক জ্ঞানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। সে গুলিকে আমরা ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি না। যথা ঐন্দ্রিয়ক-জ্ঞানের মধ্যে দূরত্বাদি জ্ঞান। উহা ব্যবহার-সমুৎপন্ন হইলেও আমরা উহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানি না, ঐন্দ্রিয়ক বলিয়াই বিবেচনা করি। মনে কর, দূরত্ব, উচ্চৈস্ত্ব, নীচত্ব, এসকল বস্তু চক্ষু গ্রাহ্য নহে, সুতরাং উহা 'চক্ষুঃ সম্ভূত জ্ঞান নহে, তথাপি আমরা বিবেচনা করি যে "এত দূর" "এত উচ্চ" যেন চক্ষে দেখিতেছি। ফলতঃ, ঐ সকল জ্ঞান আমাদের ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারাধীনই উৎপন্ন হইয়া দৃঢ় সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। উহা ব্যবহারাধীন জন্মে বলিয়া, অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বালকদিগের 'এত দূর' 'এত উচ্চ' জ্ঞান থাকা দৃষ্ট হয় না। এই রূপ, সঙ্কেতাদি ব্যবহার বিষয়ক জ্ঞান যৌক্তিক জ্ঞানের মধ্যে, এ শব্দের এই শক্তি, এই রূপ বলিলে এই রূপ

ভ্রম, প্রমাদ, কর্ণাপাটব-দোষ রহিত উক্তবিধ অধিকারী ব্যক্তি বিচার পূর্ব্বক যাহা বলে, তাহা সত্য ও সত্য জ্ঞানের প্রতিপাদক। এতদ্ভিন্ন সাংখ্য মতে বিচারিত বেদ বাক্য ও উৎকৃষ্ট-সত্ব যোগি পুরুষের বাক্যও সত্য বাক্য এবং তাহা সত্য জ্ঞানের প্রতিপাদক। যে বাক্য সত্য হয়, তাহার নাম উপদেশ, আর তজ্জন্য জ্ঞান ঔপদেশিক জ্ঞান।

এত দূরে পরীক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবটি সমাপ্ত করা হইল। অতঃপর পরীক্ষিতব্য বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

নির্গুণ পূজা বিধি।

"যানি যান্যুপহারাণি কল্পিতানি মনীষিভিঃ।
নির্গুণে গুণপূজায়াং তেষাং নাস্ত্যপযোগিতা॥"

পূজা স্থানে আবাহন—আগত জ্ঞানে স্বাগত প্রশ্ন—পাদ প্রক্ষালনার্থে উদক প্রদান—রূপাভিব্যক্তির নিমিত্ত অর্ঘ্য (পুষ্পাক্ষতাদি) প্রদান—পবিত্রতা সম্পাদনের নিমিত্ত আচমন—নৈর্ম্মল্য সম্পাদক স্নান—পরিধানার্থ বস্ত্র—অনুলেপনার্থে গন্ধ (চন্দনাদি)—আভিরূপ্য জনক অলঙ্কার, উপবীত,—সৌগন্ধ্য নিষ্পাদক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,—দৃষ্টি প্রসাদনের নিমিত্ত দীপ—আশিত্য সম্পাদক নৈবেদ্য—মুখাশুদ্ধি নিবারক তাম্বূল—রূপের ঔজ্জ্বল্য দর্শনার্থে নীরাজনা—পরিচ্ছেদ করণার্থ প্রদক্ষিণ—পূজ্য দেবের নিকট আত্মার অপকৃষ্টতা বোধক নমস্কার—গুণ বর্ণন রূপ স্তোত্র—পূজা সমাপ্তি বা পূজ্য দেবের স্বস্থান গমন প্রার্থনা রূপ উদ্বাসন বা বিসর্জন—ইত্যাদি প্রকার যে সমস্ত পূজোপকরণ পণ্ডিতেরা সগুণ দেবতা বা জীবের পূজার নিমিত্ত কল্পনা করিয়াছেন, নির্গুণ, নিরাধার, নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, জগদাত্মা, পরব্রহ্মের পূজায় সে সমস্ত উপহারের আয়োজন করিতে হয় না।

"পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনম।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ।"

যিনি পূর্ণ, দিক্, বিদিক্, অধঃ, ঊর্দ্ধ, পশ্চাৎ, সম্মুখ, সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তাঁহাকে আর কোথায় 'ইহাগচ্ছ' বলিয়া আবাহন করিব?—যিনি সর্ব্বাধার; পৃথিবী, জল, বায়ু, তেজঃ, আকাশ, স্বর্গ, পাতাল,—যিনি এই সমস্তের আধার; তাঁহার উপবেশনার্থে এমন কি পদার্থ আছে, যাহা 'ইদমাসনম্' বলিয়া দিতে পারি?—যিনি স্বতই স্বচ্ছ, সর্ব্বত্রই ব্যক্ত; তাঁহার স্পষ্টতা সম্পাদনের নিমিত্ত, বা তাঁহার পাদ প্রক্ষালনের নিমিত্ত অর্ঘ্য ও পাদ্য কল্পনা করার কি প্রয়োজন?—যিনি বিশুদ্ধ চিৎ স্বভাব; যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বৈদিক পুরুষেরা 'স আত্মা অপহত পাপ্মা' 'ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' এই বলিয়া গান করিয়াছেন, তাঁহার আবার অপবিত্রতা কোথায় যে, তৎপরিহারের নিমিত্ত আচমনীয় প্রদান করিতে হইবে।

"নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য বা।
নির্লেপস্য কুতো গন্ধো রম্যস্যাভরণং কুতঃ।"

যাঁহাতে মল স্পর্শ নাই;—ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক এবং আশয় ও (জাতি-আয়ুঃ-ভোগ) যাঁহাকে স্পর্শ করে না;—তাঁহার আবার স্নান কি? —যাঁহার স্নান নাই, তাঁহার নিমিত্ত স্নানীয় আহরণ করিয়া কি করিব?—এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার উদর কন্দরে বিনিহিত, তাঁহার আবরক-বস্ত্র কোথায় পাইব?—যিনি নির্লেপ; যাঁহার কোন অবয়ব নাই; তাঁহার অনুলেপনার্থে তুচ্ছ চন্দনদ্রব্য আহরণ করিয়া কি করিব?—যিনি আত্মারাম; যাঁহার রমণীয়তার সীমা নাই; যাঁহার রম্যতার কণাংশ-সম্পর্কে পদ্ম চন্দ্রাদির রম্যতা;—তাঁহার রমণীয়তা জন্মাইবার চেষ্টা করা কি ভ্রম! ভ্রম গৃহীত হইলেও তাঁহার উপযুক্ত আভরণ কোথায়?

ঈশ্বরের করুণা।

অপার অপরিমেয় তাঁহার করুণা,
এক এক জীবেতেই কৃপা অগণনা,
জীব পূর্ণ বসুন্ধরা
ব্রহ্মাণ্ড জীবেতে ভরা!
করিলেন সকলের মঙ্গল বিধান,
পালিলেন সম ভাবে সকল সন্তান!

পাপী সাধু জ্ঞানী মূর্খ ভেদাভেদ নাই,
প্রদান করেন সবে যার যাহা চাই,
তিনি পিতা, তিনি মাতা,
তিনি গুরু জ্ঞান দাতা,
অপরাধে দণ্ড দেন কল্যাণ কারণ,
দণ্ড হয় পুরস্কার করুণা এমন!

বুঝিতে হইবে, ইত্যাদি জ্ঞান ঔপদেশিক জ্ঞানের মধ্যে নিবিষ্ট আছে। কপিল বলেন আপ্তোপদেশ, বৃদ্ধ পরম্পরায় বস্তু ব্যবহার ও জ্ঞাত শব্দের সামানাধিকরণ্য, এই তিনটি মাত্র শব্দার্থ জ্ঞানের প্রতি কারণ। তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কারণ নাই। কিন্তু এই সকলের বিস্তার অনেক আছে, তাহা এস্থলে বলিতে গেলে অনেক বাহুল্য হইয়া উঠে।

শিখাতে সংসার ক্ষেত্রে পদ সঞ্চারণ,
দিলেন সকলে ছাড়ি, মাতার মতন,
যদি হই কম্পমান,
দেন অবলম্ব দান,
আছেন মঙ্গল-কোল করি প্রসারণ,
পদে পদে রক্ষা পাই নাহই পতন।

ভয়াবহ ভব এই আমরা দুর্ব্বল,
তাহা পুন শিশু সম সতত চঞ্চল,
কখন আগুনে ঝাঁপ,
কভু ইচ্ছা ধরি সাপ,
তখনি অমনি তিনি করেন বারণ,
জ্ঞান-হস্ত দিয়া, হস্ত করেন ধারণ!

শত শত প্রলোভনে করে আকর্ষণ,
তায় মন ধায় যেন প্রমত্ত-বারণ,
তার মাঝে ভাল যাহা,
ঘটাইয়া দেন তাহা,
হৃদয়ের ধর্ম্ম মন্ত্রী করে সাবধান,
শ্রেয় ভিন্ন প্রেয় কভু করে না বিধান!

শুভ পথে চলাবার সুচেষ্টাই কত,
রয়েছেন সাথী হয়ে সঙ্গেতে নিয়ত,
কুপথে চলিতে যাই,
সমুখেতে বাধা পাই,
আগে ভয়, পিছে ক্ষোভ উপস্থিত হয়,
কি শাসন! কি পালন! কেমন সদয়!

বিপদে করেন রক্ষা হইয়া তৎপর,
কখন স্বজন কভু রক্ষা করে পর,
পর দুঃখ দেখে নর,
হইয়া উঠে কাতর,
প্রাণপণে দুঃখ দূর করে দেয় পরে,
তাঁর দত্ত দয়া তথা হেন কাজ করে,

আহা! কিবা স্নেহ, দয়া অমূল্য রতন,
দিলেন মঙ্গলময় মঙ্গল কারণ,
পিতৃ মাতৃ স্নেহ আগে,
সন্তানে কেমনে জাগে,
প্রাণাধিক প্রিয় চেষ্টা পুত্র প্রতি হয়,
দয়া গুণে জগজন শিশুরে সদয়!

সংসারেতে স্নেহ দয়া যদিও না পাই,
বিশ্ব মাতা স্নেহ-কোলে সদা দেন ঠাঁই,
শুনিলে কাতর স্বর,
হয়ে অতি তৎপর,
মুছাইয়া অশ্রু জল শান্তনা প্রদান,
কুপুত্র সুপুত্র নাই ভেদাভেদ জ্ঞান।

ঔষধে যখন রোগ নাহি হয় ক্ষয়,
সুখ হীন, শক্তি হীন, শয্যাগত রয়।
হয়ে অতি নিরুপায়
অশেষ যাতনা পায়,
মৃত্যু রূপ মহৌষধি শেষের বিধান,
যন্ত্রণা হইতে মুক্তি কি করুণা দান!

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ

বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ...	২
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত ঐ ভাল বাঁধা ...	২৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	৷৷০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ...	৶
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ...	৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ ...	৷৷০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ	৷৷০
দশোপদেশ	৷৷৶০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	৷৷০
মাঘোৎসব	১
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	।৶০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ...	।০
ব্রহ্ম বিদ্যালয়	১
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ ...	৷৷০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ ...	৸০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব ...	।০
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে? ...	৵০
সেকাল আর একাল	৷৷০
আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত ...	।০
হিন্দু আচার ব্যবহার প্রথম ভাগ	।৶০
বক্তৃতা মালা	৷৷৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	।৶০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	১
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	[illegible]

তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ	৩৷৷০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ	১
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ	১
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে	২
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১।৶০
অধিকারতত্ত্ব : ...	৷৷০
তত্ত্বপ্রকাশ	৵০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা	৵১০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	৵০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	৵০
ব্রহ্মোপাসনা	/০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	/০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	/১০
ধর্ম্ম-শিক্ষা	৶০
পৌত্তলিক প্রবোধ	।০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ (দেবনাগর অক্ষরে)	৶০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় ...	৶০
চরিতমালা	৷৷০
নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব	১৷৷০
আর্য্য জাতির শিল্প চাতুরী ..	১৶০
প্রবচন সংগ্রহ	/১০
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	/০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	।০
ব্রহ্মসঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	৶০
সংগীত মুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ...	।০
সংগীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ...	।০
স্বভাব সঙ্গীত	।০
গীত জয়জগদীশ কাব্য	।০
গীতাঙ্কুর	/০
প্রশ্নমঞ্জরী	৷৷০
প্রভাত-কুসুম	।/০
উদ্বোধনাঞ্জলি	/০
গৃহকর্ম্ম	।০
স্তোত্রমালা	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	/০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা১৭৮৭শকের একত্র বাঁধান	৸০
কুমার শিক্ষা	।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি	১
বিবাহ ও পুত্রত্ববিষয়ে মনুর মত	।০
ব্রহ্মসাধন	৶০
ব্রহ্মজ্ঞান	/০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ...	৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ ...	/০
হিন্দু জাতি, তাহার অভাব ও কর্ত্তব্য ...	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব ...	/০
উপদেশ	(১০
দুর্গোৎসব	/০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	/০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা ...	(১০
বর্ণমালা দ্বিতীয় সংখ্যা	/০

আয় ব্যয়।

চৈত্র ১৭৯৬ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ

আয় ...	২৮২৸/ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৯১ ৷৷/ ৫
সমষ্টি ...	৬৭৪ ।৶১০
ব্যয় ...	৩১৪ ৶১৫
স্থিত ...	৩৬০ ৵১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ ..	১৫৫ /১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৭০ ৷৷৶০
পুস্তকালয় ...	৬ ৷৷৶০
যন্ত্রালয় ...	৪৬
গচ্ছিত ...	৪ ।৵১০
সমষ্টি ...	২৮২৸/ ৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ .	৭৭ /১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৯১ ।/১০
পুস্তকালয় ...	১৮ ৷৷৵১০
যন্ত্রালয় ...	১২৪ ৷৷ ১৫
গচ্ছিত ..	২ ।৵১০
সমষ্টি ...	৩১৪ ৶১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	১০
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... (পাথুরেঘাটা)	২
" কুঞ্জলাল মল্লিক ...	১
" উমাচরণ মল্লিক ...	১
" হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	১
" দয়ালচন্দ্র শিরমোণি ...	১
" চন্দ্রমোহন সেন ...	১
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	১

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৬
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায় .	৬
" জানকীনাথ ঘোষাল ...	৬
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৬
" সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ...	৬

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩
দানাধারে প্রাপ্ত	৪ /১৫
	১৫৫ /১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩২। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬। ১ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।

Registered No 52.

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
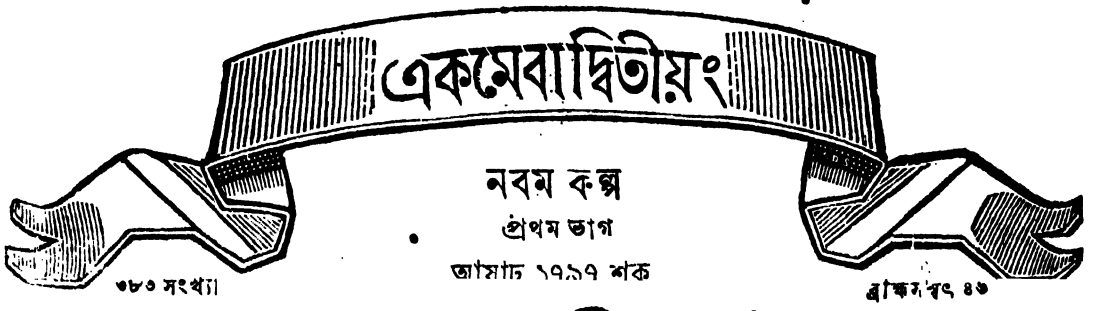
ভবানীপুরে বর্ষ-শেষের ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

৩০ চৈত্র সোমবার ১৭৯৬ শক।

সেই রাজাধিরাজ মহারাজ ত্রিভুবন-পালক, তিনি এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যিনি সমুদয় জগতের রাজা, যিনি সকলের প্রতিপালক; তিনি এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমরা তাঁরই উপাসনার জন্য এখানে সকলে সম্মিলত হইয়াছি। অসীম আকাশে তাঁর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এই সমাজ-মন্দিরের আকাশেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। এই আকাশ শূন্য নহে; জ্ঞান-নেত্রকে বিস্ফারিত কর, দেখিবে—তাঁর অধিষ্ঠানে এই আকাশ পরিপূর্ণ। এখানে যে জ্যোতির কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে, তিনি সেই জ্যোতির অন্তরাত্মা হইয়া জ্যোতির মধ্যে থাকিয়া আলোক প্রেরণ করিতেছেন—তিনি জ্যোতির জ্যোতি। এখানে যে বায়ু হিল্লোলিত হইতেছে, ইহাতে সেই পবিত্র স্বরূপ ক্রীড়া করিতেছেন। যে বায়ু আমারদিগকে প্রাণ বিধান করিতেছে, সেই বায়ুতে তিনি প্রাণের প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন। এই আকাশে তিনি প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই জ্যোতির মধ্যে তিনি প্রকাশ পাইতেছেন, এই সমীরণের হিল্লোলে তিনি ক্রীড়া করিতেছেন। জ্ঞান-নেত্রে তিনি এই প্রকারে আবির্ভূত হন। যিনি দেখিবার জন্য চক্ষু দিয়াছেন, তিনি কি দেখিতেছেন না? আমরা যে ক্ষুদ্র চক্ষু পাইয়াছি, তাহার দ্বারা আমরাই দেখিতেছি—যিনি চক্ষুকে সৃজন করিয়াছেন, তিনি কি দেখিতেছেন না? তিনি বিশ্বতশ্চক্ষু, তিনি সকল দেখিতেছেন। তিনি কেবল উদাসীনের ন্যায় দেখিতেছেন না, কিন্তু স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিতেছেন। মাতা যেমন শিশুকে দেখেন, পিতা যেমন তাঁহার পুত্রকে দেখেন; সেই রূপ তাঁহার স্নেহ-দৃষ্টি সকলের উপর। আমারদের এই বাক্য তিনি কি শুনিতেছেন না? তিনি শ্রবণ করিতেছেন এবং প্রতি জনের যে মনের ভাব তাহাও জানিতেছেন—কারণ তিনি অন্তর্যামী। যেমন আমরা তাঁহাকে পূজা করিবার নিমিত্ত অদ্য রজনীতে এখানে সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, তিনিও তেমনি পূজা গ্রহণের নিমিত্ত এখানে সমাগত হইয়াছেন—

এস আমরা হৃদয়-থাল-ভার ভক্তি-পুষ্প-হার তাঁর চরণে উপহার দিই। সম্বৎসর কাল যিনি আমারদিগের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছেন, সংবৎসর কাল যিনি কত ভয় বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সংবৎসর যিনি আমারদিগকে শোক গ্লানি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সংবৎসর যিনি আমারদিগকে পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন; সেই আমারদের হৃদয়-বন্ধুকে, সেই আমারদের প্রাণ-সখাকে, সেই আমারদের পিতার পিতাকে প্রণত হইয়া পূজা করি। সংবৎসর কাল যে করুণা আমারদের প্রতি বর্ষিত হইয়াছে, তাহার জন্য কি প্রকারে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইব। ক্ষণ কালের নিঃশ্বাসে যে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি, তারি জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি না; সংবৎসর কাল পর্য্যন্ত তাঁর অজস্র করুণাতে লালিত পালিত হইয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাক্য কোথা হইতে পাইব? আমরা অতি দুর্ব্বল—যত টুকু পারি, তাঁর করুণা স্মরণ করিয়া তাঁর উপসনাতে প্রবৃত্ত হই।

তংহদেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।

সেই আমারদের আত্মার শুভ-বুদ্ধি-প্রদাতা যে পরমেশ্বর, আমরা তাঁর শরণাপন্ন হই—ভয়াবহ সংসারের মোহপাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য মুমুক্ষু হইয়া আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। তাঁর পরণাপন্ন না হইলে কিছুতেই মুক্তির সম্ভাবনা নাই, মুক্তিদাতা বিধাতার শরণাপন্ন হইয়াই মুক্তি লাভ করিতে পারি। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হ্যয়নায়"। মুক্তি লাভের জন্য আর অন্য পথ নাই। আমরা এই ভয়াবহ সংসার-তরঙ্গে নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছি, সংসারের আশা ভরশায় স্ফীত হইয়া দিবানিশি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছি। যদি ঈশ্বরকে দেখিতে পাই, তবেই বিষয়-পাশ ছিন্ন হয়। যদি পরম পিতাকে নিয়ত সাক্ষাৎ পাই, তবে আর ভয় থাকে না। পুত্রেরা যখন পিতাকে সংসার-ক্ষেত্রে আপনার আশ্রয়-রূপে দেখিতে পায়, তখন নির্ভয়ে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করে—সেই পরম পিতাকে নিয়ত সাক্ষাৎ পাইলে তবে সংসারের সমুদায় কর্ম্ম সহজ হয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধনে সম্যক্-রূপে আপনাকে নিঃক্ষেপ করিতে পারি। যদি অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা তাঁহাকে সকল স্থানে গূঢ়-রূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন জানিতে পারি, যদি তাঁর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ পিতার ন্যায়, পিতামহের ন্যায়, দেখিতে পাই; তবে সংসারে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতে পারি। আশা ভয়ে বিক্ষিপ্ত হই না, সুখেতে স্ফীত হই না, দুঃখেতে কাতর হই না। জানি যে সুখেতেও কল্যাণ, দুঃখেতেও কল্যাণ, কেননা সুখ দুঃখ দুইই পরম পিতার হস্ত হইতে আমারদের নিকট আসিতেছে। চিরকাল বসন্ত থাকে না, চিরকাল শীতও থাকে না, ঋতুর পর্য্যায় চাই; তেমনি আত্মাকে দৃঢ়িষ্ঠ করিবার জন্য সুখ দুঃখের আবশ্যক। যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে মঙ্গল স্বরূপের রাজ্যে অমঙ্গল নাই, আমরা আনন্দের সহিত তাঁর রাজ্যে বিচরণ করিতে পারি। যদি জানিতে পারি পিতা কখন পরিত্যাগ করিবেন না, তাঁর নিকটে লইয়া যাইবেন; তবে নির্ভয় হই। সকল সময়ে তিনি আমারদের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন জানিয়া সংসারের মধ্যে পুত্রেরা যেমন পিতার আশ্রয়ে নির্ভয় হয়, তেমনি আমরা নির্ভয় হইয়া তাঁরি আদেশ বহন করি। সেনাপতির আদেশে সৈন্যেরা মস্তক দিতে কি কুণ্ঠিত হয়? যাঁর হস্তে আমারদের প্রাণ, যদি তাঁর কার্য্যের জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি, তবে সে প্রাণ অমূল্য হয়—তাহার বিনাশ হয় না। দেখ, তাঁর শরণাপন্ন হইলে সংসারের দুঃখ থাকে

না, তাঁর শরণাপন্ন হইলে সংসারের পাপ থাকে না। তাঁর শরণাপন্ন হইলে আত্মা শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া স্বীয় আত্মাতে পরমাত্মার সাক্ষাৎ পায়। সে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, পাপ তাহাকে সন্তাপ দিতে পারে না—সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়, মুক্তি লাভ করে।

সংবৎসর কাল দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল—আমরা এই সংবৎসর কি করিলাম? আত্মার উন্নতির জন্য কি করিলাম? হে মন "ক্রতোস্মর কৃতংস্মর" আপনার কৃত কর্ম্ম স্মরণ কর। কাল যাহা চলিয়া গেল, তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। এই পৃথিবী যে আকাশ দিয়া একবার চলিয়া গেল, তাহা আর সে আকাশে চলিবে না—যে স্রোত নদী দিয়া চলিয়া গেল, তাহা আর ফিরিবে না, যে সুখ দুঃখ—ভোগ করিয়াছি, তাহা আর আসিবে না। কালের স্রোত চলিয়া যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তনশীল চঞ্চল কালের মধ্যে থাকিবে কি? যতটুকু জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেমের সহিত আত্মাতে পরমাত্মাকে ধারণ করিয়াছি, যতটুকু তাঁহার সঙ্গে যোগ সম্ভোগ করিতে পারিয়াছি, তাহাই থাকিবে। আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ, তাহা বিষয়-ভোগের ন্যায় ক্ষণ-ভঙ্গুর নহে—কালের ইহাতে হস্ত নাই। যদি কালে সকলি যায়, ঈশ্বর-লাভ চিরস্থায়ী থাকিবে। "চৌরেণাপি ন নীয়তে" কাল-রূপ তস্করও তাহা অপহরণ করিতে পারে না। যে সকল পৃথিবীর বস্তু, তাহা পৃথিবীতেই পড়িয়া থাকিবে—আত্মাতে যে কিছু জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম লাভ করিব, পরমাত্মার সঙ্গে যে যোগ নিবদ্ধ করিব; তাহা লইয়াই এখান হইতে চলিয়া যাইব। অতএব কালের গতির মধ্যে অক্ষয় ধন লাভ কর, তাহাতেই মুক্তি, সুখ, আনন্দ। হে পরমাত্মন্! এই ভয়াবহ সংসারে তুমি আমারদিগকে রক্ষা কর; আমরা মুমুক্ষু হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—আমারদিগকে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাংখ্য-দর্শন।

সৎকার্য্যবাদ।

" নাসদুৎপাদোনৃশৃঙ্গবৎ।"

(কাপিল সূত্র)

সংক্ষেপে প্রমাণ পরীক্ষা * সমাপ্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রমেয় পরীক্ষা উপস্থিত। ইহাও সংক্ষেপে বক্তব্য।

সাংখ্য মতে তাত্ত্বিক প্রমেয় পঞ্চবিংশতির অতিরিক্ত নহে। যদ্যপি পশু, পক্ষী, মনুষ্য,—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, —ঘট, পট, গৃহ, কুড্য প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই প্রমেয়; এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আত্মা প্রভৃতি যে কিছু আন্তর পদার্থ, তাহাও প্র-

* পূর্ব্বে তিনটি মাত্র প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে। যদিও মতবিশেষে অধিক প্রমাণের কথা উল্লেখ আছে, তথাপি তাহা উল্লেখ মাত্র। সাংখ্য মতে "নান্যূনং নাতিরিক্তম্" তিনের অতিরিক্ত প্রমাণ নাই, ন্যূনও নাই। অলৌকিক আর্ষ বিজ্ঞান, বা যোগি-প্রত্যক্ষ যদিও প্রমাণান্তরের ন্যায় অসাধারণ ফল প্রসব করে, তথাপি তাহা কথিত প্রমাণত্রয় হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে। যোগিরা যোগ বলে, বিদেশীয়েরা যন্ত্র বলে, অতি দূরস্থ বস্তুকেও নিকটস্থের ন্যায় লক্ষ্য করেন—পরমাণু বা তত্তুল্য সূক্ষ্ম বস্তুকেও স্থূলবৎ প্রত্যক্ষ করেন—এ কথা শুনা যায় ও দেখা যায়। কিন্তু তদ্বিধ দর্শনের উপায়ীভূত যোগ ও যন্ত্র তাহারা স্বয়ং কোন প্রমাণ নহে। তবে কি না, প্রমাণান্তরের অনুগত হইলে তাহাদিগের সাধক বটে। যোগ বা যন্ত্র ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইলে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি করে মাত্র, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুরই সাধক বা বাধক হয় না। এই কথা মীমাংসক নাগা ভট্ট বলিয়াছেন, যথা "স্বচ্ছপ্রসাদস্বাভাব্যাৎ কাচাদীনাং প্রত্যক্ষপ্রত্যবাধকত্বং, প্রত্যুত উৎকর্ষতারতম্যাদিন্দ্রিয়শক্তেরুৎকর্ষতারতম্যকারিত্বম্।"

অপিচ, যোগ ও যন্ত্র, এতদুভয়ের মধ্যে অপর এক প্রভেদ বর্ত্তমান আছে। যন্ত্র কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের শক্তি

মেয় ; তথাপি, তাহা প্রমেয় হইলেও তাত্ত্বিক প্রমেয় নহে। উহা ব্যবহারিক প্রমেয় *।

তাত্ত্বিক প্রমেয় কি ? যাহা তত্ত্ব অর্থাৎ কোন মৌলিক পদার্থ বলিয়া প্রমা জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাই তাত্ত্বিক প্রমেয়। এক মাত্র মৃদ্বিকারকে ঘট, শরাব এবং উদঞ্চন প্রভৃতি নানা নামে ব্যবহার করিলেও, ব্যবহার নিষ্পাদনের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া গণনা করিলেও, তাহা যেমন মৃত্তিকা হইতে তত্ত্বান্তর নহে, তেমনি আন্তর ও বাহ্য পদার্থের ব্যবহার দশায় অসংখ্যত্ব কল্পনা করিলেও সে সমস্তের তত্ত্ব অসংখ্যেয় নহে। পদার্থ সকল ব্যবহার কালে একবিধ ; কিন্তু তাহার তত্ত্ব অন্যবিধ।

কাহারো মতে জগতের মূল তত্ত্ব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, কাহারো মতে প্রকৃতি আর পুরুষ, আবার কাহারো মতে জগতের তত্ত্ব অন্যবিধ। যতই কেন মত থাকুক না, ব্যবহারের সমসংখ্যক তত্ত্ব কোন মতে নাই। ব্যবহার ভাবের কাল্পনিকতা আর মূলের তাত্ত্বিকতা দেখাইবার নিমিত্ত ছান্দোগ্য-ষষ্ঠাধ্যায়ে একটি আখ্যায়িকা কথিত হইয়াছে। ঐ আখ্যায়িকার স্থূল মর্ম্ম এই যে, "পুরাকালে উদ্দালক নামে এক জন ঋষি, শ্বেতকেতু নামক আপন পুত্রকে ব্রহ্মজ্ঞ করিবার নিমিত্ত গুরু সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্বেতকেতু, কিছু কাল পরে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, উদ্দালক তাহার জ্ঞান-পরিমাণ অনুভবার্থে, তদীয় মুখ জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, শ্বেতকেতুর তত্ত্ব জ্ঞান হয় নাই, তদীয় অন্তঃকরণ কেবল বিদ্যাভিমানে পরিপূর্ণ হইয়াছে। শ্বেতকেতু তত্ত্বজ্ঞ হয় নাই, একটি বিচারমল্ল হইয়াছে।

উদ্দালক তদ্দর্শনে দুঃখিত হইলেন। ভাবিলেন, এখন আর ইহাকে উপদেশ দেওয়া বৃথা। যে মনুষ্যের জিজ্ঞাসা-বৃত্তি প্রবল নাই, নিজের জ্ঞান শক্তির প্রতি সংশয় নাই, সে মনুষ্যকে উপদেশ দিতে নাই। অতএব, যদি কোন প্রকারে ইহার নিজ অজ্ঞানসত্তা অনুভব হয়, তবেই ইহার বর্ত্তমান অজ্ঞান উপদেশ দ্বারা উপশান্ত হইতে পারিবে। উদ্দালক মনে মনে এই রূপ আন্দোলন করিয়া শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সৌম্য, শ্বেতকেতু! তুমি সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছ, কিন্তু তুমি এমন কোন পদার্থ জানিয়াছ—যাহাকে জানিলে সমস্তই জানা হয় ?" —

শ্বেতকেতু বলিলেন "পিতঃ। উহা কি রূপে সম্ভব হয় ?" —

উদ্দালক বলিলেন "একটি মৃণ্ময় বস্তুর মূল জানিলে যেমন সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুই জানা হয়—একটি নখনিকৃন্তনের তত্ত্ব জানিলে যেমন যাবৎ কার্ষ্ণায়স পদার্থই জানা হয়—একটি

বৃদ্ধি করে, কিন্তু যোগ অন্তরিন্দ্রিয়েরও শক্তি বৃদ্ধি করে। যন্ত্র, সূক্ষ্ম বস্তুর শরীরে স্থূলত্ব ভ্রম না জন্মাইয়া ঠিক আকারটিকে চক্ষুর্গোচর করিতে পারে না, দূরস্থ বস্তুকে নিকটস্থের ন্যায় ভ্রম না জন্মাইয়া প্রত্যক্ষে উপনীত করিতে পারে না, কিন্তু যোগ তাহা পারে। (যোগের ঐ রূপ শক্তি আছে কি না, ঠিক বলা যায় না। তবে বুদ্ধ্যারোহ করিবার নিমিত্ত যে কিছু যুক্তি আছে, তাহা পাতঞ্জল দর্শন লিখিবার কালে বক্তব্য।)

আর এক কথা। ভারত যুদ্ধের সময় ব্যাসদেব সঞ্জয়কে এক দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিয়া যান। লিখিত আছে, সঞ্জয় তদ্দ্বারা দূরস্থ যুদ্ধকাণ্ড নিকটস্থের ন্যায় অবলোকন করিয়া তদ্বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রের গোচর করিতেন। "নিকটস্থের ন্যায়" এই লিখন ভঙ্গি দ্বারা বোধ হয় ঐ দিব্য চক্ষুঃ কোন প্রকার যন্ত্র যাতীয় হইবে। চস্‌মা যখন দিব্যচক্ষুর নামান্তর, তখন অসম্ভবই বা কি।

* প্রমা শব্দের অর্থ যথার্থ জ্ঞান। সেই যথার্থ জ্ঞান যে বস্তুকে অবগাহন করে সেই বস্তুই প্রমেয়। এতাবতা বস্তু, পদার্থ, প্রমেয়, এই সমস্ত নাম এক অর্থেই ব্যবহার হয়। ব্যবহারিক প্রমা আর ব্যবহারিক প্রমেয় ব্যবহার কালেই উপযুক্ত, কিন্তু তাত্ত্বিক প্রমা ও তাত্ত্বিক প্রমেয় তত্ত্ব জ্ঞানের উপযুক্ত।

হিরণ্য কুণ্ডলের প্রকৃতি জানিলে যেমন যাবৎ হিরণ্ময় বস্তুই জানা হয়—তেমনি এক মাত্র মৌলিক পদার্থ জানিতে পারিলে, তৎকার্য্যভূত সমস্ত পদার্থই জানা হয়।"

উদ্দালকের এবম্বিধ প্রশ্নে শ্বেতকেতুর ক্রমে নিজ জ্ঞান-শক্তির প্রতি সংশয় জন্মিল, জিজ্ঞাসার উদয় হইল, বুভুৎসা প্রবল হইল; অনন্তর তর্ক সহকৃত উপদেশ দ্বারা তদীয় মনে তত্ব সঞ্চার হইল। অতএব ব্যবহার কালে ঘট-শরাবাদির পার্থক্য অনুভূত হইলেও তাহা তাত্বিক জ্ঞানের নিকট অসত্য। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" বিকার পদার্থ সকল বাক্য দ্বারাই সৃষ্ট হয়, নাম সকলের সত্যতা নাই; মূল পদার্থেরই সত্যতা। ঘট, শরাব, উদঞ্চন,—এ সকল নাম মাত্র, মৃত্তিকাই সত্য।

এই অভিপ্রায় কেবল উদ্দালক ঋষির নহে, সাঙ্খ্যাচার্য্যদিগেরও বটে। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, কার্য্য কারণ ভাব রূপ সূত্র অবলম্বন করিয়া জগতের মূল তত্বে উপনীত হও—তাহা হইলে আপনার স্বরূপ ও জগতের যথার্থ রূপ অবগত হইতে পারিবে—জগৎ ও আত্মা, এই দুই পদার্থে বিবেক জ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হইবে।

দার্শনিকদিগের কথা গুলি শুনিতে যেমন, বুঝিতে তেমন নহে। অথবা বুঝিতে যেমন, পরীক্ষা করিতে তেমন নহে। সাংখ্যকার বলিলেন "নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য কারণ ভাব অবলম্বন করিয়া মূল তত্বে উপনীত হও" কিন্তু তত দূর গমন করিবার পরিষ্কৃত পথ কৈ?—জগতের ভাব, গতি, সংস্থান ও কার্য্য শক্তি এমনি বিচিত্র, এমনি আশ্চর্য্য যে, নিম্ন শ্রেণীর কার্য্য কারণ ভাব স্থির করাও সুকঠিন। আবার মনুষ্য মনের সহিত এই জগতের এমনি বক্র সম্বন্ধ, এমনি প্রতার্য্য-প্রতারক ভাব যে, একটা সামান্য কার্য্য কারণ ভাব গড়িতে গেলেও মত ভেদ উপস্থিত হইবে। কোন অনুকরণ ধ্বনির (যেমন ঢেঁকীর কচ্‌কচির) প্রতি মনোনিবেশ করিলে, সেই ধ্বনিকে যখন যেরূপ কল্পনা করা যায় তখন সেই রূপই বোধ হয়। এই যেমন হয়, জগৎ বা আত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেও ঠিক্ সেই রূপ হয়। না হইবে কেন? যখন জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহার দুইটি এক রূপ পাওয়া যায়, তখন অবশ্যই ওরূপ হইবে। প্রজ্ঞা প্রত্যেক ব্যক্তিতেই বিশ্রান্ত বটে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিতেই অত্যন্ত ভিন্ন। অতএব, যাঁহার যেমন প্রজ্ঞা, তিনি তদনুরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন, বহু লোকে বহু প্রকার সিদ্ধান্ত করিবে, তন্মধ্যে কাহার সিদ্ধান্ত ঠিক্, কে বলিতে পারে?—

সাংখ্যকার বলেন, নির্দ্দোষ সংস্কৃত আত্মাই উহা বলিতে পারে। যাহা ত্রৈকালিক, (কস্মিন্ কালেও যাহার অন্যথা হয় না) তর্ক পরিষ্কৃত, সংস্কৃত আত্মা নিরপেক্ষ সৎপুরুষের প্রিয়, তাহাই ঠিক্। সেই ঠিক্ সিদ্ধান্তই ফল প্রসব করে। সেই সিদ্ধান্তই কল্যাণকামী পুরুষের সুগ্রাহ্য। উৎপত্তি ঘটিত কার্য্য কারণ ভাব সম্বন্ধে অনেক মত আছে বটে, কিন্তু সে সমস্ত অত্রৈকালিক, অতর্কপরিষ্কৃত, সংস্কৃতাত্মার নিকট অপ্রিয়; সুতরাং সে সকল মত অসৎ।

এক মত আছে, "অসতঃ সজ্জায়তে" অসৎ অর্থাৎ রূপ আখ্যা বিবর্জ্জিত কারণ হইতে সৎ পদার্থ জন্ম লাভ করে। (এই মতের নাম অসৎ কার্য্যবাদ)*।

* "অস্তীতি প্রতীতিবিষয়:" যাহা আছে বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহার নাম সৎ ('আছে' এই জ্ঞান প্রমা জ্ঞান হওয়া আবশ্যক) সৎ ও সত্য একই বস্তু। সদ্বিপরীতের নাম অসৎ বা অসত্য। যাহার রূপ নাই, আখ্যা নাই,—যে স্বয়ংও নাই, তাহার নাম অভাব বা অসত্য। যথা নরশৃঙ্গ, শশবিষাণ, বন্ধ্যা পুত্র ইত্যাদি।

আর এক মত আছে, "একস্য সতো বিবর্ত্তঃ কার্য্যজাতং ন বস্তু সৎ" এক সদ্বস্তু হইতে এই দৃশ্যমান কার্য্য জাত আত্ম লাভ করিয়াছে এবং এসমস্তই অসৎ অর্থাৎ ভ্রমোৎপন্ন। (এই মতের নাম বিবর্ত্তবাদ)।

অন্য এক মত আছে "সতোঽসজ্জায়তে" পরমাণু প্রভৃতি সৎ পদার্থ হইতে অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে ছিল না যে দ্ব্যণুকাদি তাহারা উৎপন্ন হয়। (এই মতের নাম অভাবোৎপত্তি বাদ)।

অপর এক মত এই যে "সতঃ সজ্জায়তএব" সদ্বস্তু হইতে সদ্বস্তুই উৎপন্ন হয়,অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেও থাকে। এই মতের নাম সৎকার্য্য বাদ। সাংখ্য প্রণেতা কপিল এই মতের পক্ষপাতী। মহর্ষি কপিল যুক্তি সহকারে বলিয়াছেন "পূর্ব্ব পূর্ব্ব মত গুলি সদোষ, অন্যথাভবিক, অত্রৈকালিক, সংস্কৃত আত্মার অপ্রিয়, স্বতরাং অসৎ ও অগ্রাহ্য; কিন্তু এই মতটি উহার বিপরীত, সাধু ও সুগ্রাহ্য।

কার্য্য, উৎপত্তি হইবার পূর্ব্বেও ছিল—কোথায় ছিল?—কারণ দ্রব্যে লুক্কায়িত ছিল।

যুক্তি কি?—বিপ্রতিপত্তিই বা কি?—

বিপ্রতিপত্তি! প্রথমতঃ সিদ্ধ সাধন,—যাহা থাকে, তাহার আবার উৎপত্তি কি?—"ছিল না হইল" এমন হইলেই উৎপত্তি বলা যায়। কার্য্য চিরকালই যদি আছে, তবে তাহার নিমিত্ত যত্ন বা আয়াস কেন?—আছে! আয়াস বা যত্নের প্রয়োজন আছে। লুক্কায়িত অর্থাৎ শক্তি রূপে সবস্থিত অব্যক্ত কার্য্যকে ব্যক্ত করাই যত্ন ও আয়াসের ফল, অনভিব্যক্ত কার্য্য ব্যবহারের উপযোগী নহে, ফল জনকও নহে। মৃৎপিণ্ডে ঘট-শক্তি আছে কিন্তু ঘটের অভিব্যক্তি ব্যতিরেকে তদ্দ্বারা জলাহরণ বা অন্যবিধ অর্থ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না; সুতরাং অভিব্যক্তির নিমিত্ত তাহাতে ব্যাপার-সংযোগ করিতে হয়। কার্য্যের সদ্ভাব থাকিলেও যখন তাহার অভিব্যক্তি হওয়ার অপেক্ষা আছে, তখন আর কার্য্য প্রবৃত্তির ব্যাঘাত হইবে কেন? যত্ন বা আয়াসের বৈফল্যইবা হইবে কেন?—কার্য্যের অনাগতাবস্থা, বা কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বাবস্থা, অথবা অব্যক্ত অবস্থার নাম উৎপত্তি না হওয়া;—বর্ত্তমানাবস্থা, বা ব্যক্ত অবস্থার নাম উৎপত্তি;—আর অতীতাবস্থা বা স্বকারণে পুন র্ব্বিলীন হওয়ার নাম ধ্বংস। এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ উৎপত্তি, অনুৎপত্তি ও বিনাশ নাই।

যে কারণে যে কার্য্য-শক্তি নাই, সেই কারণ-দ্রব্য হইতে সেই কার্য্যের উৎপত্তি কদাচ হইবে না। শত সহস্র শিল্পী একত্রিত হইলেও নীলকে পীত করিতে পারেন না। অসংখ্য উপায় অবলম্বন করিয়া চির কাল নিষ্পীড়ন করিলেও সিকতা হইতে স্নেহ নির্গলিত হইবে না; কেন? না পীত বা স্নেহ, নীলে বা সিকতায় নাই। অতএব যে কার্য্য যে উপাদানে লুক্কায়িত থাকে, শক্তি রূপে নিহিত থাকে, সেই কার্য্যই সেই উপাদান হইতে প্রাদুর্ভূত হয়, কার্য্যান্তর হয় না। যদি তাহা হইত, তবে সকল বস্তু হইতেই সকল বস্তু হইতে পারিত। যখন তাহা হয় না, তখন বিশেষ বিশেষ কার্য্য-শক্তি বিশেষ বিশেষ উপাদানে শক্ত (শক্তি সম্বন্ধে আবদ্ধ) আছে, সন্দেহ নাই। কপিল এই সৎকার্য্য রক্ষার নিমিত্ত অনেক প্রকার তর্কের উদ্ভাবন করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সে সকল ত্যাগ করা গেল *।

* "ত্রিবিধবিরোধাপত্তেশ্চ" "নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ" "উপাদান নিয়মাৎ" "সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাসম্ভবাৎ" "শক্তস্য শক্য করণাৎ" "কারণ ভাবাচ্চ"—"নাভিব্যক্তি নিবন্ধনৌ ব্যবহারাব্যবহারৌ" "নাশঃ কারণলয়ঃ" এই সকল কপিল সূত্রের মর্ম্ম লইয়া ইহা লিখিত হইল।

সাংখ্য মতে কার্য্য দ্বিবিধ। এক অভিব্যজ্যমান; অপর উৎপদ্যমান। ধান্য হইতে তণ্ডুল, গো হইতে দুগ্ধ,—ইত্যাদি প্রকার কার্য্য জাতের নাম অভিব্যজ্যমান। বীজ হইতে অঙ্কুর, আহার দ্রব্য হইতে শোণিত,—ইত্যাদি জাতীয় কার্য্যের নাম উৎপদ্যমান। এই দ্বিবিধ কার্য্যই শক্তিরূপে স্বীয় কারণে অবস্থান করে। উপযুক্ত উপায় প্রয়োগ করিলেই তাহারা স্বীয় স্বীয় রূপ ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়। সেই প্রকাশ পাওয়ার নাম, কোথাও অভিব্যক্তি, কোথাও বা উৎপত্তি।

কার্য্য-শক্তি জ্ঞান কাহারো বা কার্য্য-নিষ্পত্তির অনন্তর জন্মে, কাহারো বা তৎপূর্ব্বেই জন্মে। পরে জন্মে জড় বুদ্ধি মনুষ্যের, আর পূর্ব্বে জন্মে পরীক্ষক মনুষ্যের। এই জন্যই পরীক্ষক পুরুষেরা কার্য্যোন্নতি করিতে পারেন, জড় বুদ্ধিরা পারেন না।

সাংখ্য মতে কারণও দুই প্রকার। এক প্রকার নিমিত্ত কারণ, অপর প্রকার উপাদান কারণ। কারণ শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে "যেন বিনা যন্ন ভবতি তত্তস্য কারণম্" যদ্ব্যতিরেকে যে আত্ম লাভ করিতে পারে না, সে তাহার কারণ। এই লক্ষণ অনুসারে সকল বস্তুই সকল বস্তুর কারণ হইয়া উঠে। এই জন্য ঐ সাধারণ কারণ কূটের মধ্য হইতে কতকগুলিকে কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অধিকরণ, সম্প্রদান প্রভৃতি নাম দিয়া বিশেষ করা হয়। পশ্চাৎ অবশিষ্ট দুইটীর মধ্যে ঘনিষ্টতা অনুসারে একের নাম নিমিত্ত অপরের নাম উপাদান দেওয়া হয়। এই উপাদান কারণকে নৈয়ায়িকেরা সমবায়ী কারণ বলিয়া থাকেন। উপাদান কারণের সহিত নিমিত্ত কারণের প্রভেদ এই যে, কার্য্যের শরীরে উপাদান দ্রব্যের সংযোগ থাকে কিন্তু নিমিত্ত দ্রব্যের থাকে না। ফল, যে দ্রব্যের গাত্রে কার্য্য-জন্মে, বা, যে দ্রব্য বিকৃত হইয়া কার্য্য জন্মায়, তাহারই নাম উপাদান। কারণে যে কার্য্য শক্তি বিলীন হইয়া থাকে, সে উপাদান কারণেই থাকে।

ব্রাহ্মধর্ম্মে খ্রীষ্টীয় অনুকরণ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মোদ্ভব ধর্ম্ম। মহাত্মা রামমোহন রায় হিন্দুশাস্ত্র মূল করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা এদেশে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও প্রগাঢ় শাস্ত্রীয় জ্ঞান সহকারে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে হিন্দুদিগের প্রধান শাস্ত্র বেদ বেদান্তে, শুদ্ধ উল্লিখিত প্রধান শাস্ত্রে নহে, পুরাণ ও তন্ত্রেও একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনার বিধি আছে। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রধান আচার্য্য মহাশয় হিন্দুশাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। তিনি উপনিষদের সার বাক্য গুলি একত্র করিয়া ব্রাহ্মদিগের উপাসনা প্রকরণ প্রস্তুত করেন ও বিবাহাদি গৃহ্য ক্রিয়ার পুরাতন পদ্ধতি হইতে পৌত্তলিক অংশ বর্জ্জন করিয়া ব্রাহ্ম পদ্ধতি প্রস্তুত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন হিন্দুধর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই রূপ উহার স্বাভাবিক হিন্দু আকার যদ্যপি এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত নিষ্ঠতার সহিত রক্ষিত হইত, তাহা হইলে এত দিনে ব্রাহ্মধর্ম্মের কত দূর উন্নতি হইত তাহা বলা যায় না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে কতকগুলি ব্রাহ্ম খ্রীষ্টধর্ম্মকে আদর্শ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্যে নানা প্রকার খ্রীষ্টীয় অনুকরণ প্রবিষ্ট করাইতেছেন এবং খ্রীষ্টীয় আকারে তাহা প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যকে এই রূপে তাহার স্বাভাবিক গতি হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচুর অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। [illegible] খ্রীষ্টীয় অনুকরণের বেগে কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইতেছে এমত

নহে; নিজ ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্যে নানা প্রকার ভ্রমাত্মক মত প্রবেশ করিয়া উহার মহিমাকে কলঙ্কিত করিতেছে। প্রচার কার্য্যের ব্যাঘাত অপেক্ষা এই রূপ ভ্রমাত্মক মত সকলের প্রবেশ আরো আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে। আমরা উল্লিখিত খ্রীষ্টীয় অনুকরণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

উল্লিখিত খ্রীষ্টীয় অনুকরণের প্রথম দৃষ্টান্ত খ্রীষ্টের প্রতি অযথা ভক্তি। খ্রীষ্ট এক জন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি দোষশূন্য ব্যক্তি ছিলেন না। যেরূসালেম-স্থিত পরমেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গনে উৎসবের দিনে দেশ-প্রচলিত নানা মুদ্রা লইয়া বণিকেরা উপবিষ্ট থাকিত; যাহার টাকা ভাঙ্গাইবার আবশ্যক হইত তাহাদিগের নিকট ভাঙ্গাইত। এই সকল বণিকেরা উল্লিখিত ব্যক্তিদিগকে টাকা ভাঙ্গাইবার সময় প্রতারণা করিত, তজ্জন্য খ্রীষ্ট তাহাদিগের মুদ্রাধার টেবিল গুলিকে উল্টাইয়া ফেলিয়া ও তাহাদিগকে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। ক্রোধ বশতঃ রাজ নিয়ম বিরুদ্ধ এরূপ কার্য্য করা খ্রীষ্টের পক্ষে অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছিল। তিনি কোরাজিন, বেথ্‌যিডা ও যেরূসালেম প্রভৃতি নগরদিগকে এই অভিশাপ দিয়াছিলেন যে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হইবে; তাহাদের একটি প্রস্তর খণ্ড আর একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর থাকিবে না। খ্রীষ্ট যেরূপ ক্ষমার উপদেশ দিয়াছিলেন এরূপ অভিশাপ প্রদান তাঁহার উপযুক্ত কার্য্য হয় নাই; তন্নগরবাসীরা যাহাতে সৎপথে আইসে ঈশ্বরের নিকট কেবল প্রার্থনা করা তাঁহার পক্ষে শোভা পাইত। প্রসিদ্ধ পুরাবৃত্ত লেখক গিবন্ এই কথা বলিয়াছেন যে "The path from enthusiasm to imposture is *slippery.*" "ধর্ম্মোন্মত্ততা হইতে প্রতারণার পথ পিচ্ছিল"। খ্রীষ্ট আপনাকে মসিহা বলিয়া অবশেষে পরিচয় দেওয়াতে তিনি প্রতারণা অপবাদের ভাগী হইতে পারেন এরূপ বোধ যাঁহারা খ্রীষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা ব্যতীত অন্য সকলে না করিয়া থাকিতে পারেন না*। কোন কোন ব্রাহ্ম খ্রীষ্টকে Prince of Prophets অর্থাৎ ঈশ্বর নিয়োজিত ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের রাজা বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি ঐ আখ্যার উপযুক্ত হইতে পারেন কি না পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন। যে ব্যক্তি রিপুর বশীভূত তাহাকে "Supernatural moral heroism" অর্থাৎ অলৌকিক ধর্ম্মশূরত্ববিশিষ্ট ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। কোন বিশেষ ধর্ম্মোপদেষ্টার প্রতি এরূপ অযথা ভক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে কোন মতেই সঙ্গত হয় না।

অবতারবাদ উল্লিখিত খ্রীষ্টীয় অনুকরণের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। অবতারবাদ যে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে তাহার প্রমাণ এই পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডে এই অবতারবাদের কোন চিহ্ন নাই। উপনিষদে উল্লেখ আছে যে ঈশ্বর "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং কুতশ্চিৎ ন বভূব কশ্চিৎ" "ঈশ্বর জন্মেন না ও মরেন না, তিনি কিছু হইতে হয়েন নাই ও তাঁহা হইতে কিছু হয় নাই।" ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানকাণ্ড সমুদ্ভূত। ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি সাধারণ গতিতে চলিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে এই অবতারবাদ হইতে উহা বিমুক্ত থাকিত।

---

* যাঁহারা খ্রীষ্টের দোষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পার্কর "Discourse of Religion" নামক গ্রন্থে যেখানে Limitations of Jesus" বিষয়ে লিখিয়াছেন সেই স্থান ও এই পত্রিকায় প্রকাশিত নিউমানের খ্রীষ্ট বিষয়ক বক্তৃতা এবং ফরাশীস গ্রন্থকর্ত্তা রেণা প্রণীত খ্রীষ্টের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সংস্থাপকেরা কখন স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে অবতারবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কলঙ্কিত করিবে।

পৌত্তলিকতার প্রতি অস্বাভাবিক বিদ্বেষ ও আক্রোশ উল্লিখিত খ্রীষ্টীয় অনুকরণের তৃতীয় দৃষ্টান্ত। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি দেব দেবীর উপাসনাকে স্বভাবতঃ হীন কল্প মনে করিতে পারেন কিন্তু তাহা বলিয়া পৌত্তলিকদিগের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য হয় না। এই জগতের সকল পদার্থেরই ক্রম আছে। ধর্ম্মোন্নতিরও ক্রম আছে। একেবারে লোকে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না। পৌত্তলিকতা ঈশ্বরের অপমানজনক কার্য্য ও তজ্জন্য উহা মহাপাপ এই ভাবটি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা লইয়াছেন। লোকে দেব দেবীর উপাসনা করিলে ঈশ্বরের ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয় ও তাঁহার অপমান হয় এই রূপ বর্ণনা বাইবেলে আছে। বাইবেল প্রণেতারা বিবেচনা করেন নাই যে লোকে যেখানে যেমন করিয়া উপাসনা করুক না কেন, সেই একমাত্র পরমেশ্বরকে সকলেই উপাসনা করে। পৌত্তলিকতা মহাপাপ নহে; উহা কেবল ভ্রম মাত্র। যিনি ব্রাহ্ম তিনি লোকদিগকে এই ভ্রম হইতে বিমুক্ত করিতে অবশ্য যত্ন করেন।

খ্রীষ্টীয় অনুকরণের প্রধানতঃ এই তিনটি উদাহরণ আমরা দেখাইলাম। সামান্য সামান্য বিষয়ে উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্টিয়ানদিগের যে কত অনুকরণ করেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহারা আপনাদিগের বক্তৃতা ও লিখিত প্রস্তাবে অনেক খ্রীষ্টীয়ান শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা আদেশ (Message, from God), দেবোত্তেজনা (Inspiration), বিধান (Dispensation) স্বর্গ-রাজ্য (Kingdom of Heaven), স্বর্গস্থ পিতা (Heavenly Father), পুনর্জন্ম (Regeneration)। হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বর-আদেশের কোন উল্লেখ নাই। ঈশ্বর মানবআত্মায় নিহিত কর্ত্তব্যবিবেক দ্বারা আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন। আচার্য্যের মুখ হইতে যাহা বিনির্গত হইবে, তাহা ঈশ্বরের আদেশ, প্রকৃত ব্রাহ্ম এরূপ বিশ্বাস কখনই করিতে পারেন না। এরূপ বিশ্বাস লোকের মধ্যে প্রচলিত হইলে তাহারা নিজের ভ্রম ও পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না। উক্ত বিশ্বাসের বিষময় ফল এখনই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। ঈশ্বরের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ধর্ম্মোপদেষ্টারা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। এ প্রকার অযৌক্তিক বিশ্বাসের চিহ্ন হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ডে দৃষ্ট হয় না। জ্ঞানকাণ্ডে এই রূপ লিখিত আছে যে ঈশ্বর সকল মনুষ্যকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, তিনি তাহাদিগকে শুভ বুদ্ধিতে নিযুক্ত করেন এবং তাহাদিগের হৃদয়ে পরমার্থ বুদ্ধি প্রকাশ করেন। কিন্তু কোথাও এমন উল্লেখ নাই যে তিনি বিশেষ ব্যক্তিকে আপ্ত বাক্য উচ্চারণ করিতে উত্তেজিত করেন। ঈশ্বর যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়। ধর্ম্ম-বিষয়ে প্রতি বৎসর তাঁহার এক এক নূতন বিধান বাহির হয়, ভারতবর্ষের কোন জ্ঞানী কখন এরূপ বিশ্বাস করেন নাই। "স্বর্গরাজ্য" শব্দ কি অর্থে উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা ব্যবহার করেন, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত সম্যক রূপে বুঝিতে পারিলাম না। যদি ঐ শব্দে বিদ্বেষ ও কলহ শূন্য ঈশ্বর ও মনুষ্যের প্রতি সম্পূর্ণ প্রীতির অবস্থা বুঝায়, তাহা হইলে কখন পৃথিবীতে এ প্রকার অবস্থার অভ্যুদয় হইবে এমন সম্ভব বোধ হয় না। যত দিন মনুষ্য মনুষ্য থাকিবে, তত দিন পর্য্যন্ত ঐ অবস্থা আ-

গমন করিতে পারে না। আমাদিগের দেশের জ্ঞানীরা "বিভু" অর্থাৎ "সর্ব্বব্যাপী" শব্দে ঈশ্বরকে একাল পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া আসিতেছেন। "স্বর্গস্থ পিতা" এরূপ অদ্ভুত বাক্য তাঁহার প্রতি তাঁহারা কখন নিয়োগ করেন নাই। আমাদিগের শাস্ত্রে "দ্বিজ" শব্দ আছে কিন্তু তাহা উপনয়নসংস্কার দ্বারা পুনর্জন্ম বুঝায়। উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা পুনর্জন্ম খ্রীষ্টীয় অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহারা খ্রীষ্টীয় অনুকরণ স্পৃহা দ্বারা এ প্রকার উত্তেজিত যে তাঁহারা Trinity অর্থাৎ "ত্রীশ্বর" শব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন যখন বিলাতে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিবেচনায় ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি এই বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যদি উপরোক্ত ব্রাহ্মেরা উল্লিখিত শব্দ সকলের ব্যবহার সম্বন্ধে এই কথা বলেন যে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার না করিলে ধর্ম্মবিষয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করা যায় না, তদ্বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, যে সকল ভাব ঐ সকল শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত সে সকল ভাবের কোন সম্বন্ধ নাই। বল পূর্ব্বক সে সকল ভাব ব্রাহ্মধর্ম্মে আনয়ন করা কর্ত্তব্য হয় না।

উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা কেবল মতে ও শব্দব্যবহারে খ্রীষ্টীয়ানদিগের অনুকরণ করেন এমত নহে, তাঁহাদিগের উপাসনালয়ের আকৃতিতে ও উপাসনা কার্য্য সম্পাদনের প্রণালীতেও ঐ অনুকরণ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা কি অভিপ্রায়ে এই অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি খ্রীষ্টীয়ানদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে উল্লিখিত অনুকরণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতেছেন এমত বোধ হয় না। খ্রীষ্টীয়ানেরা তাঁহাদিগকে এই রূপ অনুকরণ জন্য উপহাস করিয়া থাকেন। সম্প্রতি বেঙ্গাল খ্রীষ্টীয়ান হেরাল্ড নামক একটী খ্রীষ্টীয়ান সংবাদ পত্রের সম্পাদক এই প্রকার অনুকরণকে "Childish and ludicrous" অর্থাৎ বালকোচিত এবং উপহাসাস্পদ বলিয়াছেন। এ দিকে হিন্দুসমাজ তাঁহাদিগের প্রতি ঐ অনুকরণ জন্য বিলক্ষণ বিরক্ত। তবে এই রূপ অনুকরণে কি লাভ হইল? লাভের মধ্যে এই হইয়াছে যে কতকগুলি ভ্রমাত্মক মত প্রচার ও উপহাসাস্পদ শব্দ ব্যবহার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ গৌরবের বিলক্ষণ হানি হইতেছে।

বৈরাগ্যের আভাস।

প্রত্যেকে আপনার অন্তর পরীক্ষা কর, দেখিবে, তথায় নিরন্তর দেবাসুরের সংগ্রাম হইতেছে। কখন দেবতার জয় অসুরের পরাজয়, কখন বা অসুরের জয় দেবতার পরাজয়। যদি একটি দেবতা জয় লাভ করেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবতা জয় ধ্বনি করিয়া উঠিবেন, যদি একটি অসুর জয় লাভ করে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অসুর জয় ধ্বনি করিয়া উঠিবে। উভয় পক্ষ আপন অধিকার সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উভয় পক্ষই যা কিছু প্রতিকূল আয়ত্ত করিয়া লইতেছে। এই রূপে আমাদিগের আত্মা সুরাসুর সংগ্রামে নিরন্তর পিষ্টপেষিত হইতেছে।

এক্ষণে একবার সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ কর। তথায় কেবলই ভোগ্য পদার্থের আয়োজন, মনকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছে। আমাদিগের মন স্বর্গীয় উপাদানে নির্ম্মিত বটে কিন্তু সংসর্গ ও অবস্থা বৈগুণ্যে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সে সংসারের ক্রীড়নক হইয়া সুখের উদ্দেশে ধাবমান হইতেছে কিন্তু কে-

খিতেছে কেবলই মরীচিকা। ফলত সংসারে প্রীতি নাই, প্রীতির যা কিছু আভাস পাওয়া যায়, তাহার মূলে অনিত্যতা। সন্তানকে প্রীতি কর, এক দিন তাহার চিতা-ধূম তোমার শোকাগ্নিকে স্পর্শ করিবে। ভার্য্যাকে প্রীতি কর, এক সময়ে শ্মশানবায়ু তাহার রূক্ষ কেশ-পাশ স্পন্দিত করিয়া তোমার মন উদাস করিবে। বন্ধুকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ কর, এক দিন সে তাহা ছেদন করিয়া যাইবে। নিজের দেহকে প্রীতি কর, এক দিন সে কোথায় না কোথায় শব হইয়া ভূমি-শয্যায় পড়িয়া থাকিবে। সংসার মনুষ্যকে প্রকৃত সুখ শান্তি কখনই দিতে পারে না, অনিত্যতা সাংসারিক প্রত্যেক বিষয়ের মূলে আছে বলিয়া প্রতি পদেই তৃপ্তির অভাব। নিজের ধন সংখ্যা করিয়া কে তৃপ্ত হইতে পারে; যশের সৌরভ দিগন্ত স্পর্শ করিল তাহাতেই বা কে সুখী; ভোগ্য পদার্থ যতই কেন সংগৃহীত হউক না ঘৃত সংযোগে বহ্নির ন্যায় আমাদিগের প্রবৃত্তি ও ইচ্ছাকে আরও প্রবল করিবে। যদি অনন্ত কালের জন্যও এই সংসারের সহিত আমাদের সম্বন্ধ থাকে, তথাচ আমাদিগের তৃপ্তি নাই।

সংসার যন্ত্রণার কারাবাস; তোমাকে কোন না কোন সম্বন্ধে আবদ্ধ রাখিয়া কেবল নিষ্পীড়ন করিতেছে। ঐ যে অনুরাগ দেখিতেছ, উহা তোমাকে কেবল মোহময়ী প্রমোদ-মদিরা পান করাইয়া উন্মত্ত করিতেছে, তুমি মুগ্ধ ও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইতেছ। স্বার্থপরতাই এখানকার নেতা। অন্যে তোমার মান মর্য্যাদায় অলক্ষিত রূপে শর নিক্ষেপ করিবে, জ্ঞান ধর্ম্ম সহিবে না, সুখ ঐশ্বর্য্যের ঈর্ষ্যা করিবে এবং সরলতার উপর নির্যাতনের চেষ্টা পাইবে। তুমি সংসারকে কিছু দেও হয় ত সে তোমাকে কিছুই প্রত্যর্পণ করিবে না। এখানকার এই রূপ উপাদান, এই রূপই নির্ম্মাণ। জীব! প্রণিধান পূর্ব্বক বল, ইহাতে কি রূপে তোমার তৃপ্তি হইবে!

মানব প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত, একটি সাংসারিক, আর একটি পারমার্থিক; যে সমস্ত মনোবৃত্তি দ্বারা আমরা পৃথিবীর জীব বলিয়া পরিচিত হই, সেই গুলি সাংসারিক এবং যাহা দ্বারা আমরা পৃথিবীর ক্ষুদ্র কীট হইয়াও অপার্থিব বস্তু গ্রহণ করিতে পারি, তাহা পারমার্থিক। এই প্রকৃতি জন-সাধারণ, কোথাও ইহার ব্যভিচার নাই। হয় ত পাত্র-বিশেষে ইহার একটি প্রচ্ছন্ন থাকিবে কিন্তু ইহার ঐকান্তিক অভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হইবে না। এই উভয়ের সামঞ্জস্য স্থাপনই মনুষ্যত্ব। যদি আমরা কেবল সাংসারিক হই, অর্থোপার্জন, যশো বিস্তার ও ভোগেচ্ছার তৃপ্তি সাধনেই রত থাকি, তাহা হইলে মনুষ্য জন্মের উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট রহিলাম। আবার যদি সংসারে বীতরাগ হইয়া কেবল পরমার্থ চিন্তায় আসক্ত হই, সাংসারিক বৃত্তি সকল নিরোধ করিয়া একান্ত মনে ধর্ম্মেরই সেবা করি, তাহা হইলেও আমাদিগের প্রত্যবায় ঘটিল। সংসার ও ধর্ম্ম উভয়কে রক্ষা করা আবশ্যক, কিন্তু ইহা যেমন আবশ্যক তেমনি সুকঠিন। আমরা সকল সময়ে প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারি না, নীচ কামনা সকল অসংযত অশ্বের ন্যায় ধাবমান হয় এবং সময়ে সময়ে বল্গার আকর্ষণ ও কষার আঘাত তুচ্ছ করিয়া আমাদিগকে গভীর অন্ধ কূপে ফেলিয়া দেয়; জ্ঞান যায়, ধর্ম্ম যায়, জীবন ও চেতনা যায়। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মহর্ষিরা সংসারী জীবের পক্ষে এই কথা বলিয়াছেন 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত'।

এই উপদেশ যেমন উচ্চ—যেমন গম্ভীর, তেমনি ফলপ্রদ। আমাদিগের প্রকৃতি কিছুই পরিমিত চায় না, যে সুখ পরিমিত তাহাতে তৃপ্ত নয়; সে অনন্ত মহান্ পুরুষের সৃষ্ট

হইয়া এই অসীম বিশ্বরাজ্যে অনন্ত সুখেরই কামনা করে। সে দেখিতেছে আমি কিছু দিন পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে ছিলাম না কিছু দিন পরেও আর থাকিব না, অতি সংক্ষিপ্ত কালের জন্য ইহার সহিত আমার সম্বন্ধ, সুতরাং এই পৃথিবীর যা কিছু প্রিয়, তাহা আমার পক্ষে প্রকৃত প্রিয় নহে। সে নিত্য কালের জন্য সংযোগই চায়, বিয়োগ সহিতে পারে না। সে সংসার চায় কিন্তু ইহার উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়া নিষ্পিষ্ট হইতে ইচ্ছুক নহে। সে দূর হইতে হয় ত ইহার রমনীয়তা দেখে কিন্তু সময়ে সময়ে যে প্রতিকূল বায়ু উঠে, তাহাতেই ভীত হয়। এই নিমিত্তই মহর্ষিরা উপদেশ দিয়াছেন 'আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত'।

যাহার এই সংসারই সর্ব্বস্ব, যে ঈশ্বরকে চাহে না, তাঁহার আদেশ তুচ্ছ করে, যদি তাহার হৃদয় ব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে দেখাইতাম সেই কৃপা পাত্র দীনের কত যন্ত্রণা। সে এই পৃথিবীর প্রলোভনে পড়িয়া সুখের উদ্দেশে নিরবচ্ছিন্ন ধাবমান হইতেছে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। তাহার হৃদয়ে কেবলই বিষাদের ঘোর অন্ধকার। সে একবার মহোল্লাসে স্ফূর্ত্ত হইতেছে, পরক্ষণেই হাহাকার করিতেছে। ঐ তাহার যৌবনের বসন্ত শ্রী তিরোহিত হইল, বার্দ্ধক্যের কুঞ্চিত ও লোল মাংস নৈসর্গিক দৌর্ব্বল্যের চিহ্ন প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন অসহ্য যন্ত্রণা। সে মৃত্যু শয্যায় শয়ান হইল, আত্মীয় স্বজন চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল, তাহার নেত্র স্তম্ভিত, হৃদয় অবসন্ন, মুখে বাক্য নাই, কোথায় ছিল কোথায় যাইবে কেবল এই ভাবনায় নিমগ্ন; যে ধন মান যশ তাহার উপাস্য পুত্তলী ছিল, তাহাদিগকে এক কালে ছাড়িতে হইতেছে, যে সকল ইন্দ্রিয় চির কিঙ্কর হইয়া তাহার পরিচর্য্যা করিয়াছে, তাহাদিগের সহিত আর সম্পর্ক থাকিবে না, যে সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহার চিত্ত নিরন্তর আকর্ষণ করিয়াছে, তাহাদিগকে চির দিনের জন্য বিসর্জন দিতে হইতেছে এবং যে সকল ভোগ তাহার সুখের জন্য রচিত হইত, তাহাদিগকেও বিদায় দিতে হইতেছে। তজ্জন্য তাহার অসহ্য যন্ত্রণা। সেই ঘোর সংসারীর জীবন আদ্যন্ত পাঠ কর, দেখিবে কেবলই অসহ্য যন্ত্রণা। কিন্তু যিনি ঈশ্বরকে প্রিয় জানিয়া তাঁহার সৃষ্ট সংসারকেও প্রীতি করেন, যিনি ঈশ্বরের অলংঘ্য নিয়মে আপনার ইচ্ছাকে সংযত করিয়া স্বয়ং কর্ত্তৃত্ব বুদ্ধি পরিহার করিয়াছেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য তাঁহারই পুত্র কন্যার দুঃখ মোচনের জন্য, যিনি পুষ্পের সৌন্দর্য্যে শিশুর মুখশ্রীতে আদি কবি ঈশ্বরেরই কবিত্ব উপলব্ধি করেন, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় স্বাধীন করিয়া এই সংসার ক্ষেত্রে ঈশ্বরেরই কার্য্য সাধনার্থ নিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার সুখ নিত্য, বিষাদ তাঁহার ত্রিসীমায় আসিতে পারে না। তিনি দেখেন পার্থিব জীবন অনন্ত জীবনের পূর্ব্বাভাস, মৃত্যু সেই অনন্ত জীবনপথ উদ্ঘাটন করিবার কুঞ্চিকা মাত্র। তিনি সাংসারিক সকল ঘটনায় ঈশ্বরেরই হস্ত দেখেন। যদি বিষাদ আইসে, সুখে আলিঙ্গন করেন, যদি সম্পদ আইসে, তাহাতেও উল্লম্ফিত হন না। সেই মহাত্মার পক্ষেই এই সংসার সবিশেষ প্রীতিকর হইয়া থাকে।

প্রকৃতির খেদ।

বালকের রচিত।

বিস্তারিয়া ঊর্ম্মিমালা, সুকুমারী শৈলবালা
অমল সলিলা গঙ্গা অই বহি যায় রে।
প্রদীপ্ত তুষার রাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে গোমুখীর শিখরে॥

ফুটিয়াছে কমলিনী অরুণের কিরণে।
নির্ঝরের এক ধারে, দুলিছে তরঙ্গ-ভরে
ঢ়ুলে ঢ়ুলে পড়ে জলে প্রভাত পবনে॥
হেলিয়া নলিনী-দলে প্রকৃতি কৌতুকে দোলে
গঙ্গার প্রবাহ ধায় ধুইয়া চরণ।
ধীরে ধীরে বায়ু আসি দুলায়ে্য অলকা-রাশি
কবরি কুসুম-গন্ধ করিছে হরণ।
বিজনে খুলিয়া প্রাণ, সপ্তমে চড়ায়ে্য তান,
শোভনা প্রকৃতি-দেবী গা'ন ধীরে ধীরে।
নলিনী-নয়ন-দ্বয়, প্রশান্ত বিষাদ-ময়
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস বহিল গভীরে॥—
'অভাগী ভারত হায় জানিতাম যদি—
বিধবা হইবি শেষে, তা'হ'লে কি এত ক্লেশে
তোর তরে অলঙ্কার করি নিরমাণ।
তা হ'লে কি হিমালয়, গর্ব্বে-ভরা হিমালয়,
দাঁড়াইয়া তোর পাশে, পৃথিবীরে উপহাসে,
তুষার মুকুট শিরে করি পরিধান॥
তা'হ'লে কি শতদলে তোর সরোবর-জলে
হাসিত অমন শোভা করিয়া বিকাশ,
কাননে কুসুম-রাশি, বিকাশি মধুর হাসি,
প্রদান করিতো কিলো অমন সুবাস॥
তা'হ'লে ভারত তোরে, সৃজিতাম মরু করে্য,
তরু-লতা-জন-শূন্য প্রান্তর ভীষণ।
প্রজ্বলন্ত দিবাকর বর্ষিত জ্বলন্ত কর
মরীচিকা পান্থগণে করিত ছলন॥'
থামিল প্রকৃতি করি অশ্রু বরিষণ।
গলিল তুষার মালা, তরুণী সরসী-বালা
ফেলিল নীহার বিন্দু নির্ঝরিণী-জলে।
কাঁপিল পাদপ-দল, উথলে গঙ্গার জল
তরুস্কন্ধ ছাড়ি লতা লুটায় ভূতলে॥
ঈষৎ আঁধার-রাশি, গোমুখী শিখর গ্রাসি,
আটক করিল নব অরুণের কর।
মেঘ-রাশি উপজিয়া, আঁধারে প্রশ্রয় দিয়া,
ঢাকিয়া ফেলিল ক্রমে পর্ব্বত-শিখর॥
আবার গাইল ধীরে প্রকৃতি-সুন্দরী।—
'কাঁদ কাঁদ্ আরো কাঁদ্ অভাগী ভারত।
হায় দুখনিশা তোর, হ'ল না হ'ল না ভোর,
হাসিবার দিন তোর হ'ল না আগত।
লজ্জাহীনা! কেন আর! ফেল্যে দে'না অলঙ্কার
প্রশান্ত গভীর অই সাগরের তলে।
পূতধারা মন্দাকিনী ছাড়িয়া মরত-ভূমি
আবদ্ধ হউক পুন ব্রহ্ম-কমণ্ডলে॥
উচ্চশির হিমালয়, প্রলয়ে পাউক লয়,
চিরকাল দেখেছে যে ভারতের গতি।
কাঁদ্ তুই তার পরে, অসহ্য বিষাদ-ভরে
অতীত কালের চিত্র দেখাউক স্মৃতি।
দ্যাখ্ আর্য্য-সিংহাসনে, স্বাধীন নৃপতিগণে
স্মৃতির আলেখ্য পটে রয়েছে চিত্রিত।
দ্যাখ্ দেখি তপোবনে, ঋষিরা স্বাধীন মনে,
কেমন ঈশ্বর ধ্যানে রয়েছে ব্যাপৃত॥
কেমন স্বাধীন মনে, গাইছে বিহঙ্গগণে,
স্বাধীন শোভায় শোভে কুসুম নিকর।
সূর্য্য উঠি প্রাতঃকালে তাড়ায় আঁধার জালে
কেমন স্বাধীন ভাবে বিস্তারিয়া কর॥
তখন কি মনে পড়ে, ভারতী মানস সরে
কেমন মধুর স্বরে বীণা ঝঙ্কারিত।
শুনিয়া ভারত পাখী, গাইত শাখায় থাকি,
আকাশ পাতাল পৃথ্বী করিয়া মোহিত॥
সে সব স্মরণ করে্য কাঁদ্ লো আবার!
আয়্ রে প্রলয় ঝড়, গিরি শৃঙ্গ চূর্ণ কর্,
ধূর্জটি! সংহার শিঙ্গা বাজাও তোমার॥
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুল্যে দেও বায়ু দল,
ছিন্ন ভিন্ন হয়ে্য যা'ক্ ভারতের বেশ।
ভারত-সাগর রুষি, উগর বালুকা রাশি,
মরুভূমি হয়ে্য থাক্ সমস্ত প্রদেশ॥'
বলিতে নারিল আর প্রকৃতি সুন্দরী,
ধ্বনিয়া আকাশ ভূমি, গরজিল প্রতিধ্বনি,
কাঁপিয়া উঠিল বেগে ক্ষুব্ধ হিমগিরি॥
জাহ্নবী উন্মত্তপারা, নির্ঝর চঞ্চল ধারা,
বহিল প্রচণ্ড বেগে ভেদিয়া প্রস্তর।
প্রবল তরঙ্গ ভরে, পদ্ম কাঁপে থরে থরে,
টলিল প্রকৃতি সতী আসন উপর।

সুচঞ্চল সমীরণে, উড়াইল মেঘ গণে,
সুতীব্র রবির ছটা হ'ল বিকীরিত।
আবার প্রকৃতি সতী আরম্ভিল গীত ॥—
'দেখিয়াছি তোর আমি সেই এক বেশ।
অজ্ঞাত আছিলি যবে মানব নয়নে।
নিবিড় অরণ্য ছিল এবিস্তৃত দেশ।
বিজন ছায়ায় নিদ্রা যে'ত পশু-গণে ॥
কুমারী অবস্থা তোর সে কি পড়ে মনে?
সম্পদ বিপদ সুখ, হরষ বিষাদ দুখ
কিছুই না জানিতিস্ সে কি পড়ে মনে?
সে এক সুখের দিন হয়ে্য গেছে শেষ,—
যখন মানবগণ, করে নাই নিরীক্ষণ,
তোর সেই সুদুর্গম অরণ্য প্রদেশ ॥
না বিতরি গন্ধ হায়, মানবের নাশিকায়
বিজনে অরণ্য-ফুল যাইত শুকায়্যে—
তপন কিরণ-তপ্ত, মধ্যাহ্নের বায়ে।
সে এক সুখের দিন হয়্যে গেছে শেষ ॥
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল।
না দেখি মনুষ্য মুখ, না জানিয়া দুঃখ সুখ,
না করিয়া অনুভব মান অপমান।
অজ্ঞান শিশুর মত, আনন্দে দিবস যে'ত,
সংসারের গোলমালে থাকিয়া অজ্ঞান ॥
তা'হ'লে ত ঘটিত না এসব জঞ্জাল।
সেইরূপ রহিলি না কেন চিরকাল ॥
সৌভাগ্যে হানিয়া বাজ, তা হ'লে ত তোরে আজ
অনাথা ভিখারী বেশে কাঁদিতে হ'ত না।
পদাঘাতে উপহাসে, তা হ'লে ত কারাবাসে
সহিতে হ'ত না শেষে এ ঘোর যাতনা ॥
অরণ্যেতে নিরিবিলি, সে যে তুই ভাল ছিলি,
কি-কুক্ষণে করিলি রে সুখের কামনা।
দেখি মরীচিকা হায় আনন্দে বিহ্বল প্রায়
না জানি নৈরাশ্য শেষে করিবে তাড়না ॥
আর্য্যরা আইল শেষে, তোর এ বিজন দেশে,
নগরেতে পরিণত হ'ল তোর বন।
হরষে প্রফুল্ল মুখে, হাসিলি সরলা সুখে,
আশার দর্পনে মুখ দেখিলি আপন ॥
ঋষিগণ সমস্বরে অই সাম গান করে
চমকি উঠিছে আহা হিমালয় গিরি।
ওদিকে ধনুর ধ্বনি, কাঁপায় অরণ্য ভূমি
নিদ্রাগত মৃগগণে চমকিত করি ॥
সরস্বতী নদী-কূলে, কবিরা হৃদয় খুল্যে
গাইছে হরষে আহা সুমধুর গীত।
বীণাপাণি কুতূহলে, মানসের শতদলে,
গাহেন সরসী বারি করি উথলিত ॥
সেই এক অভিনব, মধুর সৌন্দর্য্য তব,
আজিও অঙ্কিত তাহা রয়েছে মানসে।
আঁধার সাগর তলে একটি রতন জ্বলে
একটি নক্ষত্র শোভে মেঘান্ধ আকাশে।
সুবিস্তৃত অন্ধকূপে, একটি প্রদীপ-রূপে
জ্বলিতিস্ তুই আহা, নাহি পড়ে মনে?
কে নিভা'লে সেই ভাতি ভারতে আঁধার রাতি
হাতড়ি বেড়ায় আজি সেই হিন্দুগণে।
এই অমানিশা তোর, আর কি হবে না ভোর
কাঁদিবি কি চিরকাল ঘোর অন্ধকূপে।
অনন্ত কালের মত, সুখ-সূর্য্য অস্তগত,
ভাগ্য কি অনন্ত কাল র'বে এই রূপে ॥
তোর ভাগ্য চক্র-শেষে, থামিল কি হেতা এস্যে,
বিধাতার নিয়মের করি ব্যভিচার।
আয় রে প্রলয় ঝড়, গিরি শৃঙ্গ চূর্ণ কর,
ধূর্জটি! সংহার-শিঙ্গা বাজাও তোমার ॥
প্রভঞ্জন ভীমবল, খুল্যে দেও বায়ু-দল,
ছিন্ন ভিন্ন কর্য্যে দি'ক্ ভারতের বেশ।
ভারত সাগর রুষি, উগর বালুকা-রাশি
মরুভূমি হয়্যে যাক্ সমস্ত প্রদেশ ॥

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। ঋগ্বেদ সংহিতা। সায়ণাচার্য্য বিরচিত মাধবীয় বেদার্থ প্রকাশ নামক ভাষ্য সহিতা। শার্ম্মণ্য দেশোৎপন্নেন ইংলণ্ডদেশ বাসীনা ভট্ট মোক্ষমূলরেণ সংশোধিতা। শ্রীমৎ ভারতবর্ষ মহারাজ্ঞ্যমাত্যানা মনুমত্যাচ উক্ষতরণাভিধান নগরে বিদ্যামন্দির সংস্থান মুদ্রা যন্ত্রালয়ে মুদ্রিতা। সংবৎ১৯৩১বর্ষে। গত প্রায় পঁচিশ বৎসর ভট্ট মোক্ষমূলর যে বৃহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহা শেষ হওয়াতে আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত অভিনন্দন

করিতেছি। ভারতবর্ষে এক্ষণে বেদের আলোচনার যে দুর্দশা হইয়াছে, তাহাতে ভট্ট মোক্ষমূলর ঋগ্বেদ ছাপাইয়া আমাদিগকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিলেন।

২। শ্রীশুক্ল যজুর্ব্বেদে মাধ্যন্দিনীয়া বাজসনেয় সংহিতা। শ্রীসোমবংশস্তোব পাণ্ডব গিরিপ্রসাদ দেব বর্ম্ম রচিতা। শ্রীবেদার্থ প্রদীপাখ্য গিরিধর ভাষ্য সহিতা। চিরঞ্জীব শ্রী গরুড়ধ্বজ দেব বর্ম্ম লিখিতা। আর্য্যাবর্ত্তান্ত র্গতে ব্রহ্মাবর্ত্তৈক দেশে মথুরা মণ্ডলে ধরণীধর ক্ষেত্রে বিশ্বামিত্রপুরীয় নবীনদুর্গস্থ শ্রীব্যাঘ্রপাদ প্রকাশকাশ্ম যন্ত্রালয়ে শ্রীকণ্ঠকুলোদ্ভব দ্বারকানাথ দেব বর্ম্মণো ধিকারা, মুদ্রিতা। সংবৎসরে বিক্রমার্ক গতে ১৯৩০ শকে শালিবাহনীয়ে ১৭৯৫। আমাদিগের স্বদেশীয় ব্যক্তিরা বেদালোচনায় রত হইয়াছেন,ইহাতে যার পর নাই আনন্দিত হইলাম। ভট্ট মোক্ষমূলরের নিকট হইতে ঋগ্বেদ উপহার পাইয়া যেরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি, তদপেক্ষাও ঠাকুর গিরিপ্রসাদ সিংহের নিকট হইতে শুক্ল যজুর্বেদ সংহিতা উপহার প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। ভরসা করি অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ইতর-আমোদে সময় ক্ষেপন না করিয়া ঠাকুর গিরিপ্রসাদ সিংহের ন্যায় আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকেন।

৩। ব্রাহ্মধর্ম্ম নো কাক বোলে? শ্রীপদ্মহাস গোস্বামী কর্তৃক বিরচিত। নগাঁও, আসাম। ১৮৭০ শাল। এই পুস্তকটী আসামী ভাষায় বিরচিত। আসামি ভাষা ও বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে অতি অল্পেই প্রভেদ আছে। যুবক গোস্বামী মহাশয় অল্পের মধ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে বিশদরূপে বাগ্মিতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবরণ করিয়াছেন।

৪। চিকিৎসাতত্ব, চিকিৎসা বিদ্যা ও তদানুসঙ্গিক বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্র। গুপ্ত প্রেস, কলিকাতা, ১২৮১ শাল। এই সাময়িক পত্রিকায় ডাক্তর, বৈদ্য ও হোমিওপেথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় নানা তত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই খানি উপকারী পত্রিকা। কিন্তু আমাদিগের অনুরোধ যে ইহার লেখকেরা কেবল পুস্তকের অনুবাদ না করিয়া স্বকপোল রচিত প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশ করেন। ইহার ভাষা বড় উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না।

৫। তত্ববোধ। শ্রীনবীনচন্দ্র রায় বিরচিত,কলিকাতা, পুরাণ প্রকাশ যন্ত্র, সম্বৎ ১৯৩২। এই গ্রন্থে নিম্ন লিখিত বিষয় সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (১) ঈশ্বর (২) জীবাত্মা (৩) জীবনের উদ্দেশ্য (৪) সামাজিক উন্নতির উপায় (৫) শিক্ষা প্রণালী (৬) জীবিকা (৭) বিবাহ (৮) পরোপকার (৯) সময়। এই গ্রন্থ খানি হিন্দি ভাষায় লিখিত। ইহাতে নবীন বাবু যে যে বিষয় লিখিয়াছেন সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে বিশুদ্ধ উদার মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের দ্বারা পশ্চিমবাসীদিগের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। নবীন বাবু শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি অনেক স্থলে আপনার মতের শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

৬। সাবিত্রী নাটক। শ্রীহরিনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রণীত। কুমার খালি, মথুরানাথ যন্ত্রে মুদ্রিত, সন ১২৮১ শাল। মহাভারতের অন্তর্গত সাবিত্রী উপাখ্যান সতী ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা উপদেশ গর্ভ। উহা ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ের সহিত জড়িত রহিয়াছে। মহাকবি বেদব্যাস দ্বারা এই উপাখ্যানের রচনাকাল হইতে এপর্য্যন্ত ইহা পাঠ অথবা শ্রবণ করিয়া কত লোকের লোমহর্ষণ ও অশ্রুপাত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এই বিষয়ে অনেকেই কাব্য অথবা নাটক রচনা করিতেছেন। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "সাবিত্রী উপাখ্যান" নামক এক খানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছেন। নাটকের যেরূপ ছড়াছড়ি তাহাতে নাটকের পুস্তক খুলিতেই ঘৃণা করে। আমরা উল্লিখিত ভাবের সহিত হরিনাথ বাবুর প্রণীত নাটিকা থানি খুলিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া বিরক্তির কোন কারণ দেখিলাম না, বরং সন্তোষেরই কারণ দেখিলাম। এই নাটিকা খানিতে হরিনাথ বাবু কোন অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মনের ভাব প্রকাশ সুসঙ্গত হইয়াছে। ভাষাও বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে হরিনাথ বাবু বিশেষ নিপুণতার সহিত সাবিত্রী সত্যবানের আখ্যায়িকার রূপকমূলকত্ব দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন "অশ্বপতি শব্দের অর্থ বিষ্ণু অশ্বপতির স্ত্রী দেবী শব্দের অর্থ স্বরস্বতী, সাবিত্রী শব্দের অর্থ গায়ত্রী, দ্যুমৎসেনের অর্থ অজ্ঞান, তদীয় পুত্র সত্যবান অজ্ঞানের পর জ্ঞানোদয় বুঝায়"।

৭। মেনকা গীতিকাব্য। শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত, সম্বৎ ১৯৩১। আমরা অধর বাবুর বিরচিত ললিতা সুন্দরী কাব্য যখন সমালোচনা করি তখন কোন কোন বিষয়ে বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এ কাব্য পাঠ করিয়া কেবল সন্তোষ ভাবেরই উদয় হইল। কাব্যটী ইংরাজী কবি মুরের প্রণীত "Paradise and the Peri" নামক কাব্যের অনুকরণে লিখিত। ইংরাজীতে ঐ কাব্য যেমন মধুর বাঙ্গালাতে এই কাব্যটী প্রায় তেমনি মধুর হইয়াছে। ইহা অধর বাবুর সম্বন্ধে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে। অধর বাবুর প্রকৃত কবিত্ব শক্তি আছে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই কবিত্ব শক্তির অধিকতর উন্মেষ হইলে তিনি বঙ্গভাষাকে বিশেষরূপে অলঙ্কৃত করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। এই উৎকৃষ্ট কাব্য খানিতে কিন্তু একটী দোষ দৃষ্ট হইল। অনুতাপ ও কবিতা এই দুই পরস্পর অসদৃশ বস্তু এক শ্রেণীতে ফেলা কবির পক্ষে উচিত হয় নাই। এই দুই বস্তুর মধ্যে যখন কিছু মাত্র সাদৃশ্য নাই তখন তুলনাই চলিতে পারে না। অধিকন্তু কবি যে অনুতাপের উপদেশ দিতে চান তাহার গুরুত্বের লাঘব হইয়াছে।

৮। ভারত শ্রমজীবি। সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ১২৮১ শালের বৈশাখ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত। বরাহ নগর। ১২৮১ শাল। এই পত্রিকা খানি শ্রমোপজীবি লোকদিগের জন্য অতি সরল ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। ইহাতে পুরাবৃত্ত, ভূগোল, ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক সম্বাদ থাকে এবং নীতি গর্ভ উপদেশও প্রদত্ত হয়। ইহা শ্রমোপজীবিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইয়াছে। এই পত্রিকার সম্পাদক বরাহ নগর নিবাসী দেশ হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়।

৯। বাঙ্গালী। মাসিক পত্র ও সমালোচন। ময়মনসিংহ হইতে সম্পাদিত, কলিকাতা রামায়ণ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮১। মফস্বলে এই রূপ সাময়িক পত্রিকার অভ্যুদয় আমাদিগের দেশের উন্নতির পক্ষে সুচিহ্ন বলিতে হইবে। এই পত্রিকার অন্তর্গত প্রস্তাব গুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। "প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইউরোপে সভ্যতার ভিন্ন মূর্ত্তি" এই শীর্ষকযুক্ত প্রস্তাবটীতে বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা প্রার্থনা করি এই পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক।

১০। বিচারক। সাপ্তাহিক পত্রিকা, কলিকাতা বিকটোরিয়া যন্ত্র। এই পত্রিকা গত ফাল্গুন মাস হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা ইংরাজী ও বাঙ্গলা এই দুই ভাষায় লিখিত। ইহা এক্ষণে সমাজ দর্পণের সহিত মিলিত হইয়াছে।

১১। Wilson's Sanskrit and English Dictionary Edited by Jagunmohana Tarkalankara and Khettramohana Mookerjea. Published by Gyanendrachandra Rayachoudhuri and Brothers. Kavyaprokasha Press. 1874.

উইলসন সাহেবের সংস্কৃত অভিধান অতি উপকারী গ্রন্থ কিন্তু অতি দুষ্প্রাপ্য। ইহা পুনর্মুদ্রিত হওয়াতে সুখী হইলাম। প্রকাশক ধন্যবাদার্হ।

১২। ভারতবর্ষীয় আর্য্য পত্রিকা। এই পত্রিকা গত বৈশাখ মাস অবধি ভারতবর্ষীয় আর্য্য সভা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রমাণ করা ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদিগের পুরাতন বন্ধু পরলোকগত রাজনারায়ণ মিত্র মহাশয় এই আন্দোলনের উৎপাদয়িতা। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তাহা একেবারে স্থগিত হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে এই পত্রিকার সম্পাদক ও বন্ধুগণের দ্বারা তাহা পুনরুদ্দীপিত হইতেছে।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গীত বিদ্যালয়।

আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের জন্য, উক্ত সমাজ-মন্দিরের দ্বিতীয়তল গৃহে একটী সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অদ্য হইতে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। রবিবার ও বুধবার ব্যতীত প্রত্যহ সায়াহ্ন ৭।০ ঘণ্টা হইতে ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে উচ্চ অঙ্গের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রসিদ্ধ গায়ক ও সঙ্গীত-শাস্ত্রবেত্তা শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ভট্ট অধ্যাপনা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষার্থীগণ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের নিকট আবেদন করিবেন; বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী কোন বাধা দৃষ্ট না হইলে, তাঁহাদিগকে ছাত্র-শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা } শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
২২ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শক। } সম্পাদক।

আগামী ৯ আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭।০ ঘণ্টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ } শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১ আষাঢ় ১৭৯৭ শক } সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

বৈশাখ ১৭৯৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৬ ॥ ১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৬০ ৶১৫
সমষ্টি	৬২০ ৷৶ ১০
ব্যয়	৩০২ ৸৶১৫
স্থিত	৩১৭৸ ১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩৪ ৶০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১২৬ ।৵০
পুস্তকালয়	৪ ॥ ১৫
যন্ত্রালয়	৭৩
গচ্ছিত	২২ ।৶০
সমষ্টি	২৬০ ॥ ১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৮৮ ৸/ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৮৭ ॥৶০
পুস্তকালয়	২০ ।৵১০
যন্ত্রালয়	৪৭ ।০
পরিব্রাজকের ব্যয় ...	৪২ ৵ ৫
গচ্ছিত	১৬ ॥৵১৫
সমষ্টি	৩০২ ৸৶১৫

সাম্বৎসরিক দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু মাধবরাম গুজরাটী ...	২
" রাজনারায়ণ বসু ...	৪
" মথুরামোহন সুর ...	২
" তিনকড়ি বসু ...	১
" ঈশানচন্দ্র বসু ...	॥০

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১৬
" রাজনারায়ণ বসু ...	২
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	২
দানাধারে প্রাপ্ত	৪ ॥৶০
	৩৪ ৶০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩২। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬। ১ আষাঢ় সোমবার

Registered No 52.
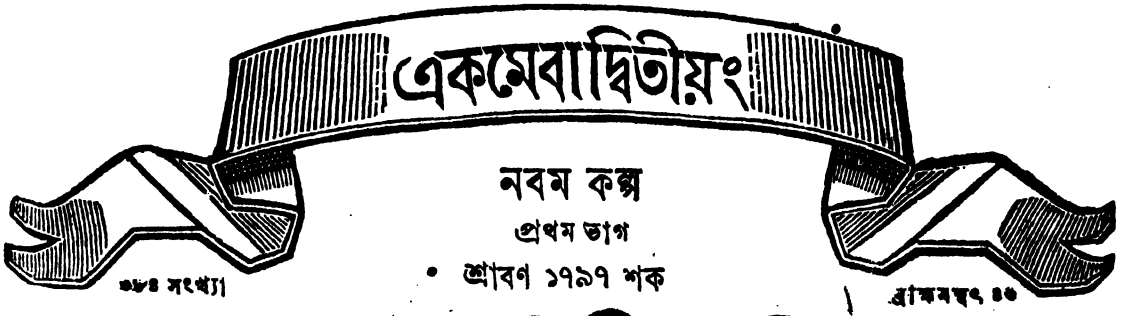
ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনায় পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

আইল উষা কাল, জাগি সবে প্রণাম কর সেই নিরঞ্জনে, পাবে পরম শান্তি হৃদি-মাঝে।

যাঁর এই সংসার, তিনি করুণাধার, নির-মল, মন-অগোচর জগত-জীবন।

পরম পুরুষ, পরমেশ্বর, পরম-জ্যোতি, প্রাণ-পতি, পর-ব্রহ্ম পরমানন্দ, নিখিল-কারণ, তারণ।

ডাকো তাঁরে, কৃপাল তিনি, পাবন, দুঃখ-নাশন অনন্ত, অবিনাশী, অমৃত দীন-শরণ।

রাগিণী দেশ—তাল সুর ফাঁকতাল।

দেখিয়ে হৃদয় মন্দিরে, ভজনা শিব সুন্দরে, কি ভ্রমে ভুলিয়ে তাঁরে কর অযতন, এখন করহ সাধন।

এই সে পতিত-পাবন, এই সে জগত-তারণ, এই সে পরম-কারণ, করহ তাঁর মনন।

হইয়ে বিষয়ে মত্ত, হারালে পরম তত্ত্ব, ভাবিলে না সেই সত্য, নিত্য বিভু নিরঞ্জন।

হৃদয়ের প্রেম-হার, দেওহে তাঁহারে উপহার, পেয়েছ কৃপায় যাঁহার, দেহ হৃদয় জীবন॥

রাগিণী ছায়ানট—তাল ঝাঁপতাল।

বিপদ-ভয় বারণ যে করে, ওরে মন, তাঁরে কেন ডাক না। মিছা ভ্রমে ভুলে সদা রয়েছ ভব ঘোরে মজি, একি বিড়ম্বনা।

এ ধন জন, না রবে হেন, তাঁহে যেন ভুলো না। ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা।

এখন হিত বচন শোন, যতনে করি ধা-রণা। বদন ভরি, নাম হরি, সতত কর ঘোষণা।

যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় কা-মনা। সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন, তাঁর কর সাধনা॥

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

৬ বৈশাখ ১৭৯৭ শক।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ হইতে

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি।

নিমেষে নিমেষে যে সকল ঘটনা ঘটি-তেছে, তাঁহা সমুদয় এই বিদ্যুৎ সমান দীপ্তি-মান্ পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইতেছে।

সনোবন্ধুর্জ্জনিতা সবিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত।

তিনি আমারদের বন্ধু, তিনি আমারদের

পিতা, তিনি আমারদের বিধাতা। তিনি সমুদয় ধাম সমুদয় ভুবন জানিতেছেন, দেবতারা তাঁহাতে অমৃত আস্বাদন করত দিব্য লোকে অবস্থান করিতেছেন।

তদ্বিপ্রাসোবিপন্যবোজাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং।

নিষ্কাম জাগ্রৎ ব্রাহ্মণেরা সেই সর্ব্বব্যাপীর পরম পদের উপাসনা করেন।

"তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা।" সমুদায় ভুবন, সকল লোক, তাঁরি প্রশ্ন করিতেছে। এই সকল ঘটনা কোথা হইতে ঘটিতেছে। কার আদেশে প্রাতঃকালে সূর্য্য উদয় হইতেছে। কার নিয়মে সূর্য্য মধ্যাহ্নকালে প্রতাপান্বিত হইয়া সমুদয় ভুবনে তেজ বিতরণ করিতেছে। কার নিয়মে এই সূর্য্য পুনর্ব্বার অপরাহ্লে অস্ত যাইতেছে। কার নিয়মে আবার সুধাকর চন্দ্র উদয় হইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছে। কার নিয়মে গর্ভ হইতে পিতা মাতার অনুরূপ সুন্দর পুত্রের জন্ম হইতেছে। কার নিয়মে সেই শিশু বাল্যকালের পরে যৌবন-শ্রীতে উৎফুল্ল হইয়া পিতা মাতার মনকে আনন্দিত করিতেছে। কার নিয়মে সেই যুবা বার্দ্ধক্যে ঈশ্বর-প্রেমে উন্নত হইতেছে। কার নিয়মে সেই বৃদ্ধ স্বীয় জীর্ণ শরীরকে ধরাশায়ী করিয়া পরলোকে উত্থিত হইতেছে। কোথা হইতে উৎপত্তি, কোথায় স্থিতি—কার নিয়মে জন্ম, কার নিয়মে মৃত্যু। কার নিয়মে বৃক্ষে পত্র হইল, পরে পুষ্প হইল, পরে ফল হইল—আবার সেই ফলের অমৃত আস্বাদে সকলের তৃপ্তি হইল। প্রথমে গ্রীষ্ম আইল—পরে কার নিয়মে মেঘ বৃদ্ধি দ্বারা বৃষ্টি হইয়া গ্রীষ্ম-তাপের উপশম হইল। কার নিয়মে তুষারের সহিত শীতকাল সমাগত হইল। কার নিয়মে বিপদ্, কার নিয়মে সম্পদ্। কে এই সকল ঘটনা আনয়ন করিতেছেন, কে এই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন—সকলেই এই প্রশ্ন করিতেছে। কাহার শাসনে এই জগতের সুনিয়ম প্রণালী বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এই সকল মঙ্গল কার্য্য কোথা হইতে হইতেছে, যদি এই প্রশ্নের সদুত্তর পাও; তবে এখনি তোমারদের জ্ঞান তৃপ্ত হইবে, হৃদয় পবিত্র হইবে, জীবন মধুময় হইবে, আত্মা উন্নত হইবে। এমন প্রশ্নের অনুরূপ সদুত্তর কোথা হইতে পাইবে? পৃথিবী সৃষ্টি অবধি সমুদয় কাল সূর্য্যকে ঘুরিতেছে, কিন্তু সে পৃথিবী এ বাক্যের উত্তর জানে না। সূর্য্য যে এমন তেজঃপুঞ্জ, সূর্য্যও তাহা জানে না। সূর্য্যের অন্তরে সূর্য্যের অন্তর্যামী রহিয়াছেন, সূর্য্য তাহা জানে না—সূর্য্য চিরকাল স্তব্ধ হইয়াই রহিয়াছে। পর্ব্বত যে সমুদ্রে ভেদ করিয়া মেঘ অতিক্রম পূর্ব্বক গগনস্পর্শ করিয়া আছে, সেও মূক ভাবে রহিয়াছে—এপ্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। সিরাজের গোলাবকে জিজ্ঞাসা কর, মানস সরোবরের হংসকে জিজ্ঞাসা কর, আকাশ-বিহারী হোমাপক্ষীকে জিজ্ঞাসা কর, সকলি মূক সাক্ষী। যদি তোমরা এ প্রশ্নের উত্তর চাও, তবে তপঃপ্রভাবে জ্বলন্ত ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা কর—যে সকল পুরাতন ঋষিরা তপঃ-প্রভাবে প্রতাপান্বিত, দেব-প্রসাদে সৌভাগ্যযুক্ত, শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া জ্ঞান-প্রসাদে ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন; তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা কর, এই প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে। তাঁহারদিগকে জিজ্ঞাসা কর, কে এ ঘটনা সকল নিয়মে রাখিতেছেন। সূর্য্য আর কিঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইলে পৃথিবী দগ্ধ হইয়া যাইত, আর কিছু দূরে থাকিলে তুষারময় হইত; কে সূর্য্যকে এমন উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছেন, যাহাতে তাহার কিরণ পাইয়া জীবেরা সুখেতে প্রাণ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। সৌভাগ্যযুক্ত ঋষিদিগকে জিজ্ঞাসা কর; এ সকল প্রশ্নের উত্তর

পাইবে, জ্ঞান তৃপ্ত হইবে, হৃদয় পবিত্র হইবে, জীবন মধুময় হইবে, আত্মা উন্নত হইবে। ব্যাকুল হৃদয়ে অনুরাগের সহিত শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে ঋষিদিগকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, দেখ তাঁরা কি উত্তর দেন। যাঁহারদের নিকটে এই সকল প্রশ্ন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি" নিমেষে নিমেষে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা সেই বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিমান্ পুরুষ হইতেই হইতেছে। এ সকল ঘটনা অন্ধ শক্তির কার্য্য নহে কিন্তু সেই মহানাত্মা দিব্য অমূর্ত্ত পুরুষ হইতেই হইতেছে। যদি তোমারদের হৃদয় মন মোহ-নীহারে আবৃত হইয়া না থাকে, তবে এখনই তাহা জানিতে পারিবে— সত্য, সত্যের সত্য, তোমারদের নিকট প্রকাশিত হইবে। দেখ, কোন্ কালে কত পূর্ব্বে, যার গণনা হয় না, ঋষিরা যাহা জ্ঞান-প্রভাবে দেব-প্রসাদে বলিয়া গিয়াছেন, শ্রুতি পরম্পরা ক্রমে এখনো পর্য্যন্ত তাহা চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞানগর্ভ-পুস্তক-সকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, অধীনতা শৃঙ্খল ইহাকে আশ পাশ বদ্ধ করিয়াছে, অজ্ঞান অন্ধকারে ভারতের দুর্দ্দশার সীমা নাই; তথাপি দেখ, কত দিনের কথা শ্রুতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়া আমারদের জীবনকে মধুময় করিতেছে। দেখ, সত্য বাক্য কেহই বিনাশ করিতে পারে নাই। ঋষিদিগের রসনা হইতে যে সকল সত্য নির্গত হইয়াছিল, তাহা সরস্বতী নদীর ন্যায় গঙ্গা নদীর ন্যায় হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; ইহার দ্বারা আমারদের যে কিছু আত্ম-প্রত্যয় আছে, তাহা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যুৎ পুরুষ হইতে সকল ঘটনা নিয়মিত হইতেছে—এ বাক্যে সংশয় নাই। যেমন দেখিতেছি, সূর্য্য উদয় হইয়াছে বলিয়া সকল প্রকাশ পাইতেছে; তেমনি জানিতেছি, তিনি থাকাতেই সমুদয় ঘটনা নিয়মিত হইতেছে। তিনি প্রতি নিমেষে আমারদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমরা কি এক বৎসর গণনা করিয়া, না শত বৎসর গণনা করিয়া, না যুগ গণনা করিয়া, ঈশ্বরের করুণা স্থির করিব? আমারদের জীবন তিনি প্রতি নিমেষে প্রেরণ করিতেছেন, পলকের উপর আমরা জীবন ধারণ করিয়া আছি—যে নিমেষে জীবন চলিয়া যাইবে, আর নিমেষ থাকিবে না। তিনি সমুদয় নিমেষের ঘটনা প্রতিক্ষণে নিয়মিত করিতেছেন, তথাপি আমরা তাঁহাকে ভুলিয়াই রহিয়াছি—কিন্তু বিদ্যুৎ পুরুষ আমারদিগকে ভুলিয়া নাই। তিনি আমারদিগকে কেবল দণ্ডে দণ্ডে অবলোকন করিতেছেন না, দিনে দিনে অবলোকন করিতেছেন না, মাসে মাসে অবলোকন করিতেছেন না, বৎসরে বৎসরে অবলোকন করিতেছেন না; কিন্তু নিমেষে নিমেষে অবলোকন করিতেছেন—কারণ "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধি"। নিমেষের নিমেষের সমস্ত ঘটনা বিদ্যুৎ-পুরুষ হইতেই উৎপন্ন হইতেছে। যার চক্ষু আছে, বিদ্যুৎ প্রকাশ হইলে তাহার নিকটে তাহা অপ্রকাশ থাকে না। ঘোর মেঘের অন্ধকারে বিদ্যুৎ যখন চলে, বিদ্যুৎ প্রকাশ হয়ই হয়। আমরা সেই রূপ মোহ-মেঘের মধ্যে থাকিয়াও বিদ্যুতের ন্যায় সেই বিদ্যুৎ পুরুষের আভা কখন কখন দেখিতে পাই। কিন্তু যাঁহারদের আত্মা সংসার-মেঘের আবরণ হইতে মুক্ত হইয়াছে, তাঁহারদের নিকটে তিনি সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বদাই প্রকাশিত থাকেন—সে সূর্য্য আর অস্ত হয় না। হা! এখন আমারদের হৃদয় শীতল হইল, আমরা জানিলাম যে দীপ্তিমান্ বিদ্যুৎ পুরুষ হইতেই নিমেষে নিমেষে সকল ঘটনা উৎপন্ন হইতেছে। ইহা একেবারে সিদ্ধান্ত কথা।

যাঁহা হইতে এই সমুদয় ঘটনা সংঘটিত

হইতেছে,তাঁহার সঙ্গে আমারদের কি সম্বন্ধ? যিনি সমুদয় জগতের অধিরাজ, যাঁর শাসনে সূর্য চন্দ্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যাঁর ইচ্ছা মাত্র সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যায়, তাঁর সঙ্গে আমারদের কি সম্বন্ধ? "সনোবন্ধু-র্জনিতা সবিধাতা" যাঁহা হইতে এই সমুদায় ঘটনা ঘটিতেছে, তাঁর সঙ্গে আমারদের প্রিয় সম্বন্ধ। তিনি আমারদের বন্ধু, তিনি আমারদের পিতা, তিনি আমারদের বিধাতা। যখন মঙ্গলময় পিতার রাজ্যে বাস করিতেছি, তখন ভয় কি? দেখ, পুরাতন ঋষিরা কি মধুর আশ্বাসময় বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন! ইহাতে করিয়া আমারদের ভয় চলিয়া যাইতেছে, আশা-সকল অনন্তের দিকে ধাবমান হইতেছে। সেই অকাল পুরুষ আমারদের প্রতি উদাসীন নন—তিনি এমনি আপনার যে তিনি আমারদের বন্ধু, তিনি আমারদের পিতা, তিনি আমারদের বিধাতা। আমরা সেই অমৃতের পুত্র। যখন আমরা অমৃত পিতাকে পাই, তখন আর রবিজ ভয় থাকে না, তখন কালের আর করাল মূর্ত্তি দেখি না। উদাসীন-ভাবে তাঁহাকে দেখ, তাঁকেও উদাসীন দেখিতে পাইবে। প্রেম দিয়া তাঁকে ডাকিলে তাঁর প্রেম-মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। বালকের ন্যায় তাঁর ক্রোড়ের প্রার্থী হইলে তিনি আত্মাকে ক্রোড়ে স্থান দিবেন। বিশ্বস্ত চিত্তে সরল হৃদয়ে ভক্তি-পুষ্প তাঁকে অর্পণ কর, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন। তাঁকে যদি প্রেম না দিই, ভক্তি না করি, তবে প্রেম ভক্তি কিসে চরিতার্থ হইবে? দেখ, আমরা প্রশ্নের সিদ্ধান্ত পাইলাম। আমাদের আত্মা হইতে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইল। যাঁহা হইতে সমুদায় ঘটনা সংঘটিত হইতেছে; তিনি আমাদের বন্ধু, তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের বিধাতা। "ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা" তিনি বিশ্ব ভুবন জানিতেছেন। আমরা এই পৃথিবী লোকে থাকিয়াও এই পৃথিবী লোকেরও কিছুই জানিতেছি না। আমরা একটি পত্রের বিষয় জানি না; একটি তৃণের বিষয় জানি না। এই অনন্ত আকাশে কত কত সূর্য্য রহিয়াছে; কোনটা পীতবর্ণ, কোনটা নীলবর্ণ, কোনটা লোহিতবর্ণ; কোথাও বা দুই সূর্য্য পরস্পর ঘুরিতেছে—এক সূর্য্য যখন উদয় হইতেছে, অপর সূর্য্য তখন অস্ত যাইতেছে। আমরা কল্পনার মধ্যে এ সকলের কবিত্ব ভাব আয়ত্ত করিতে পারি না। এ রূপ লোক-সকল যত প্রকার রহিয়াছে, তিনি তাহা সমুদয় জানিতেছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, তিনি সামান্য রূপে এবং বিশেষ রূপে সকল জানিতেছেন—যাঁর এই মহিমা ভূলোকে ও দ্যুলোকে। তিনি যদি জ্ঞানেতে এত; তবে প্রেমেতে কত, মঙ্গল ভাবে কত, তাহা কে জানিবে? অন্ত কোথায় তাঁর অন্ত কোথায় তাঁর এই সদা সবে জিজ্ঞাসে। তিনি পিতা হইয়া পুত্রদিগের কামনা পূর্ণ করিতেছেন, তিনি বন্ধু হইয়া সকলকে প্রেম বিতরণ করিতেছেন। "যত্র দেবা অমৃতমানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্তঃ।" দেবতারা তাঁহাতে অমৃত আস্বাদন করত দিব্য ধামে অবস্থান করিতেছেন। দিব্য-ধাম-নিবাসী দেবতারা তাঁতে অমৃত পান করেন, তাঁহাতেই বাস করেন; আমরাও এ ভূলোকে শুদ্ধ-সত্ত্ব হইলে, তাঁর অমৃত পান করিয়া বাস করিতে পারি। যতক্ষণ তাঁর অমৃত পান, ততক্ষণ জীবন; যতক্ষণ বিষয়-মোহে আবৃত, ততক্ষণ মৃত্যু। দেবতাদের ক্ষুধা ঈশ্বরে, দেবতাদের অন্ন ঈশ্বরের অমৃত। বালকের যেমন মাতার দুগ্ধই জীবন, তেমনি দেবতাদের ক্ষুধা ঈশ্বরামৃতে। মাতা যেমন ক্ষুধিত বালককে স্নেহের সহিত দুগ্ধ দেন, ঈশ্বর তেমনি ক্ষুধিত দেবতাদিগকে অমৃত দান করেন। আমরাও এখানে বিচ্ছ্য-

তের ন্যায় কখন কখন তাঁহাকে দেখিতে পাই এবং অমৃত-বিন্দু লাভ করি। দীপ্তিমান্ দিব্য-লোকে যেমন দেবতারা অমৃত পান করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, এই ভূলোকে নিষ্কাম জাগ্রৎ অপ্রমত্ত ব্রাহ্মণেরাও সেই সর্ব্বব্যাপীর পরম পদের উপাসনা করেন। "তদ্বিপ্রাসোবিপন্যবোজাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং।" যাঁহারা নিষ্কাম; যাঁহারা তাঁহাকে জানিবার জন্য জাগিয়া থাকেন; যাঁহারা অপ্রমত্ত হইয়া, জাগ্রৎ হইয়া, নিষ্কাম হইয়া, নিতান্ত তাঁর প্রার্থী হয়েন; তাঁহারা তাঁহাকে উপাসনা করেন। দেবতারা দিব্য-ধামে ঈশ্বরের অমৃত পান করিতেছেন। যদিও আমরা অধম শ্রেণীতে আছি, কিন্তু আমারদের উচ্চ শ্রেণীতে যাইবার আশা হইতেছে। আমরা এখনি বিলীন হইব না, এখানে তাঁর শরণাপন্ন হইলে অমৃত-ভোজী দেবতাদের ন্যায় তাঁর অমৃত পান করিতে পাইব। এমন যে আমারদের পিতা, বিধাতা, বন্ধু; তাঁরি উপাসনার জন্য আমরা এখানে যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছি। দেবতারা যেমন তাঁহার উপাসনা করেন, আমরাও সেই প্রকার বন্ধু-বান্ধবে একত্র হইয়া পরম বন্ধুর উপাসনা করিতে আসিয়াছি। এখানে তিনি এই পবিত্র সমীরণের মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছেন, তিনি এই জ্যোতির অন্তরে জাজ্বল্য রহিয়াছেন, আমারদের প্রত্যেকের অন্তরের মধ্যে আত্মাতে তিনি বিহার করিতেছেন। আমরা অকৃতজ্ঞ পুত্রের ন্যায় তাঁর চরণ থেকে চলিয়া না যাই, আমরা যেন তাঁর চরণ ধরিয়া থাকি, যেন কোন দিকে আমারদিগের মন না যায়। তাঁর সঙ্গে যদি যোগ করিতে পারি, তবে সে যোগের আর অন্ত হইবে না। তিনি আমারদের এখানে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অতএব জাগো অমৃতের অধিকারী। নয়ন খুলিয়ে দেখ করুণা-নিধান পাপ-তাপ-হারী।

সাংখ্য-দর্শন।

তত্ত্ব সঙ্কলন ও জগৎ নির্ম্মাণ।

একদা জৈমিনি ঋষির একজন শিষ্য, আপনার অধ্যাপক ব্যতীত সমস্ত দার্শনিক ঋষি—বিশেষত পুরাণ রচয়িতা ঋষিদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'ইহাঁরা জগৎ গড়া পণ্ডিত'—এই বলিয়া ব্যাজ-সম্বোধন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ঈশ্বর জগৎ নির্ম্মাণ করুন বা না করুন—তাঁহারা করেন। বস্তুতঃ যিনি যখন লেখনী গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই তখন এক এক বার জগৎ গড়িয়াছেন।

জৈমিনি-শিষ্যের মুখ হইতে ঐপ্রকার পরিহাস বাক্য নির্গত হইবার বীজ এই যে তাঁহার গুরু জগতের ঐককালিক উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করেন না। জৈমিনি বলেন "ন কদাচিদনীদৃশম্"—জগৎ এখন যে অবস্থায় যে নিয়মে চলিতেছে—চিরকালই এই রূপ। এতদপেক্ষা কোন নূতনবিধ অবস্থা ও ঘটনা জগতের সম্বন্ধে ঘটিয়াছিল কি না—বা ঘটিবে কি না বলা যায় না। অর্থাৎ এখন যেমন আমরা এক বৃক্ষের অভাব অন্য বৃক্ষের উদ্ভব,—এক জীবের মৃত্যু অপর জীবের জন্ম,—এক পদার্থের ধ্বংস অপর অপদার্থের উৎপত্তি,—এক প্রদেশের বিলয় অপর প্রদেশের উদয় প্রত্যক্ষ করিতেছি; এই রূপ অনাদি অতীত-কালের লোকেরাও করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে অনন্ত কালের লোকেরাও করিবে। সর্ব্বাবধ্বংস রূপ মহাপ্রলয় কস্মিন্ কালে হয় নাই হইবেও না। ঈদৃশ প্রকাণ্ড বিশ্বের এক সময়ে যে নাম গন্ধও ছিল না, পশ্চাৎ উৎপত্তি হইয়াছে, একথা প্রমাণাসহ। সুতরাং মহাপ্রলয় বর্ণন কেবল বাল-বিভ্রমের নিমিত্ত।

"ভবতু"—জৈমিনেয়দিগের মতে জগতের গতি যে রূপ হয় হউক,—পরন্তু আর আর ঋষিদিগের মতে জগতের উৎপত্তি বি-

নাশ বিলক্ষণ রূপে বর্ণিত আছে। আমরা যাঁহার মত প্রকাশ করিতেছি, তাঁহার মতেও আছে। সুতরাং তদীয় মতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, কি প্রকারে কি কৌশলে কাহার শক্তিতে হয় বা হইয়াছে, সে সমস্তই পাঠকগণের গোচর করা আমাদের সম্বন্ধে অত্যুচিত। কিন্তু আমরা যখন কোন তত্ত্বই বিস্তার ক্রমে বলিতেছি না, তখন ইহাও বিস্তার ক্রমে বলিব না। তথাপি এত সংক্ষেপ করিব না, যে সংক্ষেপে উদরের কথা উদরেই থাকে। পরন্তু, কতিসংখ্যক তত্ত্ব দ্বারা (কারণ দ্রব্য দ্বারা) এই প্রকাণ্ড জগৎ জন্ম লাভ করিয়াছে,—কোন্ তত্ত্ব হইতে কোন্ তত্ত্বের জন্ম,—এবং তদুভয়ের বীজ,—এই অংশত্রয়-বতীত নদ, নদী, সাগর, শৈল, লতা, গুল্ম প্রভৃতি কি কৌশলে কি কারণে কাহার শক্তিতে কি প্রকারে উৎপন্ন হয়, কাপিল মতের জগৎ রচনায় এ সমস্ত জানিবার আশা করা যায় না। যে হেতু কপিল তত দূর বলেন নাই।

একথায় মানব-মনে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে যে "বলেন নাই কেন? কপিল কি তত দূর অনুভব করিতে পারেন নাই?"—

এ জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি আমরা করিতে পারি না;—তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন নাই বলিয়া বলেন নাই। আত্মা ও জগৎ এতদুভয়ের যাথার্থ্য অনুভব করান ও বিবেক জ্ঞান জন্মানই কপিলের পুস্তক-প্রচারের প্রয়োজন;—অতএব যাহা তদুভয়ের অনুপযোগী, তাহা তিনি বলিবেন কেন?—কপিল বলেন, কেবল মাত্র গৃহ কার্য্যের উন্নতি সাধক জড়-পদার্থের গুণাগুণ ও স্থিতি প্রকার জানিলে কি হইবে? উহা ত বিবেক জ্ঞানের বাধক ভিন্ন সাধক নহে *,—সুতরাং যাহাদের মধ্যে কুতূহল নিবৃত্তি করাই অভিলষিত, শিল্প সাধনই পুরুষার্থ, তাহারা উহার অনুষ্ঠান করুক—যাহাদের প্রয়োজন জ্ঞানাভ্যাস, তাহারা করিবে না। বিশেষত প্রত্যক্ষের উপর ভাসমান পদার্থের আবার উপদেশ কি? মনুষ্য বুদ্ধি-বলেই তাহার স্বরূপ অনুভব করিতে পারিবে। অতএব, পূর্ব্ব কথিত অংশত্রয়ই উপদেশ্য, সুতরাং তাহাই আমাদের বক্তব্য।

তত্ত্ব এবং তাহার সংখ্যা।

আমরা যাহাকে মৌলিক-পদার্থ † বলি,—বৌদ্ধেরা যাহাকে ধাতু বলে,—সাংখ্যাচার্য্যেরা তাহাকেই তত্ত্ব বলেন। তত্ত্ব শব্দের সাধারণ অর্থ এই যে, যে যাহার সার বা মূল—সে তাহার তত্ত্ব। যথা ঘটের তত্ত্ব মৃত্তিকা, কুণ্ডলের তত্ত্ব সুবর্ণ, ইত্যাদি। অপিচ, যে দ্রব্য চির নিত্য এবং কস্মিন্ কালেও যাহা বিকৃত হয় না, তাদৃশ দ্রব্যও তত্ত্ব-শব্দের বাচ্য। তত্ত্ব শব্দের এই উভয় অর্থ একত্র করিলে,

---

* "যবেহকর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" "ন কর্ম্মণা বৈ বিমোক্ষঃ" "লৌকিকবিজ্ঞানং পুরুষার্থম্" "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তমজ্ঞানকার্য্যম্" "তস্মান্ন তস্মিন্ যততে মুমুক্ষুঃ" ইত্যাদি নানাস্থানগতং বাক্যম্।

† মৌলিক পদার্থ—অর্থাৎ উপাদান দ্রব্য। যে দ্রব্যের পরিণামে কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহাকে উপাদান দ্রব্য বলে। মৃৎপিণ্ডের পরিণামে ঘটরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া ঘটের উপাদান মৃত্তিকা। শাস্ত্রকারেরা বুদ্ধ্যারোহের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত দেখান—দৃষ্টান্ত বাক্যের অর্থ সর্ব্বাংশে সমান হয় না। অতএব ঘটের দৃষ্টান্তে তন্মূলীভূত স্থূল পৃথিবীকে ঘট হইতে তত্ত্বান্তর বিবেচনা করিবেন না। মৃত্তিকা ও ঘট একই তত্ত্ব। তত্ত্ব নির্ণয় প্রাকৃতিক কার্য্য দ্বারাই হয়, জৈবিক কার্য্য দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় না। ঘট, পট, গৃহ, অট্টালিকাদিকে জৈবিক কার্য্য বলা যায়। ফলত, তত্ত্ব গণনার শেষ ভূমি পঞ্চবিধ মহাভূত। ঐ পাঁচ ভূতের ন্যূনাধিক ভাবে সংযোগ বিয়োগ বশতঃ যে সকল দৃশ্য পদার্থ সমুদ্ভূত হয়, তাহার আর তত্ত্ব সংজ্ঞা নাই।

ধাতু—"দধাতি কার্য্যং—রূপান্তরং গত্বা যঃ কার্য্যসংজ্ঞাং প্রাপ্নোতি" যে কারণ-দ্রব্য রূপান্তর হইয়া কার্য্য নাম প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই ধাতু বলা যায়। এতাবতা জল্প

দ্বিবিধ নিত্য পদার্থের সঙ্কলন করা হয় ‡। এবংপ্রকারে সঙ্কলিত তত্ত্ব সমুদায়, প্রথমত চারি প্রকার লক্ষণে লক্ষিত হয়। যথা,— প্রকৃতি ১, প্রকৃতি-বিকৃতি ২, নিরবচ্ছিন্ন বিকৃতি ৩, আর অনুনয় রূপ, অর্থাৎ প্রকৃতি, বিকৃতি, বা প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব শূন্য ৪। উক্ত চতুর্বিধ তত্ত্বের প্রত্যেক-নিষ্ঠ সংখ্যা। প্রকৃতি এক, (ইহাকে মূল প্রকৃতি বলে)। প্রকৃতি-বিকৃতি সাত্, (মহৎ, অহঙ্কার, আর তন্মাত্র পাঁচ্। নিরবচ্ছিন্ন বিকৃতি ষোড়শ, (একাদশ ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূত পাঁচ্)। অনুভয় রূপ এক, (ইহা আত্মা শব্দের বাচ্য) সমুদায়ে পঞ্চবিংশতিটি তত্ত্ব জগতে বিদ্যমান আছে, ইহার ন্যূন নাই, অধিকও নাই।

শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ।

আমাদিগের মনের সহিত শরীরের এরূপ নিগূঢ় ও নিকট সম্বন্ধ যে শরীর যখন অসুস্থ হয়, তখন মনও উৎসাহ-বিহীন, উদ্বেগ-পূর্ণ এবং অশান্তির আধার হয় এবং মন ভয় কিম্বা শোক দ্বারা আক্রান্ত অথবা কাম ক্রোধাদি রিপু দ্বারা উত্তেজিত হইলে শরীরও অসুস্থ হয়। অনেকেই অবশ্য প্রতীতি করিয়াছেন যে রাত্রিতে আমরা যাহা আহার করি, তাহা সুজীর্ণ না হইলে প্রাতঃকালে আমাদিগের স্বভাবেরও ব্যতিক্রম ঘটে, আমরা অকারণ লোকের উপর ক্রুদ্ধ হই। অপর পক্ষেও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। আমাদিগের মন যদি হঠাৎ ভয়ে অভিভূত হয়, তাহা হইলে আমাদিগের শরীর ভয়-সূচক চিহ্ণ স্বরূপ বিকৃতি প্রদর্শন করে। শরীরের এরূপ বিপর্য্যয় যে রোগ উপস্থিত করিবে ইহার আশ্চর্য্য কি? শিশুগণের অনেক পীড়ার কারণ ভয়। আমাদিগের মন যখন কোন প্রিয় ব্যক্তির বা বস্তুর বিয়োগ জন্য শোকে কাতর হয়, তখন আমাদিগের শরীর রূপ যন্ত্রেরও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সঞ্চলনশীল রক্তের উপযুক্ত গতির ব্যতিক্রম ঘটে এবং তাহার পরিমাণেরও হ্রাস হয়, নাড়ী ক্ষীণ হয় ও মধ্যে মধ্যে সবেগ হয়। গাত্রের স্বাভাবিক উষ্ণতা তিরোহিত হইয়া তাহা শীতল হয়, মুখশ্রীর স্বাস্থ্য ব্যঞ্জক-বর্ণ লোপ পায় এবং পাকস্থলীর স্বাভাবিক শক্তি হ্রাস হইয়া উদরের পীড়া জন্মে ও ক্ষুধা শক্তি নির্ব্বাণ পায়। এমন কি, কোন কোন ব্যক্তি বহু দিন পর্য্যন্ত শোকাকুল থাকিয়া পরিশেষে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে। রোমের পোপ চতুর্থ ইনোসেণ্ট কোন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এ প্রকার শোকাভিভূত হইয়াছিলেন যে কিছুকাল পরে মৃত্যুই তাঁহার শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করিল। নিরাশ ভাব যখন আমাদিগের মনকে অধিকার করিয়া নিস্তেজ ও মৃতপ্রায় করে, তখন আমাদিগের শরীরও অনেক রোগের অধীন হয়। আমাদিগের মন যখন কোন অযশস্কর অথবা পাপ কার্য্য জন্য লজ্জায় অভিভূত হয়, তখন তদ্ভাব

বস্তুর মূল দ্রব্য মাত্রেই ধাতু। বৌদ্ধেরা এবংবিধ অর্থ লক্ষ্য করিয়া চতুর্ব্বিধ পরমাণুকে এবং বিজ্ঞানকে ধাতু বলে। বৈদ্যেরা রোগ-রূপ কার্য্যের মূলভাব লক্ষ্য করিয়া বায়ু-পিত্ত-শ্লেষ্মাদিকে ধাতু বলে। ব্যাকরণ রচয়িতারাও শব্দের মূলভাব লক্ষ্য করিয়া 'কৃ' 'ভূ'— প্রভৃতি-শব্দ রাশিকে ধাতু বলেন।

‡ সাংখ্য মতে নিত্য পদার্থ দ্বিবিধ; এক পরিণামী নিত্য, অপর অপরিণামী নিত্য। যে পদার্থ অনাদি ও অনন্ত কাল ব্যাপিয়া থাকে কিন্তু স্বরূপে থাকে না— নিরন্তরই রূপের পরিবর্ত্ত হয়—এতাদৃশ পদার্থকে পরিণামী নিত্য বলা যায়। যথা প্রকৃতি। সাংখ্য মতে প্রকৃতির উৎপত্তি বিনাশ নাই—এবং নিরন্তর উহা পরিবর্ত্তনশীলা। যাহার পরিণাম নাই, উৎপত্তি বিনাশও নাই, তাদৃশ পদার্থ অপরিণামী নিত্য শব্দের বাচ্য। এক মাত্র আত্মাই অপরিণামী নিত্য। (আত্মা নানা হইলেও সকল আত্মাই তুল্য লক্ষণাক্রান্ত, এবিষয়ে আত্মার একত্ব বলা হইল) এ সকল ক্রমশঃ স্পষ্ট হইবে।

প্রকাশ সূচক আমাদিগের বিলক্ষণ বাহ্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। রোমীয় প্রাকৃতিক ইতিহাসবেত্তা প্লিনি বলেন যে ডায়ডোরস নামক এক জন নৈয়ায়িক একটি বৃহৎ সভায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর কোন প্রশ্নের উত্তর করিতে না পারিয়া এত দূর পর্য্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন যে তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া যমসদনে নীত হইয়াছিলেন (১)। আমাদিগের মন যখন দ্বেষ, হিংসা, অর্থ অথবা পদলোভ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত ও কলুষিত হয়, তখন আমাদিগের শরীরও উৎকট এবং দুরপনেয় রোগের আগার স্বরূপ হইয়া অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়।

যে ব্যক্তি নীচ প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া মনকে কলঙ্কিত না করেন, অথবা মিথ্যা, ভয় ও শোকে তাহাকে আকুল হইতে দেন না এবং যিনি স্বাস্থ্যের সমুদায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করিয়া শরীরকে নিয়মে রাখিতে পারেন, তিনিই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া এই পৃথিবীর বিশাল কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়েন। অনুসন্ধিৎসু ইউরোপীয় ভেষজগণ বহু পরিশ্রম, চেষ্টা এবং গভীর আলোচনার পর উল্লিখিত সত্য নির্ধারণ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-প্রণেতা ভারতবর্ষীয় পুরাকালীন ঋষিগণও এই সত্য সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদে কেবল শরীর রক্ষা জন্য নিয়মের বিধান করা হইয়াছে এমত নহে, কিসে মনের প্রশান্ততা রক্ষা করা যায়, তাহার উপায়ও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই প্রমাণিত হইতেছে যে মনের স্থিরতা ও শান্তির সহিত শরীরের স্বাস্থ্যের যে নিকট সম্বন্ধ তাহা উক্ত শাস্ত্র প্রণেতৃগণ সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ প্রণেতৃগণ ব্যতীত অন্যান্য ঋষিগণ মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ বিশেষ রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

কৃতবিদ্য ভেষজগণের অনুসন্ধান ও ভূয়োদর্শন দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত হইয়াছে যে শরীরের অসুস্থতায় মন যতদূর পর্য্যন্ত না অসুস্থ হয়, মনের অসুস্থতায় শরীর তদপেক্ষা বহুল পরিমাণে অসুস্থ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে শরীরের উপর মনের আধিপত্য অতিশয় প্রবল। শার্ম্মণ্য দেশের(২) অদ্বিতীয় দার্শনিক কাণ্ট শরীরের উপর মনের বল নিজ জীবনেই উপলব্ধি করিয়া উহা একটি অকাট্য সত্য রূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন বাতরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতেন, তখন রোগের কষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া অন্য বিষয়ের প্রতি মন একাগ্র রাখিয়া ঐ কষ্ট এককালে বিস্মৃত হইতেন। বর্ত্তমান ইউরোপীয় অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন যে শরীরের উপর মনের আধিপত্য এতদূর যে যে বস্তু শরীরের পক্ষে যথার্থ উপকারী, তাহা যদ্যপি মনে করা যায় যে অপকারী হইবে, তাহা হইলে বস্তুতঃ অপকারই ঘটে। উন্নত-বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রাচীন ঋষিগণ যে ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাহা মনু প্রণীত ব্যবস্থা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত নিম্ন লিখিত শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। "ন ভিন্নভাণ্ডে ভুঞ্জীত, ন ভাবপ্রতিদূষিতে"। "যে পাত্রে আহার করিতে হইলে মন কুণ্ঠিত হয়, তাহাতে ভোজন করিবে না" (৩)।

(১) আমাদিগের পাঠক বর্গের মধ্যে অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে যে বিখ্যাত বাদ্যকর গোলাম আব্বস বাজনায় অতি সামান্য ভুল জন্য কোন নামলব্ধা গায়কী দ্বারা ঈষৎ ভৎর্সিত হওয়াতে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

(২) জার্ম্মেন।

(৩) আর্য্য ঋষিগণ অন্যায় ও অমঙ্গল জনক কার্য্য করিতে নিষেধ করিতেন কিন্তু ঐ নিষেধের হেতু বিশেষ

যখন আমাদিগের মনের সহিত শরীরের এবং শরীরের সহিত মনের এরূপ বিশেষ সম্বন্ধ, তখন একের স্বাস্থ্য অপরের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করিবে, ইহার আশ্চর্য্য কি? মনোবৃত্তির পরিমিত পরিচালনা শরীরের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে এবং শরীরের পরিমিত পরিচালনা মনের উন্নতি সাধনের প্রতি সহকারিতা করে। আমাদিগের মনের পরিচালনা কি রূপে শরীরের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে এবং শরীরের পরিমিত পরিচালনা মনের উন্নতি সাধনে কি রূপ সাহায্য করে, ইহা প্রদর্শন করিতে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মনের অপরিমিত পরিচালনাতে শরীর অসুস্থ হয় ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ বঙ্গদেশীয় বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর ফল। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে রূপ শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত, তাহাতে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পন্ন না হইয়া বরং বিপরীত ফল ফলিতেছে। এক্ষণে বঙ্গবাসীগণ নিজ নিজ পুত্রগণকে শৈশবকাল হইতেই কেবল মাত্র বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার প্রকৃত পথ খুলিয়া দিলেন, এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁহারা তাহাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনার প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন করেন বটে কিন্তু তদুন্নতির একটি প্রধান উপায় যে শরীরের স্বাস্থ্যরক্ষা, তাহার প্রতি কিছু মাত্র মনোযোগ প্রদান করেন না। বুদ্ধি বৃত্তি নিচয়ের সহিত শরীরের প্রকৃতিগত দুর্ভেদ্য সম্বন্ধ জ্ঞানের অভাবই ইহার কারণ। অধুনা বঙ্গদেশে চারি কিম্বা পাঁচ বৎসরের সময় বালকগণকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু ইহা যে স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য, তাহা কেহই বিবেচনা করেন না। ইউরোপীয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ স্থির করিয়াছেন যে অন্ততঃ সাত বৎসরের অগ্রে আমাদিগের মস্তিষ্ক যে রূপ অপরিণত অবস্থায় থাকে, তাহাতে উহার পরিচালনা অনেক উৎকট পীড়া উৎপন্ন করে এবং অনেকে বাল্যকালে ঐ সকল পীড়া বশতঃ অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। পুরাকালে গ্রীস রাজ্যান্তর্গত স্পার্টা নগরে লাইকর্গস নামক সুবিখ্যাত রাজনিয়মব্যবস্থাপক এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন যে কোন ব্যক্তি আপনার পুত্রকে সাতবৎসর বয়স্ক না হইলে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারিবে না। এই নিমিত্তই যে স্পার্টাবাসীগণ সুদৃঢ়, বলিষ্ঠ, রণদক্ষ, জ্ঞানী ও দীর্ঘজীবী হইতেন এবং প্রাচীন ইতিহাসে কীর্ত্তিযুক্ত নাম রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। হুফলেণ্ড (Hufeland) নামক জার্ম্মণ্য দেশীয় একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক বলিয়াছেন যে সাত বৎসরের অগ্রে মানসিক পরিশ্রম করা প্রকৃতির নিয়মের বহির্ভূত কার্য্য, ইহা শরীরকে রোগাক্রান্ত করে এবং মস্তিষ্ককে প্রকৃষ্ট রূপে বর্দ্ধিত হইতে দেয় না। শরীর মস্তিষ্ক পরিচালনা করিবার উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে যে সকল বালক প্রখর ও আশ্চর্য্য মানসিক শক্তির পরিচয় প্রদান করে, তাহারা প্রায় অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয় অথবা বয়স্কাবস্থায় নানা রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিলক্ষণ কষ্ট পায়। বাল্যকালে প্রখর বুদ্ধিশক্তি বিশিষ্ট হওয়াকে কোন কোন চিকিৎসক মস্তিষ্কের বিকৃতাবস্থা

রূপে জানিয়াও তাহা উল্লেখ করিতেন না। মনু এক স্থানে রাত্রি কালে বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু তাহার কোন কারণ দেখান নাই। আমরা এক্ষণে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে জানিতে পারিতেছি যে রাত্রিকালে বৃক্ষ হইতে কারবনিক এসিড গ্যাস নামক শরীরের পক্ষে অপকারী এক প্রকার বিষাক্ত বাষ্প নিঃসৃত হয়। সেই রূপ যে পাত্রে আহার করিলে মন কুণ্ঠিত হয়, তাহাতে ভোজন করিতে নিবারণ করিবার কারণ আমরা এক্ষণে উন্নত জ্ঞান সহকারে ইহা বুঝিতেছি যে শরীরের উপর মনের আধিপত্য প্রবল, অতএব মন যদি কুণ্ঠিত ও সন্দিগ্ধ হয়, তাহা হইলে শরীরেরও অপকার হইবার সম্ভাবনা।

বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মনুষ্য-শরীরের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বাল্যকালই শরীর পরিচালনা দ্বারা তাহাকে প্রকৃষ্ট রূপে বলিষ্ঠ করিবার প্রকৃত সময়। বাল্যকালে প্রকৃতির নিয়ম শরীর পরিচালনার প্রতি এত দূর অনুকূল যে অতিশয় আঘাত লাগিলেও তৎকালে শরীরের বিশেষ হানি হয় না এবং তাহা শীঘ্র সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয়। বাল্যকালে শরীর পরিচালনা করা একটি প্রকৃতি সিদ্ধ নিয়ম। জীবনের অন্যান্য কালে অর্থাৎ কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়াবস্থা, ও বৃদ্ধাবস্থায় শরীর, বুদ্ধি বৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি এই তিনের পরিচালনা দ্বারা নীরোগ ও সুখী হওয়া যেমন প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী, সেই রূপ বাল্যকালে কেবল শরীর পরিচালনা দ্বারা নীরোগ ও সুখী হওয়া প্রকৃতির নিয়ম সিদ্ধ। ইহা দ্বারা অখণ্ড্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে বালকগণকে চারি কিম্বা পাঁচ বৎসর বয়ক্রম হইতে কঠিন শিক্ষা প্রণালীর শাসনাধীন করিয়া প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য করা কখনই মঙ্গলকর নহে। অদ্যাবধি মনুষ্য সমাজের যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, সে সমস্ত প্রকৃতির নিয়ম পালন দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। প্রকৃতির নিয়মের বিপক্ষে গমন করিতে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই নানা অমঙ্গল ও বিপদ উপস্থিত হইয়া মনুষ্য জীবনকে দুঃখ শোকের আগার স্বরূপ করে এবং অবনতির স্রোত প্রবল হইয়া মনুষ্য জাতিকে অধর্ম্ম ও অজ্ঞান সাগরে নিক্ষেপ করে।

পৃথিবীতে কার্য্যক্ষম, দীর্ঘায়ু ও সুখী হইবার জন্য বাল্যকালে শরীরকে দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করা যেরূপ শ্রেয়ঃ, বয়স্ক হইলে বুদ্ধি বৃত্তি সকলকে সুমার্জ্জিত করা সেইরূপ আবশ্যক। শরীর রক্ষার্থ সমুদায় নিয়ম পালন যেমন মনকে নূতন বল ও উৎসাহ প্রদান করে, সেইরূপ মনের পরিমিত পরিচালনা শরীরকে নূতন জীবন প্রদান করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে সমর্থ করে। ইহার সুদৃঢ় প্রমাণ এই যে যে সকল উন্নত জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি শরীর রক্ষার্থ নিয়ম পালনের প্রতি অমনোযোগী না হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে সুমার্জ্জিত ও উন্নত করিতে সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই অল্প বয়সে জীবন পরিত্যাগ করেন নাই। গ্রীস দেশীয় হিপোক্রেটিস ১০৯ বৎসর, আইসোক্রেটিস, সাইমনিডিস ও জিনো ৯৮ বৎসর, সফোক্লিস ৯০ বৎসর, জেনোক্রেটিস ৮২ বৎসর, ইউরিপাইডিস্ ৭৯ বৎসর, এবং আরিস্টোটেল ৬৫ বৎসর; ইতালী দেশীয় জুবিনেল ৮০ বৎসর, কেসিনি ৮৭ বৎসর, গেলিলিও ৭৮ বৎসর, পিট্রার্ক ৭০ বৎসর, বোকাসিও ৬১ বৎসর, এবং এরিওষ্টো ৫৯ বৎসর; ইংলণ্ড দেশীয় টমাস উইলসন ৯৩ বৎসর, সার চার্লস বেন ৯১ বৎসর, হব্‌স ৯১ বৎসর, নিউটন ৮৫ বৎসর, বেন্থাম ৮৪ বৎসর, বটলর ৮৫ বৎসর, সুকবি ইয়ঙ ৮০ বৎসর, উইলিয়ম রস্কো ৮০ বৎসর, জনসন ৭৪ বৎসর, চসর্ ৭২ বৎসর, মিলটন ৬৬ বৎসর এবং বেকন ৬৫ বৎসর; ফ্রান্স দেশীয় লাগ্রেঞ্জ ৬১ বৎসর, এবং ফণ্টিনেল ১০০ শত বৎসর; পারস্য দেশীয় কবি সাদি ৯৯ বৎসর এবং চীন দেশীয় ধর্ম্ম সংস্কারক কংফুচে ৭৩ বৎসর, জীবিত থাকিয়া ভূমণ্ডলের অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন (৪)।

কিন্তু সকল বিষয়ে পরিমিতাচারী হওয়া সাতিশয় আবশ্যক। আমাদিগের পক্ষে পরিমিত রূপে শরীর পরিচালনা করা যেমন উপকারী ও স্বাস্থ্যপ্রদ, অপরিমিত রূপে শরীর

(৪) এতদ্ব্যতীত আরও অনেক দীর্ঘ জীবী জ্ঞানী ব্যক্তি হইয়া গিয়াছেন, প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এখানে তাঁহাদের নাম করা গেল না।

পরিচালনা করা সেই রূপ অপকারী ও অস্বাস্থ্যকর। অপর পক্ষে পরিমিত রূপে মস্তিষ্ক চালনা করিলে যেমন আমরা সুস্থ, সুখী ও দীর্ঘায়ু হই, তেমনি উহা অপরিমিত রূপে চালনা করিলে বিপরীত ফল প্রাপ্ত হই। অনেক সুবিখ্যাত ও সুযোগ্য ইউরোপীয় চিকিৎসক প্রমাণ করিয়াছেন যে অপরিমিত রূপে বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালনা করিলে নানা রোগ উৎপন্ন হইয়া আয়ুর হ্রাস হয়। যাঁহারা শরীর রক্ষার্থ নিয়মাবলি কিছু মাত্র পালন না করিয়া অপরিমিত মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই, তদ্ব্যতীত যাঁহারা শরীর রক্ষার্থ নিয়ম সকল পালন করিয়াও অপরিমিত মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহারা শিরঃ পীড়া ও মস্তিষ্ক ঘটিত নানা প্রকার কষ্ট দায়ক ব্যাধি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েন এবং বৃদ্ধ কাল নিকটবর্ত্তী হইলে তন্মধ্যে কেহ কেহ বুদ্ধি, স্মৃতি ও জ্ঞান শূন্য হয়েন। অধিক মানসিক পরিশ্রম হেতু অনেকে অপস্মার, পক্ষাঘাত এবং উন্মাদ প্রভৃতি রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েন। জুলিয়স সিজার, মহম্মদ, ও নেপোলিয়ন মানসিক পরিশ্রম ও চিন্তায় অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থাকায় অপস্মার রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইটালী দেশীয় কবি পেট্রার্ক ও ফ্রান্স দেশীয় সুবিখ্যাত লেখক রুসো ঐ কারণে জীবনের শেষ দশায় ঐ রোগাক্রান্ত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় কতকগুলি সুবিজ্ঞ চিকিৎসক এক বাক্য হইয়া বলিয়াছেন যে পাকস্থলীর সহিত মস্তিষ্কের এরূপ সম্বন্ধ আছে যে মানসিক পরিশ্রমের কিছু মাত্র আধিক্য হইলেই পাকস্থলী নিজ কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে; তন্নিমিত্ত অনেক অপরিমিত মানসিক পরিশ্রমকারী ব্যক্তি অজীর্ণ দোষ বশতঃ উদরের নানা প্রকার পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকেন। রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠ, অথবা কোন কঠিন বিষয়ে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া গাঢ় চিন্তা করিলে অজীর্ণ দোষ ঘটিত রোগ সমূহ উপস্থিত হয়। নিকলস নামক ইংলণ্ডীয় এক জন সুবিখ্যাত চিকিৎসক ও সুবিজ্ঞ শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন যে খাদ্য জীর্ণ করিবার জন্য আহারের পর মনকে ও শরীরকে কিছু কালের জন্য অব্যাপৃত রাখা কর্ত্তব্য। যদি আহারের পর শরীরের কিম্বা মস্তিষ্কের কিছু মাত্র চালনা করা যায়; তাহা হইলে খাদ্য উত্তম রূপে জীর্ণ হয় না (৫)। তিনি আরও বলেন যে যদি আমাদিগের পাকস্থলী কোন ব্যাঘাত না পাইয়া তাহার কার্য্য সম্পন্ন করিতে পায়, তাহা হইলে অনেক রোগ আমাদিগের শরীরকে আশ্রয় করিতে পারে না। পাকস্থলীর বিশৃঙ্খল অবস্থা আমাদিগের অনেক রোগের নিদান।

বুদ্ধি বৃত্তির সহিত আমাদিগের শরীরের যেরূপ সম্বন্ধ উপরে প্রদর্শিত হইল, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিচয়েরও সহিত তাহার তদনুরূপ সম্বন্ধ আছে। ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল নিয়মিত রূপে পরিচালনা করিলে আমরা অনেক রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারি এবং জঘন্য অধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল দ্বারা পরিচালিত হইলে আমাদিগের শরীর রোগে শোকে জর্জ্জরিত হইয়া জীবনকে বিষময় করিয়া তুলে।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র পরস্পরকে করুণাময় ঈশ্বর যে পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভক্তি, স্নেহ ও প্রেম-দ্বারা সুদৃঢ় করিবার প্রধান ও উৎকৃষ্ট উপায় ধর্ম্ম। আমরা প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি যে ধর্ম্ম পালন করিলে আমাদিগের মন অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দ উপভোগ

(৫) এই জন্য আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে "ভুক্ত্বা রাজবদাচরেৎ"।

করে। পিতা মাতার প্রতি সমুচিত রূপে ভক্তি করিয়া ও তাঁহাদিগের পবিত্র স্নেহ সেবন দ্বারা আমাদিগের অন্তঃকরণকে শীতল করিয়া, ভ্রাতা ও ভগিনীগণের প্রতি অকৃত্রিম প্রণয় প্রদর্শন করিয়া ও তাহাদিগের নিকট হইতে তাহার বিনিময়ে স্নেহ উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া আমরা কেমন বিমল আনন্দ উপভোগ করি। কোন পবিত্র চরিত্র সদ্বিদ্বান হৃদয় বন্ধুর সহিত প্রীতি পূর্ণ মধুর আলাপ করিয়া আমরা কত দুঃখ, শোক বিস্মৃত হই। এই সমুদায় ঈশ্বর-দত্ত স্বর্গীয় উপায় দ্বারা আমরা যে পরিমাণে মনের শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হই, শরীরও সেই পরিমাণে সুস্থ হয়।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস আমাদিগের মানসিক শান্তির একটি প্রধান প্রবর্ত্তক। ঈশ্বর আছেন, সমুদায় বিশ্ব তাঁহারই কীর্ত্তি, কীটানু হইতে অনন্ত নভোমণ্ডলে নিরন্তর ভ্রাম্যমাণ অতি প্রচণ্ড তেজোময় অসংখ্য সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা তাঁহারই অস্তিত্ব ও মহিমা জাজ্বল্য রূপে প্রমাণ করিতেছে, আমরা সর্ব্ব সময়ে তাঁহার প্রতি নির্ভর করিয়া জীবিত রহিয়াছি, তিনি আমাদিগের পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের দণ্ড বিধাতা এবং তিনি পরিশেষে সকলেরই মঙ্গল করিবেন, এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস আমাদিগকে নানা মানসিক কষ্ট হইতে পরিত্রাণ করিয়া শরীরকে সুস্থতা ও বীর্য্য প্রদান করে। যাহার এই সকল বিশ্বাস নাই, তাহার নিকট এই পৃথিবী কষ্টের আগার ও জীবন আশা-শূন্য ও বিষময় হয়। তাহার নিকট সকলই অর্থ শূন্য। কেন এই পৃথিবীতে আইলাম, কে আনিল, কোথায় যাইব এই ভাবিয়া তাহার মন সর্ব্বদা সন্দেহের নিরানন্দ কূপে নিমগ্ন থাকে। সে কিছুই ভাবিয়া নিশ্চয় করিতে পারে না। অবশেষে নিরাশ আসিয়া তাহার বিশ্বাস শূন্য দুর্ব্বল মনকে অধিকার করে ও শরীরকে নানা পীড়ার আকর স্বরূপ করিয়া অকালে মৃত্যু মুখে পাতিত করে। হায়! অবিশ্বাসীর দশা কি শোচনীয়!

আমরা পরোপকার প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কার্য্য সম্পাদন করিয়া যে অপরিসীম বিমল আনন্দ উপভোগ করি, তাহাতে আমাদিগের শরীরের প্রভূত উপকার সাধন হয় ও অনেক রোগ দূরীভূত হয়। ক্রিমিয়া সংগ্রাম ক্ষেত্রে দয়ার্দ্র-হৃদয় ও পরোপকারী ফ্লরেন্স নাইটিংগেল যখন আহত ও রোগে প্রপীড়িত সৈনিক পুরুষগণের স্বহস্তে শুশ্রূষা করিতেন, তখন রাত্রি দিন পূতিগন্ধ ও রোগীর শ্বাস প্রণালী নিঃসৃত বিষময় বায়ুর মধ্যে থাকিয়াও কেবল কর্ত্তব্য পালন নিমিত্ত মনের শান্তি ও অপার আনন্দ উপভোগ দ্বারা শারীরিক রোগ সকল হইতে দূরে থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ যদি আমরা ধর্ম্ম কার্য্য সকল নিয়মিত রূপে সম্পাদন করিয়া অথচ শারীরিক নিয়মের কোন লঙ্ঘন না করিয়া জীবন অতিবাহিত করি, তাহা হইলে আমরা ইহকালে দীর্ঘ-জীবী ও পরম সুখী এবং পরকালে অব্যক্ত স্বর্গীয় সুখের অধিকারী হইতে পারি, তাহার আর সন্দেহ নাই।

সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরের উপাসনা ও ধ্যানে প্রত্যহ কিয়ৎকাল ক্ষেপণ করিলে আমাদিগের মন আশ্চর্য্য রূপে শান্তিময় ও আনন্দ পূর্ণ থাকে। ঈশ্বরোপাসনা আমাদিগের চরিত্র সংশোধনে যেমন কার্য্যকর, তেমনি আমাদিগের মনকে সর্ব্ব প্রকার কুচিন্তা এবং মিথ্যা দুঃখ ও বিষাদ হইতে মুক্ত রাখিতে সক্ষম। এই জন্য শরীরও নানা রোগ হইতে বিমুক্ত থাকিয়া সুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে। আর্য্য ঋষিগণ ইহারই জন্য যে দীর্ঘ-জীবী হইতেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। মনু বলিয়াছেন—

ঋষয়োদীর্ঘসন্ধ্যাত্বাদ্দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চ্চসমেবচ॥

"মুনিগণ দীর্ঘকাল সন্ধ্যাবন্দনাদির অনু-

ষ্ঠান করেন বলিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী পরমায়ু, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি, জীবদ্দশায় বিমল যশ ও মরণানন্তর বেদাধ্যয়ন-জন্য বিপুল কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব পরমায়ু প্রভৃতি কামনাশীল ব্যক্তিরা অবশ্য সন্ধ্যার উপাসনা করিবেন"।

ধর্ম্ম প্রবৃত্তি নিচয়ের পরিচালনা দ্বারা আমরা যেমন মানসিক শান্তি ও শরীরের স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া সুখী হই, সেই রূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের উত্তেজনায় কার্য্য করিলে আমরা মনের ক্লেশ নিবন্ধন শারীরিক অসুস্থতা জন্য কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া অসুখী হই। কাম-রিপু-পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ যেমন মানসিক কষ্ট ও যাতনা ভোগ করে, সেই রূপ শারীরিক নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া সকলের ঘৃণার্হ হয়। সুবিজ্ঞ ডাক্তার নিকল্‌স বলেন যে যত প্রকার দুরপনেয় ও অচিকিৎস্য রোগ আছে, কাম-রিপু-পরতন্ত্র ব্যক্তির পক্ষে সেই সকল প্রকার রোগই সম্ভব। ক্রোধ আমাদিগের আর একটি দুর্দ্দান্ত রিপু। আমরা যখন ক্রুদ্ধ হই, তখন আমাদিগের শরীরের যে বিষম অপকার করিয়া থাকি, তাহা অনেকেই জানেন না। ক্রুদ্ধ হইবা মাত্র আমাদিগের তৎকালীন মানসিক ভাব সমস্ত-শরীরে একটি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। রক্ত মস্তকের দিকে বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়, মুখ ও চক্ষু আরক্তিম ও অগ্নিময় হয়, ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে থাকে, চর্ম্ম অত্যন্ত উষ্ণ হয় এবং আমাদিগের বিবেক ও বুদ্ধি শক্তি লোপ পায়। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শান্ত ও সুস্থির চিত্ত, তাহার শরীরে হঠাৎ এই পরিবর্ত্তন হইলে অতি মন্দ ফল উৎপন্ন হয়। মূর্চ্ছা, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, অপস্মার প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রোগ দ্বারা ক্রোধী ব্যক্তিগণ শীঘ্র আক্রান্ত হয়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বনিটস নামক এক জন চিকিৎসক বলেন "একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কোন ব্যক্তির প্রতি কোন অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত এত দূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি সেই ঘটনার কিছুকাল পরে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর ক্রোড়ে নীত হইয়াছিলেন"। রোম সম্রাট নার্ব্বা রাজ-সভাস্থ এক মন্ত্রী কর্ত্তৃক অযথা রূপে ব্যবহৃত হওয়াতে এমন ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে তৎক্ষণাৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া মৃত্যু গ্রাসে কবলিত হইলেন। সুল্লা নামক প্রাচীন রোমের এক জন সুবিখ্যাত ব্যক্তির উদর মধ্যে এক বিস্ফোটক হইয়াছিল। তিনি তৎকালে কোন কারণ বশতঃ ক্রুদ্ধ হওয়াতে উহা ফাটিয়া যায় এবং কিয়ৎ কাল পরে তিনি রক্ত বমন করিয়া কালগ্রাসে পতিত হয়েন। দেখা গিয়াছে যে ভোজন কালে ক্রোধের উদ্রেক হইলে খাদ্যের আর মিষ্টতা থাকে না এবং পাকস্থলী নিজ ক্রিয়া সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে বাধা প্রাপ্ত হওয়াতে অজীর্ণ দোষ উপস্থিত হইয়া নানা রোগ উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, তাহাদের প্ররোচনা অনুসারে কার্য্য করিলে আমরা মনের শান্তি ও শারীরিক স্বাস্থ্য হারাইয়া অতিশয় কষ্ট প্রাপ্ত হই। আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল নিয়মিত না হইলে আমাদিগের শত্রু এবং নিয়মিত হইলে আমাদিগের মিত্র হয়। শরীর ও মনের প্রত্যেক বৃত্তি নিয়মের অধীন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এমন কি, আমাদিগের মনের শান্তি রক্ষার জন্য আমাদিগের সুকামনা সকলকেও পরিমিতাচারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া অন্যায় রূপে বেগবতী হইতে দেওয়া উচিত নহে। মঙ্গল কার্য্যের ক্ষেত্র অনন্ত কিন্তু আমাদিগের জীবন পরিমিত ও ক্ষমতাও পরিমিত। আমরা কিছু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারি

না ; আমরা আমাদিগের জীবদ্দশাতে মনুষ্য সমাজের অবস্থা একেবারে সম্যক পরিবর্ত্তন করিতে অক্ষম। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে মনুষ্যের মঙ্গল সাধনে সাধ্যমত যত্ন করিয়া আমাদিগের যত্নের ফলের জন্য অতীব ব্যগ্র না হইয়া তাহা ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক মনের শান্তি রক্ষা করি। ফলের জন্য অতীব ব্যগ্র হইলে বরং তাহাতে কার্য্যের হানি হইবার সম্ভাবনা। তীর নিক্ষেপকর্ত্তা আপনার লক্ষ্য পর্য্যন্ত তীর না পৌছিলেও যেমন বিফল-প্রযত্ন হয়, তেমনি তাহা অতিক্রম করিয়া তীর গমন করিলেও বিফল-প্রযত্ন হয়।

এই প্রস্তাবে যাহা বলা হইল, তাহা দ্বারা এই প্রমাণিত হইতেছে যে আমাদিগের শরীরের সহিত মনের বিলক্ষণ সম্বন্ধ রহিয়াছে। মনের সুখে শরীর সুখী ও শরীরের সুখে মন সুখী হয়। একটির বিশৃঙ্খলা ঘটিলে আর একটির বিশৃঙ্খলা প্রকৃতির অখণ্ড্য নিয়মানুসারে ঘটিবেই ঘটিবে। শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের প্রশান্ত অবস্থা রক্ষা করিয়া আমাদিগের পার্থিব জীবনকে অরোগী, আনন্দময় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে পারিলে ধর্ম্মানুমোদিত ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করা হয়। আমাদিগের প্রতি প্রাকৃতিক নিয়ম-বিধাতা জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য্য করুণা যে যে সকল নিয়ম পালন আমাদিগকে সুখী ও দীর্ঘজীবী করে, তাহাতে অধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই এবং যাহা আমাদিগকে দুঃখিত, তাপান্বিত ও অল্পায়ু করে, তাহাতে অধর্ম্ম জাজ্বল্য রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু হায়! কি দুঃখের বিষয়, অজ্ঞান পঙ্কে নিপতিত মোহ পরতন্ত্র মানব জাতি এই সত্য সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত অস্বাভাবিক কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কি পরিতাপের বিষয়! যে আমরা অমৃতের পুত্র হইয়া ও অমৃতের অধিকারী হইয়া অমৃত দূরে নিক্ষেপ করতঃ বিষ পান করিয়া শোকে তাপে আর্ত্তনাদ করিতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য।

সৃষ্টি কালাবধি এ পর্য্যন্ত মানব জাতি সভ্যতার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করে নাই, তাহা প্রায় সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। আদিম পুরাতত্ত্ব-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান ও বহু দর্শিতার ফল বিশ্বাস করিতে গেলে আমাদিগকে মানিতে হয় যে মনুষ্য সর্ব্ব প্রথমে সম্পূর্ণ রূপে অজ্ঞ ছিল এবং কেবল আপনার শরীর রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বস্তু সকল আহরণে প্রবৃত্ত ছিল। সে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চালনা করিয়া উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল এবং বহু কালের পর বর্ত্তমান উন্নতির অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সভ্যতা যত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহাকে প্রকৃত সভ্যতা বলা যায় না। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদানার্থ কৌশল-পূর্ণ নানা উপায়ের বৃদ্ধি, বাণিজ্য কার্য্য, ভাস্কর বিদ্যা, স্থাপত্য বিদ্যা, চিত্র বিদ্যা, বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের অসম্পূর্ণ উন্নতি লইয়া ইউরোপ এক্ষণে সভ্যতার অভিমানে স্ফীত হয়েন, তাহা প্রকৃত সভ্যতায় উত্তীর্ণ হইবার কতকগুলি নিকৃষ্ট উপকরণ মাত্র। যে সকল বস্তু লইয়া মানব জাতি প্রকৃত সভ্যতা লাভ করিতে পারে, সেই সকলের মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মই প্রকৃত সভ্যতার উৎকৃষ্ট উপকরণ। কিন্তু কুসংস্কার-পূর্ণ পৌত্তলিক ধর্ম্ম অথবা ভ্রান্তিময় খ্রীষ্টীয়, মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রকৃত সভ্যতার উপযোগা হইতে পারে না। এমন কি,

যে ধর্ম্ম একটি মাত্র ভ্রম কিম্বা কুসংস্কার দ্বারা কলঙ্কিত, তাহাও প্রকৃত সভ্যতার সম্পূর্ণ রূপে উপযোগী হইতে পারে না। কুসংস্কার ও ভ্রম-শূন্য, সুমার্জ্জিত, সমুন্নত মতের আশ্রয়ভূমি এক মাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই প্রকৃত সভ্যতার উপযোগী ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি ও সুখের কিছু মাত্র বিঘ্ন প্রদান না করে, সেই ধর্ম্মই প্রকৃত সভ্যতার উপযোগী ধর্ম্ম। খ্রীষ্টীয়, মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণ বাইবল, কোরাণ ও ত্রিপেটক লিখিত মত অভ্রান্ত মনে করিয়া তদপেক্ষা বিশুদ্ধ মত সকল তুচ্ছ করিয়া তাহা সদর্পে দূরে নিক্ষেপ করতঃ মনুষ্য জাতির মনের প্রকৃতির নিয়মসিদ্ধ ক্রমোন্নতির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অনন্ত নরক যন্ত্রণার ভয় প্রদর্শন করিয়া আমাদিগের মনের শান্তি ও শারীরিক স্বাস্থ্য নষ্ট করে। সুবিখ্যাত ডাক্তার প্রিচার্ড বলেন যে একদা কয়েক ব্যক্তি এক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মোপদেষ্টার পরকালে অবিশ্বাসী দিগকে অনন্ত কাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে এই বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া এত দূর ভীত হইয়াছিল যে কিয়ৎ কাল পরে তাহারা অপস্মার, উন্মাদ প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহার নিকট চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্ম পারলৌকিক সুখের অবস্থা, অপবিত্র ইন্দ্রিয় সুখের অবস্থা (১) এবং যুদ্ধ কালে বিরোধীদিগের মধ্যে শান্তি সংস্থাপন জন্য, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, অথবা মহম্মদের গৌরব রক্ষার্থ মিথ্যা বলিলে কোন পাপ নাই ও কোরাণের কয়েক অধ্যায় পাঠ করিলে সহস্র পাপ ধৌত হইয়া যায় এবং ঈশ্বর আমাদিগের পিতা মাতা না হইয়া তিনি কেবল আমাদিগের দণ্ড বিধাতা ভীষণ প্রভু ও আমরা সকলে তাঁহার সেবক ভৃত্য (২), এইরূপ ভ্রমপূর্ণ মত সকলে বিশ্বাস স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের উচ্চতম মহত্ত্ব হইতে বহু নিম্নে নিক্ষেপ করে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনন্ত জ্ঞান শক্তি করুণা বিশিষ্ট ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা সর্ব্বদা স্থিতি করিতেছি এ প্রকার বিশ্বাস হইতে পরাঙ্মুখ করিয়া (৩) আমাদিগের মনকে নিরাশার কূপে নিমগ্ন রাখে ও আমাদিগকে শারীরিক এবং মানসিক যাতনার অধীন করিয়া দেয়।

ব্রাহ্মধর্ম্মে উল্লিখিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সমূহের কোন সঙ্কীর্ণ অথবা ভ্রমাত্মক মত নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম নিজ মতের সংশোধন ও উন্নতি সাধনে অনিচ্ছু হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির কোন বাধা প্রদান করেন না। পাপী তাপী সকলেই এক সময়ে অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই আশা দান করিয়া আমাদিগের মনকে সর্ব্বদা প্রশান্ত ও সুখী রাখিতে সক্ষম হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্মে এমন কোন মত নাই যে তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে এবং তদনুসারে কার্য্য করিলে

(১) God will in paradise bestow on every believer 800 girls and 4000 wives and 2 Huris. (Ain. Ul. Hayat leaf 167.) See Revd. C. G. Pfander's "Remarks on the nature of Muhammadanism" p. 61.

"In paradise the believers shall enjoy most beautiful women, pure and clean having black eyes, and countenance always fresh and white as polished pearls, drinking with them the most delicious liquors and most savoury and pleasant wines" (Alcoran) See H. Prideaux's "Life of Mahomet" p. 25.

(২) See Pfander's "Remarks &" pp 40, 9, 11.

(৩) Max Muller's "Introdnction to the Science of Religion." p. 249.

আমাদিগের শরীরের অথবা মনের কোন হানি হইতে পারে। এক মাত্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মই প্রকৃত সভ্যতার উপযোগী ধর্ম্ম হইতে পারেন।

বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সভ্যতা প্রচলিত, তাহা সম্পূর্ণ উন্নত অবস্থায় উত্তীর্ণ হইবার বহু বিলম্ব আছে। ধর্ম্ম বিষয়ে উল্লিখিত সভ্য জনপদবাসীদিগের বিশেষ মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। বকল, গিজো প্রভৃতি "সভ্যতা" বিষয়ক লেখকগণ, সভ্যতার উন্নতির জন্য রাজনীতি কত দূর উন্নত হওয়া আবশ্যক, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন; ধর্ম্ম কত দূর উন্নত হওয়া আবশ্যক, তাহার কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় সকল শ্রেণীর লোক বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে বটে কিন্তু বিদ্যার আলোক প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের উচ্চ পদাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দুরভিলাষ দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগের মনকে অসন্তুষ্ট ও অস্থির এবং শরীরকে অসুস্থ করিয়া তুলিতেছে। তন্তুবায় ও রজক নীচ ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করতঃ উচ্চপদলোভী হইতেছে কিন্তু তাহা প্রাপ্তি সম্বন্ধে অকৃতকার্য্য হইয়া মানসিক যাতনা ও শারীরিক রোগে কষ্ট পাইতেছে। ইংলণ্ডীয় অসামান্য নৈয়ায়িক পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেন যে অতি নীচ শ্রেণীস্থ দরিদ্র ব্যক্তি হইতে রাজবংশসম্ভূত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেই সম্যক রূপে বিদ্যা শিক্ষা করিলে সমাজের সম্পূর্ণ মঙ্গল; কিন্তু তন্তুবায় অথবা রজক প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ উচ্চ পদ লাভ জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিবেক না; নিজ নিজ ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ রূপে দক্ষ ও পটু হইবার জন্য এবং বুদ্ধি বৃত্তিকে সমুন্নত করিয়া ধর্ম্ম পরায়ণ হইবার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করিবেক। কিন্তু অধুনা সভ্য রাজ্যে বিদ্যা শিক্ষার এ প্রকার উচ্চতম উদ্দেশ্য সফল না হইয়া অতি অমঙ্গলজনক ফল ফলিতেছে।

মানব জাতি প্রকৃত সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার নিকট হইতে কতকগুলি নিকৃষ্ট উপকরণ প্রাপ্ত হইতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষের নিকট হইতে উহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ যে কুসংস্কার ও ভ্রমশূন্য বিশুদ্ধ ধর্ম্ম তাহাই প্রাপ্ত হইতেছে। ইহা ভারতবর্ষের অল্প গৌরবের বিষয় নহে। মনু বলিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষ-সম্ভূত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্বীয় স্বীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবেক।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

সুমার্জ্জিত ধর্ম্মই মনুষ্য জাতির মধ্যে সুমার্জ্জিত আচার ব্যবহার প্রচলিত করিতে সক্ষম। বোধ হয় ব্রাহ্মধর্ম্মই মনুর এই ভবিষ্যৎ বানী অবশেষে পূর্ণ করিবেন। সমস্ত পৃথিবীতে প্রকৃত সভ্যতা প্রচার করিবার জন্য ভারতবর্ষোদ্ভব ব্রাহ্মধর্ম্মই প্রধান উপায়। ইহা এক সময়ে পৃথিবীতে এবম্প্রকার সভ্যতা আনয়ন করিবেন, যাহার অলৌকিক জ্যোতির সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দির সভ্যতাকে অন্ধকারময় বলিয়া প্রতীত হইবেক। ইহা দ্বারা রাজনীতি, সামাজিক ও গার্হস্থ্য নিয়ম প্রণালী উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে। প্রত্যেক মনুষ্য মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীতে এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।

১৭ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৭৯৭ শক।

" পাণ্ডিতাং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ "

"পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া বাল্য ভাবে অবস্থিতি করিবে"

মনুষ্য যতই বয়োবৃদ্ধি লাভ করে, ততই তাহার বাল্য গুণ তিরোহিত হয়। বাল্যকালের প্রধান লক্ষণ, পিতা মাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর, আশা, উৎসাহ, কৌতূহল, শারল্য, ঔদার্য্য ও সদানন্দ। বালক সাংসারিক চিন্তা শূন্য হইয়া পিতা মাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া অকুতোভয়ে পরমানন্দে সংসারে বিচরণ করে। তাহার আশা যে কত তাহা বলা যায় না। ভবিষ্যতে কোটি মুদ্রার অধিপতি হইব, রাজা হইব, সম্রাট হইব, এই সকল আশা তাহার মনোমধ্যে অসংকুচিত ভাবে সঞ্চরণ করিতে থাকে। তাহার উৎসাহেরও সীমা নাই; সে সকল বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করে। সে সর্ব্বদা কৌতূহলাক্রান্ত। তাহার সকল বিষয় জানিবার ইচ্ছা। সংসারের কুটিলতা সে জানে না; সে অকপট হৃদয়ে মনের ভাব সকল ব্যক্ত করে ও কার্য্য করে। তাহার মন অত্যন্ত উদার, সে সকল মনুষ্যকে সংস্বভাব মনে করিয়া শরল ভাবে তাহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব করে। সে সর্ব্বদাই আনন্দ চিত্ত; তাহার চক্ষে সকল বস্তুই ইন্দ্রধনুর শোভন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রতীত হয়। মনুষ্য যতই প্রৌঢ়াবস্থায় উপনীত হইতে থাকে ও সংসারের শীতলতা তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে থাকে, ততই সে বাল্য কালের এই সকল রমণীয় গুণ হারাইতে থাকে। এই সকল রমণীয় গুণ হারাইয়া বিশ্বাস শূন্য, সর্ব্বদা সন্দিহান চিত্ত, শীতলহৃদয়, নিরুৎসাহ, শিক্ষা পরাঙ্মুখ, কুটিল ও অনুদার হওয়া অল্প ক্ষতির বিষয় নহে। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যিনি, তিনি বাল্য কালের ঐ সকল রমণীয় গুণ হারান না। তিনি প্রৌঢ়ত্বের প্রবীনতার সহিত বালকের গুণ সকল সংযোগ করেন। বালক যেমন পিতা মাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া অকুতোভয়ে পরমানন্দে সংসারে বিচরণ করে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সেইরূপ সেই পরম পিতা ও পরম মাতার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া নির্ভয় ও সদানন্দ চিত্তে এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন। বালকের আশা এই পৃথিবীতেই বদ্ধ থাকে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আশা অনন্ত দেশে অনন্ত কালে সঞ্চরণ করে। তিনি আশা করেন যে পরকালে তিনি স্বর্গ হইতে স্বর্গে, উৎসব হইতে উৎসবে, আরোহণ করিবেন। তাঁহার আত্মার ক্রমশঃ উন্নতি হইবে; সে উন্নতির আর শেষ হইবে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা উৎসাহান্বিত; তিনি সকল সদনুষ্ঠানে উৎসাহ প্রকাশ করেন। বাষ্পীয় পোত যেমন বাষ্প দ্বারা পরিচালিত হয়, তিনি সেইরূপ তাঁহার আপনার হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা পরিচালিত হয়েন। অতএব তিনি কেন নিরুৎসাহ হইবেন? ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র। সকল বিদ্যার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে জানা এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সকল বিদ্যা বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেন। তিনি কোন বিষয়ে আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়েন না। তিনি চিরকালই শিক্ষা করেন; তাঁহার শিক্ষা কেবল মৃত্যুতে শেষ হয়। তিনি সকল বিষয়ে সরল পথ অবলম্বন করেন। যে ব্যক্তি সরল পথ অবলম্বন করে, তাহাকে ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন; কখন দেখিলাম না যে শরল পথে কেহ কখন পথহারা হইল। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি দেশকাল

জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকেই প্রীতি করেন; তিনি সমস্ত বসুধাকে আপনার আত্মীয় কুটুম্ব জ্ঞান করেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা সদানন্দ চিত্ত। আনন্দই যৌবন। যখন কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি আনন্দ উপভোগ করেন, তখন তাঁহার যৌবন হয়। যে ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, তাঁহার তখন কতই না যৌবন হয়। যদ্যপি সেই প্রবীন ব্রহ্মজ্ঞের মস্তকের কেশের উপর বার্দ্ধক্যের তুষার অবস্থিতি করে, তথাপি তাঁহার হৃদয় যৌবনে পরিপূর্ণ থাকে। ব্রহ্মানন্দই চির যৌবন; ব্রহ্মানন্দই চির বসন্ত; ব্রহ্মানন্দই অমৃত। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ইহলোকেই অমৃত ভোগ করেন। তিনি এখানে যে অমৃত উপভোগ করেন, পরকালেও সেই অমৃত উপভোগ করেন। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায় মাত্র; তাঁহার অমৃত উপভোগের ক্রম কখনই বিচ্ছিন্ন হয় না। কেবল নদী যেমন সমুদ্রের দিকে যত অগ্রসর হয়, ততই গভীর ও প্রশস্ত হইতে থাকে, সেইরূপ তিনি যত ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হয়েন, ততই তাঁহার ব্রহ্মানন্দ গভীর ও প্রশস্ত হইতে থাকে।

যখন আমি এই উপদেশ আরম্ভ করিলাম, তখন আমি উপনিষদের এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম যে "পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" "পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া বাল্য ভাবে অবস্থিতি করিবে"। এখানে পাণ্ডিত্য শব্দের অর্থ কুপাণ্ডিত্য; সুপাণ্ডিত্য নহে। কুপণ্ডিত ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর করা দূরে থাকুক, তিনি কুতর্ক ও সংশয় জালে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তে সন্দেহ করেন। যদিই বা তাঁহার অস্তিত্বে তাঁহার এক প্রকার ক্ষীণ বিশ্বাস থাকে, তথাপি তাঁহার মঙ্গল স্বরূপে তিনি কখন বিশ্বাস করেন না। ঈশ্বর সম্বন্ধে যখন তাঁহার এইরূপ, পরকাল ত কোথায় আছে? তিনি ঈশ্বর ও আশা শূন্য হইয়া এই সংসারে অবস্থিতি করেন। তিনি শিক্ষা পরাঙ্মুখ, তিনি আপনার অজ্ঞতা স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়েন। তিনি সকল মনুষ্যকে সন্দেহ করেন ও কুটিল পথ সকল অবলম্বন করেন। তাঁহার আত্মা ঔদার্য্য-শূন্য হয়। তিনি নিরুৎসাহ, নিরানন্দ, নির্বীর্য্য ও শত্রুদিগের আমোদস্থল হইয়া এই মর্ত্ত্যলোকে কাল যাপন করেন। হে পরমাত্মন্! আমাদিগের যেন এই দশা না হয়।

A BENGALI IN GERMANY.

(FROM THE NATIONAL PAPER)

We have received the following from a Bengali who is now in Leipzig, Germany. * * * *

"The winter has passed away; the beautiful days of summer commenced not long ago and with them the Summer Session of our University. Professor Brockhams commenced his Lectures on Sanscrit. and I attended the first two lectures of this venerable man just to hear what the old German Pundit had to say about the literature of our dear old Sanscrit language. The Professor commenced with a short history of the literature of the Brahmans as he called it,—how a deep original and wonderfully varied literature has been preserved in India—how the genius of the Brahmans was especially suited to philosophical, religious, and didactic purposes. perfectly, though of course quite pardonably, unaware all the while that it was nothing more or less than the holy presence of a *bonafide* Brahman that was gracing the second bench before him. But the words of the venerable Professor sank deep into my heart. It brought to my mind in painful contrast what our India once was—and especially what that remarkable class of men the Brahmans once were. It was the Brahmans who in ages gone by represented the *mind* of India, and if India is held in any esteem or admiration even at the present day—at this her period of mental, political and social degradation—it is also for any fragments of the literature of the Brahmans which have escaped the unrelenting

ravages of time and the still more unrelenting ravages of the fanatical Mahomedans. *Brahman* then is a very honourable title when properly understood. Indeed, the name *Brahman* is held in very high esteem in Germany, for the Germans know even far better than we what does it mean, inasmuch as it is some of the German *savants* who have done more to resuscitate our Sanscrit literature than any body else. The names of William Von Humboldt, of the two Schlegels, of Bopp, of Lassen, of Goldstucker and of Max Muller must be ever gratefully cherished by every Indian heart, for is it not these men who incessantly toiling over the intricacies of the most intricate of languages, have revealed even to our Indian eyes what India once was? Is it not to them that we owe that estimation as an intellectual people in the eyes of all who have studied Sanscrit? For, I am afraid, our countrymen are but very imperfectly aware in what estimation our literature is held in this country. The eulogistic verdict of no less a man than the myriad-minded Goethe on the Sakuntala of our Kalidasa is well-known but it is not so generally known that Schopenhauer, one of the acutest, and the most rigorous, though one-sided philosophers of Germany, has made ample use of our old Sanscrit philosophers in building up his pessimistic philosophy, nor that Edward Von Hartman—a living philosopher in Berlin—in his latest work called: "The Self-decomposition of Christianity and the Religion of the Future," while summarily dismissing Christianity as an out-grown superstition and its founder as a very ordinary man. 'from head to foot a Jew,' in whose sayings there is nothing new or wonderful, declares that the only religion consistent with the rational culture of our age and the ages to come is *pantheistic monotheism*, and the only true idea of Immortality is 'Nirvana' as propounded by the prophet of Bhuddism, Sakyamuni. I have adduced these two instances only to show how our Indian mind is influencing the philosophical thought of the most philosophical nation in the world. And this mental sympathy can be easily accounted for by the striking affinity which the German mind bears to the Aryan in preference to any other nation in Europe. When with a more thorough and intimate acquaintance with the literature of this country, I shall gradually unfold to you my views on German Literature, I shall have occasion to show how the philosophy of Hegel: of a universal soul in Nature or of contemplating the Universe as a vast ocean of spirit in which every phenomenal existence is but a wave, corresponds with that of our 'Sankaracharya' or how the poetical pieces of the "many-sided." Goethe, as his admirers love to call him, reminds me of the melodious odes of Hafiz (here of course the analogy goes so far as the oriental and not the Indian), both frantic with that ever-poetical theme: Love; both of them bearing testimony to the following two verses of an American poet who is a great philosopher too:—

"Never was a poet of late or of yore,
Who was not tremulous with love-love."

But I am going further from my topic. Let me conclude this head by adding that as it is of utmost importance for the future greatness of a nation to have a glorious Past to fall back upon, and that as for this resuscitation of our own past we owe to none so much as to these German savants, let our hearts swell up in an ecstacy of gratitude towards them, while toiling for the regeneration of our country, and not "bate one jot of heart or of hope" since we too are the children of great fathers!

Seeing in what esteem is the word Brahman held in this country, I, though an "ultra-go-ahead progressionist" as Baboo Rajendra Lall Mitra would call me, have of late been introducing myself as a humble scion of that rarely gifted class of men. Not long ago one of the professors of our University actually remonstrated with me on the unreasonableness of my having thrown away the holy badge of Brahmanism—a sign I should no more have been ashamed of than a memorial left me by my father in order to remind me of his high, noble and manly characrter, and thus keep me oft from mean or wicked acts which I might otherwise have been guilty of. This professor whose lectures I am now attending, and who takes a great interest in our Indian affairs, and who, let me further add, knows our Baboo Rajendra Lall

Mitter far more than many of his countrymen, has also very kindly given me a card of introduction to Professor Brockhaus which I have not yet had the heart to make use of. And would you know why? For if, on introducing myself as a Brahman, this old German Pundit whose real existence has been more in India than here, should in his enthusiastic reception of a native of Aryavarta (though alas! only of swampy Bengal) open his lips in the "Devabhasha,"—Horror of Horrors.—I could bear any other torture—even all the agonising tortures of a Calvinic hell with its diabolical deity, exulting in the propitiation of his immutable righteousness——but to stand there before him and perhaps return his salute, in what?——German, that indeed would be more than I could bring myself to bear. For the little smattering of Sanscrit which I picked up while passing my school and college courses has been so long and so entirely neglected that I am afraid to dish it up for any earthy use again; it would need a thorough unsparing dusting. I am therefore now thinking, if possible, of brushing up the rusty lumber of my Sanscrit lore, so impiously shoved aside for years together, and then and not till then I assure you, shall I make use of the card of introduction which has been so kindly given to me. Indeed it is a matter of shame as well as regret for any Indian and especially a Brahman to come over to this land without a thorough acquaintance with the Sanscrit literature which is now being so passionately cultivated here. The men most worthy to pay a visit to Germany are no doubt, men like Babo Rajendra Lall Mitter, Pundits Eshwara Chundra Vidyasagara. Krishna Kamal Bhattacharjya, and others of a similar stamp all over our country. But there is one man more—a living iconoclast to you (for he hates the name of Hindoo which means "slave") a philosopher whom I should very much like to see, if the very idea were not extremely absurd, in Germany for it is a man like Pundit Dayanand Saraswaty! (would that he were a little more decently dressed, his breeches a little more extended and his shoes a little less worthy) who alone could give the Europeans an idea what the native *indigenous forces of our soil, apart from* all extraneous "goranda" influences, are still able to produce in the shape of a philosopher of vast logical intellect and profound lore. There are vital forces enough still slumbering in the soil itself to produce minds of a high order which need only to be utilised for the regeneration of the whole land.

* * * * *

Yours truly
A BRAHMIN IN LEIPZIG.

আয় ব্যয়।

জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ

আয়	১৮৪ ।৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩১৭৸ ১৫
সমষ্টি	৫০২। ৫
ব্যয়	১২৬ (১৫
স্থিত	৩৭৬ ৶১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৯ ।৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৮৬ ৵১০
পুস্তকালয়	১২ ৶১৫
যন্ত্রালয়	৬৫ ।৵১০
গচ্ছিত	১১ ৶৫
সমষ্টি	১৮৪ ।৶১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৪৪॥ ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৪॥ ১০
পুস্তকালয়	৩ /০
যন্ত্রালয়	৪ ।৶১০
গচ্ছিত	৪ ।৶০
পরিব্রাজকের ব্যয় ...	২৫
সমষ্টি	১২৬ (১৫

সাম্বৎসরিক দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী ...	৫
" রাজনারায়ণ ধর ...	১

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজারাম মুখোপাধ্যায় ...	১
দানাধারে প্রাপ্ত	২ ।৶১০
	৯ ।৶১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩২। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬। ১ শ্রাবণ শুক্রবার।

Registered No 52.

নবম কল্প
প্রথম ভাগ
ভাদ্র ১৭৯৭ শক

৩৮৫ সংখ্যা
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৬
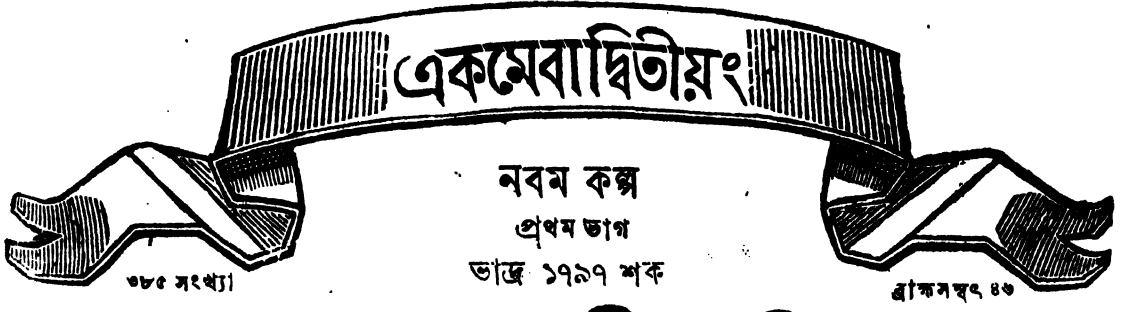
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী ভূপালী—তাল চৌতাল।

অন্তরে ভজরে তাঁরে, স্থজিত যাঁর এই দিনকর, শশধর তারক, যাঁর বিমল ভাতি সব গগন ছায় রে।

হৃদি-দরপনে মাজি যতনে, দেখরে সেই প্রেম-চন্দ্র সুধা বরষণ হইবে এখনি মধুর মধুর।

সেই অমৃত হ্রদে সবে মিলে করহ স্নান, পাইবে প্রাণ, তাপিত চিত্ত শান্ত হইবে, দূর হইবে পাপ।

শঙ্কট-হর নিত্য নিকট, কেন হে ভ্রম দূরে, তাঁর শরণ লও যাইবে ভবের পারে।

রাগিণী কানেড়া—তাল মধ্যমান।

কবে মম চিত-কমল ওহে নাথ বিকশিত হইবে।

ঘোর তিমিরে পড়িয়ে কাতরে ডাকি হে তোমায়, কর ত্রাণ।

রাগিণী ছায়ানট—তাল চৌতাল।

স্মর মন পরমেশ, সেই অসীম-সুখ-আকর, দুঃখ-মোচন, অনন্ত, অবিনাশী, আনন্দ-স্বরূপ, মন-মোহন, জন-রঞ্জন।

জগত-নাথ, জীবন-পতি, জ্যোতির্ম্ময়, স্বপ্রকাশ, অখিল-কলুষ-হারী, জগবন্দন।

তিনি পরম কারণ, ভব-তারণ, জগদীশ, দীন-শরণ, পরম-পুরুষ, অরূপ, অশরীর, অ-জর, অমর, বিভু নিরঞ্জন।

কে পারে করিতে সীমা তাঁর, অগণিত গ্রহ চন্দ্র সূরজ শূন্যে ভ্রমি না পায় কোন সন্ধান।

রাগিণী কানেড়া—তাল রূপক।

কে জানে মহিমা তব পরমেশ হো রাজা-ধিরাজ বিশ্ব-প্রতিপালক আদি-অন্ত-বিহীন।

মহী, আকাশ, সমুদ্র, ভূধর, তোমারি হে রাজ্য, চন্দ্র প্রভাকরে তোমারি শাসন।

হৃদি-মাঝে বিরাজ তুমি নিরন্তর, ওহে

বিভু অন্তরযামী, ডাকে দীন তোমারে নিশি দিন সঁপি মন প্রাণ।

পরম দয়াল হে পরম কৃপাল, তুমি পরিপূর্ণ মঙ্গল, তোমার সমান প্রভু কেবা আর।

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

ভজ মন সতত তাঁরে ভক্তি-ভাবে, যেজন বিরাজে অন্তরে, জ্যোতিরময়, পরম সুন্দর, প্রাণারাম।

আদিনাথ, নিরঞ্জন, নিরগুণ গুণ-আধার, আনন্দ-স্বরূপ, নিরমল, নির্ব্বিকার, অজর, অমর, সেই পরম পুরুষে কর ধ্যান।

যাঁর মন্দির নিখিল ভুবন, সেই দেব পরম কারণ, দীন-নাথ, দীন-শরণ, বিঘ্ন-বিপদ-নাশন।

যিনি বাক্য মনোতীত, যিনি অনাম-রূপ, সেই পুরাণ সনাতন সব জগতের পিতা মাতা; স্থাবর, জঙ্গম, অমর সবার জীবন প্রাণ।

রাগিণী ভূপালী—তাল সুরফাকতাল।

চন্দ্র বরিষে জ্যোতি তোমারি, নিরমল, অতি শীতল, কিরণ সুখদায়ী;

চৌদিকে তারাগণ, উজলি গগন অঙ্গন, ধারণ করে তোমারি শোভা মনোহারী।

বিতরণ করি জীবন, বহিছে মৃদু সমীরণ অমৃত-পূর্ণ মঙ্গল ভাব তব প্রচারি।

বরষিয়ে মধুর তান, জুড়ায়ে হৃদয় প্রাণ, বিহগগণ করে গান তব গুণ বলিহারী।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

কলিকাতা

৭ আষাঢ় ১৭৯৭ শক।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ হইতে

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

যআত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোযমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং যআত্মানমন্তরোযময়ত্যেষতআত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ॥

আমারদের কি সৌভাগ্য। আমরা এই পবিত্র প্রাতঃকালে পবিত্র-স্বরূপের উপাসনাতে আত্মাকে পবিত্র করিতেছি। আত্মার পবিত্রতা, আত্মার উজ্জ্বলতা, কেবল তাঁরি উপাসনাতে। এই আত্মার মধ্যে তিনি নিয়ত বিরাজ করিতেছেন। তিনি আত্মার মধ্যে থাকাতেই আত্মা পবিত্র হইয়াছে। যখনি এই আত্মা পরমাত্মা হইতে দূরে থাকে; তখনি সে বিষাদ প্রাপ্ত হয়, জরা শোকে জীর্ণ হয়, অপবিত্র কামনাতে দগ্ধ হয়—আত্মাতে যখন পরমাত্মাকে ধারণ করি; তখন পবিত্র হই, পরিশুদ্ধ হই। পরমাত্মা কোথায় আছেন? তিনি কাহারো নিকট হইতে দূরে নাই, তিনি সকলের অতি নিকটেই আছেন—আত্মাতে আ-ছেন। "যআত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরোযমাত্মা ন বেদ যস্যাত্মা শরীরং যআত্মানমন্তরোযমযত্যে-ষতআত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ।" যিনি আত্মাতে থাকিয়া আত্মার অন্তরে থাকিয়া আমারদের আত্মাকে পবিত্র করিতেছেন; যাঁকে আত্মা জানে না, আত্মা যাঁর শরীর, যিনি আত্মাকে নিয়মিত করিতেছেন; তিনি তোমার অন্তর্যামী অমৃত পুরুষ। এই পুরাতন ঋষির বাক্য। ইহা তেজীয়ান্ বীর্য্যবান্ যাজ্ঞবল্ক্যের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়া শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখাতে আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। অনেক ভ্রমণ করিয়া, তীর্থ-পর্য্যটন করিয়া, ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; যাহারা বাহিরে

বাহিরে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, তাহারা নিরাশ প্রাপ্ত হয়। অন্তরের বস্তুকে বাহিরে দেখা যায় না; যে অন্তরে তাঁহাকে দেখিতে চায়, সেই তাঁহাকে দেখিতে পায়। যদি ঈশ্বর কেবল সপ্তম স্বর্গে থাকিতেন, দূরাৎ সুদূরে থাকিতেন, তবে কেমন করিয়া আমরা সেখানে যাইতে পারিতাম? কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার জন্য দূরে দূরে ভ্রমণ করিতে হয় না। যখনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক শান্ত দান্ত হইয়া অন্তরে দেখি, তখনি দেখি আত্ম-সিংহাসনে তিনি বিরাজ করিতেছেন। দূরে যাইয়া তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তিনি নিকটেই আছেন—আত্মাতে তাঁহাকে দেখিতে পাই। "আত্মনি তিষ্ঠান্নাত্মনোন্তরঃ" তিনি আত্মাতে আছেন, আত্মার অন্তরে আছেন। যেমন দূরে যাইতে হইলে শরীরে কষ্ট লইতে হয়, আত্মার অন্তরে যাইতে হইলে সেই রূপ মনের কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। শারীরিক কঠোর তপস্যা অপেক্ষা মনকে সংযম করা গুরুতর কৃচ্ছ্র সাধন। আর যে কোন উপায় অবলম্বন কর, মনঃ সংযম ভিন্ন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখা যায় না। শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া, শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া, আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখিতে হয়। সহস্র ক্রোশ চলিয়া গেলে এক গম্য স্থানে উপনীত হইতে পারি; কিন্তু আত্মা এত নিকটে আছে যে তাহা হইতে আর কেহই নিকটে নাই, তথাপি মোহকে অতিক্রম করিয়া তাহাতে প্রবেশ করা অতীব দুঃসাধ্য। যাহার যেমন স্পৃহা, তাহার তেমনি মনোযোগ হয়। মনের একান্ত স্পৃহা ও মনোযোগ ভিন্ন আত্মাতে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যায় না। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে যদি না দেখিলে, শূন্য হৃদয়ে চলিয়া গেলে, তবে এখানে আসিবার তাৎপর্য্য কি। ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতির সহিত আত্মার মধ্যে যদি আমরা তাঁহাকে না প্রতীতি করিলাম, তবে এখানে আসিবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল না। এই আত্মার লক্ষণ কি, যাহাতে সেই পরমাত্মা রহিয়াছেন? এখনই তাহা জানিবার জন্য মনোনিবেশ কর। বেদে আছে "অথ যো বেদেদং জিঘ্রাণাতি সআত্মা গন্ধায় ঘ্রাণং" যে জানে আমি এই ঘ্রাণ লইতেছি, সেই আত্মা; গন্ধের আঘ্রাণ লইবার জন্য ঘ্রাণেন্দ্রিয় উপায় মাত্র। "অথ যো বেদেদং অভিব্যাহারাণীতি স আত্মা অভিব্যাহারায় বাক্" যে জানিতেছে যে আমি কথা কহিতেছি, সেই আত্মা; বলিবার জন্য বাগিন্দ্রিয় উপায় মাত্র। "অথ যো বেদেদং শৃণ্বানীতি স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রং।" যে জানিতেছে যে আমি এই শুনিতেছি, সেই আত্মা শুনিবার জন্য শ্রোত্র উপায় মাত্র। "অথ যো বেদেদং মন্বানীতি স আত্মা মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ।" যে জানিতেছে আমি মনন করিতেছি, সেই আত্মা; মন যে সে ইহার দৈব চক্ষু—ইহার অন্তশ্চক্ষু। আত্মাই মন দ্বারা অন্তরে দেখে। আত্মা হস্ত নয়, পদ নয়, চক্ষু নয়, শ্রোত্র নয়; আত্মা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নয়, বাগিন্দ্রিয় নয়। আত্মা যে সে হস্তদ্বারা গ্রহণ করে, পদ দ্বারা গমন করে, চক্ষু দ্বারা দর্শন করে, শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ করে। যখন এই আত্মাকে মনোনিবেশ করিয়া জানিতে পারিলাম, তখন আমরা পরমাত্মাকে দেখিবার অধিকারী হইলাম। গৃহের মধ্যে না গিয়া যেমন গৃহ-স্বামীকে দেখা যায় না, তেমনি আত্মাতে না গিয়া আত্মার স্বামীকে দেখা যায় না। যাহাকে আমি বলিয়া জানিতেছি, যতক্ষণ না সেই আত্মাকে জানিতে পারি; ততক্ষণ পরমাত্মাকে কোথায় দেখিব? অতএব অগ্রে স্বীয় আত্মাকে মনোনিবেশ পূর্ব্বক অবধারণ কর। এই আত্মাই দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা। এমন যে আত্মা তিনি কোথায় প্রতি-

ষ্ঠিত আছেন, এই জিজ্ঞাসার উত্তর এই যে তিনি অবিনাশী পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন, "স পরে অক্ষরে আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে।" যখন এই আত্মা আপনাকে নিরাশ্রয় জানিয়া আপনার জীবন-সহায়কে অন্বেষণ করে, এবং শান্ত দান্ত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া শুদ্ধ-সত্ত্ব হয়; তখন আপনার অন্তরে স্বীয় আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখে, এবং তাঁহার এই লোম-হর্ষণ জীবন্ত বাক্য শুনিতে পায় যে ভয় নাই, "অহং ব্রোহ্মাস্মি" তোমার অন্তরে আমি ব্রহ্ম রহিয়াছি—আমার শরণাপন্ন হইলে আর পাপ-তাপ থাকে না। আমারদের বাহিরের কর্ণ দ্বারা তাঁহার সেই মহান্ নাদ, মধুর আশ্বাস বাক্য, শুনিতে পাওয়া যায় না; অতীন্দ্রিয় জ্ঞান-যোগে ধ্যানযুক্ত হইলে তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। "জিসনে তূ জানাই সোই জন জানে, হরি গুণ সদহি আখ বখানে।" যাহাকে তুমি জানাও, সেই তোমাকে জানে, হরি গুণ সদাই ব্যাখ্যা করে। অন্ধকারের মধ্যে পরমাত্মা আছেন, অন্ধকার তাঁহাকে জানে না; আলোর মধ্যে পরমাত্মা আছেন, আলো তাঁহাকে জানে না; সূর্য্যের মধ্যে পরমাত্মা আছেন, সূর্য্য তাঁহাকে জানে না; চন্দ্রের মধ্যে পরমাত্মা আছেন, চন্দ্র তাঁহাকে জানে না; আত্মার মধ্যে পরমাত্মা আছেন, আত্মা তাঁহাকে জানে না—আত্মা কিন্তু তাঁহাকে জানিবার অধিকারী। আত্মা যখন শুদ্ধ সত্ত্ব হয়, যখন তাহার এমন অবস্থা হয় যে তাঁহাকে না জানিলে নয়, তাঁহাকে না পাইলে নয়; তখন তাহার নিকট তিনি প্রকাশিত হন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং।" যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আপনাকে প্রকাশ করেন। তিনি আত্মাতে থাকিয়া আত্মার অন্তরে থাকিয়া আত্মাকে নিয়মে রাখিতেছেন। সেই পরমাত্মাকে শূন্যে দেখিতে যাইও না; কিন্তু আত্মাতে দেখ। যেমন রক্ত সঞ্চালিত হওয়াতে শরীর চলিতেছে, যেমন নিঃশ্বাস দ্বারা শরীর জীবিত রহিয়াছে, সেই রূপ আত্মার মধ্যে পরমাত্মা থাকাতে আত্মা জীবিত রহিয়াছে। রক্ত যেমন শরীরের প্রাণ, নিঃশ্বাস যেমন শরীরের প্রাণ, আত্মার প্রাণ সেই রূপ পরমাত্মা। যে ব্যক্তি পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করিয়াছে, তাহার শরীর যখন এখানে পড়িয়া থাকিবে; তখন তাহার প্রাণ পরমাত্মাকে লইয়া চলিয়া যাইবে—সে যোগের অন্ত হইবে না। "সোশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" সে ব্রহ্মকে পাইয়া তাঁহার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করে। এই আমারদের ফল, এই আমারদের স্বর্গ, এই আমারদের মুক্তি। কি মহান্ ফল। একবার যদি আত্মাতে তাঁহাকে দেখিতে পাই, তবে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার অমৃত পান করিতে পাইব। অতএব শরীরের মধ্যে আত্মাকে দেখ—আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখ; পরমাত্মাই আত্মার প্রাণ, পরমাত্মাই আত্মার সুখ, পরমাত্মাই আত্মার মুক্তি। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষআত্মা বৃণুতে তনূং স্বাং।" না এই পরমাত্মাকে প্রকৃষ্ট কথা দ্বারা জানা যায়, না এই পরমাত্মাকে তীব্র মেধা দ্বারা জানা যায়, না এই পরমাত্মাকে বহু শ্রবণ দ্বারা জানা যায়; যে তাঁহাকে একান্ত মনে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে আপনার আত্মার মধ্যে দেখিতে পায় এবং তাঁহাকে দেখিয়া তাহার সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়। অতএব নিদ্রা হইতে জাগ্রৎ হও, সরল হৃদয়ে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হও; লোভ মোহ খর্ব্ব হইবে, সংসারের সকল দুঃখ অবসান হইবে—তোমার দক্ষিণে আমোদ পাইবে,

তোমার উত্তরে প্রমোদ পাইবে, আনন্দ-ভরে তোমার আত্মা তাঁর প্রেম গান করিতে থাকিবে। তাঁর এই কথা শোন—তিনি এই পরিমিত আত্মার মধ্যে থাকিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন "অহং ব্রহ্মাস্মীতি।"

জীবন্মুক্তি।

প্রণবো ধনুঃ শরোহাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যম্।

আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে জানিয়াছি, সেই অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্ম আমারদের লক্ষ্য—ব্রহ্মই আত্মা-রূপ শরের এক মাত্র লক্ষ্য স্থান। সেই লক্ষ্য ভেদ করাই আমারদের জীবনের উদ্দেশ্য। সমুদায় জীবনের মধ্যস্থলে ঈশ্বরকে স্থাপন কর, তাহা হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ মত কার্য্য করা হইবে—ব্রাহ্ম নামের যোগ্য হইতে পারিবে। জ্ঞানেতে প্রেমেতে ইচ্ছাতে "সত্যং শিবং সুন্দরং" যিনি, তাঁহার প্রতি উন্নত হও। সেই সত্য-স্বরূপ আমারদের জ্ঞানের অন্ন, তিনি ভিন্ন আমারদের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয় না। জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে—ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিই ব্রাহ্ম। অন্যেরা যেখানে শূন্য দেখে, আমরা সে স্থানে তাঁহার সত্তাতে পূর্ণ দেখি। অন্যে যেখানে অন্ধ শক্তির কার্য্য দেখিয়াই তুষ্ট, আমরা তাহার মধ্যে সেই মূলশক্তি, সেই প্রাণের প্রাণ, মহান্ পুরুষকে অনুভব করি। অন্য ধর্ম্মের লোকেরা ঈশ্বরকে পরিমিত স্থানে বদ্ধ করিয়া পূজা করে, আমরা তাঁহাকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত জানিয়া উপাসনা করি। আমরা জ্ঞানের দ্বারা জানিতেছি, তিনি "অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘং" তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।" যাঁহারা মৃৎ পাষাণাদি নির্ম্মিত পুত্তলিকার উপাসনা অপেক্ষা উন্নত পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা হয়ত ঈশ্বরকে গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত আছেন; অথবা মনুষ্যকে ত্রাণকর্ত্তা ও জীবনের আদর্শ জ্ঞানে মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমারদের উপাস্য দেবতা স্বতন্ত্র। ঈশ্বরই আমারদের একমাত্র আদর্শ, আমরা তাঁহার ব্যবধানে কোন মর্ত্ত্য সৃষ্ট বস্তুকে স্থাপন করি না, অন্যের চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখিতে যাই না। আমারদের যিনি ঈশ্বর, তিনি দেশ কালের অতীত; অথচ প্রতি আত্মার সহিত তাঁর সাক্ষাৎ নিকট সম্বন্ধ। যদি কোন গুরুকে আশ্রয় করি, সে কেবল ইহারি জন্য যে উপদেশ ও দৃষ্টান্তে তিনি আমারদিগকে সেই পরম গুরুর নিকটে লইয়া যাইবেন। তা না করিয়া যিনি ঈশ্বর হইতে আপনার প্রতি আমারদের হৃদয় মন আকর্ষণ করেন—ঈশ্বরের নাম করিয়া যিনি আপনার গৌরব প্রকাশ করেন, তিনি গুরু নহেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরের উপদেশ আবদ্ধ নাই—আত্মার অভ্যন্তরে তাঁহার সাক্ষাৎ উপদেশ। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন, মানবপ্রতিনিধির আশ্রয়ে আবশ্যক নাই, ঈশ্বরকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি কর। এখন সমস্যা এই যে, ঈশ্বরের সহিত এই প্রকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কি রূপে নিবদ্ধ হয়। জ্ঞান দ্বারা যেমন জানিতেছি, ঈশ্বর জীবনের লক্ষ্য 'ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে' সেই জ্ঞান কার্য্যেতে কিসে পরিণত হয়। কেবল জ্ঞান পথ দিয়াই যদি চলি, তবে হয়ত ঈশ্বরের পথে উপনীত হইতে পারি না। শুদ্ধ যদি বাহিরের জগতে তাঁহাকে অন্বেষণ করি, হয়ত মনে হইবে তিনি "দূরাৎ সুদূরে।" যদি কেবল আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির আলোকে তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে যাই, দেখি যে—

"ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।"

তবে কি তিনি প্রকাশিত হন না? বুদ্ধিতে

যখন তাঁহাকে পাই, সরল মনে বিনীত ভাবে ভক্তিযোগে তাঁহার অন্বেষণ করিলে তিনি আত্মাতে প্রকাশিত হয়েন। তখন জানিতে পারি—

"তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা যর্ব্বমিদং বিভাতি।"

সহস্র তর্ক যেখানে পরাভূত হইতেছে, সরল হৃদয়ে যখন তাঁহাকে প্রার্থনা করিতেছি, তখন তিনি দেখা দিতেছেন। যে স্থান বুদ্ধিতে অন্ধকার দেখে, প্রেম—বিনির্গত এক কিরণে তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যুক্তি যেখানে পরাভূত হয়, প্রেম সেখানে জয় লাভ করে,

"যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবে-
রভ্যুদয়ে ভাতি তত্ত্বং বিমলম্।"

সেই প্রেম কোথায় পাওয়া যায়? আমাদের শুষ্ক-হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার কিসে হইবে? ঈশ্বর-প্রেমের পিপাসু হইলে চিত্তকে নির্ম্মল করা চাই, শ্রেয়স্কাম জিতেন্দ্রিয় হওয়া আবশ্যক। যে সকল আকর্ষণ ঈশ্বর হইতে আত্মাকে দূরে প্রক্ষেপ করে, সে সকলকে কর্ত্তৃত্বের বলে প্রক্ষেপ করিতে হইবে। যে সকল মলিন চিন্তা নীচ কামনা, ঈশ্বরকে হৃদয়ের অন্তরাল করে, তাহা হৃদযকে অধিকার করিয়া না বসে; এই রূপ স্থির সংকল্প, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, যত্ন ও চেষ্টার প্রয়োজন। এক দিকে সংসার, এক দিকে ঈশ্বর। সংসারও থাকিবে, ঈশ্বরকেও পাইব, এরূপ করিয়া চলিলে হইবে না। যদি ঈশ্বরকে চাও, তাঁহার প্রেমের ভিখারী হও; তবে সংসারের মোহ পরিত্যাগ কর। অনেক সময় এমন উপস্থিত হয়, যখন ধর্ম্মের জন্য অর্থ ত্যাগ করা শ্রেয়—ঈশ্বরের জন্য সংসার পরিত্যাগ করা শ্রেয়। যদি ঈশ্বরকে চাও, তাঁহার প্রেম চাও; তবে এই রূপ ত্যাগ, এই রূপ বৈরাগ্য অভ্যাস কর। যতক্ষণ কোন একটী দুষ্প্রবৃত্তিকে ঈশ্বর ও আপনার মধ্যে ব্যবধান করিয়া রাখিবে, যতক্ষণ দুগ্ধ-পোষিত সর্পের ন্যায় কোন আন্তরিক রিপুকে পোষণ করিবে; ততক্ষণ ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে না। তাঁহার নাম কর, তাঁহার উপদেশ শুন, সকলই বৃথা। যিনি মদিরা-পান-পরবশ হইয়া আপনার বুদ্ধিভ্রংশ করিতেছেন, জীবন যৌবনে জলাঞ্জলি দিতেছেন, সহস্রবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, সহস্রবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া পশুবৎ মুগ্ধ হইতেছেন—তাঁহাকে বলি, যদি কল্যাণ চাও, ঈশ্বরকে চাও, মদিরাসক্তি পরিত্যাগ কর। যিনি স্বীয় পত্নীর প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইয়া অধম কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত নন; তাঁহার প্রতি আমার এই বক্তব্য, যদি কল্যাণ চাও, ঈশ্বরকে চাও, কামরিপু দমন কর।

আপনাকে পবিত্র কর, ঈশ্বর-প্রীতি লাভ করিবে। সেই প্রীতি যখন ঈশ্বরে স্থাপিত হইয়া পবিত্র হইল, তখন আবার তাহা সংসারে ফিরিয়া এসে জগতের কল্যাণ সাধনে আমারদিগকে নিযুক্ত করে। তখন ঈশ্বরকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁর প্রিয়-কার্য্য সাধন করিতে থাকি। ঈশ্বর-প্রেমের গুণে তখন এক নূতন ভ্রাতৃভাবের উৎপত্তি হয়। সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই প্রেম উপার্জ্জন করি, সেই প্রেমের গুণে আবার সংসার কল্যাণতর আনন্দকর হয়। শ্রেয়কে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই প্রেম উপার্জ্জন করি; আবার সেই প্রেমের গুণে আত্মা ধর্ম্মবলে অধিক বলবান্ হয়, পাপ প্রলোভন অতিক্রম করিতে অধিক শক্তিমান্ হয়। যাকে আমরা ভাল বাসি, তার অপ্রিয় কার্য্য করিতে কষ্ট বোধ হয়; যদি মোহ বশতঃ করিয়া ফেলি, তাহা প্রিয়জনের নিকট অঙ্গীকার করিতে আরো কষ্ট হয়,—অথচ মুক্তকণ্ঠে অঙ্গীকার না করিলেও আত্মগ্লানি নিবারণ হয় না। ঈশ্বর-

প্রীতির গুণে আত্মার ভাব সেই রূপ হয়। তাঁহাকে প্রীতি করিয়া নীচ মলিন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না; যদি মোহ বশতঃ পাপে পতিত হই, তবে তজ্জন্য এমন আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় যে, তাহার অনলে পাপ আপনা হইতেই ভস্মীভূত হয়, পুনর্ব্বার আর তাহা বল করিতে পারে না। প্রীতি যখন ঈশ্বরের দিকে যায়, তাঁর প্রিয়কার্য্য-সাধনে সহজেই দেহ মন সমর্পিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজে আমরা যে পাঠ করিয়াছি,—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" সে এই প্রকার। প্রীতি মূল, তাঁর প্রিয়কার্য্যসাধন তাহা হইতে নিঃসৃত হইতেছে। যতক্ষণ প্রীতি নাই, মন শুষ্ক, হৃদয় শুষ্ক; ততক্ষণ আপনার জন্য আমরা কার্য্য করি। স্বার্থপরতা নেতা, সংসার দেবতা। যখন প্রীতি ঈশ্বরে গেল, তখন সংসার তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের ক্ষেত্র এবং ঈশ্বর নেতা হইলেন! ঈশ্বরকে প্রীতি কর; সংসারে তাঁহার ইচ্ছার সহিত যোগ দিয়া কার্য্য কর; তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ শিক্ষা তোমারদের জীবনে ফলিত হইবেক।

ঈশ্বর যখন আমারদের লক্ষ্য স্থান হয়েন, আর আমরা জ্ঞানেতে প্রীতিতে ইচ্ছাতে মিলিয়া সেই লক্ষ্যের প্রতি গমন করিতে থাকি; তখনই আমরা যথার্থ স্বাধীনতা লাভ করি। সেই স্বাধীনতাই মুক্তির সোপান। সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে পলায়ন করিলেই যে মুক্তি লাভ হয়, তাহা নয়। সংসারে থেকে যখন আপন ইচ্ছাতে ঈশ্বরের কার্য্য সাধন করি, তখনই আমরা স্বাধীন। বৈরাগ্যের অর্থ এ নয় যে সন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিতে হইবে—বৃথা তপস্যায় শরীর ক্ষয় করিতে হইবে। ঈশ্বর যে স্থানে আমারদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, সে স্থান উপযুক্ত করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তথায় আমরা শিক্ষিত দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইয়া স্বাধীন হইতে পারিব। ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর আমারদিগকে এই সুখদুঃখময় সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন; যেখানে পাপ অনেক সময় জয় লাভ করে, যেখানে ধর্ম্ম পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুরূহ ও শঙ্কটা-কীর্ণ, যেখানে রাশি রাশি প্রলোভন আমারদিগকে শ্রেয়ের মন্ত্রণা হইতে আকর্ষণ করে, যেখানে শরীর আপন ভারে আত্মাকে প্রপীড়িত করে, জড়রাশি বাহ্যেন্দ্রিয়-সকলকে আকর্ষণ করিয়া ঈশ্বর ও আত্মার মধ্যে ব্যবধান হইয়া থাকে। যে সকল প্রলোভন, আমারদের চিত্তকে ধূলির সঙ্গে সমান করিয়া অধোগামী করে; সেই সকলকে অতিক্রম করা, পরাজয় করাই মুক্তি। এই মুক্তি লাভের জন্য বৃথা পরিশ্রম বৃথা কষ্ট স্বীকার আবশ্যক করে না। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক সংগ্রাম-স্থল প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সেখানকার সংগ্রামে জয়ী হইয়া বলিষ্ঠ শিক্ষিত স্বাধীন হইয়া জীবন্মুক্ত হই। সেই আত্মাই মুক্ত; যে ইন্দ্রিয়-সকলকে দমন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছে, পশু-প্রবৃত্তি-সকলকে আপন ইচ্ছার আয়ত্ত করিয়াছে। সেই আত্মাই মুক্ত; যে জড় জগতের আবরণ ভেদ করিয়া সেই অতীন্দ্রিয় পরব্রহ্মে উপনীত হইয়া শান্তি ও আরাম লাভ করে, ঈশ্বরকে ধর্ম্মাবহ পাপনুদ জানিয়া তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়ম ইচ্ছা পূর্ব্বক অবলম্বন করে এবং যে কোন অবস্থায় পড়ুক না কেন, সেই নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হয়। সেই আত্মাই মুক্ত; যে অবস্থার দাস নহে, ঘটনা-স্রোতের অধীন নহে, যে লোকাচার দেশাচার দ্বারা অন্ধের ন্যায় নীয়মান হয় না, মনুষ্যের দাসত্ব স্বীকার করে না, যেখান হইতে সত্য আসুক অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করে। সেই আত্মাই

মুক্ত; যাহার প্রেম আপনাতে, আপনার পরিবারে কি এক সম্প্রদায়েই বদ্ধ নহে, যিনি মনুষ্যমাত্রকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করত পরোপকার-ব্রতে ব্রতী হন। সেই আত্মাই মুক্ত; যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া ধর্ম্মকে সহায় করিয়া সকল ভয় পরিত্যাগ করিয়াছে; পাপেই যাহার ভয়, সহস্র বিপদে আক্রান্ত হইয়াও যে ধর্ম্ম-পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যদিও আশার অতীত, কিন্তু ধর্ম্মের বলে যতটুকু স্বাধীনতা উপার্জ্জন করা যায়, তাহা হইতে আমরা যেন বঞ্চিত না হই। রাজকীয় দাসত্বে পরিবৃত হইয়াও আমরা আত্মার বলে স্বাধীনতা কিয়দংশ লাভ করিতে পারি, সন্দেহ নাই। স্বাধীন রাজ্য আমরা কিসের জন্য চাই? না সেই রাজ্যের প্রতি-প্রজা সাধারণের শুভ উদ্দেশে স্বাধীন-ভাবে কার্য্য করিতে পারে। সেই রাজ্যে জীবন ধন সুরক্ষিত হয়, এক জাতির অত্যাচারে অন্য জাতি প্রপীড়িত হয় না——বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির উপর কোন শৃঙ্খল নাই। পরিশ্রম স্বেচ্ছাধীন ও বন্ধন-শূন্য, সুতরাং প্রত্যেকে আপন শ্রমের ফল নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ করিতে পারে, সর্ব্বসাধারণের হিতজনক রাজ-নিয়মের প্রভাবে প্রত্যেকে আপন মনের স্ফূর্ত্তিতে সচ্ছন্দে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে ও জগতের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে পারে। দেশ যদি স্বাধীন হয়, রাজা যদি মাননীয় হন, কিন্তু আমরা যদি পাপে অজ্ঞানে স্বার্থপরতাতে অভিভূত হইয়া আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে না পারি; তবে সে স্বাধীনতার ফল কি? কেবল বাহ্যিক স্বাধীনতা সম্পন্ন হইয়া যদি আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত থাকি, তবে আর কি হইল?

সাংখ্য-দর্শন।

প্রকৃতি বা জগতের মৌলিক-অবস্থা।

সঙ্কলিত তত্ত্ব সমুদায়ের মধ্যে প্রথম বা মূলতত্ত্ব প্রকৃতি। এই প্রকৃতিকে বুঝিবার নিমিত্ত সকলেই আগ্রহ করিবেন। সকলেই বলিবেন "প্রকৃতি কি? কি প্রকার পদার্থের নাম প্রকৃতি?—এবং যে প্রকৃতি জগন্নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ছিল, সে এখনও আছে কি না? যদি থাকে, উপলব্ধি হয় না কেন?"—

সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন, প্রকৃতি জগতের মূলেও ছিল, এখনও আছে এবং অন্তেও থাকিবে; তবে কি না এখন তাহার স্বরূপ সহজে হৃদ্গত করান যায় না। সংসারী আত্মার জ্ঞান তাহাকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। না পারিবার কারণ এই যে সে পদার্থ এখন রূপান্তরে অবস্থান করিতেছে!

প্রকৃতির এখন যথা স্বরূপ অবস্থাটি নাই, এখন তাঁহার জগদবস্থা। আত্মাও এখন স্ব-স্বরূপে অবস্থিত নহেন, তিনি সংসারী। প্রকৃতি এখন স্থূলাস্থূল বহুবিধ আকার ধারণ করিয়াছে, তদীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য গুণের উদ্ভব হইয়াছে। আত্মাও এখন ইন্দ্রিয় সহায় হইয়াছেন, প্রকৃতির বৃথা আলিঙ্গনে বিমোহিত হইয়া কাল কর্ত্তন করিতেছেন। প্রকৃতি বা জগতের মৌলিক অবস্থাটি সূক্ষ্ম, ব্যাপক, শব্দ স্পর্শাদি গুণ-বিবর্জ্জিত; আর, অসংসারী অবস্থায় আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্লেপ ও কেবল চিৎ স্বরূপ; সুতরাং এক্ষণকার সংসারী আত্মার পক্ষে মূল প্রকৃতির স্বরূপ অববোধ অত্যন্ত দুরূহ হইবে তাহাতে আর কথা কি!—বিবেচনা কর—যে কখন দুগ্ধ দেখে নাই, দধি দেখে নাই, নবনীতও দেখে নাই, কেবল ঘৃতই দেখিয়াছে,—ঈদৃশ ব্যক্তিকে তাহার সেই ঘৃত-জ্ঞান মাত্র অবলম্বন

করিয়া ঘৃতের মূল প্রকৃতি দুগ্ধের অবিকল আকার অনুভব করান যেরূপ সুকঠিন,—বর্ত্তমান জগদ্দ্রষ্টাকে ইহার মূল অনুভব করান তদপেক্ষাও কঠিন। বরং দৃষ্টান্ত বলে, উপদেশ কৌশলে, কথঞ্চিৎ তাদৃশ ব্যক্তির হৃদয়ে দুগ্ধের ছায়া সন্নিবেশ করা যাইতে পারে,—তথাপি প্রকৃতির স্বরূপ আবির্ভাব করান যাইতে পারে না।

"তবে তাদৃক্ পদার্থের উপদেশ বা জ্ঞান চেষ্টা বৃথা?"—

কপিল বলেন,—বৃথা নয়। তবে কি না তাহাতে অধিকারী হওয়া অপেক্ষা করে। এ নিয়ম কেবল প্রকৃতি-জ্ঞানের নিমিত্ত নহে, কার্য্য মাত্রেই অধিকারী হওয়ার নিয়ম। অনধিকারী পুরুষ শত চেষ্টা করিলেও ফল লাভ করিতে পারিবেন না, কিন্তু অধিকারী পুরুষ অত্যল্প অনুষ্ঠান দ্বারা ফলোৎপাদন করিতে পারিবেন। অপিচ, প্রকৃতি কুল-কামিনী-স্থানীয়া; আর সংসারী আত্মা স্বামি-পুরুষের স্থানীয়। প্রকৃতি সর্ব্বদাই স্বামি-পুরুষের নিকট আত্মশরীর আবৃত করিয়া হর্ষ শোকাদি জন্মাইতেছে, পুরুষও সেই আবৃতাঙ্গীর বৃথা আলিঙ্গনে মোহিত হইয়া বৃথা হর্ষ শোকাদি অনুভব করিতেছেন। এ অবস্থায় যদি কদাচিৎ প্রকৃতির অঙ্গ অত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে পুরুষের অভিলাষ জন্মে,তবে,সেই অভিলাষ মাত্রেই যে তিনি দেখিতে পাইবেন তাহা হইবে না। অনেক উপায়, অনেক সাধন অবলম্বন করিয়া অগ্রে তদ্বিষয়ে অধিকারী হইতে হইবে, তবে দেখিতে পাইবেন।

কীদৃক্ উপায় অবলম্বন করিলে প্রকৃতি দর্শনে অধিকারী হওয়া যায়? আহার শুদ্ধি, ব্যবহার শুদ্ধি, ত্রিবিধ সংঘাত শুদ্ধি, দেশ কাল পাত্রাদির আসাদন, সঙ্কল্প ত্যাগ, ইন্দ্রিয় সংযম, ব্রতচর্য্যা, সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা, এবং গুরু সেবা প্রভৃতি সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্ত প্রসাদ উপস্থিত হয়(১), চিত্ত প্রসন্ন হইলে সে চিত্ত নিকটস্থ আত্মার সুখময় প্রতিবিম্বে পরিপূর্ণ হয়, তখন আর ক্ষীরের আস্বাদজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তক্রের আস্বাদের ন্যায় প্রকৃতির বৃথা আলিঙ্গন ভাল লাগে না। প্রকৃতির আলিঙ্গন যখন ভাল লাগিবে না—(অর্থাৎ বৈকারিক সুখ যখন সুখের মধ্যে গণ্য হইবে না) অথচ বৈকারিক

(১) আহার শুদ্ধি—হিত, মিত ও মেধ্য ভোজন। যাহা স্বাস্থ্যকর ভোজন তাহা হিত,—যাহা অরোগিতার কারণ তাহা মিত (পরিমিত),—যাহা রজস্তমের অভিভাবক ও সত্ত্ব গুণের উত্তেজক তাহা মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র।

ব্যবহার শুদ্ধি—যথেচ্ছ ব্যবহার না করা আর শাস্ত্রোক্ত ব্যবহার প্রতিপালন করা। (আহার ও ব্যবহারের সহিত মনের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে, সুতরাং ধর্ম্মের সহিতও আছে)।

ত্রিবিধ সংঘাত শুদ্ধি—সংঘাত শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় যুক্ত দেহ—তৎসম্বন্ধে ত্রিবিধ অর্থাৎ বাক্, কায় ও মনের শুদ্ধি। মিথ্যা বাক্য, ও বহু বাক্য না বলার নাম বাক্ শুদ্ধি। ত্রি-সবন স্নান, মার্জ্জন, ধৌত বাস পরিধান ও বিমূত্রাদির অস্পর্শ, শরীর শুদ্ধি নামে বিখ্যাত। মিথ্যাভিলাষ, মিথ্যা কল্পনা, বিষয়াসক্তি, ও কাম ক্রোধাদির পরিত্যাগ করার নাম মনঃ শুদ্ধি।

দেশ—নদী তীর, নিরুপদ্রব অরণ্য ও বিজন গৃহ ইত্যাদি।

কাল—উষঃ কাল, সন্ধ্যা কাল ও তদতিরিক্ত মনঃ স্থৈর্য্য কর কাল।

পাত্র—গুরু, ধার্ম্মিক ব্যক্তি, অকুটিল হিতৈষি আত্মজ্ঞ ব্যক্তি।

সঙ্কল্প ত্যাগ—বাসনা ত্যাগ ও মানস কর্ম্মের পরিত্যাগ।

ইন্দ্রিয় সংযম—উদ্দাম হস্তীর ন্যায় স্ববিষয়ে ধাবমান ইন্দ্রিয়কে তত্তৎ বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করা।

ব্রতচর্য্যা—অহিংসা, পূর্ব্বোক্ত আহার সংযমাদি-নিয়ম রক্ষা করা, দয়া, দাক্ষিণ্য, মৈত্রীভাব, ও পাপ-ক্ষয়কারী কৃচ্ছ্র ব্রতাদি।

সার্ব্বভৌমত্ব—সকল দেশে,সকল কালে,সর্ব্বথা ঐ নিয়ম প্রতিপালন করা,এক দিন বা দুদিন করিলে হইবে না।

গুরু সেবা—গুরুর অভিমত কার্য্য করণ। গুরু সন্তুষ্ট হইলে তিনি মন খুলিয়া উপদেশ দিবেন।

দুঃখ অত্যন্ত অসহ্য হইবে—তখন 'কিসে তাহার পরিহার হয়' তাহার চেষ্টা জন্মিবে। যখন ঈদৃশ চেষ্টা বলবতী হইবে, তখন সেই তপঃসম্পন্ন শ্রদ্ধাবান্ দুঃখ-জিহীর্ষু উপায় জিজ্ঞাসু আস্তিক পুরুষ, প্রকৃতি বা আত্ম সাক্ষাৎকারের যথার্থ অধিকারী হইবেন। এই অধিকারীর প্রতি প্রকৃতি-উপদেশ ও তাহার জিজ্ঞাসা বিফল হইবার নহে। নচেৎ, এখন অর্থাৎ এই অনধিকারী অবস্থায় শত সহস্র উপদেশ লাভ ও শত সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহার ছায়া স্পর্শও করিতে পারিবে না।

অধিকারী ব্যক্তি যে প্রকৃতি সাক্ষাৎকার করিবে—সে কি উপায়ে? ঘট পটাদি বহিঃপদার্থের ন্যায় কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা? কি অন্য কোন উপায় দ্বারা?—

প্রকৃতিবাদী সাংখ্যকার বলেন, প্রকৃতি ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের বিষয় নহে। প্রকৃতি বা আত্ম-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত তিনটি মাত্র উপায় নির্দ্ধারিত আছে। সে উপায় এই—

"শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥"

শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসন। প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সকল আপ্ত বাক্য অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নির্দ্দোষ বাক্য আছে, তৎসমুদায়ের অর্থ ধারণা শ্রবণ। অবধৃত-অর্থকে শ্রবণ-অনুকূল যুক্তি দ্বারা নির্ম্মল ও দৃঢ়ীকরণ, মনন। সেই দৃঢ়ীকৃত অর্থের নিরন্তর অনুধ্যান—নিদিধ্যাসন করার নাম তত্ত্বাভ্যাস। এবংবিধ তত্ত্বাভ্যাস বহুবার করিতে করিতে চিত্তের জড়ত্ব বিনাশ হয়, গুরুত্ব ধ্বংশ হয়, সত্ত্বোৎকর্ষ অর্থাং মনের প্রকাশ শক্তির বৃদ্ধি পায়। তখন তাহার অন্তরে সেই দুরন্ধ সূক্ষ্ম বস্তুটি নির্ম্মল আদর্শে (অনুবীক্ষণ কাচে) সূক্ষ্ম বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রকাশের ন্যায় প্রকাশ পায়। তৈল কণা নির্ম্মল তরল জলে নিপতিত হইলেই তাহা প্রসর্পিত হইয়া সমস্ত জল ব্যাপিয়া থাকে, কিন্তু কর্দ্দমিল গাঢ় জলে নিপতিত হইলে তাহা কখনই প্রসর্পিত হয় না।

প্রকৃতি জ্ঞানের নিমিত্ত যে সকল আপ্ত বক্য ও যুক্তি অবধারিত আছে, সে সকল কি রূপ?—

ইহা প্রষ্টব্য বটে, বক্তব্যও বটে, কিন্তু আমরা এ বিষয়েও বহু আড়ম্বর করিব না। দু পাঁচটি বাক্য ও দুই একটি যুক্তি বলিয়াই ক্ষান্ত হইব। তন্মধ্যে অগ্রে আপ্ত বাক্য গুলি প্রকাশ করাই বিধেয়।

আপ্ত বাক্য।

"নেদমমূলম্ভবতি"—"সন্মূলাঃ সৌম্যেমাঃ প্রজাঃ"—জায়মান পদার্থকে প্রজা বলে। যাহা জন্মে, তাহার মূল অর্থাৎ উপাদান কারণ থাকে। জগৎও জায়মান সুতরাং জগতেরও মূল আছে।

সে মূল কি?—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ"—সে মূল সংহত তিনটি দ্রব্য। 'লোহিত' রজঃ, 'শুক্ল' সত্ত্ব, 'কৃষ্ণ' তমঃ,—সম্মিলিত এই তিনটি দ্রব্য হইতেই এই অসংখ্য প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন পিতা মাতার গুণ পুত্রে অনুক্রান্ত হয়, তেমনি তদুৎপন্ন পদার্থে তদীয় গুণ সমস্ত অনুগত আছে।

"সত্ত্ব-রজ-স্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"—

সত্ত্ব নামক, রজো নামক, তমো নামক দ্রব্যত্রয়ের সাম্যাবস্থা অর্থাৎ উক্ত দ্রব্যত্রয় যখন সমভাবে বা অন্যূনাতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করে, তখন তাহার নাম প্রকৃতি, প্রধান, অকার্য্যাবস্থা, বীজাবস্থা, ইত্যাদি;—আর যখন ন্যূনাধিকভাব ঘটনা হয়, একটি অবয়ব প্রবৃদ্ধ হইয়া অন্য অবয়বকে অভিভূত করে, তখন হইতেই তাহার পরিণাম হওয়া আরম্ভ হয়। তখন হইতেই তাহার ভিন্ন ভিন্ন নাম ঘটনা হয়। প্রথম পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব, দ্বিতীয়

পরিণামের নাম অহংতত্ত্ব, তৃতীয় পরিণামের নাম ইন্দ্রিয় ও পরমাণু, চতুর্থ পরিণাম এই বর্ত্তমান জগৎ। অতএব আর বিশিষ্ট পরিণাম আছে কি না—যদি থাকে, তবে সে পরিণামের ফল কি ?—কে বলিতে পারে। নিপুণ হইয়া লিখন ভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে কপিলের অভিপ্রায় এই রূপ বোধ হয় যে, এতদপেক্ষা আর বিশিষ্ট পরিণাম নাই। অর্থাৎ, জগতের পরিবর্ত্তে কোন নূতন তত্ত্ব আগমন করিবে না। তবে কিনা ইহার সামান্য পরিণাম আছে—যাহা এখনও চলিতেছে। এই সামান্য পরিণামের ফল জগতের জীর্ণ ভাব হওয়া। সেই জীর্ণতার সমাপ্তিতে আবার সেই সাম্যাবস্থা। ফলত,

"সত্ত্বং রজস্তম ইতি এষৈব প্রকৃতিঃ সদা।"

সত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই সম্মিলিত তিন্‌টি দ্রব্য বা তিন্‌টি অবয়ব যুক্ত একটি দ্রব্যের নামই প্রকৃতি (২)। ইনি সদা-কাল আছেন, অর্থাৎ কোন কালে ইহাঁর অভাব নাই। সূক্ষ্মতম বীজ হইতে যেমন ফল পত্রাদি সম্পন্ন প্রকাণ্ড মহীরুহ জন্মে, তেমনি এই প্রকৃতি হইতে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড জন্মিয়াছে (৩)। ইনি চিরনিত্য (অর্থাৎ কোন কালে ইহাঁর নাশ নাই), ব্যাপক (কোন প্রদেশে ইহাঁর অভাব নাই), পরিণামশীল (পরিণত না হইয়া ইনি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না), সূক্ষ্ম (পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্র নহেন, ইন্দ্রিয়ের অগোচর মাত্র), জড় (চৈতন্য পদার্থের বিপরীত), আত্ম-চৈতন্যের সান্নিধ্য বা স্বভাব বশতঃ প্রবৃত্তিশীল ইত্যাদি।

যুক্তি।

প্রকৃতির নিম্ন পরিণাম অর্থাৎ বর্ত্তমান জগদবস্থায় প্রত্যেক কার্য্য কারণ ভাব পরীক্ষা করিলে তন্মধ্য হইতে চারিটি সত্য লাভ হয়। প্রথম,—কারণ দ্রব্যের যে কিছু গুণ, তৎসমস্ত কার্য্য দ্রব্যে সংক্রান্ত হওয়া (৪),

(২) সত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন্‌টি যদি দ্রব্য হইল, তবে উহাকে গুণ অর্থাৎ সত্ব গুণ, রজো গুণ, তমো গুণ বলে কেন ?—উহার কারণ এই যে শাস্ত্রকারেরা উপকরণ দ্রব্যকে গুণ বা অঙ্গ বলিয়া থাকেন। প্রকৃতি ও আত্মার সুখ দুঃখের উপকরণ, দ্রব্য। এবং যে দ্রব্য বন্ধ মোক্ষণের সাধন, তাহাও গুণ শব্দের বাচ্য। প্রকৃতিও ত্রি-তন্তু রজ্জুর ন্যায় আত্মার বন্ধন মোক্ষের সাধন দ্রব্য; সুতরাং উহার গুণ নাম দিবার বাধা নাই।

(৩) ন্যায়, বৈশেষিক, বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক প্রভৃতি দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভুতগ্রাম অর্থাৎ চতুর্বিধ পরমাণুকে (পার্থিব, তৈজস, বায়বীয় ও আপ্য) জগতের মূল কল্পনা করেন। কপিল তাহা না করিয়া সত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই দ্রব্যত্রয়কে মূল উপাদান স্বীকার করেন। পরমাণু সকল চতুর্থ বিকার অর্থাৎ প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহঙ্কার তত্ব, তৎপরে তন্মাত্রা অর্থাৎ পরমাণু। এই পরমাণু মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি সূক্ষ্ম জগতের কারণ নহে, তবে নদ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি স্থূল কার্য্যের কারণ বটে। এই জন্যই পরমাণুর মৌলিকত্ব পক্ষ বুঝান সহজ, আর প্রকৃতির মৌলিকত্ব পক্ষ অসহজ।

কপিলের মতে পরমাণু সকল চির নিত্য নহে। মন ও ইন্দ্রিয়ও চিরনিত্য নহে (ইহা স্বতন্ত্র স্থানে প্রতিপাদিত হইবে) এক সময়ে না এক সময়ে ইহারদের বিনাশ হইবে। যদি বিনাশই হয়, তবে বিনাশ ক্রমের নিমিত্ত ইহাদেরও কারণ থাকা উচিত। যেহেতু, এমতে কার্য্যের কারণ দ্রব্যে বিলীন হওয়ার নাম বিনাশ। বিশেষত, পরমাণু সকলের সত্তা-সিদ্ধি বুদ্ধির অধীন; অতএব পরমাণু ও বুদ্ধি, এতদুভয়ের পিতা পুত্র সম্বন্ধ; সুতরাং পরমাণু আদি কারণ হইতে পারে না। কপিলের এই স্থানটী লক্ষ্য করিলে বোধ হয় কপিল কতকটা বিজ্ঞানবাদী ছিলেন।

(৪) "যেন বিনা যন্ন ভবতি তত্তস্য কারণম্" যে ব্যতিরেকে যে আত্ম-লাভ করিতে পারে না, সে তাহার নিমিত্ত বা কারণ। এই লক্ষণ অনুসারে সকলেই সকলের কারণ হইয়া উঠে, এজন্য উহার মধ্যে আবার কতকগুলি বাদ আছে। কুম্ভকারের পিতা কুম্ভকারকে জন্ম দিয়াছিল, গর্দ্দভ মৃত্তিকা বহন করিয়াছিল, ইত্যাদি পরম্পরা সম্বন্ধ বা দূর সম্বন্ধ সকল পরিত্যক্ত আছে। নিকট সম্বন্ধের মধ্যে কতকগুলি কর্ত্তা, কর্ম্ম, অধিকরণ নামে ব্যবহার করা হয়। ঘনিষ্ঠতা অনুসারে অবশিষ্ট থাকে দুইটি। একটির নাম নিমিত্ত কারণ, আর একটির নাম উপাদান কারণ। যে কারণ দ্রব্য কার্য্যে অনু-

যেমন মৃত্তিকার সমস্ত গুণ গুলি তদুৎপন্ন ঘটে সংক্রান্ত থাকে। দ্বিতীয়, —যে যখন বি-নষ্ট হয়, সে তখন স্ব-কারণে বিলীন হয়। মনে কর, একটি দীপ-শিখা নির্ব্বাণ করিলে, কিন্তু সেই শিখাকার অগ্নিটি কোথায় গেল? না অগ্নি প্রজ্বলনের কারণ যে বায়ু, সে তাহা-তেই বিলীন হইল (অর্থাৎ বায়ু ভাবাপন্ন হইল) তৃতীয়,—কার্য্য অপেক্ষা কারণের সূক্ষ্মতা থাকে। যথা, বৃহত্তম ন্যগ্রোধ বৃক্ষের কারণ তদপেক্ষা বহু সূক্ষ্ম। চতুর্থ, —কার্য্য আপনার কারণকে ক্রোড়ীকৃত করিতে পারে না, কিন্তু কারণ তাহা পারে। যেমন ঘট যাবৎমৃত্তিকা ব্যাপিতে পারে না, কিন্তু মৃত্তিকা সমস্ত ঘট ব্যাপিতে পারে। এই নিয়মিত সত্য চতুষ্টয় হইতে প্রকৃতি-জ্ঞানের উপযুক্ত যুক্তি জন্ম লাভ করে।

এখন বিবেচনা কর, কার্য্য প্রণালী দ্বিবিধ। এক ভৌতিক কার্য্য, দ্বিতীয় জৈবিক কার্য্য। ভূত সকলের উপচয় অপচয়, প্রবেশ অপ্র-বেশ ও সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি গুণ-পরি-ণাম দ্বারা যে সকল কার্য্য (জন্য বস্তু) উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ভৌতিক কার্য্য। যথা নদ, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, ওষধি প্রভৃতি। (এই ভৌতিক কার্য্যকে আমরা প্রাকৃতিক কার্য্যও বলি, যেহেতু পঞ্চবিধ মহাভূতই এক্ষণকার প্রকৃতি)। আর, যাহা আমরা করি, সে সমস্ত জৈবিক কার্য্য। যথা, ঘট, পট, গৃহ, কুড্য, অট্টালিকা, উদ্যান প্রভৃতি। বিবেচনা করিয়া দেখ, এই উভয়বিধ কার্য্যেরই মূল পঞ্চবিধ মহাভূত বা স্থূল ভূত। এক্ষণকার সমস্ত পৃথিবী, সমস্ত জল, সমষ্টি তেজ, সমষ্টি বায়ু, আর সমুদায় আকাশ, —ইহাদিগকে মহা ভূত বলে ও স্থূল ভূতও বলে। এই স্থূল ভূ-তের উপাদান সূক্ষ্ম ভূত; যেহেতু সূক্ষ্ম ভূত সকল সংহত হইলেই স্থূলতার উৎপত্তি করে। মনে কর, যেন উক্ত দ্বিবিধ কার্য্য ধ্বংস হইয়াছে—প্রণালীও রুদ্ধ হইয়াছে—স্থূল ভূত সকল আর কার্য্য উৎপাদন করে না। তাহা হইলে থাকে কি? না জগতের বিচিত্রতা ঘুচিয়া গিয়া কেবল মহাভূত কয়ে-কৃটিই থাকে। মনে কর তাহারও স্থূলত্ব বিনাশ হইল; থাকিল কি? না কতকগুলি সূক্ষ্ম ভূত। এই সূক্ষ্ম ভূতের নামান্তর তন্মাত্র ও পরমাণু। এ পর্য্যন্ত কাহারো বিবাদ নাই, বুদ্ধ্যারোহ না হইবারও কারণ নাই। কিন্তু অতঃপরই সূক্ষ্ম ভূতের মূল চিন্তা, —এই খানেই অমার্জিত বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়। যাহাই হউক, আমরা তত্ত্ব চিন্তকদিগের মত মাত্র কহিয়া ক্ষান্ত হইব।

তত্ত্ব-চিন্তকেরা বলেন, যাহার সত্তা বা অস্তিত্ব যাহার অধীন, সে তাহার কারণ। ঘটের সত্তা মৃত্তিকার অধীন, অগ্নি প্রজ্বলন বায়ুর অধীন। মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট কো-থায়?—বায়ু ব্যতিরেকে অগ্নি-প্রজ্বলনইবা কোথায়?—অতএব ঘটের ও অগ্নি-প্রজ্বলনের কারণ মৃত্তিকা ও বায়ুঃ। এই দৃষ্টান্তে, উক্ত নিয়মানুসারে, পরমাণুর কারণ বুদ্ধিঃ; যেহেতু পরমাণুর অস্তিত্ব বা সত্তা-সিদ্ধি বুদ্ধির অধীন। বুদ্ধি না থাকিলে কোথায় বা পরমাণু!!—কোথায় বা তাহার অস্তিত্ব!!—অপিচ, চক্ষু-রাদি বহিরিন্দ্রিয়ের সহিত পরমাণুর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। সুতরাং পরমাণু সকল ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানের অধীন নহে। পরমাণু সকল মনন-নিষ্পন্ন বুদ্ধিরই অধীন। সুতরাং মনন-

গত থাকে, অর্থাৎ যাহা বিকৃত হইয়া কার্য্য নাম প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম উপাদান। যেমন কুণ্ডলের উপাদান সুবর্ণ। আর যে দ্রব্য কার্য্যে অন্বিত থাকে না, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে। এতদ্ভিন্ন সহকারী কারণ নামক আর এক প্রকার কারণ আছে। কারণের গুণ কার্য্যে সংক্রান্ত হওয়া, বিনাশ কালে কার্য্যের কারণ দ্রব্যে লুক্কায়িত হওয়া—ইত্যাদি যে কিছু নিয়মের উল্লেখ করা হইয়াছে বা হইতেছে, সে সমস্তই ঐ উপাদান কারণ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

বৃত্তিক দ্রব্যই উহাদের উপাদান। এই মনন-বৃত্তিক দ্রব্য সকল জীবেরই অন্তরে আছে। তাহার নামান্তর অহঙ্কার। 'অহং' 'মম'—'আমি' 'আমার'—ইত্যাদি জৈবিক অন্তরের ভাব বিশেষ সেই অহং নামক দ্রব্যের পরিণাম। যদি সমুদায় অহং দ্রব্য একত্র হয়, তবে তাহার তত্ত্ব সংজ্ঞা হয়। এই অহঙ্কার তত্ত্ব এত ব্যাপক যে তাহার কিয়দংশ-মাত্র স্বরূপে থাকিয়া সমস্ত আত্মার সহিত ক্রীড়া করিতেছে, অবশিষ্ট অংশ বিকৃত হইয়া অসংখ্য ভূত গ্রাম ও একাদশবিধ অনন্ত ইন্দ্রিয় হইয়াছে।

এতাদৃশ অহঙ্কার তত্ত্বেরও মূল থাকা অনুভব হয়। যেহেতু ঐ অহঙ্কারের অন্তর্গর্ভে,—মূলে, বৃত্ত্যুদয়ের পূর্ব্বে, নিশ্চয়াত্মিকা অপর এক বৃত্তি থাকা দৃষ্ট হয়। সেই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি যে দ্রব্যের পরিণাম,—তাহার নাম বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব। এই মহত্তত্ত্ব যাবৎ বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের বীজ। পৌরাণিক পণ্ডিতেরা এই সমষ্টিভূত বুদ্ধি তত্ত্বকে ব্রহ্মা ও হিরণ্যগর্ভ নামে বর্ণনা করেন। (সাংখ্য মতে বুদ্ধি ও চৈতন্য এই দুইটি ভিন্ন পদার্থ। ইহা পশ্চাৎ প্রতিপাদিত হইবে)। এই ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভেরও ক্ষয়োদয় থাকা লক্ষ্য হয়, সুতরাং ইহারও মূল আছে। সেই মূল প্রকৃতি। এই স্থানেই মূল কল্পনার বিশ্রাম। অতঃপর মূল কল্পনা করা দোষ, সে দোষের নাম অপ্রামাণিক—অনবস্থা (৫)।

পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে, ভৌতিক কার্য্য অপেক্ষা ভূত সকল ব্যাপক ও সূক্ষ্ম,—স্থূল ভূত অপেক্ষা সূক্ষ্ম ভূত সকল ব্যাপক ও সূক্ষ্ম,—সূক্ষ্ম ভূত ও ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অহঙ্কার তত্ত্ব ব্যাপক ও সূক্ষ্ম,—অহং তত্ত্ব অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব,—মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা মূল প্রকৃতি(৬)। প্রকৃতির ব্যাপকত্বের সীমা নাই, সূক্ষ্মতারও দৃষ্টান্ত নাই। প্রকৃতির ব্যাপকতাকে শাস্ত্রকারেরা পূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্ব মূর্ত্ত সংযোগী প্রভৃতি নামে ব্যবহার করেন। সূক্ষ্মতাকে ইন্দ্রিয় মাত্রের অগোচর বলিয়া থাকেন, সে সূক্ষ্মতা পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্রতা অনুসারে নহে।

কারণ মাত্রই যে সূক্ষ্ম হয়, তাহার হেতু কেবল কার্য্য সকল কারণ দ্রব্যে শক্তিরূপে লুক্কায়িত থাকা। ছান্দোগ্য ষষ্ঠাধ্যায়ে এই ভাবের একটি আখ্যায়িকা আছে। তাহার মর্ম্মাংশ এই রূপ,—

উদ্দালক নামে ঋষি, শ্বেতকেতু নামক পুত্রকে তত্ত্বজ্ঞ করিবার নিমিত্ত, ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তিমান্—কারণের কারণ—ইন্দ্রিয় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না—তাঁহা হইতেই এই প্রকাণ্ড বিশ্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে,—ইত্যাদি প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। শ্বেতকেতু বালক, অমার্জ্জিত বুদ্ধি, সুতরাং সে, সেই ভাব হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। উদ্দালক তাহার জ্ঞান সম্ভাবনার নিমিত্ত লৌকিক দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। একদা, সম্মুখে এক বৃহত্তম ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া শ্বেতকেতুকে কহিলেন "বৎস! সম্মুখস্থ ঐ বৃহত্তম বৃক্ষের একটি ফল আহরণ কর"—

শ্বেতকেতু আনিলেন।

উদ্দালক কহিলেন "ভিন্দি" উহা ভাঙ্গ—

(৫) "ক্ষিত্যম্বুরাদীনাং গো-ঘটাদীনাঞ্চ ন তত্ত্বান্তরতা" "স্থূলাৎ পঞ্চতন্মাত্রস্য" "বাহ্যাভ্যন্তরাভ্যাং তৈশ্চাহঙ্কারস্য" "তেনান্তঃকরণস্য" "ততঃ প্রকৃতেঃ"—ইত্যাদি সূত্র হইতে এই সকল মর্ম্ম পাওয়া যায়।

(৬) পুরাণে বর্ণিত আছে, ভূমি অপেক্ষা দশ গুণ অধিক জল,—জল অপেক্ষা দশ গুণ অধিক তেজ,—তেজ অপেক্ষা দশ গুণ অধিক বায়ু,—বায়ু অপেক্ষা অনন্ত গুণ অধিক আকাশ,—এই আকাশ প্রকৃতির উদরে অবস্থান করিতেছে।

শ্বেতকেতু ভাঙ্গিলেন।

উদ্দালক কহিলেন "কিং নিভালয়সে?" কি দেখিতে পাও?—

শ্বেতকেতু কহিলেন "অতি সূক্ষ্ম বট বীজ।"

উদ্দালক কহিলেন "উহার একটি ভাঙ্গ"—

শ্বেতকেতু পুনশ্চ ভাঙ্গিলেন।

উদ্দালক এবারও জিজ্ঞাসা করিলেন "কি দেখিতে পাও!" শ্বেতকতু এবার তন্মধ্যে অন্য কিছু না দেখিয়া কহিলেন "কিছুই না" উদ্দালক কহিলেন "কিছু না নয়,—আছে"—সম্মুখস্থ ঐ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ সদৃশ একটি বৃক্ষ উহার মধ্যে আছে, তুমি দেখিতে পাইতেছ না। বৎস! তুমি যাহাকে বীজ বলিতেছ, কালে উহাই বৃহত্তম বৃক্ষের আকার ধারণ করিবে।

দেখা যায় না বলিয়া অবিশ্বাস করা অনর্থের মুল এবং এক উপায়ে যাহা নির্ণীত না হয়, তাহা ভিন্ন উপায়ে নির্ণীত হইতে পারে, এই প্রত্যয় জন্মাইবার নিমিত্ত এক দিন এক খণ্ড সৈন্ধব লইয়া কহিলেন "বৎস! এই লবণ খণ্ড এক উদক পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া রাখ—কাল প্রাতে লইয়া আইস"—

শ্বেতকেতু তাহাই করিলেন। উদ্দালক অনুমতি করিলেন, "উদক হইতে লবণ খণ্ড আহরণ কর" শ্বেতকেতু দেখিলেন লবণ খণ্ড নাই, সুতরাং কহিলেন "লবণ খণ্ড নাই" উদ্দালক কহিলেন "আছে—তুমি দেখিতে পাইতেছ না"। শ্বেতকেতু কহিলেন "যদি থাকে, তবে দেখিতে পাইতাম!"—উদ্দালক কহিলেন "এই জগতের অনেক বস্তুই চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু তাহা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে জানা যায়। তুমি ঐ জলে আচমন কর, লবণ আছে কি না, জিহ্বা দ্বারা বুঝিতে পারিবে।" শ্বেতকেতু তখন বুঝিতে পারিলেন যে "লবণ আছে"।

অতএব, প্রকৃতির সূক্ষ্মতা, ব্যাপকত্ব বা সদ্ভাব অবগত হইবার নিমিত্ত যোগ-বল ও সাধন-সম্পৎ আসাদন করা চাই, নচেৎ ইচ্ছা করিলেও হইবে না, সহজ জ্ঞানেও হইবে না।

ইংরাজী সভ্যতা বিষয়ে ইংরাজদিগের মত।

যে অবস্থাতে লোকদিগকে উপজিবীকার জন্য অপরিমিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম না করিতে হইয়া তাহারা চিত্তের প্রশান্ততা রক্ষা পূর্ব্বক জ্ঞানচর্চ্চায় ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে অধিক কাল যাপন করিতে পারে,সেই প্রকৃত সভ্যাবস্থা। আমরা এই পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় উল্লেখ করিয়াছি যে ভূমণ্ডলে এখনও সেই প্রকৃত সভ্যতার অবস্থা উদিত হয় নাই। ইংলণ্ড দেশের বর্ত্তমান সভ্যতা প্রকৃত সভ্যতা নহে। এ বিষয়ে ইংরাজদিগের মত অধিকতর প্রামাণিক হইবে বলিয়া এক জন ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তা এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"আমাদিগের জাতির বর্ত্তমান বিশেষ অবস্থা ধন ও পদ লোভ বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ অনুকূল। আমরা জাতীয় শৈশবাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ না হইতে হইতেই এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য এবং অসাধারণ জাতীয় সমৃদ্ধি লাভ করিতেছি। যখন এত করিবার বিষয়, এত আশার বিষয় রহিয়াছে, তখন প্রত্যেকেই কিছু করিবার বিষয় প্রাপ্ত হয়েন, সকলেই ভাবী সৌভাগ্যের শোভন দিবাস্বপ্ন দেখেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার গুরুত্ব বোধে স্ফীত হয়েন। উন্নতির ক্ষেত্র সকলের সম্বন্ধে অরুদ্ধ। আমাদিগের প্রজা-তন্ত্রীয় ব্যবস্থা সকল অত্যন্ত সামান্য ব্যক্তিকেও আমাদিগের সমাজের উচ্চতম পদের অনুসরণে প্রবৃত্ত

করে। এই নিমিত্ত ধন ও পদ লোভের হত-ভাগ্য সন্তান অশান্তি রূপ দৈত্য আমাদিগের সকলেরই সঙ্গ লইয়া আমাদিগের হৃদয়কে অসন্তোষ দ্বারা উদ্বেল করিতেছে এবং আমাদিগের সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন জন্য প্রাণ ক্ষয়কারী উদ্বেগ দ্বারা আমাদিগের মনকে নিরন্তর ক্ষত বিক্ষত করিতেছে। ভৃত্য ভৃত্যের পদে অসন্তুষ্ট, তাহার নিজ কর্ম্মে মন নাই, সে উহা অপেক্ষা অল্প-নীচ পদের জন্য লালায়িত। এই রূপ কি শিল্পী, কি বণিক, কি উচ্চতর বৃত্তির লোক, সকল অবস্থার লোকই সমান রূপে অস্থির। সকলেই বর্ত্তমান পদ অপেক্ষা উচ্চতর পদ লাভ জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে ও বর্ত্তমান পথে যে সকল অনায়াস-লভ্য সুখদ ফল পুষ্প রহিয়াছে, তাহা অবজ্ঞা করিয়া ক্রমাগত কোন কল্পিত অবস্থার দিকে দৌড়িতেছে এবং উদ্বিগ্ন চিত্তে তাহার অনুসরণ করিতেছে। সকলেই এই রূপ ব্যস্ত থাকে যে পর্য্যন্ত না মৃত্যু আসিয়া তাহাদিগের শান্তিশূন্য আত্মাকে সেই নিদ্রাকর ঔষধ প্রয়োগ করে, যাহা কেবল নিশ্চয় রূপে তাহাকে আরাম প্রদান করিতে পারে। আমাদের ইহা অস্বীকার করিবার অভিপ্রায় নহে যে অন্যান্য দেশের লোকেরা অল্প অথবা অধিক পরিমাণে লোভের বশীভূত এবং আপনাদিগের ধন বৃদ্ধি করিবার জন্য ইচ্ছুক কিন্তু উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা উল্লিখিত কারণ বশতঃ যেমন আমাদের সম্বন্ধে খাটে, এমন অন্যান্য জাতির সম্বন্ধে খাটে না। যে জাতির অবস্থা লোভ বৃদ্ধির প্রতি এতদ্রূপ অনুকূল, তাহারাই আবার আমাদিগকে সাংসারিক অবস্থার মহা ও আকস্মিক পরিবর্ত্তনের বিশেষ অধীন করে। এই সকল আকস্মিক পরিবর্ত্তন মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতিশয় অনিষ্ট জনক।

"আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে আমাদিগের সকলের চেষ্টার বিষয় অর্থাৎ সুখ লাভ জন্য যত্নের কোন নির্দ্দিষ্ট ও উৎসাহ কর মনোরথ থাকা এবং তাহার জন্য মানসিক পরিশ্রম করা অত্যন্ত আবশ্যক কিন্তু যদ্যপি মনকে সময়ে সময়ে আবশ্যক মত বিশ্রাম করিতে ও নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিতে না দেওয়া যায়; যদ্যপি মনোরথ সকল অপ্রতিহত উদ্বেগ ও পরিশ্রমের সহিত সাধিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় রূপে আমরা জীবনের লক্ষ্য অর্থাৎ সুখ হইতে বঞ্চিত হইব। এ সন্দেহ কি যুক্তিযুক্ত নহে যে আমাদিগের পৌরজনেরা ধন ও পদের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া এবং বিষয় কার্য্যে অবিশ্রান্ত ব্যাপৃত থাকিয়া সুখের প্রকৃত পথ হারাইতেছেন? সুখের উপায়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত থাকা প্রযুক্ত সুখ কি তাঁহাদিগের অন্তর্দৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইতেছে না? চিত্তপ্রশান্ততা যাহা সকল পার্থিব মঙ্গল অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তাহা ইংরাজ জাতি দ্বারা অল্প পরিমাণে প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

"নেপেল্‌স নগরের রাজমার্গে ভ্রমণ কালীন যখন দেখিলাম তথাকার অর্দ্ধনগ্ন ও গৃহহীন অলস ভিক্ষুকেরা আলস্য-পূর্ণ সন্তোষে তাহাদের অপূর্ব্ব দেশের প্রফুল্লকর রৌদ্র পোহাইতেছে, কিম্বা অনিশ্চিত বদান্যতা প্রদত্ত সঙ্কীর্ণ এবং সামান্য আহার অত্যন্ত রুচি পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। যখন তাহাদিগের আহ্লাদ-পূর্ণ মুখ-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিলাম এবং তাহাদিগের হাস্য পরিহাস শ্রবণ করিলাম ও মনে করিলাম আমাদের সম্পন্নাবস্থ পৌরজনেরা কি ব্যস্ততার সহিত পদ নিক্ষেপ করেন এবং নিরন্তর উদ্বেগ বশতঃ তাঁহাদিগের মুখশ্রী কি বিশীর্ণ—সুখাদ্য পরিপূরিত মেজের নিকট একবার মাত্র বসিয়া সেই সকল খাদ্য চর্ব্বন, এমন কি আস্বাদন না

করিয়াও উঠিয়া যান ও নিরন্তর অর্থ লোভ রূপ ভূতগ্রস্ত হইয়া ইতস্ততঃ বেড়ান, তখন এই প্রশ্ন আমার মনে সহসা উদিত হইল যে এই সকল প্রমাদী ভিক্ষুক অপেক্ষা আমরা আমাদিগের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য অর্থাৎ সুখের কি যথার্থ অধিকতর নিকটবর্ত্তী? এবং ইহা কি অসম্ভব যে পরিশেষে যখন সকলে শেষ গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবে, তখন হিসাব করিয়া দেখিলে ভিক্ষুকের সম্বন্ধে অধিক লাভ দাঁড়াইবে? অসন্তোষ চিত্ত যে দুঃখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়, তাহার সহিত শীত ও ক্ষুধা নিবন্ধন ভিক্ষুকের সাময়িক কষ্ট তুলনাই হইতে পারে না।

বাণিজ্য সম্বন্ধীয় অসমসাহসিক মৎলব সকল যাহা আমাদিগের মধ্যে সচরাচর পোষিত হইতে দেখা যায় এবং যাহা মনের শান্তি ও শরীরের স্বাস্থ্য একেবারে বিনাশ করে, তাহা অনেক পরিমাণে উল্লিখিত ধন লোভ হইতে সমুদ্ভূত হইতে থাকে। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় এই রূপ অসমসাহসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হওয়া এক প্রকার জুয়াখেলা। সামান্য জুয়াখেলা যাহা ধর্ম্ম-নীতির নিয়মানুসারে এতদ্রূপ গাঢ় কলঙ্কের কারণ, তাহা অপেক্ষা এই বাণিজ্য সম্বন্ধীয় জুয়াখেলা আরো বিস্তীর্ণ রূপে অনিষ্টকর। সামান্য জোয়ারী কেবল নিজের ধন নাশ করে কিন্তু একস্‌চেঞ্জের জোয়ারী শুদ্ধ আপনার ধন নয়—যাঁহারা তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় স্বীয় অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছে, তাহাদিগেরও ধন নাশ করেন; তিনি দেউলে হইলে তাঁহার সমস্ত জ্ঞাতিবর্গ ও বন্ধুবর্গ দেউলে হইয়া যায় কিন্তু আশ্চর্য্য সমাজের নিয়ম যে সামান্য জোয়ারী ভদ্র-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয় কিন্তু বাণিজ্যের জোয়ারী সম্মানিত, আদৃত হয় এবং সামাজিক ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উচ্চ উচ্চ পদ লাভ করে।

প্রকৃত সুখ দরিদ্রতা অথবা ঐশ্বর্য্য উভয় প্রান্ত হইতে সমান দূরে অবস্থিতি করে এবং স্বাস্থ্য ও প্রকৃত ভোগ মধ্যম পথে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সত্যের উপদেশ প্রাচীন ও অধুনাতন কালের জ্ঞানীরা সচরাচর রূপে যেমন দিয়া থাকেন, এমন অন্য কোন সত্যের উপদেশ দেন না, অথচ বোধ হয় এমন অন্য কোন সত্য নাই যাহা সাধারণ লোকে কাজের সময় এতদ্রূপ অল্প অবজ্ঞা করিয়া থাকে*।”

নির্গুণ পূজা বিধি।

৩৮২ সংখ্যক পত্রিকার ৩৮ পৃষ্ঠার পর।

“নিরালম্বস্যোপবিত্বং পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ।
অঘ্রাণস্য কুতো ধূপশ্চক্ষুর্হীনস্য দীপকঃ॥”

যিনি নিরালম্ব,—ঈদৃশ প্রকাণ্ড বিশ্ব যাঁহার একাংশ অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে,—তাঁহার নিমিত্ত উপবীত কল্পনা করা বৃথা। কেন না, সামান্য কার্পাস সূত্র তাঁহার কোথায় অবলম্বিত হইবে?—তিনিই বা সূত্রাবলম্বিত কি প্রকারে হইবেন? ইন্দ্রিয়ের একটি নাম রুদ্র; কেন না ইন্দ্রিয়গণ স্বর্গ লোকের দেবতাদিগকেও রোদন করায়। অতএব দেবতাদিগের ইন্দ্রিয় আছে—বাসনা আছে—সুতরাং ইহলোকের কুসুমে তাঁহাদের স্পৃহাও আছে। যে দেবের বাসনা আছে, স্পৃহা আছে, সে দেবের নিমিত্ত কুসুমাহরণ করিতে হয়—কিন্তু যিনি নির্ব্বাসন অর্থাৎ যাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, বাসনা নাই, কোন লোকের কোন বস্তুতে স্পৃহা নাই, তাঁহার নিমিত্ত কুসুম সংগ্রহ করিতে হয় না। যাহাতে অস্মদাদির তুল্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অভাব আছে, অস্মদাদির সদৃশ চক্ষুর অভাব আছে, তাঁহার নিমিত্ত ধূপের প্রয়োজন কি? দীপের আয়োজনই বা কেন।—

Sweetser's Mental Hygiene. pp55-56.

"নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং তাম্বূলঞ্চ কুতঃ শুচঃ।
স্বয়ংপ্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনাবিধিঃ॥"

ভৌম জীবের ন্যায় স্বর্গ্য জীবের ক্ষুৎ-বোধ আছে। সুতরাং মানবগণের ন্যায় দেবগণ তদ্বিধ বিষয়ে অতৃপ্ত থাকেন। যদি তাহাই হয়,তবে স্বর্গ্য জীবের পূজায় রাশীকৃত নৈবেদ্যের উপযোগ হইতে পারে, কিন্তু যিনি নিত্য-তৃপ্ত; তৃপ্তিই যাঁহার স্বভাব; জীবভোগ্য কোন বস্তু যাঁহাকে মোহিত করিতে পারেনা;—তাঁহার নিমিত্ত নৈবেদ্য কল্পনা কেন?—অস্মদাদির ন্যায় যাঁহার মাংসল আস্য নাই—পার্থিব ভোগোপভোগ নাই—তন্নিমিত্ত মুখ-দৌর্গন্ধ্য বা মুখের অবিশুদ্ধি নাই—তাঁহার নিমিত্ত তাম্বূল কল্পনা কেন?—যিনি স্বয়ং প্রকাশ—"যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" যাঁহার প্রকাশে সকল প্রকাশ পাইতেছে—কি দিবা, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, কোন কালেই যাঁহার অপ্রকাশ নাই, তাঁহার প্রকাশ সাধনের নিমিত্ত নীরাজনার বিধান কি প্রকারে পর্য্যাপ্ত হইবে?

"প্রদক্ষিণমনন্তস্যাদ্বিতীয়স্য কুতো নতিঃ।
বেদবাচামবেদ্যস্য কুতস্তোত্রং বিধীয়তে॥"

সকলেই জানেন যে, পরিচ্ছিন্ন বস্তুকেই প্রদক্ষিণ করা যায়; কিন্তু যিনি অনন্ত; ব্রহ্ম লোক পর্য্যন্ত ভেদকারী মন যাঁহার ইয়ত্তাবধারণ করিতে সমর্থ হয় না; সেই পূর্ণ পদার্থকে প্রদক্ষিণ করার সম্ভাবনা কি?—আপনাতে অপকর্ষ বোধ উৎপাদন করার নাম প্রণাম; উহা তুল্য-জাতীয় দুই বা ততোধিক আত্মা হইলেই সম্ভব হয়; কিন্তু যে আত্মা অদ্বিতীয়; 'তুমি' 'আমি' 'এই' 'সেই' ইত্যাদি দ্বৈতভাব, যে এক মাত্র পূর্ণ আত্মায় কল্পিত হইয়াছে; সে আত্মার নিকট আবার কোন্ আত্মা আপন অপকর্ষতা উৎপাদন করিবে?—অসীম বেদ বাক্য যাঁহার মহিমা বর্ণনে অসমর্থ; সামন্য মনুষ্য-বাক্য কি তাঁহার মহিমা বর্ণন রূপ স্তোত্র নির্ম্মাণে সমর্থ হইতে পারে?

আর্য্য জাতির নীতি শাস্ত্র।

রাজনীতি প্রকরণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ হর্ষো মান-মদৌ তথা।
এতানতিশয়ান্রাজা শত্রূনিব বিশাতয়েৎ॥"

অতিশয় কাম, অতিশয় ক্রোধ, অতিশয় লোভ, অতিশয় হর্ষ, অতিশয় মান, অতিশয় মদ (হর্ষে নিমগ্ন) এই সকলকে রাজা শত্রুর ন্যায় নিপাত করিবেন অর্থাৎ কাম ক্রোধাদির সেবা করিবেন কিন্তু অতিশয়িত নহে।

"সেব্যাঃ কালেষু যুক্তেতে লোভগর্ব্বৌ বিবর্জ্জয়েৎ।
তেজ এব নৃপাণান্তু তীব্রং সূর্য্যস্য বৈ যথা॥"

রাজা কামাদির অতি-সেবা করিবেন না। যে যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিবেন, তাহা উপযুক্ত কালেই করিবেন এবং যুক্তি পূর্ব্বক করিবেন। উক্ত কামাদি ছয়টির মধ্যে যে লোভ ও গর্ব্ব, এতদুভয়কে একেবারে পরিত্যাগ করিবেন। তেজ রাজাদিগের সর্ব্বথা সূর্য্যবৎ অত্যাজ্য এবং তীব্র।

"তত্র গর্ব্বং রোগযুক্তকায়বত্তন্তু সংত্যজেৎ।
আখেটকাক্ষৌ স্ত্রীসেবা পানঞ্চৈবাত্মদূষণম্॥
বাক্‌দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যং সপ্তৈতানি বিবর্জ্জয়েৎ।
পরস্ত্রীষু বিরক্তাসু সেবামেকান্ততস্ত্যজেৎ॥"

গর্ব্বকে রোগযুক্ত শরীর জ্ঞান করিবেন, এবং যাহাতে গর্ব্বের সর্ব্বথা অনুদয় হয় এরূপ করিবেন। মৃগয়ায় আসক্তি, ক্রীড়ায় অভিনিবেশ, স্ত্রী জাতিতে অতি-রতি ও নিয়ত মদ্যপান, এই চারিটি রাজার আত্মাকে দূষিত করে এবং কর্কশ বাক্য ও কর্কশ দণ্ড প্রয়োগ, এই দুইটিও রাজাকে কলঙ্কিত করে। অতএব রাজা, দূষণাবহ গর্ব্ব, মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রী-সেবা, মদ্যপান, বাক্ পারুষ্য, দণ্ড পারুষ্য, এই সাতটি অবশ্য ত্যাগ করিবেন। অপিচ, পর স্ত্রী এবং বিরক্তা স্ত্রী একবারে পরিহার করিবেন।

"সতীষু নিজনারীষু প্রেম্না কুর্য্যাচ্চ সেবনং।
রতিপুত্রকলাদারাস্তাংস্তু নৈকান্ততস্ত্যজেৎ॥"

বিবাহিতা সতী স্ত্রীতে প্রীতি পূর্ব্বক উপগত হইবেন। রতি ও পুত্র, এই উভয়বিধ ফল-প্রদাত্রী ভার্য্যার ত্যাগ বিধেয় নহে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গৃহ-কর্ম্ম হইতে উদ্ধৃত।

ঈশ্বর।

ঈশ্বর এই বিচিত্র জগতের একমাত্র সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা; তিনিই আমাদের পিতা পাতা মুক্তিদাতা সকলই। আমরা তাঁহা হইতে দেহ মন আত্মা সকলই লাভ করিয়াছি, এখানে তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করিতেছি, প্রতিদিন তাঁহারই বিতরিত অন্ন পান লাভ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তেই জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া আত্মার প্রাণ পোষণ করিতেছি। লোকান্তরে অনন্ত কাল তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিব। তিনি যেমন আমাদিগের ইহলোকের পালয়িতা, তেমনি তিনি আবার আমাদের পরলোকেরও আশ্রয়দাতা। তিনি আমারদের চিরকালের শরণ্য—চিরকালের সুহৃৎ।

তিনিই জীবের সুখের জন্য, মঙ্গলের জন্য পৃথিবীকে এই অনুপম সুখের সজ্জায় সজ্জীভূত করিয়া দিয়াছেন। "তিনি লোক-ভঙ্গ নিবারণার্থে আপনি সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদায় ধারণ করিতেছেন।"

তিনি প্রীতি-নয়নে—স্নেহ-নয়নে নিয়তই এই সংসারকে সন্দর্শন করিতেছেন। তাঁহার সিংহাসন সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাঁহারই মহিমা সমুদায় সংসার প্রচার করিতেছে। এমন স্থান নাই, যেখানে সেই সর্ব্বব্যাপী বিশ্বতশ্চক্ষু পরমেশ্বর বিদ্যমান নাই। এমন কার্য্যই নাই, যাহা সেই অনন্ত-জ্ঞান পরমেশ্বর না জানিতেছেন। আমরা যেখানে থাকি, তাঁহারই সম্মুখে; যাহা বলি, যাহা করি তাঁহারই সাক্ষাতে। তিনি আলোক অন্ধকারে সমান রূপেই আমারদের হৃদয়ের প্রত্যেক গূঢ় কামনা সকল সহজে অতি সুন্দর রূপে অবগত হইতেছেন।

সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই এই জগতের প্রাণ, তিনিই কেবল আমারদের আত্মার একমাত্র জীবন। তাঁহা হইতেই আমারদিগের সুখ সম্পদ, বল বীর্য্য, জ্ঞান ধর্ম্ম সকলই। তাঁহারই করুণা শতধা বহুধা হইয়া পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী পত্নী সকলের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে—তাঁহারই প্রীতি সর্ব্বত্র বর্ষিত হইয়া বসুধাকে জীবন-যৌবনে সুখ-ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিতেছে।

তাঁহারই সত্তাতে সংসার আমাদের চক্ষে মধুর ভাবে বিচরণ করে, তাঁহারই সম্বন্ধে আমারদের নিকটে সকলেই আত্মীয়-রূপে প্রতীত হয়। যতক্ষণ তাঁহাকে আমরা আত্মস্থ দেখি, ততক্ষণ এই সংসার আমারদের গৃহ, এতন্নিবাসী জনগণ আমাদের নিকটে ভ্রাতৃভাবে বিরাজ করে। তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমারদের ধর্ম্ম-ভাব কর্ত্তব্য-ভাব সকলই তিরোহিত হইয়া এই জন-সমাজ অসম্বদ্ধ বালুকা রাশির ন্যায় বোধ হয়। তাঁহা হইতে বিচ্যুত হইলে হৃদয় শ্মশান-সমান—সংসার মরুভূমির ন্যায় নীরস হইয়া পড়ে।

তিনিই সকলের একমাত্র গৃহ-দেবতা, তিনিই সকলের নিত্য সেবনীয়—নিত্য পূজনীয় এবং নিত্য স্তবনীয় পরম উপাস্য হয়েন।

সেই অনাদ্যনন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া পাপ হইতে বিরত থাকিবে, কায়-মনোবাক্যে তাঁহাকে প্রীতি করিবে এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে যত্নশীল থাকিবে। গৃহধর্ম্ম এবং সামাজিক কর্ম্ম সকল তাঁহারই আদেশানুমত জানিয়া অবিরক্ত চিত্তে সম্পাদন করিবে।

পিতা মাতা।

পিতা মাতা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা (১) স্বরূপ। সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং পরম ধর্ম্ম। পিতা সংসারে ঈশ্বরের প্রতিনিধি স্বরূপ। পিতা হইতে আমরা বল বীর্য্য, জ্ঞান ধর্ম্ম, সমুদায়ই লাভ করি। পিতার অনুপম স্নেহ, অজস্র করুণার প্রতি নির্ভর করিয়াই আমরা জীবন-পথে অগ্রসর হই, পিতার অকৃত্রিম স্নেহ-ভাব নিষ্কাম প্রীতি-ভাব দেখিয়াই আমাদের পরম পিতার অলৌকিক বাৎসল্য-ভাব বুঝিতে পারি। এমন পিতাকে —এমন প্রত্যক্ষ দেবতাকে যে অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করে, তাহার ন্যায় কৃতঘ্ন আর দ্বিতীয় নাই। সে বিষম দুর্গতিতেই পতিত হয়।

পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া পুত্রের যার পর নাই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পিতা যদি আমারদিগকে সেই অসহায় অবস্থাতে মুখে অন্ন, অঙ্গে বস্ত্র দিয়া সেই সুকোমল শরীরকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে আমরা কোন্ কালে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতাম। তিনি যদি শৈশবাবস্থা হইতেই আমারদিগের দেহ মনের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি না করিতেন,তিনি যদি কৃপা করিয়া আমারদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মের শিক্ষা না দিতেন, তাহা হইলে কোথায় বা আমারদিগের বল বীর্য্য, সুখ সৌভাগ্য, কোথায় বা

(১) লোকান্তরবাসী মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মজীবি জীবকে দেবতা বলে।

আমারদিগের ধর্ম্মজনিত অনুপম স্বর্গীয় আশা ও আনন্দ থাকিত। পিতাই আমারদিগের ইহলোকের সকল প্রকার সুখ-সম্পদের একমাত্র কারণ—পিতাই আমাদিগের পরলোকের একমাত্র পথ-প্রদর্শক।

পুত্রের ভরণ পোষণ রক্ষণাবেক্ষণ এবং জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি সাধন জন্য পিতাকে যে কত কষ্ট—কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, পিতা না হইলে আর তাহার স্বরূপভাব কখনই স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবার উপায় নাই। অতএব সহস্র কারণে উত্যক্ত হইলেও এমন পিতার প্রতি, এমন প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করা অবজ্ঞা করা পুত্রের কখনই কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্ব প্রযত্নে পিতৃসেবা করিবে। পিতার সন্তোষ সাধনে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিবে।

সকল গুরুর মধ্যে মাতা পরম গুরু। মাতা আমাদিগের পরম পূজনীয়া, পরম সেবনীয়া হয়েন। মাতাকে ঈশ্বরের স্নেহ-গুণের মূর্ত্তি-বিশেষ বলিলেই হয়। মাতার ন্যায় পুত্রের শ্রী-সৌভাগ্য-অভিলাষিণী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। মাতার হৃদয় কেবল স্নেহের ভাণ্ডার, মাতার মন কেবল মমতারই আলয়। মাতা পৃথিবীতে স্নেহ-বাৎসল্যের অনুপম দৃষ্টান্ত ভূমি! সংসারে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহার সহিত মাতৃ-স্নেহের তুলনা হইতে পারে। আমারদিগের শরীরের রস রক্ত মাতা হইতেই।

প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপা জননী আপনার শরীর নিঃসৃত দুগ্ধ দিয়া স্বীয় সন্তানের শরীরকে পোষণ করেন, আপনার মুখের গ্রাসার্দ্ধ দিয়া পুত্রের উদর পূরণ করেন, আপনার ধন প্রাণ সমর্পণ করিয়া স্বীয় সন্তানের স্বাস্থ্য সাধন এবং বল বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

জননী স্বীয় জরায়ু শয্যায় সন্তানকে স্থান দান করিয়াই আজন্মের মত দুঃখের ভার মস্তকে ধারণ করেন। যতদিন সন্তান গর্ভস্থ থাকে, ততদিন তো মাতার ক্লেশের পরিসীমাই নাই। ভোজন ভ্রমণে, শয়ন উপবেশনে কেবল কষ্টই সহ্য করিতে হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার শরীর রক্ষার জন্য দিন যামিনী বিব্রত থাকিতে হয়। পীড়িত হইলে আপনি উপবাসী থাকিয়া—আপনি ঔষধ পথ্য সেবন করিয়া পুত্রের আরোগ্যের জন্য প্রতিনিয়তই ব্যাকুলিত চিত্তে দিন যাপন করেন। ঘটনাক্রমে সন্তান বিয়োগ হইলে মাতার তো শোক সন্তাপের আর ইয়ত্তা থাকে না।

এমন কত শত জীবিত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে জননী স্বীয় হৃদয়ধন পুত্রকে হারাইয়া আজন্মের মত উন্মাদিনী হইয়া ধর্ম্মার্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। কেহ বা পুত্র-বিরহে দিন যামিনী অনিবারিত শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করত চির-জীবনের মত চক্ষু-রত্নে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ অবগত হইবা মাত্র কত জননী উদ্বন্ধনাদি দ্বারা প্রাণত্যাগ করত দুর্নিবার্য্য শোকানল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। এমন জননীকে যে অশ্রদ্ধা করে, অনাদর করে, তাহা অপেক্ষা নরাধম এই পৃথিবীতলে অতি বিরল। বিপথ-গামী হইয়া পাপাসক্ত হইয়া এমন মাতার আশা-তরুর মূলচ্ছেদ করিও না। তোমরা এমন মাতার অবাধ্য ও অবশীভূত হইয়া তাঁহার নির্ভর-যষ্টি ভগ্ন করিও না। জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জনে অবজ্ঞা ও অবহেলা করিয়া জীবিত থাকিতে মাতার ক্রোড় শূন্য করিও না। যদি জীবন যায়, তাহাও মঙ্গল তথাচ জননীর প্রতি উদাসীন হইও না। জীবন সর্ব্বস্ব পণ করিয়া পিতা মাতার তুষ্টি সাধন করিবে। ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া পিতা মাতাকে পরিপোষণ করিবে। তোমরা প্রাণপণে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়-কমল প্রফুল্লিত করিবে, আশা-লতাকে বর্দ্ধিত করিবে, তাঁহারদিগের মুখ উজ্জ্বল করিবে। সর্ব্বদা তাঁহারদিগের সন্তোষ সাধনে নিযুক্ত থাকিবে। সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহারদিগের দুঃখ-ভার মোচন করিতে যত্নশীল হইবে। ইহা ঈশ্বরের আজ্ঞানুমত কর্ম্ম এবং পরম ধর্ম্ম জানিবে।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। বিবর্ত্ত বিলাস অর্থাৎ চৈতন্য উপাসনা এবং নিগূঢ় সাধন তত্ত্ব। শ্রীকিশোরীলাল মৈত্রেয় দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা, রায় প্রেস, ১২৮১।

এই পুস্তকের প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীলাল মৈত্রেয় মহাশয় এই পুস্তকের ভূমিকায় বলেন "মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে যখন ভক্তি স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি ইহা আমার জানিতে ইচ্ছা হইল। আবার যখন দুই জন ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মাশ্রিত হইয়া (অর্থাৎ যাহাদিগকে কেহ কেহ কর্ত্তা ভজা বলেন) বলিতে লাগিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মে কেবল চালভাজা চিবিয়ে মরিতে হয়, যদি নগদ বস্তু চাও তবে বৈষ্ণব হও। তখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম মধ্যে কি নগদ বস্তু আছে, তাহা জানিবার জন্য আমার কৌতূহল আরও বৃদ্ধি হইল। আমি সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য প্রায় সাত বৎসর কাল নেড়া, বাউল এবং দরবেশ এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে এবং বিরক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ ভাবে পরিভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার

কষ্ট যন্ত্রণার মধ্য হইতে সমুদায় অঙ্গ প্রত্যাঙ্গের সহিত ঐ নগদ বস্তু স্বরূপ কয় খানি গ্রন্থ লাভ করিয়া তন্মধ্যে প্রথমেই এই মূল গ্রন্থ খানি বৈষ্ণব সমাজের হিত উদ্দেশেই সাধারণ জনসমাজে প্রকাশ করিলাম। সুচতুর পাঠকগণই নগদ বস্তু কেমন তাহা জানিতে পারিবেন, কিন্তু অন্যের চক্ষে ঠিক গোলকধাঁদা। * * বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রীতি নীতি এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম জীবন এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রকাশিত হইবে।" আমরা শুনিলাম কিশোরীলাল বাবু না কি বৈষ্ণব বেশে বৈষ্ণবাচরণ করিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়দিগের মধ্যে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে কিশোরীলাল বাবু এরূপ ছদ্মতা সহকারে বৈষ্ণবদিগের নিগূঢ় তত্ত্ব করতলস্থ করিয়া প্রকাশ করিয়া দিলেন, এক্ষণে তাঁহার পুরাতন বন্ধু বৈষ্ণবেরা এই আচরণ জন্য কি মনে করিতেছেন? কিন্তু চিরপ্রচলিত প্রথা কিশোরী বাবুর পক্ষে; তিনি এবিষয়ে অনেক নজির দেখাইতে পারিবেন। অন্যান্য নজিরের মধ্যে তিনি বর্টন ও প্যালগ্রেব সাহেবের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিবেন। তাঁহারা মুসলমানের বেশে আরবদিগের মধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া মক্কা প্রভৃতি তীর্থ স্থানের নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। কিশোরী বাবু দেশীয় নজিরও দেখাইতে পারিবেন।

ভারতবর্ষীয় এক জন প্রধান ধর্ম্ম-সংস্কারক পরম ভাগবত চৈতন্যের ধর্ম্ম এক্ষণে কি বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে,তাহা এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা অবগত হইতে পারি। পৃথিবীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থেরই অধিকতর বিকৃতি হইয়া থাকে। প্রেমসাধন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন, কিন্তু ইহাই আবার অধিকতর বিকৃত হইয়া থাকে। প্রেম সাধনকে জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত করা কত আবশ্যক তাহা চৈতন্য সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দেখিলে উপলব্ধি হয়। কোন কোন ব্রাহ্মেরা তাহাদিগের দৃষ্টান্ত হইতে উপদেশ গ্রহন করিতে পারেন। কিশোরীলাল বাবু যেরূপ পরিশ্রম করিয়া এই সকল পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সাধারণের ধন্যবাদের উপযুক্ত। তাঁহার প্রণীত বৈষ্ণব সমাজের রীতি নীতি এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মজীবনের বৃত্তান্ত জন্য আমরা কৌতূহলাক্রান্ত রহিলাম।

২। বঙ্গ মহিলা—মাসিক পত্রিকা। প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। কলিকাতা ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২। আমাদিগের বঙ্গমহিলাগণের জন্য অতি অল্প সংখ্যক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে; তাহাদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই আনন্দের কারণ। এই খানি বিশুদ্ধ ও সহজ ভাষায় লিখিত। ভাবের সারবত্তাও আছে। এই পত্রিকাটি স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। এই সংখ্যায় "বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ সংস্কার" এই শীর্ষক প্রস্তাব যিনি লিখিয়াছেন তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

৩। সম্মিলনী। সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা, প্রথম ভাগ, প্রথম সংখ্যা। ঢাকা গিরীশ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২। এ সম্বাদ পত্রটি নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল না। বরদার গুইকুমার বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে তাহাতে বিলক্ষণ তেজস্বিতা প্রকাশিত হইয়াছে। বাণিজ্য বিষয়ক প্রস্তাবে অল্প পুরাতত্বানুসন্ধিৎসা প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এই পত্রের উন্নতি প্রার্থনা করি।

৪। প্রতিবিম্ব। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তা শাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দ শাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২। এই সংখ্যায় নিম্ন লিখিত প্রস্তাব গুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম সূচনা, ২য় মনু ও তাঁহার রাজনীতি, ৩য় উদাসীন যোগী বেশে সাজারে আমায়, ৪র্থ বিজ্ঞান, ৫ম আলঙ্কারিক শিল্প, ৬ষ্ঠ প্রকৃতির খেদ, ৭ম পৌরাণিক ভূ-বৃত্তান্ত, ৮ম আয়ুর্ব্বেদ। স্বীয় লেখকগণের নাম ঘোষণা বিষয়ে প্রতিবিম্বের কোন আড়ম্বর নাই কিন্তু আমরা শুনিতে পাই এই মাসিক পত্র প্রণয়ন কার্য্যে উত্তম উত্তম লেখক ব্রতী আছেন। "আলঙ্কারিক শিল্পের" ন্যায় গদ্য প্রস্তাব ও "প্রকৃতির খেদের" ন্যায় কবিতা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহা সাধারণের সমাদরভাজন না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। আমরা প্রার্থনা করি এই পত্রিকা চিরস্থায়ী হয় ও উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। আমরা শুনিলাম পরলোকগত শ্যামাচরণ শ্রীমানি মহাশয় আলঙ্কারিক শিল্প ও পৌরাণিক ভূ-বৃত্তান্ত এই প্রস্তাবদ্বয় লিখিয়াছেন। এই প্রস্তাবদ্বয় পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে বিষাদ ভাবের উদয় হইল। তাঁহার ন্যায় ধীর, অমায়িক, শিল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তি অল্পই পাওয়া যায়। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুণ।

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩২। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬। ১ ভাদ্র সোমবার।

Registered No 52.

নবম কল্প
প্রথম ভাগ
আশ্বিন ১৭৯৭ শক

৩৮৬ সংখ্যা

ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৬
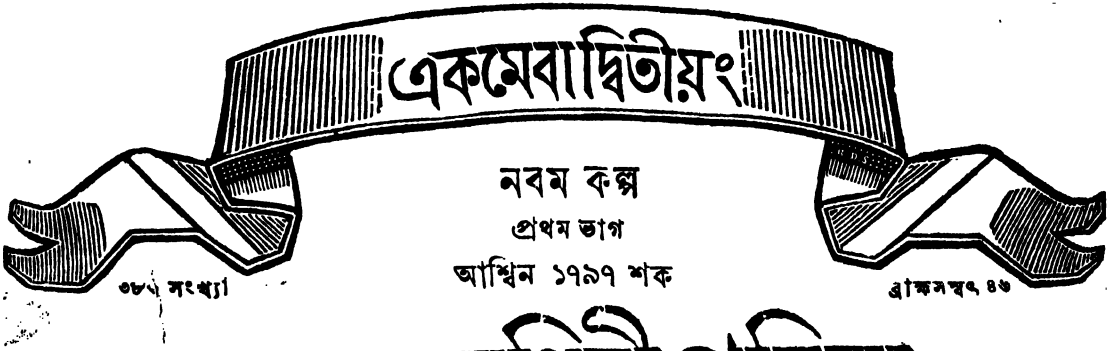
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভবানীপুর সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

৯ আষাঢ় মঙ্গলবার, ১৭৯৭ শক।

ভারতের সেই দুঃখ-দুর্দ্দিনের অবসান হইয়াছে—সেই যুদ্ধ বিগ্রহের কাল চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মই যে কেবল মনুষ্যের এক মাত্র উপাস্য দেবতা, তিনিই যে ভারতবাসী-দিগের "প্রত্যক্ষ পিতা এবং পুরাতন পিতা-মহ" তাহা সহস্র তর্ক বিতর্ক দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহার উপাসনাতেই যে মনুষ্যের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়, তাঁহার ধ্যান-ধারণা—নিত্য অর্চ্চনাতেই যে মানব-আত্মা মুক্তি লাভ করে, ব্রাহ্ম-সমাজ শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া এই অমোঘ উজ্জ্বল সত্য রত্ন উদ্ধার করিয়া সমগ্র ভূমণ্ড-লের মধ্যে ভারতের জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ে ভারত ভূমি, অপরাপর জাতির নিকটে হীন বল থাকিলেও থাকিতে পারে কিন্তু অক্ষয় ধর্ম্ম-ধনে অদ্যাপি আর কোন দেশই ভারতের সমকক্ষ হইতে সমর্থ হয় নাই। কাল-জীর্ণ কীট কবলিত পত্র অন্তরাল হইতে মেঘ-মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সুধার আধার ব্রাহ্মধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রকাশ সন্দর্শন করিয়া অনেকানেক সুসভ্য জনপদস্থ বিদ্বান্ মণ্ডলীও সচকিত হইয়াছেন। ভারতে যে অমৃতের উৎস প্রমুক্ত হইয়াছে—বঙ্গের বক্ষঃ দিয়া স্নিগ্ধ মূর্ত্তি গঙ্গা-নদীর ন্যায় যে শান্তিপ্রদ মুক্তি-জনন-ধর্ম্মের স্রোতঃ প্রবাহিত হইয়া দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করিতেছে, ইহাতে আর কস্মিন্ কালেই ভারত সন্তানদিগকে ধর্ম্ম-তৃষ্ণা শান্তির জন্য ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। সাংসারিক অভাব বিদূরিত করিবার জন্য, যেমন ভারতবাসীদিগের গৃহ প্রাঙ্গ-নেই অজস্র রূপে অন্ন-বস্ত্র উৎপন্ন হই-তেছে, তেমনি ভারত সন্তানগণের পিতৃ-পিতামহ-সঞ্চিত অক্ষয় ধর্ম্ম-রত্ন তাহারদের আধ্যাত্মিক অভাব পরিহারের নিমিত্ত গৃহ দ্বারেই প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই চিরকালের সম্বল—অনন্ত জীবনের উপজীবিকা, এখন ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রতি জনের হস্তেতেই প্রদত্ত হইতেছে। আমোদ প্রমোদের প্রলোভনের মধ্যে, বিষয় বাণিজ্যের ব্যস্ততার অভ্যন্তরে নিপতিত হইয়াও, এখন কোন মনুষ্যেরই সম্যক্ রূপে ধর্ম্ম, ঈশ্বর,

পরকাল চিন্তা হইতে বিরত হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, প্রত্যেক সম্বৎসরে উদার-ভাবে সেই উন্নত ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচিত হইতেছে—সেই পুরাণ পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ পূজার অনুষ্ঠান হইতেছে। এখন বালক বৃদ্ধ যুবা—নর-নারী সকলেরই উপযোগী ধর্ম্ম-গ্রন্থ সকল সর্ব্বদাই প্রকাশিত হইয়া গৃহ প্রাচীরের মধ্যেও ধর্ম্মামৃত পানের সরল সোপান প্রমুক্ত করিয়া দিতেছে। বলিতে কি, ব্রাহ্মসমাজ যে ধর্ম্ম সাধন পক্ষে ভারতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, সকলকেই তাহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। আর্য্য ঋষিদিগের আন্তরিক তপস্যা ও অধ্যাত্ম যোগ-লব্ধ অমূল্য সত্য-রাজি, ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ সমক্ষে ধারণ করিয়া যে, সকলের হৃদয়ে স্বদেশ প্রেম, স্বধর্ম্মানুরাগ বিশেষরূপে প্রদীপ্ত করিয়া দিয়াছেন, ইহা কে না স্বীকার করিবে?

এই ধর্ম্ম প্রধান আস্তিক ভূমী ভারতবর্ষে পণ্ডিত মূর্খ, ধনী কৃষক, বালক-বৃদ্ধ-যুবা—নর-নারী সকলেই সমুদয় হৃদয় মন আত্মার সহিত ঈশ্বরের অস্তিত্বে, পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভারতের বেদ বেদান্ত, শ্রুতি স্মৃতি-পুরাণ তন্ত্র, এক বাক্যে সেই মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। আমরা এই সকল অনুকূল অবস্থার মধ্যে—অনুকূল উপাদানের অভ্যন্তরে সংস্থাপিত হইলেও আমারদের সেই পূর্ব্ব পিতৃ পিতামহগণ—সেই পূজ্যপাদ ঈশ্বর-প্রাণ মহর্ষিদিগের ন্যায় কেন ব্রহ্ম সাধনে সমর্থ হইতেছি না? কেন আমরা সম্যক্ রূপে ধর্ম্মরত, ব্রহ্মগত-প্রাণ হইয়া জীবনের প্রকৃত মহত্ত্ব সাধন করিতে পারিতেছি না? আমারদের উৎসাহ ও অনুরাগ কেন স্থায়ী হইতেছে না? ব্রাহ্মসমাজের এই মনোহর দৃশ্য, এই স্বর্গীয়-শোভা কেন আমরা প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে সন্দর্শন করিতে পাই না? আমারদের হৃদয়ের প্রীতি-কুসুম, শরতের শেফালিকা-পুষ্পের ন্যায় কেন এক রাত্রির জন্য প্রস্ফুটিত হইয়া, আবার উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে ভুমিসাৎ হইয়া পড়ে? যে ঈশ্বর আমারদের চির-কালের বন্ধু, অনন্ত-কালের আশ্রয়, প্রতি দিনের উপাস্য দেবতা; তাঁহার সঙ্গে কেন আমরা আমারদের আত্মার চির-যোগ, চির-সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হই না? ব্রহ্মানন্দ,যোগানন্দ, বিষয়-সুখ ইন্দ্রিয়-সুখ অপেক্ষা যে অনন্ত-গুণে উৎকৃষ্ট তাহা প্রতি জনে পরীক্ষাতে প্রকৃষ্ট রূপে উপলব্ধি করিয়াও, কেন আমরা সময়ে সময়ে তাহার প্রতি উদাসীন হই? কেন আমরা বিষয় কোলাহলের মধ্যে নিপতিত হইয়া তাহার মধুরাস্বাদ বিস্মৃত হইয়া যাই? শোক তাপ, দুঃখ বিপদ্ হইতে সুরক্ষিত হইবার দুর্ভেদ্য দুর্গ-স্বরূপ পরমেশ্বরের সর্ব্বত্র প্রসারিত ক্রোড়ে সংস্থিত হইয়াও কেন আপনাদিগকে অসহায় ও নিরাশ্রয় বোধ করি? কেবল যত্নের অভাবে—সাধনের অভাবেই আমারদের এই দুর্গতি। করুণা-নিধান প্রতি আত্মাতেই মনুষ্যত্ব লাভের উপযুক্ত সম্বল স্বয়ং অর্পণ করিলেও, আমরা তাহার যথাবিধি পরিচালনায় বিমুখ হইয়া থাকি বলিয়াই সেই সংসারের সার ধন উপার্জ্জন করিতে পারি না—আমরা আমারদের আধ্যাত্মিক দারিদ্র্য দুঃখ পরিহারে সমর্থ হই না। সুতরাং অমৃতের পুত্র হইয়াও মৃত্যুর দিকে ধাবিত হই; ব্রহ্ম-লোকের যাত্রী হইয়াও সংসার পান্থ নিবাসে অধিবাসীর ন্যায় আচরণ করি। অমৃত ভোজী আনন্দ ভোজী হইয়াও বিষয়ের কীট হইয়া পড়ি! উন্নতিশীল প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াও বালকের ন্যায় ক্রীড়ার উপকরণ লাভ করত আশু তৃপ্ত হইয়া

থাকি। একবার সেই যোগ সিদ্ধ ব্রহ্মবাদিদিগের এই সারগর্ভ বাক্য পাঠ করিয়া তাহা কার্য্যেতে পরিণত করি না যে, "ব্রহ্মজ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গল ভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে, বিশ্ব-কার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই।" সেই তপঃ-সিদ্ধ কৃত পুণ্য ঋষি-বাক্য অধ্যয়ন করিয়া যথা পদ্ধতি ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হই না বলিয়াই ঈশ্বরকে হৃদয়ের প্রিয়ধন রূপে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে পারি না। সাংসারিক কার্য্যে—বিষয় ব্যাপারে তাঁহার সহিত অকাট্য যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হই না। সেই কারণেই সুখ দুঃখে, সম্পদ্ বিপদে, হর্ষ বিষাদে তাঁহার মঙ্গল রূপ সত্য-স্বরূপ সমভাবে সন্দর্শন করিতে পারি না। সেই জন্য ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে, কর্ম্ম-ভূমিতে হৃদয়ের উৎসাহ অগ্নি এক ভাবে প্রজ্বলিত থাকে না। একবার সেই সাধন উপদেশ আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, আমরা সেই মহাবাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া চলি না বলিয়াই, ব্রহ্ম-যোগে সংসিদ্ধ হইতে পারি না। "আত্মা বাঅরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যোমন্তব্যোনিদিধ্যাসিতব্যঃ।" "পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেক।" তাঁহার দর্শন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে কৃতকার্য্য হইলেই তাঁহার সহিত আত্মার দৃঢ় যোগ নিবদ্ধ হয়। অন্তরে বাহিরে, সকল স্থানে, সকল অবস্থাতে তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। কিন্তু আমারদের মধ্যে কয়জন সেই সাধন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন? শোভা সৌন্দর্য্য, জ্ঞান প্রেম মঙ্গল ভাব সমন্বিত শক্তি কৌসল-পূর্ণ বিশ্ব-ক্ষেত্র আমারদের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে এবং আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার মহিমা সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছি। কিন্তু আমরা কি তাঁহার জ্ঞান শক্তি মহিমা প্রতি নিমেষে, প্রতি নিশ্বাসে প্রণীতি করিয়া থাকি? আমরা কি সেই নিখিল বিধরণ পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রাণ রূপে সন্দর্শন করি? জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, চিকিৎসা তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি সমুদায় বিজ্ঞান শাস্ত্র যোড় করে যাঁহার মহিমা—যাঁহার স্নেহ-করুণা অহর্নিশ কীর্ত্তন করিতেছে, আমরা কি সুস্পৃহ হৃদয়ে তাহা শুনিয়া থাকি? সমুদয় বিশ্ব এক তানে যাঁহার মধুর মঙ্গল গীত গান করিতেছে, আমরা কি শ্রদ্ধা-ভক্তি-সমন্বিত হইয়া তাহা শ্রবণ করি? পরমার্থ তত্ত্বদর্শী ঈশ্বর-প্রাণ ভগবদ্ভক্ত সাধু সজ্জন সকল, ঈশ্বরের স্নেহ প্রেম মঙ্গল ভাব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া প্রেমোৎফুল্ল-হৃদয়ে যাহা ব্যাখ্যা করেন, আমরা কি আদরের সহিত তৎপ্রতি কর্ণপাত করি? জগতে তাঁহার মহিমা দর্শন করিয়া, এবং আচার্য্য সন্নিধানে তাঁহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া কি সেই সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহার মনন করত তাহাতে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহার নিদিধ্যাসন করি? এবং আন্তরিক নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক অনুরাগ-সহকারে কি তাঁহাতে আত্ম সমাধান করিয়া কৃতপুণ্য হই? এই রূপে আমরা ব্রহ্ম সাধনে প্রবৃত্ত হই না বলিয়াই আমারদের উৎসাহ আনন্দ স্থায়ী হয় না। আমারদের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, ব্রহ্মানুরাগ এই জন্যই সকল সময়ে সকল অবস্থাতে প্রকাশ পায় না। গৃহ ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে যেমন ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি প্রভৃতি সকল উপদ্রবে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকে, তেমনি সাধন-তপস্যা প্রকৃত পদ্ধতি ক্রমে সুনিষ্পন্ন হইলে সংসারের সহস্র অত্যাচারে, বিষয়ের বিবিধ প্রলোভনের মধ্যেও আত্মা তন্মনা তন্নিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। তখন হৃদয়-

মন-আত্মা মানৈষণা বিত্তৈষণা রূপ প্রবল পবন হিল্লোলে আন্দোলিত না হইয়া নিস্তরঙ্গ হৃদয়-সরোবরে নিরুদ্বেগে সেই প্রেম শশীর বিমলচ্ছবি সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতে থাকে। তখন সেই পুণ্যাত্মার ধর্ম্ম সাধন—কর্ত্তব্য সম্পাদন নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার ন্যায় সহজ হইয়া পড়ে। তখন তাঁহার প্রস্ফুটিত জ্ঞান চক্ষু সমুদায় বিশ্ব-সংসারের মধ্যে—সকল ঘটনা, সকল কার্য্যের অভ্যন্তরে সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের অপ্রতিহত ইচ্ছা স্রোতকে প্রবাহিত দেখিয়া তাহাতেই উৎসাহ পূর্ব্বক আপনার জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছা—সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অনুকূল স্রোতগামী পোত সঞ্চালকের ন্যায় নিরুদ্বেগে লক্ষ্য স্থানাভিমুখে গমন করিতে থাকে! "অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি"। তখন তিনি "পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্ম যোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন"। তপঃসাধনের প্রকৃত পুরস্কার স্বরূপ "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"। তখন "তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন"। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আদেশ—এই উপদেশের প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া আমারদিগকে ধর্ম্ম-সাধন করিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম; ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞান প্রেম, যোগ-প্রধান ধর্ম্ম; জ্ঞান-প্রেমের উৎকর্ষতা সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মা ঈশ্বরের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। ঈশ্বরের দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন প্রভাবেই আত্মা সুনিশ্চল সমাধি-সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

হে পরমাত্মন্! এই পরম ধর্ম্ম প্রেরণ করিয়া যেমন তুমি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ—বঙ্গের মহত্ত্ব-সাধন করিয়াছ—পৃথিবীর কল্যাণের সোপান প্রমুক্ত করিয়া দিয়াছ, তেমনি তুমি কৃপা করিয়া এই পরম ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য বিধান করিয়া আমারদিগকে কৃতার্থ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাংখ্য-দর্শন।

প্রাকৃতিক গুণ ও তাহার অবয়ব শক্তি।

পূর্ব্বের কথাগুলি স্মরণ কর। এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, জগতের মৌলিক অবস্থার নাম অব্যক্তাবস্থা ও প্রকৃতি; আর, তাহারই বিকারাবস্থার নাম ব্যক্তাবস্থা বা জগৎ। অপিচ আরও বলা হইয়াছে যে, অব্যক্তাবস্থার ধর্ম্ম ব্যক্তাবস্থার ধর্ম্ম হইতে অত্যন্ত পৃথক্। উক্ত উভয় বিধ অবস্থাও বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত গুণময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অবয়বের (সত্ব, রজঃ, তমঃ, ইহার প্রত্যেকটির) সামান্য পরিচয় ও তাহাদের গুণসংজ্ঞা হওয়ার কারণ বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকনিষ্ঠ শক্তি বা স্বভাবের কথা কিছুমাত্র বলা হয় নাই এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম গুলি বিভাগ করিয়াও বলা হয় নাই, সুতরাং এক্ষণে তাহাই বক্তব্য।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির উভয় বিধ অবস্থার সমস্ত ধর্ম্ম সঙ্কলন করিয়া দুই শ্রেণী কর—এক শ্রেণীতে সাধারণ ধর্ম্ম, আর এক শ্রেণীতে অসাধারণ ধর্ম্মগুলি স্থাপন কর। সিদ্ধান্ত আছে, কতকগুলি ধর্ম্ম ব্যক্তাবস্থায় থাকে অব্যক্তাবস্থায় থাকে না। কতকগুলি ধর্ম্ম অব্যক্তাবস্থাতেই থাকে ব্যক্তাবস্থায় থাকে না। কতকগুলি ধর্ম্ম উভয় অবস্থাতেই থাকে। এই থাকা না থাকা অনুসারে উহাদের সাধারণ অসাধারণ বা সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য নির্ণয় হয়। যাহা কেবল অব্যক্তাবস্থাতেই থাকে ব্যক্তাবস্থায় থাকে না, তাহা অব্যক্তাবস্থার অসাধারণ

ধর্ম্ম; সুতরাং তাহাই অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য। যাহা কেবল ব্যক্তাবস্থাতেই আছে অব্যক্তাবস্থায় নাই, তাহাই ব্যক্তাবস্থার অসাধারণ ধর্ম্ম, সুতরাং সেই অসাধারণ ধর্ম্মগুলি ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য। আর যাহা উভয়বিধ অবস্থার কোন অবস্থা হইতে প্রচ্যুত হয় না, তাহাই প্রকৃতি-সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকৃতি-সাধারণ ধর্ম্মগুলি উভয় অবস্থাক্রান্ত প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য বলিয়া জানিতে হইবে। অপিচ, যাহা অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য, তাহা ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য, যাহা ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য, তাহা অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য। আর যাহা প্রকৃতি মাত্রের সাধর্ম্ম্য, তাহা আত্মার বৈধর্ম্ম্য, অর্থাৎ কি ব্যক্তনিষ্ঠ কি অব্যক্তনিষ্ঠ, সমস্ত প্রাকৃতিক ধর্ম্মের অভাব আত্মায় দৃষ্ট হয়। এই রূপ সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য নির্ণয়ের প্রয়োজন আত্মোদ্ধার। প্রকৃতির আবেশে আত্মার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন হওয়াতে তিনি দুঃখী আছেন, সেই দুঃখ হইতে তাঁহাকে মুক্ত করাই আত্মোদ্ধার।

ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য।

(১) প্রত্যেক ব্যক্তই সহেতুক (স-কারণ), অনিত্য (নশ্বর), অব্যাপি (পরিমাণ আছে), স-ক্রিয় (চলন আছে), অনেক (বহু সংখ্যক), আশ্রিত (কারণ দ্রব্য আশ্রয় করিয়া উৎপত্তি ও স্থিতি লাভ করে), লিঙ্গ (বোধক কারণ থাকার অনুমাপক), সাবয়ব (অংশ করা যায় বা অংশ আছে), পরতন্ত্র (কারণের অধীন)। এই গুলি ব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য এবং অব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য।

অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য।

অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য উহারই বিপরীত। অর্থাৎ,—অহেতুক, নিত্য, ব্যাপক, নিষ্ক্রিয় (এস্থলে নিষ্ক্রিয় শব্দের অর্থ পরিস্পন্দ অর্থাৎ এক প্রদেশ হইতে আর এক প্রদেশে গতি যাহাকে চলন ও কম্পন বলে তাহা না থাকা) এক (অর্থাৎ পরমাণুর ন্যায় স্বজাতীয় বস্তু বিভাগ নাই) অনাশ্রিত (যেহেতু ইহার আর কারণ নাই) অলিঙ্গ, নিরবয়ব, কারণ নাই বলিয়া কারণের অনধীন। এই গুলি অব্যক্তাবস্থার সাধর্ম্ম্য, ও ব্যক্তাবস্থার বৈধর্ম্ম্য।

উভয় অবস্থার সাধর্ম্ম্য।

ত্রৈগুণ্য (পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়ের মিশ্রভাব), অবিবেকিত্ব (সংযোগে কার্য্যান্তর জন্মান বা কারণ ভাব হইতে অবিযুক্ত থাকা), বিষয় (জ্ঞান গ্রাহ্য), সামান্য (প্রতিবন্ধক অভাবে ব্যক্তি মাত্রের গ্রাহ্য), প্রসবধর্ম্মী (কার্য্য শক্তি বিশিষ্ট),—এই গুলি ব্যক্ত রাশিতেও আছে, অব্যক্ততেও আছে; সুতরাং ইহা প্রকৃতি মাত্রের সাধর্ম্ম্য। প্রকৃতির সমস্ত সাধর্ম্ম্য গুলি আত্মার নিকট বৈধর্ম্ম্য হইবে(২)। ইহা পশ্চাৎ বক্তব্য।

যে সকল ধর্ম্ম লইয়া এই সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য উক্ত হইল, সে সকল ধর্ম্ম প্রকৃতির শাক্তিক ধর্ম্ম; অর্থাৎ শক্তিগত ধর্ম্ম। এতদ্দ্বারা কেবল প্রকৃতির অবস্থা ভেদ ও আত্মার স্বতন্ত্রতা নির্ণীত হয়; কিন্তু যদ্দ্বারা আত্মার ভোগ সিদ্ধি হইতেছে, জগতের কার্য্য নিয়মিত রূপে চলিতেছে এবং যে সকল গুণ প্রকৃতির প্রত্যেক অবয়বে সংলগ্ন থাকিয়া জগতের বিচিত্রতা সম্পাদন করিয়াছে বা করিতেছে সে সকল গুণ এতদতিরিক্ত। এক্ষণে তাহাও বিশদী করা কর্ত্তব্য।

প্রকৃতির একটি অবয়বের নাম সত্ত্ব। এই সত্ত্ব-পদার্থটি লঘু, প্রকাশক ও সুখাত্মক,

(১) ব্যক্ত ও জন্য একই কথা। অতএব ব্যক্ত বলিলে বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে ভৌতিক কাণ্ড সমস্ত জন্য বস্তুই বুঝায়।

(২) এই সকল সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যের বিষয় কাপিল শাস্ত্রে যুক্তি পূর্ব্বক নির্ণীত আছে, 'ইহা আছে কেন? উহা নাই কেন?'—এবিষয়ের উপর তর্কও আছে, কিন্তু এস্থলে সে সকল উদ্ঘাটন করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিলাম।

(প্রসাদ, সচ্ছতা, প্রীতি, তিতিক্ষা ও সন্তোষাদি বহু ভেদ থাকিলেও সামান্যত সুখাত্মক বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম)। আর একটি অবয়বের নাম রজঃ। এই রজো দ্রব্যটি মধ্য, উপষ্টম্ভক, চলনশীল ও দুঃখাত্মক। (ক্রিয়া ও শোকাদি নানা ভেদ থাকিলেও সংক্ষেপতঃ দুঃখাত্মক বলা হইল)। আর একটি অবয়ব তমঃ। এই তমো দ্রব্যটি গুরু, আবরণকারী (অজ্ঞান) ও মোহাত্মক। (ইহারও নিদ্রা, আলস্য, বুদ্ধি-মান্দ্য প্রভৃতি বহু ভেদ থাকিলেও সংক্ষেপের নিমিত্ত মোহাত্মক বলা হইল) (৩)। এই তিন দ্রব্যের বর্ণ যথাক্রমে শুক্ল, লোহিত ও কৃষ্ণ।

(লঘু,—যাহার স্বভাব উদ্গমন তাহাই লঘু। অগ্নির উর্দ্ধ জ্বলন, বাষ্পের উদ্গতি, বায়ুর তীর্য্যক গতি, ইন্দ্রিয় সকলের তীব্রতা ও বিষয়প্রবৃত্তি,—এসকলই সত্বের কার্য্য) এই নিমিত্ত সত্ব দ্রব্যটি লঘু। প্রকাশক,—যাহার স্বভাব আবরণ নাশ করা বা প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা তাহারই নাম প্রকাশক। তেজের তমোনাশকত্ব, স্ফাটিকের বা কাচের প্রতিবিম্ব গ্রাহিত্ব, জ্ঞানের অজ্ঞাননাশকত্ব,—এসমস্ত কার্য্য সত্বের প্রকাশ, অতএব সত্ব দ্রব্যটি প্রকাশ-ধর্ম্মা। সুখাত্মক,—(স্পষ্টই বলা হইয়াছে)। উপষ্টম্ভক,—যাহার স্বভাব উপষ্টম্ভ অর্থাৎ উত্তেজনা বা কার্য্যোন্মুখ করা তাহাই উপষ্টম্ভক। যে বস্তু চলনশীল তাহাই উপষ্টম্ভক হয়। অগ্নি যে প্রসর্পিত হয়, বায়ু যে প্রবাত হয়, মন যে চঞ্চল থাকে, কার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত থাকে,—তাহার কারণ রজঃ; অতএব রজো দ্রব্যটি উপষ্টম্ভক ও চলন-ধর্ম্মা। দুঃখাত্মক,—(স্পষ্টই বলা হইয়াছে)। গুরু,—যাহার স্বভাব চলনের বিরোধী হওয়া বা নিরন্তর চলনকে নিয়মিত করা, তাহাই গুরু। পূর্ব্বোক্ত সত্ব ও তমঃ, এতদুভয়ই নিশ্চলস্বভাব। কেবল রজই ইহাদিগকে পরিচালিত করে। অতএব চলনস্বভাব রজঃ যাহাতে সর্ব্বথা অর্থাৎ যথেচ্ছ পরিচালনা করিতে না পারে, তমো দ্রব্যটি তাহার উপায় বিধান করিতেছে। তমকে যথেচ্ছ পরিচালন করিবার শক্তি রজের নাই। বরং তমঃ স্বীয় গুরুতা দ্বারা রজের পরিচালনা শক্তিকে নিয়মিত করিতেছে। মোহাত্মক,—(সহজ, ও এক প্রকার বলা হইয়াছে) এই রূপে সুখ, দুঃখ, মোহ,—প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিয়ম,—ও লঘু, মধ্য, গুরু,—এই সকল ধর্ম্মও প্রকৃতির সম্বন্ধে সাধারণ। অতএব এগুলিও প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য ও আত্মার বৈধর্ম্ম্য। এই সকল ধর্ম্ম ব্যক্ত প্রকৃতিতে ব্যক্ত ভাবে আছে, আর, অব্যক্ত প্রকৃতিতে অব্যক্ত ভাবে ছিল) (৪)।

কাপিল মতের তত্ত্বচিন্তকেরা এইরূপে আত্মা, জগৎ ও প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য

(৩) সামান্যতঃ মূল বর্ণ তিনটি। ইহারই মিশ্রণে অন্যান্য বর্ণের উৎপত্তি। ইহাতে যে সকল যুক্তি এবং আপত্তি আছে, তাহা পরমাণু সৃষ্টির বিষয় শেষ করিয়া বলিব।

(৪) এতাবতা বস্তুর তম-অংশই গুরু হইতেছে। এই গুরু ধর্ম্মা তমঃ পরিচালক রজকে নিয়মিত করে। রজঃ দ্রব্য তম কর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া, সত্বকে এবং তমকে পরিচালন করেণ পরন্তু উদ্গমন স্বভাব হেতু সত্বের পরিচালনা উর্দ্ধ বা তির্য্যক দিকে হয়; আর তমের পরিচালনা উর্দ্ধের বিপরীত দিকে হয়। আর এক নিয়ম আছে। স্বজাতীয়গণ স্বজাতীয়ের সহিত মিলিতে চায়—স্বজাতীয় স্বজাতীয়ের পোষণ করিতে চায় ইত্যাদি। এই নিয়মানুসারে পতন, উদ্গমন, তীর্য্যকগমন, ভ্রমণ, রেচন ও স্পন্দন রূপ গতি ভেদ ও তাহার তারতম্য জন্মে। পৃথিবী ভুত তমঃ প্রধান। এই জন্যই পার্থিব বস্তু মাত্রেই পৃথিবীর সহিত মিলিতে চায় বা পৃথিবী পার্থিব বস্তুকে ক্রোড়ীকৃত করিতে চায়। নৈয়ায়িকেরা বলেন "পতনের প্রতি কারণ গুরুত্ব" আর বিদেশীয় পণ্ডিতেরা বলেন "পৃথিবীর আকর্ষণ" ফল সাংখ্য মত এই দুই মতের কোন মতকে বাধা দিতেছেন না।

নির্ণয় করেন। ইহার ফল আত্মোদ্ধার, ইহা বলা হইয়াছে। পরন্তু প্রকৃতির ত্রৈগুণ্য নিবন্ধন জগতের প্রত্যেক বস্তুই ত্রিগুণ। তন্নিবন্ধন পূর্ব্বোক্ত গুণসঙ্কুল অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, মোহ,—প্রকাশ, প্রবৃত্তি, নিয়ম,—লঘু, মধ্য, গুরু,—ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই আছে। ইহাতে একটা আছে—উহাতে পাঁচটা আছে—আর একটাতে নাই এরূপ নহে। প্রত্যেক বস্তুতে এমন কি একটা সামান্য তৃণ শরীরেও ঐ সমস্ত গুণ আছে। তবে কি না তাহার তারতম্য আছে। তারতম্য থাকার কারণ গুণ সংযোগের তারতম্য। অপিচ, জগতে যে ত্রৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, প্রকৃতির ত্রৈগুণ্যই তাহার কারণ। যেহেতু কারণে না থাকিলে পূর্ব্বপ্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে কার্য্যে থাকিতে পারে না। উক্ত গুণত্রয়ের কথিত ধর্ম্ম ভিন্ন আরও একটি ধর্ম্ম আছে; তদ্দারাই জগতের বিচিত্রতা এবং সেই ধর্ম্ম থাকাতেই প্রত্যেক বস্তুর ও প্রত্যেক সংখ্যার আকার প্রকার ভিন্ন এবং মানব অন্তঃকরণের অবস্থা ও রুচি ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়। সে কি?—না পরস্পর পরস্পরের অভিভাব্য এবং পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক। সত্ত্ব প্রবৃদ্ধ হইলে, যথা সম্ভব রজ স্তমকে অভিভব করে—রজঃ প্রবৃদ্ধ হইলে তমঃ সত্ত্বকে অভিভূত করে তমঃ প্রবৃদ্ধ হইলে রজঃ সত্ত্বকে অভিভূত করে। এই রূপ পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করে। এবং উহারা পরস্পর পরস্পরের সহচর। সত্ত্ব একেবারে নাই কিন্তু তম আছে—তমঃ নাই সত্ত্ব আছে—বা তম নাই রজঃ সত্ত্ব আছে—এরূপ নহে। জগতের সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণ। তবে কি না ন্যূনাধিক ভাব আছে। ন্যূনাধিক ভাব থাকাতেই জগতের বিচিত্রতা। এ বিষয় আর অধিক বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই।

সম্প্রতি আর এক আপত্তি উপস্থিত। আপত্তি না হউক, সংশয় বটে। সে সংশয়ের বীজ সার্ব্বজনীন অনুভব, আর এই প্রকৃতি-কারণ-বাদীর মত। প্রকৃতি-বাদী বলিলেন, জগতের প্রত্যেক বস্তুতে সুখ, দুঃখ ও মোহ সংলগ্ন আছে; কিন্তু অনুভব হয় চিত্তে বা আত্মায় আছে। অতএব, সুখ দুঃখ কোথায়?—বাহ্য বস্তুতে? না মনে?—না আত্মায়?—

নৈয়ায়িক বলেন "আত্মায়—কিন্তু তাহাতে সদাকাল নাই—বিষয় সংযোগাধীন উৎপন্ন হয়।"

মীমাংসক ও বৈদান্তিকগণ বলেন "মনে—সদাকালই আছে—তবে কি না বিষয় সংযোগাধীন প্রকাশ পায়।"

কপিল বলেন "আত্মা ভিন্ন সমস্ত পদার্থেই সুখ দুঃখ আছে—বহিঃস্থ সুখাদি ও আন্তঃকরণিক সুখাদি প্রক্রিয়া ভেদে স্থূল বা পুষ্ট হইয়া আত্মার নিকট প্রকাশ পায়। ইহাকেই বৈষয়িক বা বৈকারিক সুখ বলে। তদ্ভিন্ন বিষয় নিরপেক্ষ সত্ত্ব পরিণাম নিবন্ধন আন্তরিক সুখ বা দুঃখ স্বতন্ত্র।"

পূর্ব্বপূর্ব্ববাদীরা বলেন "যদি বাহ্য বস্তুতে সুখ দুঃখাদি বর্ত্তমান থাকিত—তবে, বাহ্য বস্তুও সদাকাল আছে এবং তাহার সহিত সম্বন্ধও অনেকের হইতেছে, সুতরাং সদাকালে এবং সকলেরই যুগপৎ সুখ দুঃখাদির অনুভব হইত এবং 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' এই প্রত্যয়ের ন্যায় 'স্ত্রী সুখী' 'চন্দন সুখী' 'মাল্য সুখী' এইরূপ প্রত্যয় হইত।"

কপিল হাসিয়া উত্তর করেন, "উলুক ও বসু মিত্র প্রভৃতি প্রাণীরা সূর্য্য মণ্ডলে অন্ধকার দেখে বলিয়া তাহাতে আলোকের অভাব কল্পনা করিতে পার না এবং 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী'—এই আকারের অনুভব দেখিয়া উহা কেবল আত্ম-নিষ্ঠ নির্ণয় করি-

তেও পার না; তাহা হইলে 'আমি ধনী' 'আমি গৃহী' এই অনুভব দ্বারা ধন ও গৃহের আত্ম-লগ্নতা সিদ্ধি হইত। তবে যে সকলের সকল বস্তুতে এবং একই বস্তু, অথচ তাহাতে সকলের সকল সময়ে সুখ বা দুঃখ হয় না—ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে ভিন্ন ব্যক্তির রুচি দৃষ্ট হয়—তাহার কারণ ভিন্ন। ফল, সুখ দুঃখাদি রূপ গুণ চিত্তেও আছে, বাহ্য বস্তুতেও আছে।"

প্রক্রিয়া—"স্বজাতীয় স্বজাতীয়ের উত্তেজক, উদ্দীপক ও পরিপূরক হয়। শরীরের জলাংশ ক্ষীণ হইলে, বাহিরের জলাংশ তাহার পরিপূরণ করে। জলময় চন্দ্রের সন্নিকর্ষে পৃথিবীর জল উত্তেজিত হয়—এবং পৃথিবীর জল উত্তেজিত হইলে, শরীরের জলও উত্তেজিত হয়। এই পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া বুদ্ধি চালনা কর,—বাহ্য বস্তু নিষ্ঠ সুখ ধর্ম্মা সত্ব, আর অন্তঃকরণ নিষ্ঠ সুখ ধর্ম্মা সত্ব,—এই দুই সত্ব ইন্দ্রিয়দ্বয় দ্বারা সন্নিকৃষ্ট হইলে, উভয়েরই উত্তেজনা উভয়ে করে। আন্তঃকরণিক সত্ব উত্তেজিত হইলে, সে পরিণত হইয়া সুখাকারা বৃত্তি প্রসব করে। তবে যে সকলের সকল বস্তু দর্শনে এবং সকলের সকল সময়ে সুখ দুঃখ হয় না, তাহার কারণ প্রতিবন্ধকের সদ্ভাব। কাষ্ঠ সংযোগে অগ্নি উদ্দীপ্ত হয় সত্য বটে, কিন্তু সে কোন্ কাষ্ঠ? না যে কাষ্ঠে অগ্নি-স্বজাতীয়-বস্তু বহুল পরিমাণে আছে। শুষ্ক কাষ্ঠ সংযোগে অগ্নি প্রবৃদ্ধ হইবে, কিন্তু আর্দ্র কাষ্ঠ সংযোগে হইবে না। বরং সে অগ্নিকে অভিভবই করিবে। এইরূপ, বিষয় সংযোগাধীন যে অন্তঃকরণের পরিণাম হয়—সে অবস্থানুযায়িই হয়৲ যদিও বস্তু এক; কিন্তু তাহার গৃহীতা অন্তঃকরণ নানা। সুতরাং নানা অন্তঃকরণের নানা অবস্থা এবং প্রত্যেক ক্ষণে তাহারদের ভিন্ন ভিন্ন পরিণাম থাকে বলিয়া সকল সময়ে বা সকল ব্যক্তির সমান রূপে সুখ দুঃখ ভোগ ঘটে না। এই অভিপ্রায়ে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন "রূপ যৌবনাদি সম্পন্না এক স্ত্রী তাহার স্বামীকে সুখী করে—আবার সেই দণ্ডে তাহার সপত্নীকে দুঃখিনী করে—এবং সেই সময়েই তাহাকে যে লাভ করিতে না পারিয়াছে তাহাকে মুগ্ধ করে। কেন? না উহাদের প্রত্যেকের মন ও মানসিক অবস্থা ভিন্ন সুতরাং তন্নিবন্ধন কাহার সত্ব, কাহার রজঃ, কাহার বা তম-অংশ সেই সেই রূপে সমুদ্ভূত হয়।"

ফল, সুখ দুঃখাদি যাহাতেই থাকুক না কেন—উহা যে আত্মায় নাই—একথা অনেক আর্য্য এক বাক্যে বলিয়াছেন! মহা মুনি মার্কণ্ডেয়, 'সুখ দুঃখ কিসে আছে?' এ প্রশ্ন লইয়া বিবাদ দেখিয়া বলিয়াছিলেন,

"তৎসস্ত চেষ্টস্যাথবাপি দেহে সুখানি দুঃখানি চ কিং মমাত্র।"

সুখ দুঃখাদি দেহেতেই থাকুক—আর চিত্তেতেই থাকুক—তাহাতে আমার কি?—অর্থাৎ আত্মা নির্ধর্ম্মক ও বৈকারিক সুখ দুঃখ বর্জিত। (এই জ্ঞান দৃঢ় হইলেই মনুষ্য মুক্ত হয় অর্থাৎ নিঃস্বপ্ন নিদ্রা সম্ভোগের ন্যায় আত্ম সুখ সম্ভোগ করে।)

সুখ কি?—দুঃখই বা কি?—এসম্বন্ধে বহু মতামত ও বহু তর্ক বিতর্ক আছে, তাহা পরে প্রকটিত হইবে; সম্প্রতি উপস্থিত প্রস্তাবের উপসংহার করা গেল।

পরিণাম ও তাহার হেতু ভাব।

বলা হইয়াছে, প্রকৃতি পরিণামশীলা;—এমন কি "নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে" পরিণত না হইয়া ক্ষণ কালও থাকিতে পারে না;—সেই হেতু বর্ত্তমান সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুই পরিণামী। প্রতি স্বর্গাবস্থায় অর্থাৎ যখন দৃশ্যমান জগৎ ছিল না,—যাহাকে মহা-প্রলয়াবস্থা, অব্যক্তাবস্থা ও প্রকৃতি-অবস্থা বলা

হইয়াছে, সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণাম হইত। তবে কি না অবস্থার পরিণাম সদৃশ পরিণাম।

পরিণামবাদী কপিল প্রকৃতির দ্বিবিধ পরিণাম শক্তি থাকা নির্ণয় করেন; সদৃশ পরিণাম এবং বিসদৃশ পরিণাম। পরিণাম শব্দের অর্থ অবস্থাপরিবর্ত্ত। এক অবস্থায় বা এক ভাবে না থাকাই পরিণাম। প্রতিস্বর্গাবস্থায় যে সদৃশ পরিণাম হয়, তাহার ভাব এই—পূর্ব্বক্ষণে যে ভাবে সত্ব ছিল, পরক্ষণে সে ভাবের সত্ব নহে তৎসদৃশ ভাবের সত্ব; অর্থাৎ সে সময় সত্ব সত্বরূপে,—রজঃ রজো রূপে,—তমঃ তমোরূপেই পরিণত হয়। আর জগদবস্থায় বিসদৃশ পরিণামের অর্থ এই যে, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ প্রভৃতি গুণ ভাবের পরিবর্ত্ত। অর্থাৎ রূপের অন্যথা—রসের অন্যথা—গন্ধের অন্যথা—স্পর্শের অন্যথা—ও শব্দের অন্যথা। এই দ্বিবিধ পরিণাম সর্ব্ব কালের নিমিত্ত নিয়মিত। অতি দূর অতীত কাল হইতে—অসীম ভবিষ্যৎ কালের নিমিত্ত নিয়মিত। সহজ জ্ঞানে যাহাকে আমরা এখন অপরিণামী বলিয়া জানিতেছি (যথা চন্দ্র সূর্য্য, জল বায়ু প্রভৃতি মহা ভূত) তাহারাও পরিণামী। তবে কি না কোন বস্তুর তীব্র পরিণাম নিবন্ধন তাহা সদ্য অনুভব হয়—কাহার বা মৃদু পরিণাম হেতু কালান্তরে অনুভূত হয় (যথা চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, মহা জল ও মহা বায়ু প্রভৃতি) এই মৃদু পরিণামের কাষ্ঠা প্রাপ্তি বা চরমসীমা যেখানে, সেই স্থানটিই পূর্ব্বোক্ত সদৃশপরিণামের ভিত্তি। তদ্দৃষ্টেই সদৃশপরিণামের কল্পনা। তীব্র পরিণামের তীব্রতা এত পরিমাণে আছে যে, পূর্ব্বক্ষণে সমুৎপন্ন বস্তুর পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত হয়; আবার মৃদু পরিণামের মৃদুতা এত আছে যে, তাহারই চরম সীমা সদৃশপরিণাম। এবংবিধ মৃদু, মধ্য ও তীব্র পরিণামের হেতু পূর্ব্বোক্ত গুণত্রয়ের সমাবেশ বা সংযোগ বিশেষ। এই জন্যই কোন কোন বস্তু উৎপন্ন হইবা মাত্র তৎপরক্ষণেই আমরা তাহার বিকার অনুভব করি—আবার কোন কোন বস্তুর পরিণাম আমাদের জীবনে অনুভূত হইল না—আমাদের অধস্তন সন্তানেরা অনুভব করে। এই সকল বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম, মৃত্যু, জরা,—উৎপত্তি, স্থিতি, লয়,—বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য,—জীর্ণতা, নবতা, মধ্যতা,—ও দৃঢ়তা অদৃঢ়তা প্রভৃতি।

কাল্ যে সূর্য্যকে আমরা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি—আজ তাঁহার সে অবস্থা নাই—পরিণাম হইয়াছে (অনুভব হইতেছে না)। কাল্ যে জগৎপ্রাণ বায়ু দেবের সেবা করিয়াছি—আজ্ তাঁহারও পরিণাম হইয়াছে (অনুভব হইতেছে না)। আদি সর্গকালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণির যে রূপ স্বভাব ও শক্তি ছিল—কপিলের সময় তৎসমস্তের যথাসম্ভব পরিবর্ত্ত হইয়াছিল—তখন কপিলের সময় যে রূপ ছিল—আমাদের সময়ে আর তাহা নাই—আমাদের সময়ে যাহা চলিতেছে—আমাদের সন্তানবর্গের সময় ইহাও থাকিবে না—পরিবর্ত্ত হইবে।

ব্রহ্মসাধন।

৩৭৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৭ পৃষ্ঠার পর।

ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে যে ব্রহ্মসাধনের উচ্চতম সোপান স্বরূপ যে যোগসাধন তাহাতে উত্থান করিতে হইলে প্রথমতঃ জ্ঞান, স্বাধীনতা ও অধ্যবসায় প্রভৃতি তিনটিকে সহায় করা নিতান্ত আবশ্যক। কি রূপ জ্ঞান, কি রূপ স্বাধীনতা এবং কি রূপ অধ্যবসায়ের সহায়তা আবশ্যক, তাহাও পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে, যাঁহারা আমা-

দিগের ন্যায় ক্ষীণমতি এবং সাংসারিক, তাঁহারা কি কি উপায়ে প্রোক্ত ত্রিবিধ সহায়ের আশ্রয় লইতে পারেন,তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইতেছে।

প্রস্তাবিত সন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় যোগাচার্য্যগণ আমাদিগের লক্ষ্য যে একাত্মভাবের ব্রহ্মযোগ, তাহা সাধনার্থে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন তত্তাবতের মর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল পন্থানুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহারা স্বয়ং এবং তাঁহাদিগের শিষ্যগণ ব্রহ্মযোগসাধনে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতে পারিলে যে আমরা বর্ত্তমান গবেষণায় অভ্রান্ত পথে অগ্রসর হইতে পারিব, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহাদিগের উপদেশ সকল যথাবৎ পালন করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া কার্য্য করিতে থাকিলে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা নাই। অতএব তাঁহারা যেরূপ কার্য্য প্রণালী দ্বারা যোগসাধনে সক্ষম হইতেন তাহার গূঢ় তথ্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, এই অষ্টবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্বতন সাধকগণ ব্রহ্মযোগ সাধনে সিদ্ধকাম হইতেন*। তাঁহারা কি উদ্দেশ্য সংসাধনার্থে—ইহার কোন অঙ্গ সাধন করিতেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে সকলেই তাঁহাদিগের মনোগত অভিপ্রায় স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

* এই অষ্টবিধ যোগাঙ্গের সাধন প্রণালী ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৯ ও ৩৭১ সংখ্যক পত্রিকায় বিস্তারিত রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যাঁহারা তত্তাবতের বিশেষজ্ঞ হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ কয়েক খণ্ড পত্রিকা অবলোকন করিতে পারেন।

প্রথমতঃ যোগাঙ্গ গুলির লক্ষণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের অভিসন্ধি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

(১) যম শব্দে পঞ্চবিধ ব্যবহার বুঝায়, যথা, অহিংসা, অস্তেয়, (অচৌর্য্য), সত্য, ব্রহ্মচর্য্য (সংযত আহার ব্যবহার), অপরিগ্রহ (অন্যের দান গ্রহণ না করা)।

(২) নিয়ম শব্দে পঞ্চবিধ অনুষ্ঠান বুঝায় যথা, শৌচ (শরীর শুদ্ধ রাখা), সন্তোষ (দুঃখ বা বিপৎপাতেও মনের প্রসন্নতা বা প্রশান্ত ভাব রক্ষা করা), তপস্যা (শুভোদ্দেশে ক্লেশসহন অর্থাৎ অধ্যবসায় অভ্যাস করা), স্বাধ্যায় (যে সকল শাস্ত্র দ্বারা আত্মা ও বহির্জগতের তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা অধ্যয়ন করা), ঈশ্বর-প্রণিধান (ঈশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণার্থে মনোনিবেশ করা)।

(৩) আসন শব্দে সাধারণতঃ বসিবার স্থান বা উপবেশন করা বুঝায় বটে, কিন্তু এস্থলে তাহা নহে। এখানে উহাতে সিদ্ধাসন, পদ্মাসন প্রভৃতি বিশেষ রূপে উপবেশন করিবার অভ্যাস বুঝাইতেছে।

(৪) প্রাণায়াম শব্দে শ্বাস দ্বারা বায়ুকে দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ ধারণ ও পরিত্যাগ করিবার যে অভ্যাস তাহাই বুঝায়। ঐরূপ অভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ শ্বাস-গতি নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়।

(৫) প্রত্যাহার—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয় মাত্রকে তাহাদিগের উপভোগ্য বিষয় সকল হইতে প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক সতত স্বায়ত্তে সংযত ভাবে রাখিবার নিমিত্ত যে অভ্যাস তাহার নাম প্রত্যাহার।

(৬) ধারণা—চিত্ত বৃত্তি সমুদায়কে তাহাদিগের উপভোগ্য বিষয় সকল হইতে নিবৃত্ত করিয়া সতত স্বায়ত্তে সংযত ভাবে রাখিবার যে অভ্যাস তাহাকে ধারণা কহে।

(৭) ধ্যান—একাগ্রতা সহকারে ধারাবা-

হিক রূপে প্রণব বা পরমাত্মার স্বরূপ চিন্তনে নিযুক্ত থাকার নাম ধ্যান।

(৮) সমাধি—জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য অনুভব করিয়া এক মাত্র তাঁহারই সহিত সংযুক্তাবস্থায় অবস্থিতি করাকেই সমাধি কহে। এই সমাধিরই অবান্তর নাম যোগ।

এক্ষণে ইহার কোন্ অঙ্গ কি অভিপ্রায়ে সাধিত হয়, তাহা পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। যমাঙ্গের অন্তর্গত যে কয়েকটি ব্যবহার, তন্মধ্যে অহিংসা, অস্তেয়, এবং সত্য ব্যবহার দ্বারা আত্মার প্রাকৃতিক ভাব অর্থাৎ অবিকৃত ভাব যেরূপ রক্ষিত হয়, সেরূপ আর প্রায় কিছুতেই হয় না। এতদ্ভিন্ন ঐ তিনটি ব্যবহার দ্বারা আত্মা অনেক পরিমাণে বাহ্য বিপদ বা ভয় সমূহের হস্ত হইতে নিস্কৃতি লাভ করে। অপরন্তু এতদন্তর্গত ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ রূপ দুইটি ব্যবহার দ্বারা আত্মা অনেকাংশে শারীরিক রোগের অধীনতা, লোকের অধীনতা, বিষয়ের অধীনতা এবং বস্তুর অধীনতা হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারে। যমাঙ্গ সংক্ষেপতঃ নিয়মাঙ্গের পোষক।

নিয়মাঙ্গের অন্তর্ভূত যে কয়েকটি অনুষ্ঠান, তন্মধ্যে শৌচ দ্বারা দেহের এবং সন্তোষ দ্বারা মনের প্রসন্নতা জন্মে। দেহ মনের প্রসন্নতা ভিন্ন দীর্ঘকালব্যাপী অথচ আয়াসসাধ্য কোন কর্ম্মেই রুচি জন্মে না, এই হেতু যোগ সাধনের প্রাথমিক অবস্থায় শৌচ ও সন্তোষের নিতান্ত আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে। যোগসাধন অতীব কৃচ্ছ্র সাধন সাপেক্ষ ব্যাপার, সুতরাং তপস্যা বা কষ্ট সহনাভ্যাস ব্যতিরেকে যোগের কোন অঙ্গই কেহ সাধন করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব সাধকদিগের প্রথমাবস্থায় তাহারও উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জ্ঞান পরিমার্জ্জনার্থে স্বাধ্যায় বিহিত হইয়াছে। অধ্যয়ন ব্যতীত অন্যান্য উপায় দ্বারাও আত্মার জ্ঞান উদ্দীপ্ত ও পরিমার্জিত হইতে পারে বটে, কিন্তু জনসাধারণের নিমিত্ত অধ্যয়ন যেমন নিশ্চিত উপায় সেরূপ আর প্রায় কিছুই নহে; সুতরাং সাধারণ ব্যবস্থাবলীর মধ্যে জ্ঞানোদ্দীপক অন্য কোন উপায়ের পরিবর্ত্তে শুদ্ধ মাত্র অধ্যয়নই বিহিত হইয়াছে। অধ্যয়ন দ্বারা জগতের তত্ত্বজ্ঞান উদ্দীপ্ত হইলে, সমুদায়ের মূলস্বরূপ যে ঈশ্বর, তাঁহার তত্ত্বের প্রতি মনোনিবেশ করা আবশ্যক। জ্ঞানেতে ঈশ্বরের প্রকাশ না হইলে, যোগ সাধিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার কিছু অর্থই থাকে না, এই হেতু যোগসাধন প্রকৃত পক্ষে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নিয়মাঙ্গের মধ্যে ঈশ্বর-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জ্ঞান যখন জগৎ-তত্ত্ব লাভে সমর্থ হয়, তখন ঈশ্বরতত্ত্ব সহজেই প্রতিভাত হয়, আবার, যখন তাহাতে ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রতিভাত হয়, তখন জগৎ-তত্ত্বের দুর্ব্বোধ অংশও তাহাতে অনায়াসে প্রকাশিত হইয়া পড়ে; অতএব জগৎ-তত্ত্ব আর ঈশ্বর-তত্ত্ব একটী বিশেষ সম্বন্ধে আবদ্ধ। নিয়মের সমুদায় অঙ্গ পর্য্যালোচনা করিলে সংক্ষেপে এই মাত্র প্রতীয়মান হয়, যে ঈশ্বর-তত্ত্বের উদ্বোধনই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, আর শৌচ সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায়ই ঐ উদ্দেশ্যের পোষক।

আসনরূপ তৃতীয় অঙ্গে[illegible]প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা সাধারণের অনুধা[illegible]করা কঠিন। পূর্ব্বতন সাধকগণ বিবিধ রূপ আসন সাধন করিবার নিমিত্ত যে সকল কষ্ট স্বীকার করিতেন আপাততঃ তাহার প্রকৃত সার্থকতা অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার যে কিছু মাত্র কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয় না, এমত নহে।

মস্তক ও বক্ষ উন্নত এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত স্থান বা নাসাগ্রে চক্ষের দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিতে পারিলে,মন একাগ্রতা সম্পন্ন হইয়া, অনেক ক্ষণ কোন বিষয় ধারাবাহিক রূপে চিন্তা করিতে পারে। আসনসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে উপবেশন করিলে মস্তক ও বক্ষ ঋজু ভাবে উন্নত অবস্থায় এবং দৃষ্টি ভ্রূমধ্যস্থিত স্থান বা নাসাগ্রে স্থাপিত থাকে; সুতরাং আসন অভ্যাস দ্বারা মন যে অনেক পরিমাণে স্বাধীন হইয়া একাগ্রতা সম্পন্ন হয়, তাহা অবাধে বলা যাইতে পারে। যোগসাধনের সকল অবস্থায় যে একাগ্রতার নিতান্ত প্রয়োজন, আসন দ্বারা তাহাই অনেক পরিমাণে সাধিত হয় বলিয়া ঈশ্বর-প্রণিধানের পর এবং প্রকৃত যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আসন অভ্যাস কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। অপরন্তু ইহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যোগের চতুর্থ অঙ্গস্বরূপ যে প্রাণায়াম তাহার সাধন বিষয়েও বিস্তর উপকার হয়। আসন অভ্যাস করিবার সময়ে অনেক প্রকার শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু তাহা এক বার অভ্যস্ত হইলে সে সকল কষ্ট আপনা হইতেই দূরীভূত হইয়া যায়।

প্রণায়াম সাধনের তাৎপর্য্য অতীব চমকার। শরীরের ঐকান্তিক স্থৈর্য্য সম্পাদনই প্রাণায়াম সাধনের প্রধান উদ্দেশ্য। শরীর যদি জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কাতর হয়, ক্ষুৎপিপাসায় [illegible]কুল হয়, মলমূত্র ত্যাগের নিমিত্ত ব্য[illegible] এবং শীতাতপ প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হয়, তাহা হইলে মন যে কোন মতেই অধিক কাল পর্য্যন্ত একাগ্রতা সম্পন্ন থাকিয়া ধারাবাহিক রূপে ব্রহ্মচিন্তারূপ মহান্ বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারে না, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। শারীরিক-উদ্বেগ-জনিত মনের অস্থৈর্য্য নিবারণ করিবার জন্যই পূর্ব্বতন সাধকগণ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন। সাংসারিক লোকেরা শারীরিক বৈকল্য নিবারণার্থে সচরাচর যে সকল পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে তৎসমুদায় উপেক্ষা করিয়া নিত্যবহমান শ্বাসগতি নিরোধ করিবার জন্যই ব্যগ্র হইতেন কেন, তাহা আমাদিগের সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। আমরা শারীরতত্ত্ব পর্য্যলোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহাই বিবৃত হইতেছে। শরীরাভ্যন্তরে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, পাকস্থলী, প্লীহা, যকৃত, মুত্রগ্রন্থি, বীজকোষ প্রভৃতি যে কত প্রকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যন্ত্র আছে এস্থলে তাহার উল্লেখ করাও সহজ নহে এবং করিলেও তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না। এবম্বিধ যন্ত্র সমুদায়ের নিত্য কার্য্যকারিতা নিবন্ধনই শরীরের বৈকল্য ও সচ্ছন্দতা উভয়ই উৎপন্ন হইতেছে। কোন্ সময়ে কোন্ যন্ত্রের কি রূপ কার্য্যকারিতা দ্বারা কোন্ প্রকার বৈকল্য বা সাচ্ছন্দ্য জন্মে, তাহা অদ্যাপি কেহই নিশ্চিত রূপে বলিতে সমর্থ হয়েন নাই। তদ্বিষয়ে কি ভারতবর্ষ, কি ইউরোপ, কি আমেরিকা সকল দেশীয় পণ্ডিতেরাই কিঞ্চিৎ পরিদর্শন ও অধিকাংশ কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়া যাঁহার যাহা ইচ্ছা এক এক রূপ বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের বাক্য যদি সম্পূর্ণ সত্যমূলক হইত, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী না হউক, অন্ততঃ সুসভ্য দেশ সমুদায়ে কখনই অদ্যাপি রোগ জরা প্রভৃতি শারীরিক বৈকল্য সমুদায় মহা প্রতাপে বিরাজ করিতে পারিত না। অস্মদ্দেশীয় যোগসাধকগণ যখন দেখিলেন যে, যে সকল শারীরিক বিকার দ্বারা মনের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই অবশ্যম্ভাবি এবং তত্তাবতের নিবারণ জন্য যে সকল উপায় লোক মণ্ড-

লীতে অবলম্বিত হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই সম্পূর্ণ অনিশ্চিত; তখনই বোধ হয়, তাঁহারা শ্বাসগতি নিরোধ পূর্ব্বক শরীরকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইলেন। শরীরাভ্যন্তরে যত প্রকার যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে শ্বাস যন্ত্রই সকলের পরিচালক। শ্বাস-যন্ত্রের ক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ হইলে আর আর সমুদায়ের ক্রিয়াই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যদি অকস্মাৎ শ্বাস-যন্ত্রের সহিত অন্যান্য যন্ত্রের ক্রিয়া লোপ হয়, তাহা হইলে প্রকৃত মৃত্যুই উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু যদি ক্রমে অভ্যাস দ্বারা তাহাদিগের নিরোধ সাধন করা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগের শুদ্ধ স্তম্ভন ভিন্ন কোন মতেই প্রকৃত মৃত্যু সংঘটিত হইতে পারে না। অভ্যাস দ্বারা শ্বাস-যন্ত্রের সহিত আর আর সমুদায় যন্ত্রের স্তম্ভন সাধন করিতে পারিলে একটি অতীব চমৎকার ফল লাভের সম্ভাবনা। ঐরূপ করিতে পারিলে শরীরের ক্ষয়োদয় সুতরাং ভাব অভাব সকলই নিবৃত্ত হইয়া যায়। শরীরাভ্যন্তরে যে সকল যন্ত্র আছে, তৎসমুদায় প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী বাহির হইতে বিবিধ রূপ পদার্থ আনয়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করে। এই শ্রেণীর কার্য্যকারিতা নিবন্ধনই ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি অনুভূত হয়। অপর শ্রেণী অভ্যন্তরস্থ দূষিত পদার্থ সকল শরীর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়া তাহার অবস্থা সংশোধন করে। এই শ্রেণীর কার্য্যকারিতায় মল মূত্রাদি পরিত্যাগের প্রয়োজন উপস্থিত হয়। অবশিষ্ট শ্রেণী প্রোক্ত দুই শ্রেণীর পরিচালক স্বরূপ। এই ত্রিবিধ যন্ত্রের কার্য্যকারিতা না থাকিলে যে শরীর সম্পূর্ণ রূপে স্তম্ভিত হইয়া সমুদায় শারীরিক ভাব ও অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা এক্ষণে সকলেই অনুমান করিতে পারেন। কেহ কেহ এস্থলে ইউরোপীয় শারীর-বিধান-বিদ্যার মতাবলম্বী হইয়া এই রূপ মনে করিতে পারেন, যে, প্রাণায়াম প্রভাবে নিশ্বাস, আহার, পান, কিছুই শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে কোন মতেই মৃত্যু সংঘটিত না হইয়া থাকিতে পারে না। তাঁহাদিগের এই রূপ মনে করিবার অধিকার আছে বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা যাহা মনে করেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। নিশ্বাস, প্রশ্বাস, আহার ও পানীয় প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি লইলেই যে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না, তাহা অস্মদ্দেশের যে সকল ব্যক্তি ভূকৈলাশ, জসলমির, লাহোর প্রভৃতি স্থানের আধুনিক যোগীগণের দর্শন লাভ বা বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। যাঁহারা প্রাণায়াম সাধনে কৃতকার্য্য হয়েন তাঁহাদিগকে বরং এক প্রকার মৃত্যুঞ্জয় বলিলেই উপযুক্ত হয়। প্রকৃত প্রাণায়াম-সাধকের শরীর শীর্ণ বা জরাগ্রস্তও হইতে পারে না; কারণ যে শরীরের আগম ও নিগমের দ্বার, অর্থাৎ আয় ও ব্যয়ের হস্ত উভয়ই রুদ্ধ, তাহার আর হ্রাসবৃদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক হইতেছে যে, যদিও প্রাণায়াম সাধন দ্বারা প্রকৃত মৃত্যু হয় না বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা শরীর যে সম্পূর্ণ জড়ের ন্যায় হইয়া পড়ে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। প্রাণায়াম সাধন দ্বারা শরীর জড়বৎ হইয়া যায় বলিয়া যে আত্মাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে জড়বৎ হইয়া পড়ে, এমত নহে, [illegible]হার প্রভা কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইবার [illegible] বরং শরীর যতই নিষ্ক্রিয় হয়, উত্তেজনা-শূন্য হয়, ততই তাহার দীপ্তি উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে।

প্রত্যাহার সাধনের উদ্দেশ্যটি সকলেই অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। চক্ষু, শ্রোত্র, জিহ্বা প্রভৃতি বাহেন্দ্রিয় সমুদায়ের

বিদ্যমানতা বশতঃ আত্মা জগত্তত্ত্বের জ্ঞান লাভে অনেক দূর উন্নত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদিগের বিদ্যমানতা বশতঃ আত্মা আবার প্রায় কোন সময়েই সম্পূর্ণ রূপে চঞ্চলতা পরিহার পূর্ব্বক সুস্থির হইতে পারে না। বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সহিত বাহ্যেন্দ্রিয় সকলের এমনই আসক্তি, যে নিদ্রিতাবস্থা ভিন্ন প্রায় আর কোন সময়েই তাহারা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। যদি কেহ কোন নির্জন, নিস্তব্ধ, অন্ধকারময় গৃহে কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বেই অস্থির হইয়া উঠেন; তখন তাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে প্রায় কোনটিই আপনার ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হইতে পারে না। অপরন্তু যদি সেই গৃহে পরক্ষণেই একটি আলোক প্রজ্বলিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই তাঁহার অস্থিরতা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হয়; কারণ তখন তাঁহার চক্ষু সেই গৃহে নানা প্রকার ভোগ্য বিষয় প্রাপ্ত হয়। বাহ্য পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়গণের এই রূপ যে আসক্তি তাহা বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গণের পরিচালক যে মন, তাহারই আসক্তি; ইন্দ্রিয়গণ সেই আসক্তি প্রকাশের দ্বার-স্বরূপ মাত্র। মনের এই রূপ আসক্তি নিবারণ করিতে না পারিলে তাহাকে একাগ্রতা সম্পন্ন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। মন যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে বিষয় উপভোগ করিয়া তাহার তত্ত্ব অবগত হইয়াছে, যাহাতে নূতনত্ব মাত্রই নাই, [illegible] যে সে পুনঃ পুনঃ সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করিবার জন্য ব্যগ্র হয়, ইহাতেই তাহার ভয়ানক আসক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই রূপ আসক্তি নিবন্ধন মনের বিক্ষেপ নিবারণ করিতে হইলে জ্ঞান দ্বারা বিবিধ উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে সতত আয়ত্তাধীনে রাখা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গণ কোন রকমে কিছু দিন নিরুদ্ধ থাকিলে মন আর বাহ্য বস্তুর আসক্তি বশম্বদ হইয়া তাহাদিগের যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে না; সুতরাং অচিরাৎ তাহার বিক্ষেপের অভ্যাস তিরোহিত হয়। ধারণা সাধনের উদ্দেশ্যও পূর্ব্ববৎ। মন যেমন বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়, তাহার নিজ বৃত্তি সমুদায়ের যোগেও তাহা সেই রূপ হইয়া থাকে। যখন কোন বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও মন ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে, তখনই তাহার শেযোক্ত রূপ বিক্ষেপের স্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপ বিক্ষেপ নিবারণ করাই ধারণার এক মাত্র উদ্দেশ্য। যদি চিত্তবৃত্তি সমুদায়ের যথাবৎ সংযমন সাধিত না হয়, তাহা হইলে কি আসন, কি প্রাণায়াম, কি প্রত্যাহার, কিছুতেই মনের সম্পূর্ণ একাগ্রতা সাধিত হইতে পারে না। মনোবৃত্তি সমুদায়কে মনেই আবদ্ধ করিয়া রাখা বিস্তর জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ—তাহার সহিত বাহ্যানুষ্ঠানের অধিক সম্বন্ধ নাই। এই সাধনটি পূর্ব্বোক্ত সকল গুলি অপেক্ষাই কঠিন। যখন মনের এই রূপ সংযমন অভ্যাস পরিপক্ক হয়, তখন সে যাহা চিন্তা করে, তাহা ভিন্ন কোন বৃত্তির প্রেরণা অনুসারেই সে একবারও অন্য বিষয়ে গমন করে না। বহিরিন্দ্রিয় সমুদায় যেমন বহির্বিষয়ে আসক্ত, মনোবৃত্তি সকল শুদ্ধ সেরূপ নহে। তাহারা যেমন বাহ্য তেমনি আভ্যন্তরিক উভয় বিষয়েই সমান আসক্ত। মন যত দিন বাহ্য বা আভ্যন্তরিক বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়, তত দিন সে তাহাদিগের অধীন থাকে। এই রূপ অধীনতার অবস্থা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সে কোন মতেই একাগ্রতা সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব প্রত্যাহার ও ধারণা দ্বারা মন সমুদায়ের অধীনতা হইতে মুক্ত হয়।

ধ্যান ও সমাধির উদ্দেশ্য যে কি তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিবার অপেক্ষা নাই। যোগ শব্দের প্রকৃত অর্থ এই দুইটি সাধনেই নিহিত রহিয়াছে। ধ্যানই ব্রহ্মযোগ সাধনের প্রথম সোপান এবং সমাধিই তাহার শেষ সোপান। এই দুইটি সোপানে উত্থিত হইতে সমর্থ হইবার জন্যই পূর্ব্বতন সাধকগণ প্রথমে পূর্ব্বোক্ত ষড়বিধ যোগাঙ্গের সাধন করিতেন। আর আর সকলই এই দুয়ের পোষক স্বরূপ। এই দুইটি সাধন পরিত্যাগ করিলে পূর্ব্বোক্ত ষড়ঙ্গের কিছুই সার্থকতা থাকে না।

এক্ষণে যম হইতে সমাধি পর্য্যন্ত সমুদায় অঙ্গের পর্য্যালোচনা করিয়া সঙ্ক্ষেপে এই মাত্র উপলব্ধি হইতেছে যে,যম ও নিয়ম সাধন দ্বারা অধ্যবসায়, সাধারণরূপ স্বাধীনতা ও তত্ত্বজ্ঞান, আসন ও প্রাণায়াম দ্বারা বিশেষ রূপ শারীরিক স্বাধীনতা ; প্রত্যাহার ও ধারণা দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিষয় সম্বন্ধীয় বিশেষ রূপ স্বাধীনতা ; এবং ধ্যান ও সমাধি দ্বারা প্রকৃত যোগ পরিলব্ধ হয়। অতএব অস্মদ্দেশীয় পূর্ব্বতন সাধন-প্রণালীর সার মর্ম্ম এই যে, ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ যোগ নিবদ্ধ করিতে হইলে বিশেষরূপ অধ্যবসায় ও জ্ঞান এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা যোগ সাধন করিবার নিতান্ত অভিলাষ করেন তাঁহাদিগেরও বিবিধ রূপ কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা বিশেষ রূপ অধ্যবসায়, জ্ঞান ও স্বাধীনতা প্রভৃতি তিনটি পরম উপাদেয় সামগ্রী সর্ব্বাগ্রে করতলগত করা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্বতন সাধকগণ যে সকল প্রণালীতে ঐ তিনটি সামগ্রী করতলগত করিতেন, আমরাও সেই রূপে করিতে চেষ্টা করিব কি না, তাহাই এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

সমাজসংস্কার।

জগতে কিছুরই স্থায়ীত্ব নাই। সকল পদার্থ পরিবর্ত্তনের নিয়মের অধীন। লোকসমাজও এই পরিবর্ত্তনের নিয়মের অতীত নহে। সকল দেশের লোকসমাজেই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; সেই সকল পরিবর্ত্তন প্রভাবে সেই সকল দেশের লোকসমাজ আকৃতি প্রকৃতি উভয়েতেই এক্ষণে অন্য প্রকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসাধারণ সৌন্দর্য্যানুরাগ ও নিত্য উৎসবপ্রিয়তা সমন্বিত প্রাচীন গ্রীকসমাজ নানা প্রকার ঘটনা বশতঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিড়াল প্রভৃতি পশূপাসনা ও পিরামিড নামক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্ত্তি স্থাপনের প্রতি অনুরাগ সমন্বিত মিশরসমাজও কালপ্রভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইউরোপখণ্ড রোমকদিগের সময়ে যেরূপ ছিল তাহা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ও শিবাল্‌রি অর্থাৎ বীরত্বানুরাগ ও স্ত্রীলোকের প্রতি অসাধারণ সম্মান পোষক প্রথা ও অন্যান্য কারণ নিবন্ধন বর্ত্তমান কালে আর এক আকার ধারণ করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে ভারতবর্ষে কোন প্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই কিন্তু সে সংস্কার অমূলক। ভারতবর্ষের লোক সমাজও পরিবর্ত্তনের নিয়মের অতীত নহে। যদি মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা পুনর্জীবিত হয়েন তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমান লোক সমাজের আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়েন সন্দেহ নাই। তিনি দেখিবেন তাঁহার সময়ের গুরুকুলে দীর্ঘকাল বাস ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান এক্ষণে নাই; তাঁহার সময়ের অগ্নিহোত্র ও পঞ্চযজ্ঞাদি ব্রাহ্মণদিগের নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই; তাঁহার সময়ের বাণপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণের প্রথা প্রচলিত নাই। ব্রাহ্মণগণ শুদ্র-রাজ্যে বাস করা দূরে থাকুক, ম্লেচ্ছ-রাজ্যে বাস করিয়া ম্লেচ্ছের অনুবৃত্তি

করিতেছেন। যে শকদিগকে তাঁহারা অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, সেই শকবংশোদ্ভব জাতি* এক্ষণে ভারতবর্ষের অধীশ্বর হইয়া স্বীয় বাহুবলে আর্য্য রাজাদিগকে করপ্রদ করিয়া তাহাদিগের ভাগ্য যদৃচ্ছা রূপে নিয়ন্তৃত করিতেছেন এবং আর্য্যদিগের আহার পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিষয়ে রীতি নীতি ক্রমে ক্রমে ভিন্ন আকারে পরিণত করিতেছেন।

লোক সমাজে রীতি নীতি বিষয়ে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা দুই কারণে ঘটিয়া থাকে। প্রথম কারণ কালপ্রভাব; দ্বিতীয় লোকের স্বাধীন চেষ্টা। কালপ্রভাবে লোকের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটে। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে লোকের পরিচ্ছদ ও শিষ্টাচার বিষয়ে তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে অনেক গুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইংরাজদিগের রাজত্ব সময়েও ঐ প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কালপ্রভাবে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, লোকে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনাদিগের স্বাধীন চেষ্টা দ্বারা কুরীতি উন্মূলন ও সন্নীতি সংস্থাপন করিতে যত্নবান হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি সকল মধ্যে মধ্যে উদিত হয়েন যাঁহারা লোকসমাজের দুর্দশা দর্শনে কাতর হয়েন এবং কালের মৃদু গতির কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে অগ্রসর করিয়া দিতে যত্নবান হয়েন। এপ্রকার ব্যক্তি ভারতবর্ষেও অনেক উদিত হইয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ শাক্য মুনি নিষ্ঠুর পশুঘাত ও জাতি বিভেদ প্রথার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে ভয়ানক রূপে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছিলেন; তৎপরে এক যুবক অদ্বৈতবাদ প্রচার ও সন্ন্যাস ধর্ম্মের দ্বার সকল জাতির সম্বন্ধে মুক্ত করিয়া আর্য্য সমাজকে অসাধারণ রূপে বিলোড়িত করেন। সেই যুবকের নাম শঙ্করাচার্য্য। যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বত্রিশ বৎসর মাত্র ছিল। তৎপরে রামানন্দ, কবির, নানক, দাদূ, চৈতন্য, পরে পরে উদিত হইয়া হিন্দু সমাজ সংস্কার করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন।

যে সমাজ সংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ না থাকে তাহা তত সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। ধর্ম্ম যেমন আমাদিগের জীবন পরিবর্ত্তন করিতে পারে, এমন আর অন্য কিছুই নহে। পৃথিবীর পুরাবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে যে যেখানে সমাজ সংস্কার বদ্ধমূল হইয়াছে তাহা ধর্ম্ম প্রভাবেই হইয়াছে। কিন্তু যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক প্রাচীন প্রথা একেবারে উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করেন তিনি কোন রূপে কৃতকার্য্য হয়েন না। যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক সংহার অপেক্ষা রক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগী তিনিই সংস্কার কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক প্রাচীন প্রথা একেবারে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করেন, ধূমকেতুর ন্যায় সেই করাল ব্যক্তি কখন সংস্কার কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না। ফরাশিস দেশীয় বিখ্যাত রাজবিপ্লব-আনয়নকারীদিগের ন্যায় তাহার যত্ন বিফল হয়। গ্রহগণ যেমন কেন্দ্রবর্ত্তিনী ও কেন্দ্রবর্জ্জিনী শক্তির সামঞ্জসীভূত প্রভাবে স্বীয় স্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ করে সেই রূপ ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার কার্য্যে মনুষ্যের রক্ষণশীলতা ও উচ্ছেদশীলতা প্রবৃত্তিদ্বয়ের সমঞ্জসীভূত

* স্যাকসন্ শব্দ শকসূনু অর্থাৎ শকপুত্র শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আদিম পুরাবৃত্ত লেখক হিরোডোটসের গ্রন্থে শকসূনুদিগের উল্লেখ আছে। পারস্য রাজের সৈন্যদিগের মধ্যে এক দল শকসূনু ছিল। ইউরোপ খণ্ডে আমাদিগের পুরাণে উল্লেখিত দুই প্রাচীনদিগের মতে অনার্য্য জাতি অদ্যাপি পাওয়া যায়; স্যাকসনি ও ইংলণ্ডে শকেরা এবং হঙ্গেরিতে হূনেরা।

কার্য্য প্রভাবে সম্পাদিত হয়। সংরক্ষণপ্রিয় ব্যক্তিগণের বিদ্যমানতা সমাজের মঙ্গলের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। লোকের সংরক্ষণ-প্রবৃত্তি যদি না থাকিত, তাহা হইলে সমাজে সর্ব্বদাই মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত অনিষ্ঠ ঘটিত। লোকসমাজের অধিকাংশ লোকই সংরক্ষণপ্রিয়, অতএব প্রাচীন মত ও প্রথা যত দূর রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা রক্ষা করিলে সংস্কার-কার্য্যে সুসিদ্ধ হইতে পারা যায়, নতুবা সেই কার্য্যে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই।

উপরের কথা গুলি পৃথিবীর সকল দেশ সম্বন্ধে খাটে। খ্রীষ্ট, মহম্মদ, লুথর প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা প্রাচীন মত ও প্রথা অনেক রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন, ইহা বিলক্ষণ রূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ সকল কথা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যতোধিক খাটে এমন অন্য কোন দেশ সম্বন্ধে খাটে না। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ উদিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত আর সকলে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চীন,শ্যাম,জাপান প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কবির, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা সাধারণ হিন্দু সমাজের প্রতি স্বকীয় প্রভাব বিশিষ্ট রূপে প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তিরা এক্ষণে এক এক সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ে বদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। হিন্দু জাতি অন্য সকল জাতি অপেক্ষা সংরক্ষণপ্রিয়। তাহারদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে গেলে প্রাচীন প্রথা যত দূর রক্ষা করা যাইতে পারে তাহা রক্ষা করিয়া চলা কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারকেরা যত দূর প্রাচীন মত ও প্রথা রক্ষা করা উচিত মনে করেন তাহা অপেক্ষা অধিক রক্ষা করা যাইতে পারে। প্রাচীন আর্য্যেরা নির্বোধ ব্যক্তি ছিলেন না; তাঁহারা যাহা কিছু করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলই ভ্রমাত্মক ও অযৌক্তিক নহে।

"গৃহ কর্ম্ম" হইতে উদ্ধৃত।

গুরু শিষ্য।

গুরু-জনকে দেবতুল্য সম্মান করিবে। কেন না গুরু-জনের মধুময় উপদেশে আমারদের হৃদয়ে সদ্ভাব ধর্ম্ম-ভাব সকল উদ্দীপ্ত হয়। তাঁহারদের প্রাণগত ধর্ম্মানুষ্ঠান সন্দর্শন করিয়া আমরাও সৎকর্ম্ম সাধনে উৎসাহিত হই।

শান্ত সমাহিত বিশুদ্ধ-চরিত্র ঈশ্বর-প্রাণ গুরু-জনকে সংসারের ভয়াবহ প্রবল তরঙ্গের মধ্যে—শোক-সন্তাপ, বিপত্তি বিষাদের অভ্যন্তরে অটলভাবে ধর্ম্মাচরণ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মের উন্নত ভাব সকল আমাদের হৃদয়-ভূমিতে কেমন বদ্ধ-মূল হইতে থাকে।

যখন আমরা সংসার-কোলাহলে হতচেতন হইয়া পড়ি, সাংসারিক কার্য্যে বিব্রত হইয়া আপনারদের জীবনের লক্ষ্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাই, যখন কেবল অন্ধ-শক্তির ন্যায় এখানে কার্য্য করিতে থাকি, তখন কে সস্নেহ ভাবে নিস্বার্থ ও নিষ্কাম হৃদয়ে আমারদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন? তখন কাহার আদেশে আমরা জাগ্রৎ হই? কাহার প্রখর হৃদয়-ভেদী উপদেশে আমারদের পাষাণ-হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে? কাহার কথায় আমারদের দুর্ব্বল মনে বলাধান হয়—নিরুদ্যম চিত্তে উদ্যমের আবির্ভাব হইতে থাকে? আচার্য্যেরই আদেশে, কেবল সাধু সজ্জনগণেরই উপদেশে।

গুরুজনগণের সারগর্ভ উপদেশ সকল একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিবে। পুত্রের ন্যায় তাঁহারদের আজ্ঞাবহ হইবে। যে ব্যক্তি গুরুজন-প্রদর্শিত নির্ম্মল ধর্ম্ম-পথে গমন না করে, যে ব্যক্তি সাধুজনের সদুপদেশ শ্রবণ না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহার দুর্গতির আর পরিসীমা থাকে না। সে ইহলোকে ধর্ম্মজনিত বিশুদ্ধ আনন্দ কখনই সম্ভোগ করিতে পারে না এবং পরলোকেও সহসা সদ্গতি লাভে সমর্থ হয় না।

শিষ্য যেমন গুরুজনকে যথা বিধি সম্মান সমাদর না করিলে, তাঁহারদের হিত-উপদেশ সকল শ্রবণ না করিলে দুঃখভাগী হয়, তেমন গুরুজনও যদি শান্ত সমাহিত-চিত্ত ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু শিষ্যকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ না করেন,অকপট হৃদয়ে যথাশক্তি অভ্রান্ত ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে যত্নশীল না হন, তাহা হইলে তাঁহারদিগকেও কর্ত্তব্য-বিমুখ হইতে হয়। সত্যানুসন্ধায়ী ঈশ্বর-

পিপাসু ব্যক্তিকে গুরুজন সেই বিদ্যার উপদেশ দিবেন, যাহাতে তাহার জ্ঞান-তৃপ্ত হয়, ধর্ম্ম-স্পৃহা চরিতার্থ হয়, চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, ঈশ্বর-লাভ হয় এবং ভ্রম প্রমাদ সকল তিরোহিত হইয়া যায়। স্বার্থ-অন্ধ হইয়া অযথা-যোগ্য সম্মান গ্রহণে কোনক্রমেই শিষ্যকে নিয়মিত করিবেন না। কোনরূপেই তাহার আত্মার স্বাধীনতা বিলোপ করিবেন না।

শিষ্য যাহাতে তাঁহাকে বা কোন মনুষ্য বিশেষকে জ্ঞানধর্ম্মের অভ্রান্ত আদর্শ করিয়া তোলে, তৎপ্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিবেন। সাধু মহাশয় লোকের সৎ-কার্য্য ও সদনুষ্ঠানের অনুসরণের উপদেশ দিবেন, কিন্তু যাহাতে সেই পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-মঙ্গল পূর্ণ-প্রেম পরমেশ্বরেরই প্রতি সর্ব্বতোভাবে মনশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়, তাঁহার শুভাভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া—তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া যাহাতে মানব-আত্মা অনন্ত উন্নতি পথে উত্থিত হইতে পারে কায়মনোবাক্যে তাহারই চেষ্টা করিবেন। যাহাতে শিষ্যের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল সম্যক্রূপে উত্তেজিত হয়, ধর্ম্মানুরাগ ও ঈশ্বর-প্রেম দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হয়, ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য সাধনে—সংসারের কল্যাণ সম্পাদনে অপ্রতিহত অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে এবং পরলোকের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে দৃঢ়ীভূত হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাহারই উপদেশ দিবেন। আচরণ ও অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাই প্রদর্শন করিবেন।

পবিত্রতার এমনি বিচিত্র শক্তি! ধর্ম্মের এমনই মনোহর ভাব যে, হৃদয় একেবারে অসাড় হইয়া না পড়িলে আত্মম্ভরিতা একেবারে সম্পূর্ণরূপে মনকে অধিকার না করিলে আর সংযতেন্দ্রিয় ঈশ্বর-প্রাণ পুণ্যাত্মার প্রতি কাহারো সহসা অশ্রদ্ধা জন্মে না—গুরুজনের প্রতি নিন্দাবাদে কটুকাটব্য প্রয়োগে—তাঁহারদের অসন্তোষ সাধনে প্রবৃত্তি হয় না।

অতএব গুরু-জনকে সর্ব্বদা সম্মান করিবে। কায়-মনোবাক্যে আচার্য্যের অনুগত হইবে। তাঁহারদের প্রদর্শিত পুণ্যপথে বিচরণ করিবে এবং ধর্ম্ম উপদেশ সকল যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ে রক্ষা করিবে। এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন ন্যায়-পরায়ণ ধর্ম্মপ্রিয়-সাধু সকল, পিতামাতা আচার্য্যকে দেববৎ মর্য্যাদা করিতে আদেশ করিয়াছেন। যথা "পিতৃদেবোভব মাতৃদেবোভব আচার্য্যদেবোভব।"

"সমদর্শী" হইতে উদ্ধৃত।

ফুল।

(নির্জ্জন উদ্যানে লিখিত)

(১)

সুন্দর কুসুম! এ ঘোর নির্জ্জনে,
ঘন পত্রাবৃত নিজ সিংহাসনে
নিজ মনে হাস আনন্দেতে ভাস
তোমার তুলনা করি কার সনে?
এমন সুচারু এমন কোমল
এমন পবিত্র এমন উজ্জ্বল
লাবণ্যে গঠিত নির্জ্জনে চিত্রিত,
কি পদার্থ আছে এ পাপ ভুবনে?

(২)

কোমল প্রফুল্ল বদনে তোমার,
কি সুন্দর মাখা নিশার নিহার!
একেত কোমল তাতে হিমজল
যেন ঢল ঢল লাবণ্যের ভার!
নিরখি, নিরখি, যেন ডুবে যাই
ওরে প্রিয় ফুল! তুলনা ত নাই;
কি তুলনা দিব মিছা কি বর্ণিব
অতুলন তুমি বলেছে সংসার।

(৩)

নবীন যৌবনে নব প্রস্ফুটিত
সারল্য, বিনয়, আনন্দে জড়িত,
নারীর বদন সুন্দর কেমন!!
তার সঙ্গে কিরে করিব তুলিত?
জগতের শোভা রমণীর মুখ
তাতেও জীবের হরে শত দুখ,
সকল হৃদয়ে সকল সময়ে
কিন্তু হেন ভাব হয় না উদিত!

(৪)

যেরূপ নির্জ্জনে দূর লোকালয়ে
তরু পত্রাবৃত কুটীর হৃদয়ে,
সতী পতিপ্রাণা গৃহস্থ ললনা
থাকে একাকিনী কুলধর্ম্ম লয়ে।
তার সে সতীত্ব দেব প্রশংসিত,
তুচ্ছ রূপ শোভা যেখানে নিন্দিত;
লম্পটের দৃষ্টি হলাহল বৃষ্টি
করে না; সে আছে তব সম হয়ে।

(৫)

অথবা সুন্দর শিশু সুকুমার
প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে উঠে যে প্রকার,
প্রফুল্ল কোমল মুখে স্বেদজল
ঠিক যেন এই নিশার নীহার
নিষ্কলঙ্ক মুখে নিষ্কলঙ্ক হাসি
এমনি দেখিতে বড় ভালবাসি;
তবে প্রিয় ফুল যদিও অতুল
তার সনে করি তুলনা তোমার।

(৬)

অথবা নির্জ্জন পল্লীতে যেমন
লুকাইয়া থাকে সাধু কোন জন,
তাঁর যে চরিত্র উজ্জ্বল পবিত্র
নিজে প্রকাশিত জানে না ভুবন।
আপন পল্লীতে আপনার ঘরে
নিজের সৌরভে আমোদিত করে;
সেই অজানিত চরিত্র সহিত
হও রে তুলিত হেন লয় মন।

(৭)

কোথা দিনমণি সুদূর গগণে!
কোথা তুমি ফুল সহস্র যোজনে
কিন্তু রে উষার না হতে সঞ্চার

ফুটিয়া উঠিলে আনন্দিত মনে;
দিবাকরে দেখি হইলে পাগল
ঢল ঢল রূপে আনন্দে বিহ্বল,
কতই হাসিছ হেলিছ দুলিছ
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তুলি দিবাকর পানে।

(৮)

কোথায় অগম্য অপার ঈশ্বর,
কোথা ক্ষুদ্রজীব হীনমতি নর!
কিন্তু রে গগনে দেখে সে তপনে
হয় প্রস্ফুটিত জীবেরো অন্তর,
প্রাণ পদ্ম ফুটে তারো দলে দলে;
তারো তনু সিক্ত প্রেম ভক্তি জলে;
এ পাপ ভুবনে সেই জীব সনে
হও রে তুলিত কুসুম সুন্দর

(৯)

তুমি ক্ষুদ্র চক্ষে দিবাকর পানে
যে ভাবে চাহিয়া আছ এক মনে,
নিজ ক্ষুদ্র আঁখি তাঁর চক্ষে রাখি
জীবাত্মা মগন থাকে যোগধ্যানে;
চক্ষে চক্ষে উঠে প্রেমের লহরী;
এ পাপ সংসার যায় রে পাশরি;
সব আশা ফুটে কি সৌরভ ছুটে
কার সাধ্য তাহা বর্ণেতে বাখানে।

(১০)

তোমার আদর করে সর্ব্বজনে
সুসভ্য অসভ্য সকল ভুবনে;
ব্যাধের যুবতী সরলা প্রকৃতি
তোমারে তুলিয়া পরম যতনে,
গাঁথিয়া কোমল সুচিকণ হার,
সোহাগে হৃদয় পরে আপনার;
তুমি প্রিয় ফুল কর্ণে হও দুল
সব অলঙ্কার তুমি তার সনে।

(১১)

সুসভ্য ইংরাজ পাইলে তোমারে
এখনি সাজাবে, তুলি থরে থরে,
প্রণয়িনী পাশে লইয়া উল্লাসে
দিবে বসাইয়া হৃদয় উপরে,
বঙ্গবালা পেলে পরিবে যতনে
সুনীল সুন্দর কবরী বন্ধনে;
বসাবে পুলকে, দোলাবে অলকে;
দেখাবে হাসিয়া নিজ প্রাণেশ্বরে!

(১২)

কিন্তু রে কুসুম! আর্য্য-সুতগণে,
দিয়াছে তোমারে দেবতা চরণে।
ঠিক ব্যবহার সেই রে তোমার
সেই রে সদ্গতি ভাবি মনে মনে!
এমন পবিত্র এমন কোমল
দেব পদ ভিন্ন কোথা যাবে বল?
তোমার মহিমা মানব জানে না
তব গুণগ্রাহী শুধু দেবগণে।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। সূক্ষ্ম জ্ঞান। হরিচন্দ চিন্তামন প্রণীত। লণ্ডন, ১৮৭৫। এই গ্রন্থ খানি ইংরাজীতে প্রণীত, কিন্তু ইহার আখ্যা সংস্কৃত। গ্রন্থকার ইহা বিলাত হইতে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বোম্বাই প্রদেশীয় অতি মান্য ব্যক্তি ও হতভাগ্য গুইকোয়ারের বিলাতস্থ মুক্তিয়ার। তিনি বিলাতে ভগবৎগীতার একটি ইংরাজী ভাষ্য ছাপাইয়া যথেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। আলোচ্যমান গ্রন্থে মন্থন পাত্র, রথ ও হুঁকার সহিত মনুষ্যের সাদৃশ্য দেখান হইযাছে। শরীর মন্থন পাত্র,তাহার ভিতর রিপু সকল ক্রমিক ঘূর্ণিত হইতেছে। চিন্তা মন্থন দণ্ড, নিষ্ঠা রজ্জু, জ্ঞান বিশুদ্ধ নবনীত, বৃথা আমোদ দধি। নবনীত হইতে মনুষ্যের বাঞ্ছনীয় সুখ স্বরূপ ঘৃত প্রাপ্ত হওয়া যায়। রথের সঙ্গে মনুষ্যের সাদৃশ্য প্রসিদ্ধই আছে। যাঁহারা উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই সাদৃশ্যের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছেন। গ্রীশ দেশীয় মহাজ্ঞানী প্লেটোর গ্রন্থেও এই উপমা প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের পাঠকবর্গ রথের সহিত মনুষ্যের সাদৃশ্য যেমন বুঝিতে পারিবেন হুঁকার সহিত তাহার সাদৃশ্য বোধ হয় সেরূপ সহজে বুঝিতে পারিবেন না। আমরা নিম্নে তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছি। শরীর হুঁকা,রিপু সকল তমাক, মন খোল, বুদ্ধি নলচে, জ্ঞান অগ্নি, নল সুখ, ধূম নির্ব্বোধিতা। হুঁকার মৃদু শব্দ স্থিরবুদ্ধিপ্রদত্ত পরামর্শ। যেমন অগ্নি দ্বারা তমাক দগ্ধ হইয়া তাহার বিশুদ্ধ অংশ জল মধ্য দিয়া আসিয়া আমাদিগের ভোগ্য হয়,সেইরূপ রিপু সকল জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া তাহাদের বিশুদ্ধ অংশ আমাদিগের ভোগের বিষয় হয়।

২। হিন্দু বিবাহ সমালোচন। প্রথম খণ্ড। শ্রীভুবনেশ্বর মিত্র কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, বাল্মীকী যন্ত্র। সম্বৎ ১৯৩১। এই পুস্তক খানি মহামান্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে উৎসর্গিত হইয়াছে। পুস্তকের উদ্দেশ্য ভূমিকায় এই রূপে বিবৃত হইয়াছে। "এই পুস্তকে প্রচলিত বাল্য বিবাহ, অসম বিবাহ, বহু বিবাহ এবং অধিবেদন আর সাম্প্রতিক অপ্রচলিত বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ের শাস্ত্রিকতা ও যৌক্তিকতার যথাসাধ্য বিচার করা গিয়াছে। তন্নিমিত্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রীয় ও পৌরাণীক প্রমাণ তথা আধুনিক ও পুরাকালের শারীরতত্ত্বজ্ঞ দিগের মত পর্য্যালোচিত হইয়াছে। বিবাহ রীতির দোষ বশতঃ সমাজে যে সকল অনিস্ট রাশি উদ্ভূত হইয়া আসিতেছে, তাহা বিষয় বিশেষের বর্ণন স্থলে প্রদর্শিত এবং তথায় তাহাদিগের নিবারণোপায়ও প্রস্তাবিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মুসলমান ও খৃস্টীয় সমাজ ও তত্তৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে। তদ্দ্বারা যে কেবল ঐ ঐ সমাজের বৈবাহিক পদ্ধতির আভাস দেওয়া হইয়াছে, তাহা নহে; হিন্দু বিবাহ রীতি ও তদন্তর্গত ইষ্টানিষ্ট ফলের তত্ত্ব নির্ণয়ে উহা পোষক স্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে"। গ্রন্থের এই প্রথম খণ্ডে কেবল বাল্য বিবাহ ও অসম বিবাহের বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। এদেশের সামাজিক বিষয় সকল, হিন্দু-

শাস্ত্র-জ্ঞান, ইউরোপীয় বিজ্ঞান-জ্ঞান ও তীক্ষ্ণ যুক্তি সহকারে কিরূপে আলোচিত হওয়া উচিত, এই পুস্তক তাহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত নহে। গ্রন্থের ভাষাও প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ ও বিষয়োচিত গম্ভীর। আমরা অনুরোধ করি, গ্রন্থকার এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড শীঘ্র প্রকাশ করিয়া সাধারণবর্গকে উপকৃত করেন।

৩। সোজা ও তকরারী জমাখরচী হিসাব অনুসারে মহাজনী দর্শন এবং জমিদারী ও বাজার হিসাব। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত। সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত। ইংরাজী ১৮৭৫ সাল। এই খানি বড় উপকারী গ্রন্থ। ইংরাজেরা মহাজনের জাতি; তাঁহাদিগের ব্যবহৃত জমা খরচী হিসাব প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ প্রণালীকে পত্তন ভুমি করিয়া নবীন বাবু এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা মান্যবর উড্রো সাহেবকে উৎসর্গিত হইয়াছে। আমাদিগের মাননীয় বন্ধু বাবু ঈশাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থটি দেখিয়া দিয়া গ্রন্থকারকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

সংবাদ।

বিগত ৭ ভাদ্র রবিবার ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতে ও অপরাহ্ণে উভয় কালেই ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। অপরাহ্ণের উপাসনা কার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদন করিয়াছিলেন। উৎসব-কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের শোভমান উদ্যান-গৃহেই হইয়াছিল। উপাসক দলে উৎসব-ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছিল। উক্ত উৎসব উপলক্ষে দীন দরিদ্রদিগকে অর্থ ও অন্ন সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল দত্ত মহাশয়ই এই সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

বিগত ২৩ ভাদ্র মঙ্গলবার বনহুগলী বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব-কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুনিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে উৎসব-উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল মল্লিক মহাশয়ের উদ্যান-গৃহেই উক্ত কার্য্য সমাধা হয়। সায়ংকালের উপাসনা শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদন করেন, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহাশয় সংগীত কার্য্য সমাধা করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উপাসক দলে উৎসব-ক্ষেত্র পূর্ণ হইয়াছিল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব-উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীজগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

আষাঢ় ১৭৯৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	২ ৫ ৩ /১৫
পূর্ব্বকার স্থিত		...	৩ ৭ ৬ ৴/১০
সমষ্টি	...	...	৬ ২ ৯ ।/ ৫
ব্যয়	...	...	২ ৯ ৩ ৴/১৫
স্থিত	...	...	৩ ৩ ৬ ,/১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৪ ১ ৴/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	১ ১ ৯ ॥৴/১০
পুস্তকালয়	...	...	৩ ॥/ ৫
যন্ত্রালয়	...	...	৭ ৬ । ১০
গচ্ছিত	...	...	১ ২ ।/০
সমষ্টি	...	..	২ ৫ ৩ /১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১ ১ ৮ ॥৶/১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	৮ ১ (১৫
পুস্তকালয়	...	...	২ ২ ৸/১০
যন্ত্রালয়	...	...	৫ ৯ ৸৴/০
গচ্ছিত	...	...	১ ০ ॥৴/১৫
সমষ্টি	...	...	২ ৯ ৩ ৴/১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের

বাটীর মধ্যের দান	...	...	৩ ৭
দানাধারে প্রাপ্ত	...	...	৪ ৴/১০
			৪ ১ ৴/১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা।
সম্বৎ১৯৩২। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬। ১ আশ্বিন বৃহস্পতিবার।

Registered No 52.

নবম কল্প

প্রথম ভাগ

৩৮৭ সংখ্যা কার্ত্তিক ১৭৯৭ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৬
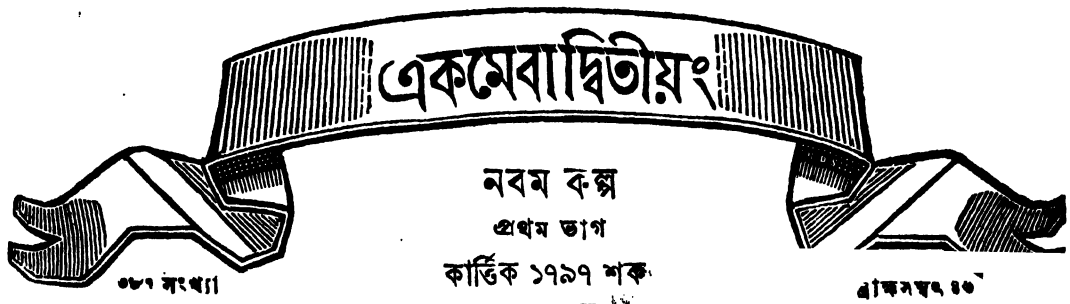
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থা।

ঈশ্বরেতে আত্মার্পণ ও তাঁহার সহিত যোগসাধন ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থা।

মনুষ্য প্রতি পদে পদে অনুভব করে যে সে সর্ব্বদা এক অলৌকিক পুরুষের অধীন। মনুষ্য ভাবে এক, হয় অন্য। মনুষ্য চেষ্টা করে এক, হইয়া পড়ে অন্য। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি আপনার জীবন পর্য্যালোচনা করেন, তাহা হইলে তিনি অনুভব করিবেন যে, অনেক সময় তাঁহার ইচ্ছার বিপরীত ঘটনা ঘটিয়াছে। এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ক্ষীণতার কার্য্য করে; দ্রুতগামী দৌড়িয়াও আপনার অভীষ্ট সাধন করিতে পারে না; অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুদ্ধি-চালনা করিয়াও কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারে না; অনেককে অসম্পূর্ণ-মনোরথ হইয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইতে হয়। আমরা কালস্রোতে সকলেই ভাসমান আছি, সেই কালস্রোত আমাদিগকে এক সময়ে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। মনুষ্যকে পৃথিবীরূপ রঙ্গ-ভূমিতে অভিনয় করিয়া তাহা হইতে এক সময় নিষ্ক্রান্ত হইতেই হয়। সংসার-সমুদ্রে মনুষ্য বুদ্‌বুদের ন্যায় উত্থিত হইয়া পরক্ষণেই তাহাতে লীন হয়। মনুষ্য-জীবন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় প্রতীত হয়। মৃত্যু কখন কাহাকে কেশাকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। যখন লোকের মৃত্যু হয়, সমস্ত অন্তর ও বাহ্য ঘটনা সকল যেন সেই মৃত্যু সংঘটনের প্রতি অনুকূল হয়। যখন লোকের বিপদ ঘটে, তখন সমস্ত অন্তর ও বাহ্য ঘটনা সকল যেন সেই বিপদ আনয়নের সহকারী হয় এই রূপ প্রতীত হয়। মনুষ্য আপনি আপনার অধীন নহে। ইহা বিলক্ষণ রূপে বুঝা যায় যে, এক অলৌকিক পুরুষ আমাদিগের ভাগ্য নিয়ন্তৃত করিতেছেন। তাঁহার শক্তি অসীম ও রাজ্য অনন্ত, তাঁহার হস্ত হইতে পলায়ন করিবার কোন উপায় নাই। অতএব তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে আত্মার্পণ করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু এই আত্মার্পণ প্রীতির সহিত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি দৈত্য নামক প্রভূত ক্ষমতাপন্ন নিষ্ঠুর জীব যথার্থ থাকিত, তবে মনুষ্য তাহার ক্ষমতা অনুল্লঙ্ঘনীয় জানিয়া যেমন তাহাকে আত্মার্পণ করিত এ আত্মার্পণ সেরূপ আত্মার্পণ নহে। সেই মঙ্গলময়ের নিকটে যে আত্মার্পণ তাহা প্রীতির সহিত আত্মার্পণ।

ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের এমনি সম্বন্ধ যে, সে তাঁহাকে প্রীতি না করিয়া কখনই থাকিতে পারে না। জগতে চতুর্দ্দিকে অন্যায় ও নিষ্ঠুরতাচরণ দেখিয়াও সে ঈশ্বরকে করুণাময় ও প্রেমাস্পদ বলিয়া না বিশ্বাস করিয়া কখনই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। এই বিশ্বাস এক প্রকার স্বাভাবিক সংস্কার। যদি এই বিশ্বাসের কোন উদাহরণ থাকে জন্তুদিগের মধ্যে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন কোন পশু যেমন মানব-প্রভুকে ভাল বাসে, মনুষ্য সেইরূপ ঈশ্বরকে ভাল বাসে। তিনি যদি আমাদিগকে হত্যা করেন তথাপি তাঁহাকে আমরা না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারি না। সেই পরম প্রেমাস্পদ যাহা করেন তাহাই আমাদিগের পক্ষে ভাল ও আমাদিগের শিরোধার্য্য এই রূপ ভাবে তাঁহাকে আত্মার্পণ করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য যখন এই আত্মার্পণের অবস্থাতে উত্তীর্ণ হয় তখন সচরাচর প্রার্থনা শব্দ যে অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে সেরূপ প্রার্থনা আর থাকে না। এই অবস্থাতে কেবল একটি মাত্র প্রার্থনা থাকে তাহা এই; "নাথ! তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।"

ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থাতে সচরাচর উপাসনা শব্দ যে অর্থে গৃহীত হইয়া থাকে সেরূপ উপাসনাও থাকে না। উপাসনা শব্দের অর্থ ঈশ্বরের নিকট উপবেশন। কিন্তু এ অবস্থাতে উপবেশন আর থাকে না, সাধক ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া যান। জ্ঞান, প্রীতি, অনুষ্ঠানে মহানাত্মা ঈশ্বরের সহিত সেই ক্ষুদ্র আত্মা এক হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত সাধকের ইচ্ছা সম্মিলিত হয়। যেমন নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া অস্তমিত হয় সেই রূপ তাঁহার সকল ইচ্ছা, সকল কামনা, সেই ঈশ্বরে গিয়া অস্তমিত হয়। তিনি ঈশ্বর-গত চিত্ত ও ঈশ্বর-গত প্রাণ হয়েন এবং তাঁহাতে সর্ব্বদা জীবিত থাকেন। ইহারই নাম যোগ। যোগের পরিপক্কতার প্রধান পরীক্ষা এই যে সাংসারিক কার্য্য দ্বারা তাহা ভঙ্গ হয় না। সংসারাসক্ত লোকের নিকট ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে কিন্তু বাস্তবিক ইহা সত্য, পরম সত্য।

উপরে বর্ণিত অবস্থা মনুষ্য একেবারে প্রাপ্ত হয় না; উহা দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধন-সাপেক্ষ। মনুষ্য ঐ অবস্থাতে উত্তীর্ণ হইলে তাহা তাঁহার স্বাভাবিক হইয়া যায় তখন তাঁহার আর সাধনের আবশ্যকতা থাকে না; তিনি সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।

কিন্তু কয় ব্যক্তি উল্লিখিত অবস্থাতে উপনীত হইয়াছেন? কেহ কেহ ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থায় আরোহণ করেন নাই কিন্তু সেই অবস্থা প্রাপ্তির ভান করেন। তাঁহারা এমন ভান করেন যে, যেন ঈশ্বরকে তাঁহারা করতলস্থ করিয়াছেন; ঈশ্বর যেন তাঁহাদিগের জ্ঞাতি কুটুম্ব অথবা উদ্যানের বন্ধু এই রূপ তাঁহার সহিত তাঁহারা আলাপ ও ব্যবহার করেন কিন্তু বস্তুতঃ তাহা তাঁহাদিগের কল্পনা মাত্র। এমন সকল লক্ষণ আছে যাহা দ্বারা অনুভব করা যায় যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না। তাহার একটি প্রধান লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে গর্ব্ব-হীনতা ও প্রকৃত নম্রতা। ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা ধর্ম্মের নিম্নাবস্থার যে সকল কর্ত্তব্য তাহা যেন পরিত্যাগ না করি। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া সাধনাদি ধর্ম্মের নিম্নাবস্থার কর্ত্তব্য পালন পরিত্যাগ করেন এবং ক্ষণস্থায়ী ভাব ও কল্পনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থা প্রাপ্তির ভান করেন তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া যায়। আইস আমরা সকল

প্রকার ভান পরিত্যাগ করিয়া উপরে বর্ণিত ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থায় শান্তভাবে সাধন দ্বারা ক্রমে আরোহণ করিতে চেষ্টা করি।

সাংখ্য-দর্শন।

(পূর্ব্ব পত্রিকার অনুবৃত্তি)

(তিষ্ঠতু)—কপিল সিদ্ধান্ত করিলেন, "প্রকৃতি জড়া, অস্বতন্ত্রা অথচ জগনির্ম্মাণ-কর্ত্রী"—এ সিদ্ধান্ত কেমন হইল?—এ সিদ্ধান্তের সঙ্গতি কি প্রকারে হইবে?—যেহেতু দেখা যায় জড় বস্তুর স্বতঃপ্রবৃত্তি নাই, যদি কদাচিৎ কোন জড়ের স্বতঃপ্রবৃত্তিতা থাকে এমন হয়—তবে তাহার সে প্রবৃত্তি অনিয়মিত প্রবৃত্তি হইবে—সুতরাং তাদৃশ অনিয়মিত প্রবৃত্তিতা অবধারণ করা প্রকৃতির পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত। বিবেচনা কর,—এমন শৃঙ্খলা-সম্পন্ন, এমন নিয়মানুগত, এমন অদ্ভূত কৌশলযুক্ত জগতের নির্ম্মাণ কি ইচ্ছাদি-গুণ-শূন্য জড়স্বভাব প্রকৃতির দ্বারা সম্ভবে? কখনই না। তবে এইরূপ হইলে কথঞ্চিৎ সঙ্গতি হইতে পারে—প্রকৃতি উপাদান; আর নিত্য, অব্যাহতেচ্ছ, নিত্য জ্ঞান সম্পন্ন ও সর্ব্ব শক্তিমান্ কোন কর্ত্তৃ পুরুষ তাহার অধিষ্ঠাতা।

কপিল বলেন, না—সেরূপ না। রথ একটি জড় বস্তু, কিন্তু কোন চেতনাবান পুরুষ তাহার অধিষ্ঠাতা হইয়া তাহাকে যেমন যথেচ্ছ-গতিমান করে; অথবা সুবর্ণখণ্ড এক জড় বস্তু, কোন কুশলী পুরুষ অধিষ্ঠাতা বা কর্ত্তা হইয়া তাহাকে যেমন কুণ্ডলাদি আকারে পরিণামিত করে, প্রকৃতির সম্বন্ধে সেরূপ পরিণামকর্ত্তা বা প্রেরণকর্ত্তা বা সেরূপ অধিষ্ঠাতা কেহই নাই। প্রকৃতি জড়া তাই বলিয়া রথনিয়ন্তা সারথির ন্যায় তাহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকা আবশ্যক হয় না। প্রকৃতি অস্বতন্ত্রা, তাই বলিয়া তাঁহার পরিণাম, কর্ম্মকারের অধীন সুবর্ণপরিণামের তুল্য নহে। তাঁহার অধিষ্ঠাতা আত্মা, অধীনতা নিজ শক্তির নিকট।

"তৎসন্নিধানাদধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ।" (কপিল)

যেমন সন্নিধান বশত জড়স্বভাব অয়স্কান্ত-মণির শল্যনিষ্কর্ষকত্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সংযোগ বা সান্নিধ্য বশতঃ আত্মারই অধিষ্ঠাতৃত্ব সিদ্ধি হয়।

"নিরীচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লৌহঃ প্রবর্ত্ততে।
সত্তামাত্রেণ দেবেন তথা স্বয়ং জগজ্জনঃ।"
(বিজ্ঞানভিক্ষু)

যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়েই জড়; ইচ্ছাদিগুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত হইয়াও সন্নিধান বশতঃ লৌহশরীরে গতি-ক্রিয়া এবং চুম্বকশরীরে আকর্ষণ-ক্রিয়া উপস্থিত হয়, সেইরূপ, আত্মা নিষ্ক্রিয় নিরীহ এবং প্রকৃতি জড়া ও স্বতঃপ্রবৃত্তি-রহিত হইলেও সন্নিধান-বিশেষ-বলে প্রকৃতি-শরীরে পরিণামশক্তির উদয় হয়। তবে যে প্রকৃতি জড় বলিয়া অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা করিয়াছিলে, তাহা অলীক অর্থাৎ আশঙ্কা মাত্র। যেহেতু নিয়মিত পরিণাম হওয়াই প্রকৃতির শক্তি। অপিচ, জড় বস্তুর প্রবৃত্তি যে অনিয়মিত রূপেই হয়—এই জ্ঞান তোমার কোথা হইতে সঞ্চয় হইল? অবশ্য কোন বাহ্য বস্তু হইতেই হইয়া থাকিবে। যদি তাহাই হয়, তবে পুনশ্চ বস্ত্বন্তরের প্রতি বুদ্ধি নিবেশ কর, দেখিবে যে সকল বস্তুই নিয়মিত পরিণামের অধীন। তবে যে কদাচিৎ অনিয়মিত পরিণামও লক্ষ্য হয়, তাহার কারণ, মূলে কারণ-কূটের বিঘটন থাকা। দুগ্ধের বিকার দধিই হয়, কর্দ্দম হয় না। চূর্ণ বীজ-সংযুক্ত হরিদ্রা রক্তাকারই ধারণ করে, কৃষ্ণাকার ধারণ করে না। শত সহস্র চেতন বা বুদ্ধিমান্ পুরুষের অধিষ্ঠান থাকিলেও তাহার অন্যথা হইবে না। প্রকৃতি

বা প্রাকৃতিক বস্তুর নিয়মিত পরিণামের বিষয়ে বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি পরীক্ষা শাস্ত্রই সাক্ষ্য প্রদান করিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"সলিলবৎ প্রতি প্রতি গুণাশ্রয় বিশেষাৎ।"

মেঘ-বিনির্ম্মুক্ত জল এক ও একরস; কিন্তু সেই একরসাত্মক জল পৃথিবীতে আসিয়া, পার্থিব বিকার ও তাল, তালি, নারিকেলাদি ভিন্ন ভিন্ন বীজভাবাপন্ন বিকারের সংযোগ বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ফলে, ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল প্রভৃতি ভিন্ন রসের উৎপাদন করে বা ভিন্ন ভিন্ন রসাকারে পরিণত হয়, তেমনি, প্রকৃতি-নিষ্ঠ গুণত্রয়ের এক এক গুণের অভিভব ও এক এক গুণের সমুদ্ভব হেতুক প্রধান প্রধান গুণ ভাবের সহযোগে অপ্রধান গুণ ভাব সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থাকার প্রাপ্ত হয়। অতএব, জগদ্‌যন্ত্রের বৈচিত্র্য ও নিয়ম পূর্ব্বক প্রচলন দেখিয়া প্রকৃতি ভিন্ন পদার্থান্তর সত্তার কল্পনা করিবার আবশ্যক নাই।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বা মহত্তত্ত্ব।

"গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্ব্বভুব হ।" (বিষ্ণু)

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে অর্থাৎ আদি-সর্গ কালে আদি-আত্মার সন্নিধি বিশেষ বশতঃ প্রকৃতি-শরীরে বিক্রিয়ার উদয়—প্রাকৃতিক গুণ সমুদায়ের সংক্ষোভ অর্থাৎ সাম্যাবস্থার বিনাশ হইয়া বিষমাবস্থার আবেশ—তদ্দশায় সত্ত্ব দ্রব্যের বিশিষ্ট পরিণাম, (যথোচিত শক্তিসম্পন্না বুদ্ধিরূপে পরিণাম) এই প্রাথমিক বিশিষ্ট পরিণামের নাম মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধি। এই মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধিকে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক প্রাণিনিষ্ঠ প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। দৃষ্ট হইবে যে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বীজস্থান অন্তঃকরণ। আরও দৃষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমান প্রাণিনিষ্ঠ প্রত্যেক অন্তঃকরণ সংযুক্ত হরি হর মূর্ত্তির ন্যায় দ্বিবিধ পরিণামবৎ বস্তু সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। তাহার প্রথম পরিণামের নাম মনন বা অধ্যবসায়। দ্বিতীয় পরিণামের নাম অভিমান বা অহংভাব। অধ্যবসায়—"আমি" "আমি আদি" "বস্তু" "বস্তু আছে" "আমার" "আমার কৃতিসাধ্য" "আমি" "আমি" "আমি করিতে পারি"—ইত্যাদি প্রকার সহজাত নিশ্চয়িকা জ্ঞানের নাম অধ্যবসায়। আন্দোলন বা অননুসন্ধান পূর্ব্বক সহজাতস্বরূপে যে নিশ্চয়াত্মিকা দৃঢ়তম জ্ঞান জীবের অন্তরাত্মায় নিরন্তর লগ্ন আছে, তাহাই বুদ্ধির অধ্যবসায়াত্মিকা বৃত্তি; সেই বৃত্তিমৎ অংশই ব্যষ্টি মহান্ বা ব্যষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব। এই ব্যষ্টি মহান্ বা ব্যষ্টি বুদ্ধিতত্ত্বের সমষ্টিই মূল মহত্তত্ত্ব বা মূল বুদ্ধিতত্ত্ব। এই মূল মহত্তত্ত্বের নামান্তর হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, কার্য্য-ঈশ্বর (অর্থাৎ হরি হর প্রভৃতি)। সাংখ্যানুগত পৌরাণিকেরা এই পদার্থকেই

"মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ।"
(বিষ্ণু পুরাণ)

মহত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব, ব্রহ্মা, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর প্রভৃতি নামে বর্ণন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষ-লোক, চন্দ্র-লোক, সূর্য্য-লোক, গ্রহলোক, নক্ষত্র-লোক, ব্রহ্ম-লোক প্রভৃতি সমস্ত লোকের সমস্ত পদার্থই ইহার অধীন। আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্র-লোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, সূর্য্য-লোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, পশুর জ্ঞান, পক্ষীর জ্ঞান,—ইত্যাদি ক্রমে প্রত্যেক জগতের প্রত্যেক প্রাণী কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন হইয়া প্রত্যেক জগতের প্রত্যেক বস্তুকেই অধিকার করিয়া আছে। যাহা কোন জগতের কোন প্রাণীর জ্ঞানের অধিকৃত নহে তাহা নাই। অতএব, সমস্ত জগতের

সমস্ত অন্তঃকরণের একীভাব ব্রহ্মা, হিরণ্য-গর্ভ, বা কার্য্য ঈশ্বর বলা যায়। সাংখ্য এবং সাংখ্যানুগত পুরাণ নির্ম্মাতারা বলেন, যেমন আমরা আমাদের এই হস্ত পাদাদি বিশিষ্ট দেহের উপর "আমি" এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি, এইরূপ হিরণ্য-গর্ভ বা ঈশ্বর কথিতপ্রকার অন্তঃকরণ সমষ্টির উপর "আমি" অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছেন। আমাদের দেহের উপর যেমন আমার কর্ত্তৃত্ব, সেইরূপ সমষ্টি অন্তঃকরণের উপর হিরণ্য-গর্ভের কর্ত্তৃত্ব। আমরা যেমন আমাদের হস্ত পাদাদিকে যথেষ্ট প্রেরণ করি, সেইরূপ, হিরণ্য-গর্ভ সমষ্টি অন্তঃকরণকে প্রেরণ করেন; এই মত কপিলের গ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট না হইলেও সাংখ্যমতবক্তা অন্যান্য আর্ষ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কাপিল গ্রন্থে কেবল "মহদাখ্যমাদ্যং কার্য্য তন্মনঃ"—এই কথাটি আছে।

দ্বিতীয় পরিণাম বা অহঙ্কারতত্ত্ব।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম পরিণামের অর্থাৎ "আমি" "আমায়" ইত্যাদি সহজাত নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির এক দেশে যে "অহং" "আমি আছি" ইত্যাদি অহং ভাব বা অভিমান সংলগ্ন আছে, তাহার নাম অহঙ্কার। এই সমষ্টি অহঙ্কারের নাম অহঙ্কারতত্ত্ব। অভিমান ও অহঙ্কারবৃত্তির প্রভেদ এই যে মহতত্ত্বের অন্তর্গত 'আমি' প্রভৃতি সহজাত অর্থাৎ অলক্ষ্যোৎপন্ন আর অহঙ্কার তত্ত্বের অন্তর্গত "আমি আছি" প্রভৃতি লক্ষ্য পূর্ব্বক উৎপন্ন।

তৃতীয় পরিণাম ইন্দ্রিয় ও পরমাণু।

এই অহঙ্কার তত্ত্বের দুই পরিণাম। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রা (পরমাণু)। যেমন এক দুগ্ধ রূপ উপাদান হইতে দ্বিবিধ বিকার অর্থাৎ আমিক্ষা (ছানা) ও বাজী (ছানার জল) জন্ম লাভ করে, সেইরূপ, এক অহঙ্কার রূপ অভিন্ন উপাদান হইতে উক্ত দ্বিবিধ বিকার আত্ম লাভ করে। তন্মধ্যে, ইন্দ্রিয়গণ প্রকাশ ও লাঘবধর্ম্মা সত্ত্বাংশের বিকার; আর, ভূতগণ জড়ধর্ম্মা তমাংশের বিকার। অপিচ, সমস্ত ইন্দ্রিয় ও সমস্ত পরমাণু একাকার না হইবার কারণ কেবল রজো দ্রব্যের পরিচালনা বিশেষ। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের শক্তি, স্বভাব ও আকার প্রকারাদি ভিন্ন; কেবল প্রকাশকত্ব ও লঘুত্বই অভিন্ন। আর প্রত্যেক জাতীয় পরমাণুর স্বভাব ও শক্তি প্রভৃতি ভিন্ন; কেবল অস্থূলতা ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতাই অভিন্ন। এরূপ ভিন্নতার কারণ এই যে, ত্রৈগুণ্যযুক্ত অহঙ্কার পদার্থের পরিণাম কালে যে যে অংশে যে যে রূপ পরিণাম হইতে ছিল, পরিচালক রজ অংশ তাহার সেই সেই অংশেরও সেই সেই রূপ গুলি পরিচালিত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত করিয়াছে। ফল, প্রাকৃতিক পরিণাম বিচিত্র। কোন কোন মতে,

"ইত্যেষঃ প্রাকৃতঃ সর্গঃ——
অবুদ্ধি পূর্ব্বক স্বেষ ব্রাহ্মীং সৃষ্টিং নিবোধত।"

এই পর্য্যন্তই অবুদ্ধি পূর্ব্বক প্রাকৃতিক সৃষ্টি। অতঃপরই জৈবিক সৃষ্টির ন্যায় বুদ্ধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মী সৃষ্টি, অর্থাৎ আমরা যেমন সলিল, সূত্র, মৃদাদি লইয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক ঘট পটাদি নির্ম্মাণ করি, এই রূপ, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর উক্ত প্রাকৃতিক উপাদান লইয়া বুদ্ধি-নিয়মিত বিবিধ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তত্তৎ উপাদান দ্বারা বুদ্ধি পূর্ব্বক নিয়মিত করা ও কৌশলে জগৎ রচনা করাই তাঁহাদিগের ঈশ্বরত্ব।

অপিচ, উক্ত অহঙ্কারিক একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রার মধ্যে, ইন্দ্রিয়গণের এক প্রকার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, আর তাহা বিস্তার করিবার আবশ্যক নাই। তবে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা-অনুসারে কেবল মন সম্বন্ধে আর কিছু বলিব।

আর্য্য জাতির নীতি-শাস্ত্র।

রাজনীতি প্রকরণ।

(পূর্ব্ব পত্রিকার অনুবৃত্তি)

"কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ হর্ষো মানমদৌ তথা।
এতানতিশয়ান্রাজা শত্রূনিব বিশাতয়েৎ॥"

রাজা কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, মান এবং মদ (মত্তভাব),—এই গুলিকে প্রবৃদ্ধ হইতে দিবেন না, শত্রুর ন্যায় গণ্য করিয়া যাহাতে ঐ দোষ গুলি উন্মূলিত হয় তাহা করিবেন।

"সেব্যাঃ কালেষু যুক্ত্যেতে লোভ গর্ব্বৌ বিবর্জয়েৎ।"

কাম, ক্রোধ, উৎসাহ ও মান,—এ সকলের একবারে উচ্ছেদ করাও উচিত নয়। উপযুক্ত কাল, উপযুক্ত দেশাদি উপস্থিত হইলে, যুক্তি পূর্ব্বক উহাদিগের সেবা করিবেন, পরন্তু লোভ ও গর্ব্ব এই দুইটীকে একবারেই পরিহার করিবেন।

"তেজএব নৃপানান্তু তীব্রং সূর্য্যস্য বৈ যথা।"

রাজাদিগের তেজ ধারণ করা কর্ত্তব্য। রাজাদিগের তেজই সূর্য্যের ন্যায় তীব্রতর।

"তত্রগর্ব্বং রোগযুক্তকায়বত্তন্তু সংত্যজেৎ।"

রোগযুক্ত শরীর যেমন ত্যজ্য, সেইরূপ, গর্ব্বযুক্ত রাজ শরীর ত্যজ্য।

"আখেটকাক্ষৌ স্ত্রীসেবা পানশ্চৈবাত্মদূষণম্।
বাগ্‌দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যং সপ্তৈতানি বিবর্জয়েৎ।"

আখেটক (মৃগয়া)—অক্ষ (পাশ ক্রীড়াদি)—স্ত্রী সেবা—পান (সুরাপান)—আত্ম দূষণ (যাহাতে আত্মা কলুষিত হয়)—বাক্ পারুষ্য (কটু বাক্য)—দণ্ড পারুষ্য (কঠিন দণ্ড),—রাজা এই সাতটিকে যথাযথ বর্জন করিবেন।

"পরস্ত্রীষু বিরক্তাসু সেবা মেকান্তত স্ত্যজেৎ।
সতীষু নিজ নারীষু প্রেম্না কুর্য্যাচ্চ সেবনম্।"

পর স্ত্রীতে, বিশেষত বিরক্তা স্ত্রীতে রাজা অনুগত হইবেন না। সাধ্বী আত্ম-স্ত্রীতেই প্রীতি পূর্ব্বক অনুগত থাকিবেন।

"রতিপুত্রফলা দারাস্তাংস্তু নৈকান্তত স্ত্যজেৎ।
তয়োঃ সিদ্ধ্যৈ স্ত্রিয়ঃসেব্যা বর্জয়িত্বাতিসক্ততাম্।"

স্ত্রী সেবার ফল রতি এবং পুত্র; সুতরাং বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ ত্যাগ অবিধেয়। পরন্তু তদুভয়ের নিমিত্ত স্ত্রীতে অনুগত থাকা উচিত হইলেও যাহাতে অতিশয় আসক্তি না জন্মে এরূপ করিয়া স্ত্রী সেবা করাই রাজাদিগের পক্ষে উচিত।

"মৃগয়াস্তু প্রমদানাংস্থানং নিত্যং বিবর্জয়েৎ।
অক্ষাংস্তথা ন কুর্ব্বীত সৎকার্য্যাসক্তি নাশনান্।"

সতত মৃগয়া, নিরন্তর প্রমদাগণের সহিত বাস, প্রতি দিন ক্রীড়া,—এই সকল সৎকার্য্যের বিঘটক; এজন্য রাজা উহা বর্জন করিবেন।

"অন্যৈঃকৃতং কদাচিত্তু সেবেত নাত্মনাচরেৎ।"

রাজা স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য অন্যের উপর নির্ভর করিবেন না, স্বীয় কার্য্য স্বয়ংই করিবেন।

"অকার্য্য করণেবীজং কৃত্যানাঞ্চ বিবর্জনং।
অকালে মন্ত্র ভেদেচ কলহে সৎকৃতিক্ষয়ে॥
বর্জয়েৎ সততং পানং শৌচ মাঙ্গল্য নাশনম্।
আয়ুঃ ক্ষয়করং নিত্যং ত্যজেচ্চৈবাত্মদূষণম্॥"

মদ্যপান সর্ব্বদা করিলে তাহা যাবৎ অকার্য্যের বীজ,—সমস্ত কার্য্যের বিঘটক,—মন্ত্রণা ভেদ, কলহ ও সৎকার্য্য হানির দ্বার ও আয়ুঃ ক্ষয়কর হয় এবং আত্মাকে কলুষিত করে, অশুচি করে, মঙ্গলজনক কার্য্যের হানি করে,—এই নিমিত্ত সর্ব্বদা বা অনিয়মিত মদ্যপান রাজাদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ।

"অভিশস্তেষু চৌরেষু ঘাতকেষ্বাততায়িষু।
সততং পৃথিবীপালো দণ্ডপারুষ্য মাচরেৎ॥"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "দণ্ড পারুষ্য অর্থাৎ কঠিন দণ্ড প্রকাশ করা অবিধেয়" কিন্তু নিম্নলিখিত ব্যক্তির প্রতি তাহা দোষের নিমিত্ত হইবে না। যথা—ঘোরতর অপবাদগ্রস্ত, চৌর, ঘাতক, আততায়ী (বধোদ্যত),—এই সকল ব্যক্তির প্রতি দণ্ডপারুষ্য রাজাদিগের সম্বন্ধে দূষণাবহ নহে।

মনুর ভবিষ্যদ্বাণী।

বিখ্যাত নামা মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥ ১)

সরস্বতী দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর অর্থাৎ প্রশস্ত নদীর মধ্যস্থানে যে দেব-নির্ম্মিত দেশ অর্থাৎ প্রশস্ত দেশ তাহাকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে।

তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥

এই ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে পরম্পরা ক্রমাগত ব্রাহ্মণাদির যে আচার ব্যবহার আছে, তাহাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় ও সঙ্কীর্ণ জাতি মাত্রেরই সদাচার জানিবে।

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥ (২)

কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, কান্যকুব্জ ও মথুরা এই কয়েকটি দেশকে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলে, এই দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন।

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বংস্বং চরিতং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

এই ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশ-সম্ভূত দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোক স্বীয় স্বীয় আচার ব্যবহার শিক্ষা করিবে।

মনুর এই দাম্ভিকতা-পূর্ণ ভবিষ্যদুক্তি শ্রবণ করিলে বোধ হয় সকলেরই তাঁহার প্রতি বিষম অশ্রদ্ধার উদয় হয়। যাঁহারা মনু প্রভৃতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করেন না, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই; যাঁহারা তত্তাবতের অধিকাংশ বাক্যের সসারত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও সহজে এবম্বিধ উক্তির যাথার্থ্য বিশ্বাস করিতে পারেন কি না সন্দেহ। এ বিষয়ে যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস হয় হউক, কিন্তু বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন যে, জ্ঞানী-প্রবর মনু অতি প্রাচীন কালে (সম্ভবতঃ ৩১০০ বৎসর) যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এত দিনের মধ্যে সর্ব্বাংশে না হউক অনেকাংশে সফল হইয়াছে।

মনুর ভবিষ্যদুক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে একটি বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। পূর্ব্ব কালে এদেশে যে সকল শাস্ত্র ও আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে, তৎসমুদায় এদেশের যে সে স্থান হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সমুদায় প্রধান প্রধান শাস্ত্র ও রীতি নীতির মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ দেশের যেখানে যে শাস্ত্র বা রীতি প্রচলিত থাকুক না কেন, তত্তাবতই প্রায় ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ-নিবাসি ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছিল। আর্য্যগণ ভারতবর্ষের এই দুই বিভাগেই, প্রথমে বাস করেন এবং এই দুই বিভাগেই বহুকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হয়েন। এই হেতু ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশই আর্য্যগণের সমুদায় প্রধান প্রধান শাস্ত্র ও আচার ব্যব-

---

(১) ব্রহ্মাবর্ত্তের বর্ত্তমান নাম কি তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। কিন্তু কুরুক্ষেত্র তীর্থের নিকট অদ্যাপি সরস্বতী নদী বিদ্যমান আছে এবং ঘাগর নামে আর একটি নদী তাহার দক্ষিণে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া রহিয়াছে। ঘাগরের প্রাচীন নাম দৃষদ্বতী হইতে পারে। যাহা হউক, অনেকে স্থির করিয়াছেন যে, ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ দিল্লীর ৫০ ক্রোশ পশ্চিম উত্তর এবং পঞ্জাবের পূর্ব্বে অবস্থিত।

(২) কুরুক্ষেত্রের বর্ত্তমান নাম স্থানেশ্বর। মৎস্য দেশের আধুনিক নাম জয়পুর। রঙ্গপুর, দিনাজপুর এবং কোচবেহারকেও মৎস্য দেশ কহে, কিন্তু সে বঙ্গদেশের মৎস্য এ মৎস্যের বাচ্য নহে। পঞ্চাল দেশের বর্ত্তমান নাম পাঞ্জাব নহে; কান্যকুব্জ বা কনোজই উহার প্রকৃত নাম। শূরসেনের বর্ত্তমান নাম মথুরা।

হারের মাতৃভূমি। পরে এই দুই বিভাগ হইতে আর্য্য-সন্তানেরা ক্রমে যাইয়া আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থানে ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যে মনজ্ঞ স্থান সমুদায়ে বাস করিলেন। উক্ত দুইটি বিভাগ ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য স্থান এবং দাক্ষিণাত্য হইতেও যে নানারূপ শাস্ত্র ও আচার ব্যবহার উৎপন্ন হয় নাই এমত নহে, কিন্তু তত্তাবত প্রোক্ত বিভাগদ্বয় নিবাসি ঋষিদিগের মত-বিরুদ্ধ বা অনভিমত হইতে পারে নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে আর্য্যগণের যে সকল আচার ব্যবহার পূর্ব্বে ছিল এবং এক্ষণে আছে,তৎসমুদায়ই,মূল ধরিতে গেলে, ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ-জাত। এস্থানে আবার ইহাও বক্তব্য যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ও তাঁহাদিগের শাস্ত্র কর্ত্তৃক যে সকল আচার ব্যবহার দেশান্তরে বিস্তারিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তত্তাবতও মূলতঃ উক্ত ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশ হইতে উৎপন্ন। অতএব ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষিদেশ সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করিয়া ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর কোন্ জাতি কি কি শিক্ষা করিয়াছেন, তাহার অনুসন্ধান করিলেই মনু বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণীত হইতে পারে।

মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ে লিখিত আছে—

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ॥

পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, জবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খশ, এই সকল দেশের লোকেরা ক্ষত্রিয় জাত বটে, কিন্তু ক্রমে উপনয়নাদি সংস্কার বিহীন হইয়া এবং তন্নিবন্ধন যাজন অধ্যাপন ও প্রায়শ্চিত্তাদি কার্য্যের নিমিত্ত ব্রাহ্মণাদির দর্শন না পাইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

পৌণ্ড্রকাদি দেশ সকল কোথায় অবস্থিত, তাহা স্থিরীকৃত হইলেই, ক্ষত্রিয়গণের সহিত ভারতবর্ষীয় আচার ব্যবহার মনুর সময়ে কত দূর বিস্তারিত হইয়াছিল তাহা সকলেই দেখিতে পাইবেন।

পৌণ্ড্র—গৌড়াদি পূর্ব্ব দেশের নাম পৌণ্ড্র। ঔড্র—উৎকল দেশের পূর্ব্ব নাম ঔড্র দেশ। দ্রাবিড়—দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে কলিঙ্গ দেশের দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত দেশের নাম দ্রাবিড়। এই কয়েকটি দেশে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণ বাস করিয়া আর্য্য আচার ব্যবহার সকল প্রচার করিয়াছেন।

কাম্বোজ—ভূখার অর্থাৎ বর্ত্তমান বোখরা দেশের দক্ষিণাংশে পারোপার্শিস পর্ব্বত ও তাহার উত্তরাংশের ভূমি খণ্ডকে কাম্বোজ কহে। এই দেশে উত্তম উত্তম অশ্ব জন্মে। এক্ষণে হিন্দুকুশ পর্ব্বতে কামৌজি, কামভোজ, কামজ প্রভৃতি কয়েক প্রকার সিয়াপোশ জাতি বাস করে। বোধ হয় ইহারা মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে কাম্বোজ দেশ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুকুশ পর্ব্বতে গিয়া বাস করিয়াছিল। পূর্ব্ব কালে কাম্বোজ দেশে সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক কোন ভাষা প্রচলিত ছিল। এক্ষণে হিন্দুকুশে যে সিয়াপোশেরা বাস করে তাহাদিগের ভাষাও সংস্কৃত মূলক। অতএব এই সিয়াপোশেরাই যে প্রোক্ত কাম্বোজ দেশে বাস করিত, তাহাতে আর সংশয় নাই। ইহারা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট; এই জন্য ইহারা ম্লেচ্ছমধ্যে পরিগণিত। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কাম্বোজেরা সর্ব্ব শিরো মুণ্ডিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিকও ইহারা মস্তকে কেশ মাত্র ধারণ করে না।

জবন—পাঠান, আরব, তুর্ক প্রভৃতি জাতিদিগকে এক্ষণে জবন বলা যায়। মহাভারতে লিখিত আছে যে, যযাতি রাজার পুত্র তুর্ব্বসু হইতে জবন জাতির উৎপত্তি হই-

য়াছে। সগর রাজার উপাখ্যানে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়েরাই যবন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কিন্তু অশোক রাজার রাজ্যশাসন-কালে, মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারিত হইবার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে যে সকল গ্রীক (গ্রীস দেশের লোক) বাস করিত, তাহারাও যবন শব্দে উক্ত হইয়াছে। পালি ভাষাতে গ্রীকদিগকে জোন কহে। বিষ্ণু পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যবনেরাও মুণ্ডিত-শির বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আরব তুর্ক প্রভৃতি দেশে যে সকল মুণ্ডিতশির মুসলমান বাস করেন, তাঁহারাই মনুসংহিতা-বর্ণিত যবন নামধেয় ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়।

শক—ভারতবর্ষের উত্তর, অকসস্ অর্থাৎ অলকনন্দা, ও জকজর্তিস্ নদীর মধ্যবর্ত্তি তুর্ক স্থানের যে অংশ তাহার পূর্ব্ব নাম শক। এই স্থান নিবাসি লোকদিগকে শক জাতি বলিত। গ্রীক দেশীয় গ্রন্থাদিতে ইহারা শকি এবং পারস্য ভাষাতে ইহারা শক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই শকেরা পূর্ব্বে সর্ব্বদাই ভারতবর্ষ আক্রমণ করিত। রাজা বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আপন অব্দ শক নাম দিয়া প্রচলিত করেন। বিষ্ণুপুরাণে এই শক জাতি অর্দ্ধ-মুণ্ডিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পারদ ও পহ্লব—সম্ভবতঃ বর্ত্তমান পারস ও আফগানিস্থান দেশের পূর্ব্ব নাম পারদ ও পহ্লব হইতে পারে। পূর্ব্বে ঐ দুইটি স্থানের লোকেরা পারদ ও পহ্লব জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে ভারতবর্ষের পশ্চিম দেশস্থ ম্লেচ্ছগণ পারদ ও পহ্লব বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শব্দসাদৃশ্য দ্বারা বোধ হয়, পারদ জাতি আর পার্থিয় জাতি এবং পহ্লব জাতি আর পূর্ব্বতন পহ্লবীভাষী পারসিক জাতি ভিন্ন নহে। বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পারদেরা মুক্তকেশ ও পহ্লবেরা শ্মশ্রুধারী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

চীন—চীন ও চীনতাতার বলিয়া এক্ষণে যে দুইটি বৃহৎ দেশ প্রসিদ্ধ, তাহাই ভারতবর্ষে চীন ও মহাচীন শব্দে উক্ত হইত। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে চীন ও মহাচীনের উল্লখ আছে। অতএব এক্ষণে চীন ও চীনতাতারে যে সকল লোক আছেন তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণের সন্ততি। উক্ত ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক যে সকল ভারতবর্ষীয় বিদ্যা ও আচার ব্যবহার প্রচারিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই এক্ষণে বর্ত্তমান চীন দেশে প্রচলিত আছে।

কিরাত—ইহার সম্বন্ধে দুই প্রকার বিবরণ আছে। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে কিরাত ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। হিমালয়ের পূর্ব্বভাগে শিকিমের পশ্চিমে মুরঙ্গের পর্ব্বতে কিরাত নামে এক জাতি এখনও বাস করিতেছে; ইহারা অসভ্য ও আচারভ্রষ্ট। আবার রোমদেশীয় গ্রন্থকারেরা অলকনন্দা নদীর সন্নিহিত স্থানে আর এক কিরাত জাতির উল্লেখ করেন। এই উভয়বিধ বিবরণ সত্য বলিয়া জ্ঞান করিলে ইহাই বোধ হয় যে, কিরাত জাতি উক্ত দুই স্থানেই বাস করিয়াছিল।

দরদ—হিমালয়ের উত্তরে সিন্ধু নদীর নিকটে কাফর স্থান ও ত্রিবর্ত্ত নামে যে দুইটি দেশ আছে তাহারই পূর্ব্ব নাম দরদ। এই দরদ নিবাসীরা দরদ জাতি বলিয়া খ্যাত ছিল।

খশ—বঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগে যে সকল *খশিয়া পর্ব্বত* আছে, তাহাতে *খশিয়া জাতি* বাস করে। ইহারা এক্ষণে ম্লেচ্ছ মধ্যে পরিগণিত।

পুরাণ-পুরী নামক জনৈক উদাসীন ভ্রমণকারী বলেন যে, তুর্ক (টার্কি) দেশীয় *বসোয়া*

নগরে গোবিন্দ রাও এবং কল্যাণ রাও-নামে দুইটি বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। তিনি আরও বলেন যে, তিনি তুর্ক দেশীয় মস্‌কট্‌ নগরে, তাতার দেশীয় বাখ্‌ নগরে এবং খরক উপদ্বীপে অনেক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি লোকের সহিত সাক্ষাত করিয়াছেন, এবং আসিয়া-খণ্ড-স্থিত রুষ দেশীয় অস্ত্রকান নগরে অনেক হিন্দুর বসতি স্থান ও পারসের অন্তর্গত হিঙ্গনাজ নগরে অনেক হিন্দু দেব-মূর্ত্তি স্থাপিত দেখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, "আসিয়াটিক রিসার্চ গ্রন্থে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, আরব দেশের মধ্যস্থিত মরুভূমির মধ্যে এক স্থানে অনেক গুলি ব্রাহ্মণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

প্রাচীন কালে পারস দেশে সিপাসিয়ান নামক এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ছিল, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সমধিক ধর্ম্মনিষ্ঠ তাহারা আর্য্য ঋষিদিগের পদ্ধতি অনুসারে যোগানুষ্ঠান করিত। ঋষিদিগের ৮৪ প্রকার আসনাদির সহিত অষ্টবিধ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই সিপাসিয়ানদিগের ধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের অনেক বিষয়ে ঐক্য দৃষ্ট হয়। তাহারা মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, ও শনি প্রভৃতি গ্রহ এবং অগ্নির উপাসনা করিত এবং পুণ্য পাপ অনুসারে ঊর্দ্ধ ও অধোলোকে নানা প্রকার যোনি ভ্রমণও স্বীকার করিত। এতদ্ভিন্ন, আমাদিগের ন্যায় তাহাদিগের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি চারিটি বর্ণ ছিল। দাবিস্থান নামক পারসিক গ্রন্থে লিখিত আছে, মহাবাদ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। যাঁহারা অগ্নিহোত্রী ঋত্বিক, জ্ঞানবান, সূর্য্যোপাসক, বিদ্যাবান এবং ধর্ম্ম-নিয়ম সকলের রক্ষক, তাঁহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। তাঁহাদিগের নাম বর্ম্মাণ (১)। রাজা ও বীরগণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত; তাঁহাদিগের নাম চত্রমান, চত্রমন বা চত্রি (২)। রাজ্য রক্ষা, নিয়মপ্রচার, বিচারকার্য্য এবং রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ করাই তাঁহাদিগের প্রধান কার্য্য। কৃষি লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত; তাহাদিগের নাম বাস (৩)। ঐ ভাষায় বাস শব্দের অর্থ আধিক্য বা প্রচুরতা অর্থাৎ যাহারা প্রচুর ধন সম্পন্ন। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পই এই শ্রেণীস্থ লোকদিগের মুখ্য কার্য্য। চতুর্থ শ্রেণীর লোকদিগের নাম সুদীন, সুদী বা সুদ (৪)। দাসত্বই তাহাদিগের প্রধান কার্য্য।

গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাস হইতে বিদেশে হিন্দুদিগের বসতি ও আচার ব্যবহার প্রচারের আরও কয়েকটি বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় ২৩৩৭ বৎসর পূর্ব্বে যখন জরকৃসস্‌ নামক পারসিক রাজ্যের সম্রাট গ্রীস দেশ আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হিন্দু সৈন্যেরা কার্পাস বস্ত্র পরিধান ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল। গ্রীক সম্রাট সিকন্দার সাহের সহিত যখন পারসিক রাজা দরায়াসের যুদ্ধ হয়, তখনও হিন্দু বীরগণ পারসিক রাজার অধীন হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, পারস দেশে অনেক আর্য্যসন্তান বসতি করিতেন। যখন আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে অনেক লোক (সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় বর্ণীয় লোক) তথায় বাস করিয়াছিলেন, তখন ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহাদিগের দ্বারা ভারতবর্ষীয় আচার ব্যবহার বহুল পরিমাণে তথায় প্রচারিত হইয়াছিল।

সিরিয়া দেশের অন্তর্গত হায়েরো পোনিশ নগরে এক দেবীর প্রতিমা ছিল, হিন্দুরা

(১) বর্ম্মাণ ব্রাহ্মণ শব্দের অপভ্রংশ স্বরূপ।

(২) চত্রি ক্ষত্রি বা ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ স্বরূপ।

(৩) বাস বৈশ্য শব্দের অপভ্রংশ স্বরূপ।

(৪) সুদ শূদ্র শব্দের অপভ্রংশ স্বরূপ।

তাঁহাকে নানাবিধ রত্নোপহার প্রদান করিতেন। এই দেবীর সন্নিধানে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীমূর্ত্তি ছিল, পুরুষ বৃষারূঢ় ও স্ত্রী সিংহ-বাহিনী। এতদ্ভিন্ন, ঐ স্থানে আর আর যে সকল দেব-মূর্ত্তি ছিল, তাহাদিগের আকার প্রকার দেখিলে বোধ হয়, ঐ সকল দেবতা হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত হইবে।

খৃষ্টাব্দ আরম্ভের পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আরমানি দেশে যাইয়া তথায় একটি পিত্তলময় দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে তত্রত্য খৃষ্টানেরা ঐ দেব-মূর্ত্তির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহাদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত করে। ঐ সংগ্রামে খৃষ্টানেরা জয় লাভ করিয়া মূর্ত্তিসহ দেবালয় ভগ্ন করিয়া ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহাও লিখিত আছে যে, গ্রেগরি নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষ এক দিবসে ৫০৫০ জন হিন্দুকে বল পূর্ব্বক খৃষ্টান করেন। তদনন্তর ঐ দেশবাসি কতিপয় ব্রাহ্মণ উক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অসম্মত হওয়ায় ঐ দেশের রাজা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করেন ও মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দেন।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদিতে আরো দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন অরনিয়ম নামক রুম রাজ্যের সম্রাট তাতমোর দেশ (পার্লমিরা) জয় করেন, তখন তত্রত্য হিন্দু অধিবাসিগণ তাঁহার নিকটে দূত ও বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যখন তিনি জয়োল্লাসের সহিত তদীয় রাজধানী রুম নগরে প্রবেশ করেন, তখন হিন্দুরা আনন্দোৎসাহ প্রকাশ করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই সকল বিবরণ দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের **আচার ব্যবহার আসিয়া খণ্ডের সর্ব্ব স্থানেই প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল**। আসিয়া খণ্ডের সর্ব্ব স্থানের লোকেরাই জ্ঞাতসারে হউক, আর অজ্ঞাতসারে হউক, সাক্ষাত সম্বন্ধে হউক, আর পরম্পরা সম্বন্ধে হউক, আর্য্য রীতি নীতি সকল শিক্ষা করিয়া উন্নত হইয়াছে। এই স্থলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষীয় আর্য্য-সন্তানগণ আসিয়া খণ্ডের প্রায় সর্ব্ব স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই যে তাঁহাদিগের নিকট হইতে তত্তদ্দেশবাসীরা আর্য্য রীতি নীতি সকল শিক্ষা করিয়া উন্নত হইয়াছিল, এমত হইতে পারে না। যাঁহারা এইরূপ মনে করেন, তাঁহাদিগের এই মাত্র জানা আবশ্যক যে যখন ইতিহাস দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে আসিয়া খণ্ড কেন পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডের অগ্রেই ভারতবর্ষ সভ্যপদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, তখন তথাকার দ্বিজাতিগণ যেখানে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন, সেই স্থানের লোকেরাই যে আগ্রহ সহকারে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার সকল অনুকরণ-প্রণালীতে শিক্ষা করিয়া উন্নত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। আবার, কেহ কেহ ইহাও বলিতে পারেন যে, হিন্দু জাতীয় যে সকল লোকের পারস, সিরিয়া, তাতার, রুম প্রভৃতি দেশে যাইয়া বাস করার বিষয় উল্লিখিত হইল, তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া তত্তৎ স্থানে বাস করিয়াছিলেন এরূপ না বলিয়া ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ যেরূপ সিথিয়া হইতে যাইয়া তথায় (ভারতবর্ষে) বসতি করেন, সেইরূপ ঐ সকল হিন্দুও সিথিয়া হইতে যাইয়া পারস সিরিয়া ও রুষ প্রভৃতি দেশে বাস করিয়াছিলেন, এইরূপ বলিলেই সঙ্গত হয়। ইহার প্রত্যুত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, ইউরোপীয় ইতিহাসলেখকদিগের মতানুসারে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ সিথিয়া হইতে আসিয়াছিলেন কি না তাহার সত্যাসত্য

বিচার করা আমাদিগের এই প্রস্তাবের লক্ষ্য নহে, কিন্তু প্রোক্ত হিন্দুগণ যে সিথিয়া হইতে না যাইয়া ভারতবর্ষ হইতে যাইয়াই পূর্ব্বোক্ত দেশসমূহে বসতি করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে তাঁহারা পারসিক, গ্রীক ও রোমীয় গ্রন্থাদিতে হিন্দু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পারস, গ্রীস, ও রোম প্রভৃতি রাজ্যে ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

পৃথিবীর অন্যান্য খণ্ডের লোকেরা যে আর্য্য রীতি নীতি সকল কত দূর শিক্ষা করিয়া উন্নত হইয়াছেন তাহা পরে প্রকাশিত হইবে।

মুখ্য এবং গৌণ।

বঙ্গ-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল কি মন্দ এবং কিরূপে তাহার উন্নতি সাধন হইতে পারে, সংবাদ পত্র সমূহে ইহার বিচার ক্রমাগতই চলিতেছে, কিন্তু বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে মুখ্য কি এবং গৌণ কি ইহার প্রতি দৃষ্টি না থাকাতে সিদ্ধান্ত স্থির করিবার সময় অনেকেই ভ্রমে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। আমাদের দেশে যে কথাটি উত্থাপিত হয় তাহাই মুখ্য-রূপে গৃহীত হয়। "জাতীয়-ভাব" "উন্নতিশীলতা" "ভারত-জননী" "সুসভ্য আচার-ব্যবহার" এমনি এক একটি কথার উল্লেখ মাত্রেই তাহার এক একটি কার্য্যের-সহিত-সম্বন্ধ-বিরহিত অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে। অর্থ দুইরূপ—বাক্যার্থ এবং ভাবার্থ; বাক্যে যাঁহাদের আঁট তাঁহারা বাক্যার্থই গ্রহণ করেন, কার্য্যে যাঁহারদের আঁট তাঁহারা ভাবার্থই গ্রহণ করেন। বাক্যার্থে মুখ্য-গৌণ বিচার অপ্রাসঙ্গিক; বাক্যের মুখ্য অর্থটিই বাক্যার্থ, তাহার এ দিক্ ও দিক্ হইলেই তাহার অপলাপ ঘটে। কিন্তু ভাবার্থে মুখ্য-গৌণ বিচার নিতান্তই আবশ্যক। উদাহরণ;—"জাতীয়-ভাব" এ শব্দটির বাক্যার্থ স্বজাতির প্রতি অনুরাগ—এই মাত্র; কিন্তু সেই অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ অথবা বিরাগ অথবা উপেক্ষা থাকিতে পারে, এমন কি ভিন্ন জাতির প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরাগও থাকিতে পারে। যদি কেহ বলেন যে "স্বজাতির প্রতি আমার অনুরাগ যথেষ্ট আছে, সুতরাং আমি জাতীয়-ভাব রক্ষা করি না একথা তুমি বলিতে পার না, কিন্তু ভিন্ন জাতির প্রতি আমার তদপেক্ষা অধিক অনুরাগ;" তবে তাঁহার সে বাক্যে আমরা সায় দিতে পারি না কেন? জাতীয়-ভাবের বাক্যার্থ মাত্র দেখিলে বোধ হয় যে তিনি ঠিক্ কথাই বলিতেছেন; কিন্তু তাহার ভাবার্থ দেখিলে তাঁহার কথা অযথা বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইবে। কেননা জাতীয় ভাবের বাক্যার্থ স্বজাতির প্রতি অনুরাগ—এই মাত্র; কিন্তু তাহার ভাবার্থ, মুখ্যরূপে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, এবং গৌণরূপে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ; ইহার বিপরীতে মুখ্য-রূপে ভিন্ন জাতির প্রতি অনুরাগ এবং গৌণ-রূপে স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বর্ত্তিলে জাতীয়-ভাব কেবল একটা কথার কথা হইয়া পড়ে। পূর্ব্বোল্লিখিত "জাতীয়-ভাব" ইত্যাদি চারিটি বিষয়ের ক্রমান্বয়ে মুখ্য গৌণ নিরূপণ করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

জাতীয়-ভাব রক্ষা করা সকল জাতিরই স্বভাবসিদ্ধ কর্ত্তব্য কার্য্য। সার্ব্বভৌমিক ভাবের নিকটে জাতীয়-ভাবের লাঘব স্বীকার করাও তেমনি স্বভাব সিদ্ধ। সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয়-ভাব এ দুয়ের সামঞ্জস্য করিতে গেলেই স্বজাতীয় ভাবের সহিত বিজাতীয় ভাবের মুখ্য এবং গৌণ সম্বন্ধ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। "জাতীয়-ভাব রক্ষা করা" ইহা একটি মাত্র বচন, কিন্তু ইহা

হইতে, যে যেমন সে তেমনি অর্থ নিষ্কর্ষণ করিয়া লয়। এজন্য "জাতীয়-ভাব রক্ষা করা" ইহার অর্থ এত গুলি যথা;— প্রথম; স্বদেশে বিজাতীয়-ভাবকে তিল-মাত্র স্থান না দেওয়ার নাম জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। দ্বিতীয়; বিজাতীয়-ভাবের প্রতি উপেক্ষা করা, এবং স্বজাতীয়-ভাবকে পোষণ করা, ইহার নাম জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। তৃতীয়; স্বজাতীয়-ভাব এবং বিজাতীয়-ভাব দুইকে সমান রূপে রক্ষা করত জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। চতুর্থ; বিজাতীয়-ভাবকে মুখ্য-রূপে রক্ষা এবং স্বজাতীয়-ভাবকে গৌণ-রূপে রক্ষা করত জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। পঞ্চম; স্বজাতীয়-ভাবকে মুখ্য-রূপে এবং বিজাতীয় ভাবকে গৌণ-রূপে রক্ষা করত জাতীয়-ভাব রক্ষা করা। আমাদের মতে উক্ত কয়টি অর্থের মধ্যে শেষোক্তটিই কার্য্যকর আর সকল গুলিই অকার্য্যকর। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিলে চৌকিতে বসিলেই জাতীয়-ভাবের অন্যথাচরণ করা হয়। দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে ইংরাজি অধ্যয়ন করিলেই জাতীয়-ভাবের অবমাননা করা হয়। তৃতীয় অর্থটি গ্রহণ করিলে বাঙ্গালি-সমাজে ধুতি চাদর ও ইংরাজি-সমাজে কোর্ত্তা ও পেন্টুলন্ পরিধান করা কর্ত্তব্য হইয়া উঠে। চতুর্থ অর্থটি গ্রহণ করিলে জাতীয়-ভাব একেবারেই লোপ পায়। পঞ্চম অর্থটি গ্রহণ করিলে সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয়-ভাব উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়—ইহাই "জাতীয়-ভাব রক্ষা করা" এই বচনটির প্রকৃত অর্থ।

যেমন মনুষ্য-জাতি, পশ্বাদি অন্যান্য জাতি হইতে বিভিন্ন, সেইরূপ প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্য অপর জাতীয় মনুষ্য হইতে বিভিন্ন। আম্র-বৃক্ষ যেমন জম্বু-বৃক্ষ হইতে ভিন্ন, অথচ উভয়েই বৃক্ষ বটে; সেইরূপ বাঙ্গালি, ইংরাজ, ফরাসিস্, সকল জাতীয় মনুষ্যই মনুষ্য বটে, কিন্তু তথাপি তাহারদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। আম্র-বৃক্ষে যেমন আম্র-ফলই শোভা পায়, জম্বূ-বৃক্ষে যেমন জম্বূ-ফলই শোভা পায়, সেইরূপ ফরাসীস্ জাতির ফরাসি-ভাবই শোভা পায়, ইংরাজ জাতির ইংরাজি-ভাবই শোভা পায়, বাঙ্গালি জাতির বাঙ্গালি-ভাবই শোভা পায়। অপিচ আম্র-বৃক্ষ যেমন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে, আম্র-বৃক্ষ যেমন যথাসময়ে পল্লব পুষ্প ফল উৎপাদন করে, এবং তাহা না করিলে তাহার বৃক্ষত্বে দোষ পোঁছে, সেই রূপ জম্বূ-বৃক্ষও যথাসময়ে পল্লব পুষ্প ফল প্রসব করে, না করিলে তাহার বৃক্ষত্বে দোষ পোঁছে। এমনিই জানিও যে, ফরাসীস্ দেশীয় ব্যক্তি দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হইবেক, যদি তাহা না হয় তবে তাহার মনুষ্যত্বের হানি হইবে, বাঙ্গালি জাতিও দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, জ্ঞানবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হইবেক, যদি তাহা না হয় তবে তাহার মনুষ্যত্ব রক্ষা পাইবে না। মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা সকল জাতিরই আবশ্যক। আম্র-বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা যেমন আবশ্যক, আম্র-বৃক্ষত্ব রক্ষা করাও তেমনি আবশ্যক; জম্বূ-বৃক্ষের বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক, কিন্তু আম্র-বৃক্ষত্ব রক্ষা করা আবশ্যক হওয়া দূরে থাকুক্ তাহা তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক। সেইরূপ, ইংরাজের মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, ইংরাজিত্ব রক্ষা করাও উচিত; বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব রক্ষা করা উচিত, কিন্তু ইংরাজিত্ব রক্ষা করা বাঙ্গালির পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি উপহাসাস্পদ। মনুষ্যের সার্ব্বভৌমিক ভাবের সহিত জাতীয় ভাবের কি রূপে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে—এক্ষণে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বাঙ্গালি, বাঙ্গালিত্ব রক্ষা করিবেক—এইটি জাতীয়-ভাবের উত্তেজনা, বাঙ্গালি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবেক এইটি

সার্ব্বভৌমিক ভাবের উত্তেজনা, উভয়ই বাঙ্গালির শিরোধার্য্য। এক্ষণে উভয়ের সামঞ্জস্য সাধনের পদ্ধতি কিরূপ, তাহাই দেখা যাউক।

কেহ মনে করেন যে, সকল জাতির ভাব সংগ্রহ করিয়া একত্র সন্নিবেশ করিলেই সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয়-ভাব উভয়ই রক্ষিত হয়। ইহাঁদের যুক্তি এই রূপ যে, সকল জাতীয় ভাব যেখানে একত্র করা হইয়াছে, সেখানে স্বজাতীয়-ভাব যেমন আছে বিজাতীয়-ভাবও তেমনি আছে, সুতরাং জাতীয়-ভাব এবং সার্ব্বভৌমিক-ভাব উভয়ই রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এটি ভ্রম। একটি আম্র-বৃক্ষে যদি জম্বু-ফল, আতা-ফল, তিন্তিড়ী-ফল, একত্র করা যায়, তাহা হইলে তাহা যেমন বিকারের প্রলাপের সহিত উপমেয় হয়, নানা জাতীয় ভাব একত্র করিলে তাহা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। জাতীয় ভাব এবং মনুষ্যত্ব উভয়ের সামঞ্জস্য করা কেবল মাত্র বিচারের কার্য্য নহে, উহা শিক্ষা সংস্কার এবং অভ্যাসের কার্য্য। এ জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এবিষয়ের যেমন বৈশদ্য হইতে পারে, যুক্তি দ্বারা তেমন হইতে পারে না। অতএব দৃষ্টান্তচ্ছলে নিম্নে তাহার উপায় কথিত হইতেছে।

প্রথম, বাঙ্গালিদের মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে হইবে—এইটি উপদেশ। বাঙ্গালিদের মধ্যে মনুষ্য * জন্মিয়াছে, এবং মনুষ্য বর্ত্তমান আছে—এটি প্রত্যক্ষ এবং জন-শ্রুতি উভয়েরই সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয়, বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্ব রক্ষা করিতে হইবে—এটি উপদেশ; এবং ইহা যে বাঙ্গালি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে ইহা বলা বাহুল্য।

উপরের দুই প্রত্যক্ষ বিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিয়া তাহা হইতে জিজ্ঞাস্য উপায়টি নিষ্কর্ষণ করাই বৈধ-প্রণালী। সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালিরা মনে করেন যে, দশ জনকে প্রতিপালন করাতে মনুষ্যত্ব হয়; পোষ্যবর্গ এবং পোষক উভয়ের মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা উপযুক্ত রূপে রক্ষা করাতেই মনুষ্যত্ব † রক্ষিত হয়; কেবল স্বার্থ লইয়া থাকিলে মনুষ্যত্বের বিপরীতাচরণ করা হয়। এ ভাবটি রক্ষা করিয়া চলিলে বাঙ্গালির বাঙ্গালিত্ব এবং মনুষ্যত্ব উভয়ই রক্ষা হয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের একটি ভাগ রক্ষা করিলেই যে সম্যক্‌রূপে মনুষ্যত্ব রক্ষা করা হয় তাহা নহে। সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন মনুষ্যত্ব রক্ষা করা আবশ্যক। বাঙ্গালিরা যেমন স্বার্থ-বিহীন পোষ্য-পোষক-সম্বন্ধ রক্ষা করাকে মনুষ্যত্ব কহে; ইংরাজেরা সেইরূপ স্বাধীন-ভাব রক্ষা করাকে মনুষ্যত্ব কহে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, উক্ত দুই ভাবই মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়, অতএব উভয়ের কোনটিই ত্যজ্য নহে।

কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে, বাঙ্গালিরা বহুকাল হইতে মঙ্গল-ভাবকেই বিশেষ রূপে আদর করিয়া আসিতেছেন, ইংরাজেরা স্বাধীনতাকেই বিশেষ রূপে আদর করিয়া আসিতেছেন; এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বাঙ্গালিরা কিরূপে ইংরাজদিগের নিকট হইতে তাঁহারদের বহু যত্নার্জ্জিত স্বাধীন-ভাব শিক্ষা করিবেন; এবং ইংরাজেরাই বা কিরূপে বাঙ্গালিরদের নিকট হইতে তাঁহাদের বহু-কালার্জ্জিত মঙ্গল-ভাব শিক্ষা করিবেন। বাঙ্গালিরা দেশীয় কুসংস্কার উন্মূলন করিতে উদ্যত হইয়াছেন ইহা অতি উত্তম, কিন্তু তাঁহারা দেশীয় সুসংস্কার উন্মূলনেও

* এখানে মনুষ্য শব্দের অর্থ যে—মনুষ্যে মনুষ্যত্ব বিশেষ রূপে স্ফূর্ত্তি পায়।

† ইহা ভিন্ন আর কিছুই মনুষ্যত্ব নহে ইহা বলা তাৎপর্য্য নয়। সংক্ষেপ-মানসে মনুষ্যত্বের কোন একটি ভাগ (যে ভাগটির প্রতি বাঙ্গালি জাতির বিশেষ লক্ষ্য তাহাই) দেখান হইল।

সমান আগ্রহ প্রকাশ করেন ইহা অতি নিন্দনীয়। আজ-কাল সকল বিষয় সমান চক্ষে দেখাই উদারতার চিহ্ন বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে; সুতরাং আপনারদের উদারতা সাধন করিবার জন্য অনেকে সুসংস্কার এবং কুসংস্কার উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। স্বাধীনতা বিষয়ে বাঙ্গালিদের অনেক কুসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিলাম; কিন্তু মঙ্গল অনুষ্ঠান বিষয়ে বাঙ্গালিদের যে অনেক সুসংস্কার আছে, ইহা স্বীকার করিতে কেন আমরা কুণ্ঠিত হইব? বাঙ্গালিদের সমাজে মঙ্গল-ভাবের যখন আদরাধিক্য, তখন সেই ভাবের মধ্য দিয়া কিরূপে স্বাধীনতার উদ্বোধন হইতে পারে, ইহাই তাঁহারদের চেষ্টা করা উচিত; চিরার্জ্জিত মঙ্গল ভাবের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া, যিনি স্বাধীনতার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে যান, তাঁহার সে ভক্তি অতি-ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না যিনি মঙ্গল-ভাবের প্রতি অভক্তি করিতে পারেন, তিনি কি কখন স্বাধীনতার ভক্ত হইতে পারেন, এও কি কখন সম্ভব? এমন হইতে পারে যে, এক ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে মঙ্গল-ভাবেরই অনুশীলন করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং তাহাতে তাঁহার এক প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, এজন্য মঙ্গল-ভাবের প্রতি তাঁহার অপেক্ষাকৃত অধিক ভক্তি; এ প্রকার ভক্তির আধিক্য স্বাভাবিক; কিন্তু মনে কর যে, বাল্যকাল হইতে মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন করিয়াও তাহার প্রতি যাঁহার ভক্তি জন্মে নাই, এরূপ ব্যক্তি কি এত মহৎ হইতে পারেন যে, স্বাধীনতার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখিবামাত্রই তৎপ্রতি তাঁহার ভক্তি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে? স্বাধীনতা এবং মঙ্গল-ভাব এ দুইটি যদি নিতান্তই বিরোধী বিষয় হইত, তাহা হইলে একের প্রতি অভক্তি এবং অন্যের প্রতি ভক্তির আতিশয্য একত্র শোভা পাইত, কিন্তু স্বাধীনতা এবং মঙ্গল-ভাবের মধ্যে সেরূপ বিরোধ থাকা দূরে থাকুক,—একটি আর একটির সোপান-স্বরূপ। স্বাধীনতা হইতে মঙ্গল-ভাবে এবং মঙ্গল-ভাব হইতে স্বাধীনতাতে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অতএব বাঙ্গালিরা আপনারদিগের পৈতৃক ধন-স্বরূপ মঙ্গল-ভাবকে পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছানুযায়ী একটা কৃত্রিম স্বাধীনতাতে ঝম্প প্রদান করেন, ইহা কোন রূপে যুক্তি-সিদ্ধ নহে; বাঙ্গালি যদি স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহার উপায় এই, যথা—বাঙ্গালি জাতি যে যে ভাবকে বিশেষ-রূপে মনুষ্যত্বের চিহ্ন বলিয়া আদর করিয়া আসিতেছেন, এমন কি, যে যে ভাবের অনুশীলনে তাঁহাদের এক প্রকার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে সেই সেই ভাবকে মূল করিয়া অনভ্যস্ত স্বাধীনতার পথে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হ'ন; ইহাই তাঁহারদের কর্ত্তব্য; ইহার অন্যথাচরণ করা উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতে আশা করা মাত্র। এখানকার ভাব এরূপ নহে যে, মঙ্গল-ভাব অপেক্ষা স্বাধীনতা কোন অংশে ন্যূন, অথবা স্বাধীনতা অপেক্ষা মঙ্গল-ভাব কোন অংশে ন্যূন। এখানকার অভিপ্রায় কেবল এই যে, মঙ্গল-ভাবের অনুষ্ঠানে যাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, তিনি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন ইহা অতীব উত্তম, কিন্তু তাহা বলিয়া মঙ্গল-ভাবের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিবেন কেন? মঙ্গল-ভাবের মধ্য দিয়া কি স্বাধীনতাতে পোঁছান যায় না? যদি বল "না—পোঁছান যায় না," তবে ইহা নিশ্চিত জানিও যে, তুমি যাহাকে স্বাধীনতা বলিতেছ তাহা স্বাধীনতাই নহে, তাহা স্বেচ্ছাচার। এখানে দার্শনিক বিষয়ের আলোচনাতে বিশেষ ফল দেখা যাইতেছে না—বাঙ্গালির

কার্য্যতঃ কিরূপ করা উচিত তাহাই দেখা যাউক।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মিসর দেশ।

আফ্রিকাখণ্ড যদি সুয়েজ সংযোজক দ্বারা আসিয়া-খণ্ডের সহিত সংযুক্ত না থাকিত, তাহা হইলে উহাকে একটি মহাদ্বীপ বলিয়া ডাকা যাইতে পারিত। এক্ষণে যখন সুয়েজ খাল প্রস্তুত হইয়াছে, তখন উহাকে এক প্রকার মহাদ্বীপ শব্দে উক্ত করা যাইতে পারে। মিসর এই মহাদ্বীপের উত্তরপূর্ব্ব কোণে স্থিত। মিসর অতি উর্ব্বর দেশ। প্রাচীন কালের লোকেরা উহাকে পৃথিবীর গোলাবাড়ী বলিয়া ডাকিত। পর্জ্জন্যদেব মিসরের প্রতি কদাচিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন; ঐ দেশে প্রায় বৃষ্টিপাত হয় না। মিসরের উর্ব্বরতা নীল নদীর সাময়িক প্লাবনের প্রতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

মিসর পৃথিবীর মধ্যস্থলে স্থিত হইয়া পৃথিবীর পুরাবৃত্তে চিরকাল অতি প্রকাশ্য স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। মিসরে যত রাজপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এতদ্রূপ রাজপরিবর্ত্তন হয় নাই। স্বদেশীয় রাজাদিগের রাজ্যের লোপ হইলে মিসর গ্রীকদিগের দ্বারা অধিকৃত হয়। তৎপরে রোমকেরা উহা আপনাদিগের সাম্রাজ্য-ভুক্ত করে। তৎপরে রোমসাম্রাজ্য পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে বিভক্ত হইলে মিসর পূর্ব্বে রোম রাজ্যের অন্তর্গত হয়, তৎপরে আরবেরা মিসর দেশ অধিকার করে। তৎপরে তুর্কিরা উহাকে জয় করে। এক্ষণে উহা তুর্কিদিগের অধীনে নামমাত্র আছে।

অতি প্রাচীন কাল হইতে মিসর দেশ অতি সভ্য দেশ বলিয়া খ্যাত। প্রাচীন মিসরের কোন ধর্ম্ম-যাজক বলিয়াছিলেন যে, গ্রীকেরা কল্যকার শিশু। মিসরে এক্ষণে অনেক স্থানে প্রাচীন দেব-মন্দির সকল বিদ্যমান আছে। সেই সকল দেব-মন্দিরে এবং মিসরের প্রাচীন রাজাদিগের সমাধি-মন্দিরে এবং পিরামিড সকলের অভ্যন্তরে যে সকল মূর্ত্তি ও চিত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার আলোচনা দ্বারা মিসরের প্রাচীন অধিবাসীদিগের রীতি নীতি ধর্ম্ম অনেক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। পিরামিড্ সকল বর্ত্তমান কালের সভ্য লোকদিগের বিলক্ষণ বিস্ময়ের কারণ। তাঁহারা স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না যে, সে কালের লোকে এরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কীর্ত্তি কি প্রকারে করিয়া তুলিয়াছিল। এক জন গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন যে, যেমন আমরা নূতন জ্ঞান লাভ করিতেছি, তেমনি কোন কোন বিষয়ে পুরাতন জ্ঞান হারাইতেছি। স্থাপত্য-বিদ্যা বিষয়ে পুরাকালের কোন কোন কীর্ত্তির সহিত বর্ত্তমান কালের কীর্ত্তির তুলনাই হইতে পারে না। এমন কি, ভারতবর্ষে দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আমাদিগের ইংরাজ রাজপুরুষদিগের দ্বারা নির্ম্মিত অনেক অট্টালিকা অপেক্ষা দৃঢ় ও স্থায়ী। প্রাচীন কালে মিসরে মৃত-শরীর সংরক্ষণ করিবার এক বিদ্যা ছিল। সেই কালের সংরক্ষিত মৃত-শরীর সকলকে "মমিয়া" বলে। কত সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের মৃত শরীর ঐ বিদ্যা প্রভাবে এখনও অভিনব অবস্থায় দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন কালে মিসরে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার সহিত পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন মিসরবাসীদিগের ওসাইরিস্ নামে এক দেবতা ছিল, তাহার সহিত আমাদিগের শিবের অনেক সাদৃশ্য আছে। আমাদিগের দুর্গার ন্যায় আইসিস্ নামে তাঁহাদিগের এক দেবী ছিল। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এদেশ হইতে কতকগুলি হিন্দু সিপাই মিসরে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা তথাকার দেবমন্দিরস্থিত মূর্ত্তি সকল দেখিয়া আপনাদিগের দেশের দেবমূর্ত্তি জ্ঞান করিয়া তাহাদের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। প্রাচীন মিসরের ভাষার সহিত সংস্কৃতের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রাচীন মিসরবাসী, হিন্দু জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল এমত কখনই বোধ হয় না! এস্থলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম কি প্রকারে প্রাচীন মিসরে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার মিসর দেশ জয় করিয়া তথায় স্বনামখ্যাত এলেকজেণ্ড্রিয়া নামক নগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর টলমি নামক তাঁহার এক জন সেনাপতি মিসরের অধীশ্বর হয়েন। তাঁহার বংশীয় রাজারা মিসর দেশে অনেক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। টলমি বংশের রাজারা বিলক্ষণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে এক জঘন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। তাঁহারা সহোদরাদিগকে বিবাহ করিতেন। ক্লিয়োপেট্রা নামক মিসরের বিখ্যাত রাজ্ঞী যখন পূর্ণ-যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাঁহার দশম বর্ষীয় ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। তলমিদিগের পর মিসর দেশ অনেক কাল পর্য্যন্ত রোমক-দিগের অধিকারে ছিল। তৎপরে উহা আরবদিগের হস্তগত হইয়াছিল। মহম্মদ প্রচারিত ধর্ম্ম হইতে

আরবেরা নূতন জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই নব-জীবন ও নবোৎসাহ সহকারে তাহারা পৃথিবীর অনেক দেশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মহম্মদের মৃত্যুর এক শত বৎসরের মধ্যে তাহারা এসিয়া খণ্ডের তাতার দেশ হইতে ইউরোপ খণ্ডের স্পেন দেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল: এমন এক কাল উপস্থিত হইয়াছিল যখন একই সময়ে তাহাদিগের সমরাশ্ব সকল চক্ষূব নদীর ও টেগস নদীর জল পান করিয়াছিল, একই সময়ে সমারকন্দের ডুম্বর ও গ্যাস্কনি প্রদেশের দ্রাক্ষা কালিফ অর্থাৎ আরব সম্রাট আলওয়ালিদের পদতলে প্রজাদত্ত উপহার স্বরূপ অর্পিত হইয়াছিল এবং একই সময়ে সিন্ধুনদী তীরে ও এটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলে কল্‌মা নামক ধর্ম্ম মন্ত্র উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল। অমরু নামক আরব সেনাপতি মিসর দেশ জয় করেন। ঐ সময়ে এলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে এক মহাপুস্তকালয় ছিল। তথায় প্রায় ৮০০০০০ পুস্তক ছিল। অমরু কালিফ ওমারকে ঐ সকল পুস্তকের বিষয় কি করিবেন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠানতে তিনি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে সেই সকল পুস্তকে যাহা আছে, তাহা যদি কোরাণের বিরোধী হয় তবে তাহা অবশ্য পুড়িয়া ফেলা কর্ত্তব্য, আর যদি কোরাণের সহিত ঐক্য থাকে তাহা হইলে তাহা অনাবশ্যক বলিয়াও পুড়িয়া ফেলা কর্ত্তব্য। এই আদেশমতে ঐ মহা পুস্তকালয় পুড়িয়া ফেলা হইয়াছিল। তাহাতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংসারের কত ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। বিখ্যাত পুরাবৃত্ত লেখক গিবন্ কিন্তু উক্ত পুস্তকালয়ের এ প্রকারে বিনস্ট হওয়ার কথা অবিশ্বাস করেন। যে কয়েক জন পুরাবৃত্ত লেখক এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুইটি প্রাচীন পুরাবৃত্ত লেখক ইহার কোন উল্লেখ করেন নাই। অমরু নিজে এক জন কবি ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, এই বিনাশ কার্য্যটি তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গত হয় না। এই দুই কারণ বশতঃ গিবন্ উল্লিখিত বৃত্তান্তটি অবিশ্বাস করেন কিন্তু তিনি ব্যতীত আর সকল আধুনিক পুরাবৃত্ত লেখক উহা বিশ্বাস করেন।

মিসরের জয়ের কিছু দিন পরেই তাহার আরব অধীশ্বরেরা বোগদাদের আরব সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিলেন। ঐ সকল অধীশ্বর মহম্মদ-দুহিতা ফাতেমার বংশোদ্ভব ছিলেন। তাঁহারা আবার হীনপ্রভ হইলে তুর্ক জাতীয় লোকেরা যখন এশিয়ামাইনর ও উত্তর এফ্রিয়া জয় করে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মিসরও জয় করিয়াছিল। মিসর ইস্তাম্বুল অর্থাৎ কনষ্টাণ্টিনোপেলের সুলতানদিগের অধীনতা এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া আসিতেছিল, কিছু দিন হইল সমরদক্ষ অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহম্মদ আলি পাশা মিসরকে এক প্রকার স্বাধীন করেন। এক্ষণে মিসরের অধীশ্বর ইস্তাম্বুলের সুলতানের অধীনতা নাম মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। মিসরের বর্ত্তমান অধীশ্বরদিগের উপাধি "খেদীব"। খেদীব মহম্মদ আলি প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বকার পাশাদিগের সময়ে সরকেশিয়া দেশীয় লোকের বংশোদ্ভব মামেলুক নামক সৈন্যদিগের একাধিপত্য ছিল। তাহারা যাহা মনে করিত তাহাই করিত, পাশা কিছু বলিতে পারিতেন না। মহম্মদ আলি এক দিন মামেলুক সৈন্যাধ্যক্ষ দিগকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগের মস্তক চ্ছেদন করাইয়াছিলেন। ঐই একটী মাত্র নিদারুণ কার্য্যের অপবাদ তাঁহার নামে দেওয়া যাইতে পারে। তিনি সাধারণতঃ ন্যায়বান ও দয়ালু ছিলেন। তিনি মিসর দেশে ইউরোপীয় সভ্যতা অনেক পরিমাণে প্রবর্ত্তিত করেন। তিনি "বে" উপাধি দিয়া অনেক কর্ম্মদক্ষ ফরাসীস ও ইংরাজকে আপনার রাজ্য মধ্যে উচ্চ উচ্চ পদ প্রদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান খেদীব ইসমাইল পাশার পুত্র পারিস নগরে ইউরোপীয় যুদ্ধ বিদ্যা ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন।

মিসর দেশের ঐতিহাসিক ও ভূবৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া এক্ষণে বর্ত্তমান মিসরবাসীদিগের ধর্ম্ম ও রীতি নীতি বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

মিসরের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোক আরব জাতীয়। তাহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। মুসলমান ব্যতীত কপ্‌ট নামক এক প্রকার লোক মিসরে আছে। ইহারা প্রাচীন মিসরদেশীয়দিগের বংশোদ্ভব ও খৃষ্ট ধর্ম্মাবম্বী। ইহারা খ্রিষ্টীয়ানদিগের মধ্যে "গ্রীক চর্চ্চ" নামক সম্প্রদায়ভুক্ত। রোমান কেথোলিক চর্চ্চের সহিত গ্রীক চর্চ্চের অনেক সাদৃশ্য আছে। কপ্‌টদিগের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ এলেকজেণ্ড্রিয়া নগরে বাস করেন। মিসর দেশে মুসলমান ও কপ্‌ট দেখিলেই চিনা যায়; কপ্‌টদিগের পাগড়ী কৃষ্ণ অথবা নীলবর্ণ এবং মুসলমানদিগের পাগড়ী শ্বেতবর্ণ। মুসলমানদিগের সহিত তুলনা করিলে কপ্‌টদিগের সংখ্যা অতি অল্প বলিতে হইবে।

মিসর দেশের মুসলমানদিগের মধ্যে দরবেশ ও ফকীরদিগের বিলক্ষণ আধিপত্য। ইহাঁদিগের মধ্যে জেকর্ নামক প্রথা অর্থাৎ অতি উচ্চৈঃস্বরে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন প্রচলিত আছে। অনেক গুলি দরবেশ পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ঈশ্বরের স্তোত্র পাঠ ও ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। এক এক জন

দরবেশ এরূপ ঘুরিতে থাকে যে ঘুরিবার সময় তাহার ঘাঘরা উদ্ঘাটিত বিলাতী ছত্রের ন্যায় দেখায়।

ইহাদিগকে Whirling Durvesh অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান দরবেশ কহে। এই প্রকার ঈশ্বর স্তোত্র পাঠ ও ঘূর্ণয়নের সময় কেহ কেহ দশা প্রাপ্ত হয়। ঐ দশার নাম "মেলবুস্"। যাহাদিগের মেলবুস্ হয় তাহাদিগের স্বর আল্লার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ক্ষীণ হইয়া আইসে। তাহারা ভূমিতে পতিত হয়, মুখ হইতে ফেণ উদ্গীর্ণ হইতে থাকে, চক্ষু মুদ্রিত হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল খেঁচিতে থাকে এবং তাহাদিগের হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর অন্য অঙ্গুলি সকল দৃঢ় রূপে সম্বদ্ধ হয়। যাহারা মেলবুস্ হয় তাহারা অধিকাংশ ঈশ্বর প্রেম বিষয়ক সঙ্গীত শুনিয়া ঐরূপ হয়। সেই সঙ্গীত হইতে এখানে একটী পদ অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। "প্রেমে আমার অন্তঃকরণ উদ্‌বেজিত হইয়াছে, আমার চক্ষে নিদ্রা নাই। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছে; অশ্রুধারা আমার চক্ষু হইতে নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে। মিলন এখন দূরস্থিত, আমার প্রেমাস্পদকে কি আমি দেখিতে পাইব? হায়! যদি বিচ্ছেদ আমার অশ্রু বল পূর্ব্বক নিঃসারণ না করিত, তাহা হইলে এমন কি দীর্ঘ নিশ্বাসও পরিত্যাগ করিতাম না, হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েই লুক্কায়িত থাকিত। রাত্রি জাগরণ করিয়া আমার শরীর ক্ষয় হইতেছে, বিরহে আমার আশা নির্ব্বাণ হইতেছে, মুক্তার ন্যায় আমার অশ্রুবিন্দু সকল পতিত হইতেছে, আমার হৃদয় অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, আমার অবস্থার ন্যায় আর কাহার অবস্থা? এ অবস্থার ঔষধ কি তাহা জানি না। যদি বিচ্ছেদ আমার অশ্রু বলপূর্ব্বক নিঃসারণ না করিত তাহা হইলে এমন কি দীর্ঘ নিশ্বাসও পরিত্যাগ করিতাম না, হৃদয়ের বেদনা হৃদয়েতেই লুক্কায়িত থাকিত।"

মিসরবাসীদিগের মধ্যে অনেক উৎসব প্রচলিত আছে। তাহারা মহরমের প্রথম দশ দিন অত্যন্ত শুভকর জ্ঞান করে এবং দশম দিনের দিন মহোৎসব করিয়া থাকে। বৎসরের চতুর্থ মাসে তাহারা মুলীদ অল্‌হসানিন নামক উৎসব করিয়া থাকে। নিজ মহম্মদের স্মরণার্থ যে সকল উৎসব হয়, তাহা ব্যতীত অন্য সকল উৎসবের মধ্যে এই উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই উৎসব হোসেনের স্মরণার্থ সম্পাদিত হয়। সে দিবস মসজীদ সকল আলোকে আলোকময় করা হয় ও জেকরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়। রজব নামক মাসের সপ্ত বিংশতি দিবসে তাহারা মহম্মদের কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বশরীরে স্বর্গারোহণ ঘটনার স্মরণার্থ একটী উৎসব করিয়া থাকে। এই উৎসবের দিন প্রধান শেখ অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষের ঘোটক ভূতলশায়ী ভক্তের উপর দিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ প্রবাদ যে ইহাতে তাহাদিগের শরীরে কোন অনিষ্ট হয় না।

বর্ত্তমান মিসরবাসীরা নীল নদের প্রথম জল বৃদ্ধির সময়ে একটী উৎসব করিয়া থাকে। প্রাচীন মিসরবাসীরা এই সময়ে একটী কুমারীকে শোভন পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া নদে নিক্ষেপ করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত যে এই রূপ একটী কুমারী নীল নদকে অর্পণ না করিলে যথেষ্ট প্লাবন হইবে না। আরব সেনাপতি অম্রু মিসর দেশ জয় করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত করেন। কথিত আছে যে ঐ প্রথা রহিত করাতে নীল নদের জল যথেষ্ট রূপে বর্দ্ধিত হয় নাই। তজ্জন্য মিসরবাসীরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হওয়াতে অম্রু কালিফ ওমারকে কি করা কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। কালিফ ওমার একটী পত্রিকা লিখিয়া অম্রুর নিকট পাঠাইয়া দেন এবং উহা নীলনদে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। ঐ পত্রিকায় এই কথা গুলি লিখিত ছিল। "ধর্ম্ম নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের অধিপতি আবদুল্লা ওমারের দ্বারা মিসরের নীল নদের প্রতি উক্ত,—যদি তুমি আপনার ক্ষমতাতে বর্দ্ধিত হয়, তবে বর্দ্ধিত হইও না। আর যদি সর্ব্ব শক্তিমান এক মাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ইচ্ছাতে হও, তবে আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি তোমার জল বৃদ্ধি করুন"। কালিফের আদেশ মত অম্রু ঐ পত্রিকা নীল নদে নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে যে তাহার পর দিন রাত্রে নীল নদ ষোল হাত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এরূপ অদ্ভুত উপাখ্যান কখন বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

নীল নদ যখন যথেষ্ট রূপে বর্দ্ধিত হয় তখন মনাদি নামক সাধারণ সম্বাদ ঘোষকেরা বালক সমভিব্যাহারে পতাকা হস্তে করিয়া গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঐ ঘটনা

ঘোষণা করিয়া দেয়, যেহেতু নীল নদের বৃদ্ধির সমাচার না পাইলে প্রজারা নির্দ্দিষ্ট কর দিতে অনিচ্ছু হয়। নীল নদ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইলে যে দিবস তাহার তীরস্থিত বাঁদ কাটিয়া কাহিরা (Cairo) নগরের সন্নিহিত খালে তাহার জল আনয়ন করা হয়, সে দিন মহা মহোৎসব হইয়া থাকে। নানা শোভন বর্ণে রঞ্জিত বৃহৎ বৃহৎ নৌকা আরোহণ করিয়া ধনাঢ্য ও অপর সাধারণ ব্যক্তিগণ বাঁদ কাটা রূপ ক্রিয়া দেখিতে উপস্থিত হয়। এই উপলক্ষে নৌকার উপরে নৃত্য গীত বাদ্য হইয়া থাকে। যখন উপস্থিত প্রধান কর্ম্মচারী বাঁদ একটু কাটিয়া দেন তখন সকল লোকে গগনভেদী রবে আপনাদিগের আহ্লাদ প্রকাশ করে।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। ডাক্তার বাবু নাটক। জনৈক ডাক্তার প্রণীত। কলিকাতা, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১২৮২ সাল।

আজ কাল বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে অসারতা পরিপূর্ণ কোন নির্দ্দিস্ট-উদ্দেশ্য-শূন্য নাটকের যেরূপ প্রাচুর্য্য তাহাতে এক খানি প্রকৃত নাটক খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এই নাটক খানি ঐ শ্রেণীভুক্ত নহে। আমাদিগের দেশের নব্য ডাক্তারদিগের মধ্যে সচরাচর যে সকল ঘৃণার্হ দোষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই বিশেষরূপে দেখাইয়া উহাদিগকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করা এই নাটক খানির উদ্দেশ্য। ইহাতে ডাক্তারদিগের যে সকল দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার সকল গুলিই যে সম্পূর্ণরূপে সত্য ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস না হইলেও আমরা উহার উদ্দেশ্যের মহত্ব প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না। ইহাতে বঙ্গসমাজের অন্যান্য প্রচলিত সামাজিক দোষও প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রীসের সুবিখ্যাত নাটককার এরিষ্টোফেনিস স্বদেশের সামাজিক দোষ সকল দেখাইয়া যে সকল নাটক প্রকাশ করিতেন, তাহা সাধারণ সমক্ষে নাট্যশালায় অভিনীত হইয়া অনেককে সেই সেই দোষ হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম হইত। বঙ্গ ভাষায় ঐ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট নাটকের সংখ্যা অতি অল্প। ঐরূপ নাটক সকল প্রকাশিত ও অভিনীত হইয়া আমাদিগের সমাজের নানা দোষ দূরী করণে সহকারী হয় এই আমাদিগের প্রার্থনা।

২। অণুবীক্ষণ। স্বাস্থ্য রক্ষা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ও তৎ সহযোগী অন্যান্য শাস্ত্রাদি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক শ্রী হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা। ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। কলিকাতা, অণুবীক্ষণ যন্ত্র। শ্রাবণ, ১২৮২ সাল। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রস্তাব গুলি পাঠ করিয়া বোধ হইতেছে ইহা দেশের বিশেষ উপকারী হইবে। এই পত্রিকা প্রকাশে সম্পাদকের প্রধান অভিপ্রায় এই যে যে কারণে এতদ্দেশীয়েরা এক্ষণে হীনবল ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে তাহা অনুসন্ধান এবং সাধ্যমত নিবারণ করা। আমরা প্রার্থনা করি তিনি তাঁহার এই অত্যন্ত শুভ অভিপ্রায় সাধনে কৃতকার্য্য হয়েন। এই সংখ্যায় পরিপাক বিষয়ক যে প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রমথাংশের ন্যায় কেবল ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত সামগ্রী না ছাপাইলে ভাল হয়। উহার শেষাংশটি উত্তম হইয়াছে। উহা লেখকের নিজ রচিত হিতজনক উপদেশে পরিপূর্ণ।

৩। পশুবলি নিষেধ শ্রীগোপালচন্দ্র দেবশর্ম্ম কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, ১৭৯৭ শক। এই পুস্তক খানি মহামহিমান্বিতা মহারাণী স্বর্ণময়ীর নামে উৎসর্গিত হইয়াছে। ইহা ব্যবস্থাকারে সংস্কৃত ভাষায় রচিত, কিন্তু ইহার বিজ্ঞাপনটি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত। এই বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকর্ত্তা বলেন "আমাদিগের দেশে বলিদান কালে যে পশু হত্যা দৃষ্ট হয়, তাহা দেখিলে সকলেরই করুণা উপস্থিত হয়। পশুকে বল পূর্ব্বক উপর দিকে পা মুড়িয়া ধরা, পরে ছাড়িকাটে তাহার গলাতে খিল দিয়া টানিতে থাকা, তৎকালীন সেই পশুর আর্ত্তস্বর এবং কাটিবার পরে বেগে রক্ত পড়া ও পা ছোড়া এই সকল ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলে 'পাষাণও গলিয়া যায় এবং বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়'।" যাঁহারা বলিদান দেখিয়াছেন তাঁহারা গ্রন্থকারের এই কথায় সায় না দিয়া থাকিতে পারেন না।

৪। সচিত্র একাধিক সহস্র রজনী। ইব্রাহিম ও জেমিলে। গুপ্ত প্রেশ, কলিকাতা। ইহা প্রকাশমান সচিত্র আরব্য উপন্যাসের এক অংশ। বিলাতের ন্যায় সচিত্র পুস্তক বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ইহা বর্ত্তমান উন্নত কালের একটি লক্ষণ। এই পুস্তকের চিত্র গুলি পরিষ্কার ও উৎকৃস্ট। ছাপাও উত্তম। ভাষাও সুশ্রাব্য।

৫। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র। পূর্ব্বকাণ্ড। কুলাবধূত শ্রীমদ্ধরিহরানন্দনাথ ভারতী বিরচিত টীকা সহিত। দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীযুক্ত রায় কালীকিঙ্কর রায় বাহাদুরের অভিমতানুসারে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দা ১৭৯৭। এই পুস্তক পূর্ব্বে আমরা একবার সমালোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীযুক্ত

বাবু কুলদাকিঙ্কর রায় গ্রন্থের শেষে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে বলেন "মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে সপ্তম হইতে দশম উল্লাস পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে পূর্ব্বকাণ্ড সম্পূর্ণ হইবে। পূর্ব্বকাণ্ডের মুদ্রাঙ্কন শেষ হইলেই উত্তর কাণ্ড আরম্ভ করা যাইবে"।

সম্বাদ।

আমরা শোকার্ত্ত হৃদয়ে আমাদিগের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, আদিব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় গত ১ আশ্বিন দিবসে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সময় তাঁহার বয়ক্রম ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি যৌবন কালাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন আদি ব্রাহ্মসমাজেরই কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রায় বত্রিশ বৎসর হইল তিনি এবং আর তিনটী ছাত্র কাশীতে বেদাধ্যয়ন জন্য প্রধান আচার্য্য মহাশয় দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি চারি বৎসর তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক অথর্ব্ববেদ ও বেদান্ত-দর্শন বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ তেমনি কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তিনি সমাজের বৈষয়িক ও আচার্য্যের কর্ম্ম অতি নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতা নিবন্ধন তিনি সাধারণ হিন্দুসমাজের এক জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পঞ্চদশী, বেদান্তসার, উপনিষদ, ও ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থ সটীক ও সানুবাদ প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশে ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনার প্রকৃষ্ট সোপান উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ন্যায় বেদান্ত-দর্শনবিৎ পণ্ডিত অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল গ্রন্থ ব্যতীত তিনি ব্রাহ্ম বিবাহের শাস্ত্রসিদ্ধতা বিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাহ্ম বিবাহের আন্দোলনের সময় আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ-প্রণালীর শাস্ত্র-সিদ্ধতা প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি এক জন অমায়িক ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন!

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণ হুণ্ডি মনিঅর্ডর প্রভৃতি সহকারি সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নামে পাঠাইবেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ
১ কার্ত্তিক, ১৭৯৭ শক

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক সোমবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব-উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীজগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা।
সম্বৎ ১৯৩২। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬ ১ কার্ত্তিক রবিবার।

Registered No 52.

নবম কল্প

প্রথম ভাগ

৩৮৮ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৭৯৭ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৬
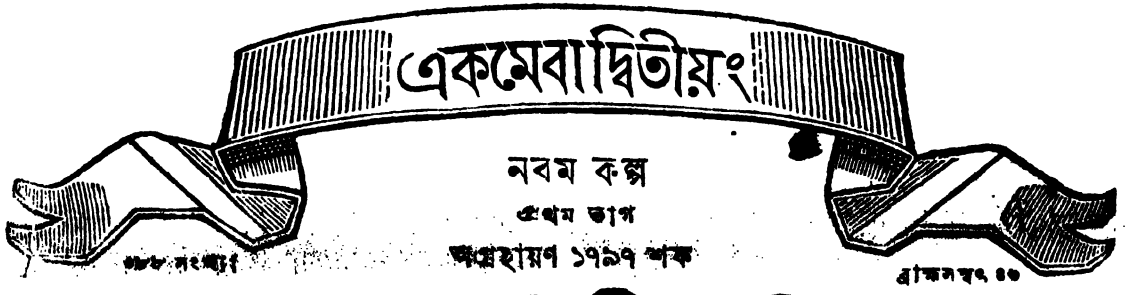
তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৪ আশ্বিন বুধবার ১৭৯৭ শক।

সমস্ত জগৎই ভ্রমণ করিতেছে, জগৎ শব্দের অর্থই ভ্রমণশীলতা। ইহার মধ্যে আমরা স্থিরত্ব অন্বেষণ করিতে যাই, কিন্তু কোথাও তাহা দেখিতে পাই না। আমরা অল্প-বুদ্ধি বালক, তাই বহির্বিষয়েরই দিকে ধাবমান হই, এবং মৃত্যুর বিস্তীর্ণ পাশে বদ্ধ হই; আমরা যদি ধীর-বুদ্ধি হইতাম, তাহা হইলে অমৃতত্ব যে কি তাহা জানিতাম, তাহা জানিলে আর অস্থায়ী বিষয়ের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করিতাম না!

পরাচঃ কামান্ অনুয়ন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশং।

অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥

অমৃতত্বের দিকে মনুষ্য-মনের স্বাভাবিক গতি। "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যদ্দ্বারা আমি অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব? কিন্তু এই সংসারের ভাব দেখিলে বোধ হয় যে, ইহার কোথাও অমৃতত্ব নাই, ইহার সকলই অস্থায়ী। "যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা। ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয়।" যদুপতির মথুরা-পুরী কোথায় গেল! রঘুপতির উত্তর-কোশলা কোথায় গেল! এইটি সবিশেষ চিন্তা করিয়া মনকে স্থির কর, জান যে জগৎ স্থির-সত্য নহে। ইনি বলিতেছেন "জগৎ স্থির নহে ইহা জানিয়া মনকে স্থির কর"—কিন্তু কি অবলম্বন করিয়া মন স্থির হইবে? যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত জগৎ স্থিতি করিতেছে, তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন আমারদের আর গত্যন্তর নাই। তাঁহাকে অবলম্বন না করাতে দেখ আমাদের সমাজের কি দুর্দশা ঘটিতেছে—

আমাদের চতুর্দিকে সমাজের গ্রন্থি-সকল ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, সমাজের মস্তক বিভ্রান্ত হইতেছে! সমাজের কুসংস্কার যদি একগুণ উন্মূলিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুসংস্কার দশ গুণ শত গুণ উন্মূলিত হইতেছে; পৌত্তলিকতা যদি এক গুণ উন্মূলিত হইতেছে, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অকৃত্রিম দেব-ভক্তি দশ-গুণ উন্মূলিত হইতেছে; স্বাধীনতার প্রতি যদি এক গুণ অনুরাগ জন্মিতেছে, তবে মঙ্গল-অনুষ্ঠানের প্রতি দশ গুণ বিরাগ জন্মিতেছে; সমাজের এইরূপ

অস্থির দশা দেখিয়া আমারদের মন কিরূপে সুস্থির হইবে? সমাজের অবস্থা দেখিয়া আমাদের মন যেমন অস্থির হয়, পুত্র-শোকে তেমন অস্থির হয় না, এ কথা অত্যুক্তি হইলেও হইতে পারে কিন্তু এ কথার অর্থ আছে। যে পুত্র-পৌত্রের মঙ্গলের জন্য আমরা এত আগ্রহান্বিত, সমাজ ভগ্ন হইলে তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে? মাতার রুগ্ন অবস্থা হইলে তাঁহার স্তন্য-সুধাও যেমন বিষ হইয়া পড়ে, সেইরূপ সমাজের রুগ্ন অবস্থায় তাহার মঙ্গল অনুষ্ঠান সকলও অমঙ্গলে পরিণত হয়। তাই আমরা চতুর্দ্দিকে নয়নপাত করিয়া দেখিতেছি যে, এত দিন আমারদের দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল—প্রকৃত ধর্ম্মের ভাব কোথায়? পূর্ব্বে যে মোহকোলাহল ছিল এখনো তাহাই রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মন নিতান্তই অস্থির হইতেছে। কিন্তু এ সমুদায় অস্থিরতাই বিলুপ্ত হয়—যখন দেখি যে সমাজের উপর ঈশ্বরের দৃষ্টি আছে! ঈশ্বরের হস্ত আছে! ঘোরতর এই যে বিশৃঙ্খলা ইহা মঙ্গলেরই জন্য। শত বৎসরে না হউক, দ্বিশত বৎসরে, দ্বিশত বৎসরে না হউক, ত্রিশত বৎসরে, দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী কোন না কোন সময়ে, মঙ্গলের আলোক আমারদের চক্ষে অনাবৃত হইবে; কি রূপ মঙ্গল হইবে, কি রূপেই বা হইবে, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু মঙ্গল হইবেই হইবে ইহা আমরা জানিতেছি—এই জ্ঞানটির উপরেই আমাদের মনের স্থৈর্য্য নির্ভর করিতেছে। যিনি অস্থায়ী বিষয়ের স্থায়িত্ব প্রার্থনা করেন, তাঁহার মন কখনই সুস্থির হইতে পারে না; কেবল যিনি সংসারের পার পরব্রহ্মে অচলা ভক্তি সমর্পণ করেন, তিনিই অচলের ন্যায় স্থির থাকিতে পারেন—"তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে সেই পায় অচল শরণ।"

হে পরমাত্মন্! সংসারের ভয়াবহ তরঙ্গের মধ্যে যাহাতে তোমার মুখ-জ্যোতি দেখিয়া মনের সকল ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতে পারি, আমারদের প্রতি সেই তোমার অমোঘ কৃপা বর্ষণ কর। মৃত্যুর করাল হস্ত হইতে আমারদিগকে মুক্ত কর, সংসারের কি এমন তাপ-যন্ত্রণা যাহা তোমার অমৃত বারিতে শীতল না হয়; তুমি আমারদের হস্তকে বলীয়ান কর, নয়নকে জ্যোতিষ্মান কর, হৃদয়কে সজীব কর, তাহা হইলে আমরা কোন বাধাতে পরাজিত হইব না, কোন বিভীষিকাতে ভয় পাইব না, কোন পীড়াতে কাতর হইব না—কি ধন না মেলে যখন তোমার সঙ্গে থাকি, মঙ্গল-মূরতি দেখাও তোমার প্রাণ আসে দেহে যখন তোমায় দেখি।

সমাজ সংস্কার।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

৩৮৬ সংখ্যক পত্রিকার ১১৩ পৃষ্ঠার পর।

আমরা পূর্ব্বকার প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, প্রাচীন প্রথা যতদূর রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে দেখা যাউক যে আমাদিগের হিন্দুসমাজের প্রতি ঐ নিয়ম নিয়োগ করিয়া কত দূর সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করা যাইতে পারে।

আমাদিগের হিন্দুসমাজের ভিত্তিভূমি জাতি-বিভেদ-প্রথা ও স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার প্রণালী। বর্ত্তমান প্রস্তাবে জাতি বিভেদ প্রথা আলোচনা করা যাইতেছে। এই প্রস্তাবে স্বাধারণতঃ জাতি বিভেদপ্রথার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিয়া আমাদিগের দেশে প্রচলিত জাতিবিভেদপ্রথার গুণ ও দোষ এবং সেই দোষ নিবারণের উপায় বিবেচনা করা যাইবে।

প্রকৃত ধর্ম্মের নিকট জাতিবিভেদ নাই। জল, বায়ু, জ্যোতি প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থের প্রতি যেমন সকল জাতির অধিকার আছে, তেমনি সর্ব্ব জাতির পিতা মাতা ঈশ্বরের উপাসনাতে সকলেরই অধিকার আছে। ঈশ্বরোপাসনাতে জাতিবিভেদ নাই। কিন্তু যেমন পৃথিবীর উপর উচ্চ নিম্ন স্থান চিরকালই থাকিবে, তেমনি লোকসমাজে উচ্চ নিম্ন শ্রেণীর লোক চিরকালই থাকিবে। এক্ষণে আমাদিগের দেশে যে জাতিবিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা উঠাইয়া দেও, আর এক প্রকার জাতিবিভেদপ্রথা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। এক্ষণে আমাদিগের দেশের লোকেরা যাহা জ্ঞান ও ধর্ম্ম মনে করে, কোন ব্যক্তি তদ্‌সম্পন্ন হইলে তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকে। এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধূলিপূর্ণ পদে ধনী প্রতাপশালী শূদ্রের ভবনে সমাগত হইলে তিনি তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিবেন। এ প্রকার জাতিবিভেদ উঠাইয়া দিলে হয়ত ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যে প্রকার জাতিবিভেদপ্রথা আছে, অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিকে অত্যন্ত সম্মান করিবার প্রথা, তাহা প্রচলিত হইতে পারে; তাহাতে আমাদিগের সমাজের বিশেষ উপকার না হইয়া বরং অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ঐশ্বর্য্যের প্রতি অত্যন্ত সম্মাননা মনকে অতিশয় হীন করে। ধনী ব্যক্তির প্রতি কেবল ধন-নিবন্ধন অত্যন্ত সম্মান করা অপেক্ষা উল্লিখিত দরিদ্র পণ্ডিত ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত সম্মানে মহত্ত্ব আছে তাহা অপক্ষপাতী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। বিলাতে ধনী স্বর্ণকার অথবা ধনী কর্ম্মকার দরিদ্র স্বর্ণকার অথবা দরিদ্র কর্ম্মকারের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিবে না, কিন্তু আমাদিগের দেশে ধনী স্বর্ণকার অথবা ধনী কর্ম্মকার স্বজাতীয় দরিদ্র ব্যক্তির সহিত একত্র বসিয়া আহার করিবে। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমাদিগের বর্ত্তমান জাতিবিভেদ-প্রথা উঠাইয়া ইউরোপীয় জাতিবিভেদপ্রথা আমাদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করা শ্রেয়স্কর নহে।

অনেকে বিবেচনা করেন, আমাদিগের দেশে প্রচলিত জাতিবিভেদপ্রথা কেবলই অনিষ্টজনক, তাহাতে কিছু মাত্র উপকার নাই; কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া অপক্ষপাতী চিত্তে বিবেচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে তাহা একেবারে উপকারশূন্য নহে। এক্ষণে ইংলণ্ডে পূর্ব্বকার ন্যায় বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তি না জন্মানতে তথাকার কোন কোন বিজ্ঞ লোকের এইরূপ মত দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহাদিগের দেশে বিশেষ বুদ্ধিমান লোকের প্রবাহ রক্ষার জন্য বুদ্ধিমান পুরুষ বুদ্ধিমান স্ত্রীলোককে বিবাহ করিবে এই প্রথা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের লোকসমাজের প্রকৃতি এবং ব্যবস্থা ও প্রণালী এইরূপ যে, আমাদিগের এরূপ কোন প্রথা নূতন অবলম্বন করিবার আবশ্যকতা নাই। আমাদিগের দেশের উচ্চ জাতির লোকেরা প্রায় বুদ্ধিমান হয়েন; উচ্চ জাতীয় পুরুষেরা স্বজাতীয় স্ত্রী বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহাতে বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হয়, ইহাতে প্রায় বুদ্ধিমান সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল দেখিলে প্রতীত হইবে যে, যে সকল ছাত্রেরা ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা অধিকাংশ উচ্চ জাতীয় যুবক। আমাদিগের দেশের প্রসিদ্ধ কবি এবং কাব্য ব্যতীত অন্যান্য প্রকার উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা, এমন কি, প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারকেরা পর্য্যন্ত উচ্চ জাতীয়। অতএব দেশে বিশেষ বুদ্ধিমান লোকের প্রবাহ রক্ষার জন্য আমাদিগের যে বর্ত্তমান প্রণালী আছে তাহাই

যথেষ্ট। এ বিষয়ে কোন বিদেশীয় লোকের প্রস্তাবিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে না।

আমাদিগের দেশে যে জাতিবিভেদ-প্রথা প্রচলিত আছে তাহা কোন কোন বিষয়ে উপকারী হইলেও তাহা দোষশূন্য নহে। তাহার প্রধান দোষ এই যে, উচ্চ জাতীয় ব্যক্তি যদি জ্ঞানহীন অধার্ম্মিক ও দুশ্চরিত্র হয়, তাহা হইলেও তাহাকে উচ্চ জাতির উচিত্ সম্মান প্রদান করিতে হয়, এই প্রথা অজ্ঞান ও অধার্ম্মিকতার প্রশ্রয় দিয়া লোকসমাজের অনিষ্ট সাধন করে। এক্ষণে উল্লিখিত দোষের সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে।

আমাদিগের এ প্রকার সামাজিক নিয়ম হওয়া উচিত যে, কেবল ব্রহ্মজ্ঞ সদ্বিদ্বান ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণকেই আমরা ব্রাহ্মণোচিত সম্মান করিব, অন্য প্রকার ব্রাহ্মণকে কেবল ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব বলিয়া আমরা সেরূপ সম্মান করিব না। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী কোন ব্যক্তি এ প্রকার নিয়মের প্রতি কোন আপত্তিই করিতে পারেন না। আমরা এই পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় এ বিষয়ের ভূরি ভূরি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদান করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ, সদ্বিদ্বান ও ধার্ম্মিক তিনি ব্রাহ্মণ শব্দের বাচ্য। পুরাকালে যে উদ্দেশে ব্রাহ্মণশ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য যাঁহারা রক্ষা করিতে না পারেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য মর্য্যাদা কখনই প্রাপ্ত হইতে পারেন না। এই কথাটি বুঝা এত সহজ এবং যিনি ব্রাহ্মণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞ, বিদ্বান ও ধার্ম্মিক হইবেন এই প্রত্যাশা এইরূপ ন্যায্য যে তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের অবশ্যকতা নাই।

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা সংরক্ষণ নিমিত্ত উল্লিখিত নিয়মের অনুষঙ্গাধীন আর একটি নিয়ম অবলম্বন করা কর্ত্তব্য; সে নিয়ম উন্নয়ন ও অবনয়নের নিয়ম। বস্তুতঃ এই দুই নিয়মের পরস্পর এরূপ নিকট সম্বন্ধ যে, একটি আর একটিকে স্বভাবতঃ আনয়ন করিতেছে। যদি কোন নিম্ন জাতীয় ব্যক্তি বিশেষরূপে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হয়েন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নত করা অত্যন্ত উচিত এবং যে মূর্খ ও দুশ্চরিত্র ব্রাহ্মণ পবিত্র ব্রাহ্মণকুলের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অক্ষম তাহাকে নিম্ন জাতিতে অবনয়ন করা অতীব কর্ত্তব্য। আমরা এই পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে এ প্রকার প্রথা ভারতবর্ষে পুরাকালে প্রচলিত ছিল। আমাদিগের যদি স্বদেশীয় রাজা থাকিতেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ্য প্রথাতে এক্ষণে যে সকল দোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহার সংশোধনে তিনি অবশ্য যত্নবান হইতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমাদিগের রাজা স্বদেশীয় নহেন, তখন দেশের সকল সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বান ব্যক্তির উচিত যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করেন। আর্য্যধর্ম্মের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, ঐ ধর্ম্ম অতিপ্রাচীন কালে যাহা ছিল, তাহা এক্ষণে ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে এমত নহে। ঋগ্বেদপ্রোক্ত ধর্ম্মের সহিত এক্ষণকার প্রচলিত ধর্ম্মের অনেক পরিমাণে সাদৃশ্য নাই। আর্য্যধর্ম্মে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা আর্য্যেরা নিজ যত্নেই সংসাধন করিয়াছেন। অতএব এ প্রত্যাশা অমূলক নহে, যে বর্ত্তমান আর্য্যধর্ম্মের দোষ সকল, আর্য্যেরা নিজ চেষ্টা দ্বারা সংশোধন করিতে যত্নবান হইবেন। উল্লিখিত দুটী নিয়ম প্রচলিত হইলে বর্ত্তমান জাতিবিভেদ প্রথাতে যে সমস্ত দোষ আছে কেবল তাহাই নিরাকৃত হইবে এমৎ নহে, জাতিবিভেদ-প্রথা জ্ঞান ও ধর্ম্মের পালয়িতা এবং অজ্ঞান ও অধর্ম্মের দময়িতা হইয়া লোকসমাজের

প্রভৃত কল্যাণকর হইবে। উল্লিখিত পরিবর্ত্তন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে কোন নূতন নিয়ম অবলম্বন করিতে হইবে এমন নহে, প্রাচীন প্রথা পুনর্জীবিত করিলেই তাহা সংসাধিত হইবে। উন্নয়নের প্রথা অনেক দিন পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছে, কিন্তু পাপ জন্য অবনয়নের প্রথা সে দিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। এক কি দুই বংশ পূর্ব্বে পরদারাভিগমন ও সুরাপান জন্য লোকে জাত্যন্তরিত হইত। উন্নয়ন ও অবনয়নের নিয়ম সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিলে হিন্দুসমাজের যে কত কল্যাণ সাধিত হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

মুখ্য এবং গৌণ।

৩৮৭ সংখ্যক পত্রিকার ১৩২ পৃষ্ঠার পর।

বাঙ্গালিদিগের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ ইহা জানিয়া যেরূপ করিলে সেই অবস্থার উন্নতি হইতে পারে তাহাই বাঙ্গালিদের কর্ত্তব্য। "প্রকৃত অবস্থা" এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আনুমানিক এবং মনঃকল্পিত অবস্থাই সহজে লোকের দৃষ্টিতে পড়ে, প্রকৃত অবস্থা জানিতে হইলে অনুসন্ধান, পরীক্ষা, আলোচনা, বিবেচনা ইত্যাদিক্রমে বুদ্ধি চালনা এবং শ্রম স্বীকার আবশ্যক হয়। যেমন কোন ভূমিখণ্ড অধিকার করিতে হইলে অগ্রে তাহার একটি মানচিত্র চাই, সেই রূপ বঙ্গ-সমাজের তত্ত্বানুশীলন করিবার অগ্রে তাহার একটি মানচিত্র আবশ্যক; তাহা এইরূপ;—প্রথমতঃ, বাঙ্গালি সমাজ ইংরাজি-সমাজ দ্বারা বেষ্টিত; দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালি সমাজের রীতি নীতি সমস্তই প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে প্রবাহিত; তৃতীয়তঃ, মুসলমানদিগের প্রভাব দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম ঘটনা।

এই মানচিত্রটি সম্মুখে রাখিয়া দেখা যাউক্ যে, হিন্দু মুসলমান ইংরাজ এই তিন জাতির কোন্ জাতি কোন্ ভাবে বঙ্গসমাজের দশা চক্রের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন। সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুরা মঙ্গল-প্রধান ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, মুসলমানেরা বল-প্রধান ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন ইংরাজেরা স্বাধীনতা-প্রধান ভাবে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। বাঙ্গালি সমাজের মধ্যে মঙ্গলপ্রধান ভাব এবং বল-প্রধান ভাব স্ব স্ব কার্য্য করিয়া অবসর লইয়াছে, এক্ষণে স্বাধীনতা-প্রধান ইংরাজী ভাবের অভ্যুদয় হইতেছে। যাহা বলা হইল, সংক্ষেপে তাহার দুই একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। মনু প্রভৃতি ঋষিদিগের ব্যবস্থাতে আর যে কিছুর ত্রুটি থাকুক্ না কেন, কিন্তু উক্ত বিধান-কর্ত্তাদিগের মঙ্গল-ভাবের কোন অংশে ত্রুটি ছিল না। তাঁহারা যে কোন বিষয় উপকারী জানিতেন, তাহা কিরূপে জনসাধারণের ভোগে আসিবে, যে কোন কার্য্য হিতকারী জানিতেন তাহা কিরূপে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইবে, যে কোন অনুষ্ঠান শুভজনক জানিতেন তাহাতে কিরূপে লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি ও নিষ্ঠা জন্মিবে, এই চিন্তাই তাঁহাদের মনে সর্ব্বদা জাগিত। সামান্য গৃহধর্ম্ম বিষয়ে উক্ত তিন জাতির মধ্যে কাহার কিরূপ ব্যবস্থা-প্রণালী তাহা দেখিলেই তিন জাতির তিন প্রকার ভাব স্পষ্ট উপলব্ধি হইতে পারিবে। গৃহ-ধর্ম্ম বিষয়ে মন্বাদি ঋষিগণের ব্যবস্থা সংক্ষেপতঃ এইরূপ;—মাতা পিতাকে দেবতুল্য জানিবে, স্ত্রীকে স্বামী ভরণ পোষণ করিবেক, ছায়ার ন্যায় পত্নী পতির অনুবর্ত্তী হইবেক, পুত্রগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবেক, কন্যাগণকেও অতি যত্ন পূর্ব্বক পালন করিবেক এবং শিক্ষা দিবেক; দাস-বর্গ ছায়ার ন্যায়, দুহিতা কৃপা-পাত্র, অতএব এ সকলের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইলেও সংযত হইয়া সমস্ত সহ্য

করিবেক ইত্যাদি। ইহাতে কেমন মঙ্গলভাব প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমান ব্যবস্থা যে, বল-প্রধান তাহা তুলনাতেই ধরা পড়ে; ঋষিগণের ব্যবস্থাতে স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়াছে, যথা "কন্যাকেও অতি যত্নের সহিত পালন করিবে এবং শিক্ষা দিবে," "স্ত্রী গৃহের শ্রী-স্বরূপা" ইত্যাদি। কিন্তু মুসলমান ব্যবস্থাপকেরা স্ত্রী জাতিকে অপেক্ষাকৃত হেয় জ্ঞান করিয়াছেন। যাঁহারা বলের পক্ষপাতী তাঁহারা দুর্ব্বল অবলা জাতিকে হেয় জ্ঞান করিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? কেবল যাঁহারা মঙ্গলের অনুরাগী তাঁহারাই স্ত্রীজাতির দুর্বলতার মধ্যেও স্নেহ-প্রেম-দয়া-ভক্তির বল দেখিতে পা'ন। ইংরাজদিগের স্বাধীনতা কিছু অতিরিক্ত; তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর অনুগামী হইবে।" ইহার প্রতি বক্তব্য এই যে, "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং"। এরূপ অতিরিক্ত স্বাধীনতা স্বাধীনতার বিকার অবস্থা, উহা কখনই আমাদের অনুকরণীয় নহে। বাঙ্গালি সমাজে যে কিছু মঙ্গল ভাবের চর্চ্চা অদ্যাপি চলিতেছে তাহা পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রসাদাৎ; অনতি পুরাকালে বলবানের আনুগত্য ও দুর্ব্বলের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য যাহা দেখা যাইত তাহা মুসলমানদিগের প্রসাদাৎ; এবং এক্ষণে যে স্বাধীনতার চর্চ্চা চলিতেছে তাহা ইংরাজদিগের প্রসাদাৎ। এক্ষণে বঙ্গসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে বাঙ্গালিদের কিরূপ ভাবে চলা কর্ত্তব্য তাহা দেখা যাউক বাঙ্গালিদের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ;—স্বজাতীয় ভাবের প্রতি, অর্থাৎ মঙ্গল-প্রধান ভাবের প্রতি, বাঙ্গালিদের নিতান্তই অনাদর জন্মিয়াছে; বলপ্রধান ভাবের প্রতি তদপেক্ষা অধিক আদর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাধীনতার প্রতি লোকের একটা বিপরীত ভক্তি জন্মিয়াছে। "বিপরীত ভক্তি" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সেই স্বাধীনতার প্রতিই মনুষ্যের প্রকৃত ভক্তি জন্মিতে পারে, মঙ্গল-ভাবের সহিত যাহার যোগ আছে; প্রত্যুত মূল-ছাড়া শাখার ন্যায় যে স্বাধীনতা মঙ্গল-ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছে সে স্বাধীনতা প্রকৃত নহে তাহা বিকৃত, তাহাকে স্বেচ্ছাচার বলাই সঙ্গত। এরূপ স্বাধীনতা কখনই শ্রদ্ধেয় নহে।

ইংরাজ জাতিরা আপনারদের স্বাধীনতা আপনারা অর্জ্জন করিয়াছেন; স্বাধীনতা-লাভের যে কিরূপ পদ্ধতি, ইংরাজদিগের পুরাবৃত্ত পাঠে তাহা আমরা অবগত হইতে পারি। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" ইহা ইংরাজ জাতিরা বিলক্ষণ বুঝেন। মঙ্গল-ভাবের পরিস্ফুটন দ্বারা তাঁহারা স্বহস্তে স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়াছেন এই জন্য তাঁহাদের স্বাধীনতা যদিও স্থল-বিশেষে তীব্র বৈকারিক ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার একটি বিশেষ গুণ এই যে, তাহা নৈসর্গিক, স্বদেশীয়, তাহাতে পরানুকারিতা ও কৃত্রিমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের লোকেরা ইংরাজদিগের পরিপাটী উপকরণ সামগ্রী সকল দেখেন, এবং তাহাতেই মুগ্ধ হন, কিন্তু যেরূপ প্রকরণ দ্বারা সে সকল সামগ্রী প্রস্তুত হয় তাহা দেখেন না,—এমনিই, তাঁহারা ইংরাজদিগের স্বাধীনতা মাত্র দেখেন এবং তাহাতেই মুগ্ধ হন, কিন্তু কি প্রকরণ দ্বারা ইংরাজেরা আপনাদের স্বাধীনতা আপনারা উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহা দেখেন না। ইংরাজেরা যখন ম্যাগ্না চার্টা নামক নিয়ম-পত্রের উপরে স্বাধীনতার সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের মঙ্গলভাব কেমন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; রাজার অত্যাচার হইতে ক্ষুদ্র প্রজাদিগকে বাঁচাইবার জন্য, প্রধান প্রধান দল-

পতিরা যে মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান হইলেন—ইহা মঙ্গল-ভাবের একটি প্রধান উদাহরণ-স্থল বলিতে হইবে। কিন্তু এ সকল মহৎ দৃষ্টান্ত কেন উল্লেখ করিতেছি? যাঁহারা পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধুকে ছাড়িয়া কলিকাতা নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে বা ইংলণ্ডে স্বাধীনতার গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিতে যা'ন, তাঁহারদের স্বাধীনতার সঙ্গে ঐ প্রকার স্বদেশ-প্রেমী নৈসর্গিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতার কি কোন সম্পর্ক আছে? নৈসর্গিক এবং অকৃত্রিম স্বাধীনতা কি, তাহা যদি জানিতে চাও তবে পুরু-রাজা বন্ধনদশায় আলেক্জাণ্ডরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হও। তোমরা কতকগুলি চাকচিক্য দেখিয়া আপনার দেশকে ভুলিয়া যাও—তোমরা যদি স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত-স্থল হইলে, তবে যাঁহারা তাহাতে না ভুলেন, যাঁহারা পুরু-রাজার ন্যায় স্বদেশের গৌরব রক্ষা করেন, তাঁহাদের ন্যায় পরাধীন ত আর জগতে নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ বাঙ্গালিকে স্বাধীনতা-ভক্ত উপাধি দেওয়া যাইতে পারে? যিনি বঙ্গসমাজ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজিত্ব-ব্রত অবলম্বন করেন, তিনি কি স্বাধীন? এক প্রকার স্বাধীন বটে; তিনি ইচ্ছা মতে পান-ভোজন করিতে পারেন, ইচ্ছা মতে আপনার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারেন, তাঁহার স্বাধীনতার ব্যাপ্তি এই পর্য্যন্ত। স্বাধীনতা কি মহৎ নাম! স্বাধীনতার জন্য পৃথিবীতে কত রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে, স্বাধীনতার জন্য লোকে কত দিন উপবাস করিয়াছে, ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে কত সুখে বঞ্চিত করিয়াছে, কত কঠোর তপস্যা করিয়াছে, বিষয়-সুখের প্রলোভন হইতে মনকে কত বল পূর্ব্বক উচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, কেবল অন্তরের মহত্ত্বের জন্য বাহ্যিক সকল প্রলোভন, সকল সুখ সম্পত্তি, অট্টালিকা পরিচ্ছদ বেশভূষা সমস্তই তুচ্ছ করিয়াছে; সে-সকল গিয়া এক্ষণকার স্বাধীনতা কি? না "আমি স্বাধীন দেশ-বিশেষে পদার্পণ করিয়াছি—সুতরাং আমি স্বাধীন! এই প্রকার স্বাধীন যুবা মনে মনে বলেন "ইহা কি সুখের বিষয় যে, ইংরাজেরা এত কষ্টে এত পরিশ্রমে যে স্বাধীনতা উপার্জ্জন করিয়াছেন, আমরা বিনা পরিশ্রমে বিনা কষ্টে সেই স্বাধীনতা আপনারদের করিয়া লইতেছি। আমরা কি বুদ্ধিমান্ জাতি! আমারদের ধী-শক্তি কি চমৎকার! ইংরাজেরা এত বুদ্ধি-বিদ্যা ব্যয় করিয়া যে সকল অত্যাশ্চর্য্য পণ্য-সামগ্রীতে বিপণী সাজাইয়া রাখিয়াছে, আমরা কেবল মুদ্রা-মাত্র ব্যয় করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারি, আমারদের কি সৌভাগ্য!"

এক্ষণে বঙ্গযুবকদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বপুরুষদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া মঙ্গল-ভাবের যথাসাধ্য অনুশীলন কর, তাহা হইলে স্বাধীনতা ঐক্য এবং মনুষ্যত্ব সকলই হস্তগত হইবে। যখন পিতা মাতাকে যথোচিত ভক্তি করিবে, ভ্রাতৃগণের সহিত যথোচিত সদ্ভাব রাখিবে, স্ত্রী পুত্র কন্যা সকলের প্রতি কর্ত্তব্যানুযায়ী ব্যবহার করিবে, যখন স্বদেশের প্রতি অনুরাগী হইবে,—স্বদেশের যে সকল উত্তম রীতি নীতি, যে সকল জ্ঞানগর্ভ উক্তি, যে সকল উদার ব্যবস্থা, সে সকলকে যখন প্রাণতুল্য জানিবে,—স্বদেশের যে সকল আচার ব্যবহার নিন্দনীয় জানিবে তাহা বিনা আড়ম্বরে (যত সহজ-ভাবে হয়) যখন পরিত্যাগ করিবে, স্বদেশের পূর্ব্বতন মহাত্মাগণের প্রতি যখন সমুচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে; এইরূপে যখন চলিবে; তখন দেখিবে যে, স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে না, স্বাধীনতা স্বয়ং আসিয়া তোমারদের চিরাভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

যাঁহারা মঙ্গলভাব ছাড়িয়া স্বাধীন হইতে চান, এবং যাঁহারা না পড়িয়া পণ্ডিত হইতে চান, উভয়েই সমান! হইব স্বেচ্ছাচারী,বলিব স্বাধীন, এ ভাব পূর্ব্বে ছিল না, এ ভাব একটি নূতন সৃষ্টি। স্বাধীন-ভাবের অনুশীলন অত্যন্ত আবশ্যক, কিন্তু "স্বাধীনতা" নামটির বাক্যার্থ মাত্র গ্রহণ করিলে হইবে না, তাহার ভাবার্থের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। আমারদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের যেরূপ আত্ম-নির্ভর ছিল, পরানুকরণে তাঁহাদের যেরূপ অপ্রবৃত্তি ছিল,এবং ইংরাজদিগের এক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তাহাই আইস আমরা অনুকরণ করি; আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দ্বারা আমরা যেন আমাদের পবিত্র পূর্ব্বপুরুষদিগের নামকে কলঙ্কিত না করি। কার্য্যে অনুকরণ-প্রিয়তা, এবং বাক্যে অনুবাদপ্রিয়তা, এ দুটি থাকিতে, আমরা স্বাধীনতাই বলি আর উন্নতিশীলতাই বলি, যাহা বলি তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিলেই ঠিক হয়। স্বাধীনতার অর্থ অভিধানে যাহা থাকুক না কেন, এক্ষণে তাহার অর্থ— ইংরাজি চাকচিক্যের অধীনতা, এবং উন্নতির আভিধানিক অর্থ যাহা হউক না কেন, এক্ষণে তাহার অর্থ অধোগতি প্রাপ্ত হওয়া। আমারদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের শ্রী বিদ্যা এবং কল্যাণ এই তিনের প্রতি যেকতদূর যত্ন ছিল তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে, অথচ তাহার প্রতিই আমরা অন্ধ, পরন্তু তাঁহাদের যে সকল দোষ ছিল তাহারই আলোচনাতে আমরা অত্যন্ত পটু হইয়াছি; সে দোষ গুলি যদি পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে প্রকৃত একটি কার্য্য করি,—সে দিকে আমরা এগই না; কেবল আলোচনাই করি; কেহ বা ইংরাজদের শ্রবণ-রঞ্জন করিবার অভিপ্রায়ে তাহা আলোচনা করেন, কেহ বা স্বেচ্ছাচারের পথ খুলিয়া দিবার মানসে তাহা আলোচনা করেন; কেহ বা ক্রীড়াচ্ছলে তাহা আলোচনা করেন —জানেন না যে অনর্থক আপনারদের দোষ ঘোষণা করা, নিরুৎসাহের বীজ বপন করা মাত্র। সংশোধন-মানসে দোষ কীর্ত্তন করা স্বতন্ত্র, আর ক্রীড়াচ্ছলে দোষ কীর্ত্তন করা স্বতন্ত্র। দোষ সংশোধন মানসে যাঁহারা বঙ্গসমাজের দোষ কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা যদি অল্পাংশ দোষ কীর্ত্তন করেন তবে অধিকাংশ গুণ কীর্ত্তন করেন। কিন্তু ক্রীড়াচ্ছলে যাঁহারা দোষ কীর্ত্তন করেন তাঁহারা শুদ্ধ কেবল দোষই দেখেন, গুণ তাঁহারা একটি মাত্রও দেখিতে পা'ন না; এইরূপ দোষ কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে বাঙ্গালিরা নিরুৎসাহ নির্বীর্য্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। স্বদেশের মঙ্গল-প্রধান ভাব যে কত যত্নের ধন, তাহা বিস্মৃত হইয়া কৃত্রিম স্বাধীনতার দিকে সকলেই ধাবিত হইতেছে। মুখ্যরূপে মঙ্গলভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলেই কালে বাঙ্গালিদের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারিবে, ইহা ভিন্ন স্বাধীনতা লাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। "আমি কিছু মানি না" বলিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার নাম স্বাধীন-ভাব নহে; তাহার নাম বিশৃঙ্খল ভাব; পুত্র যদি পিতাকে না মানে, স্ত্রী যদি স্বামীকে না মানে, লোকেরা যদি পূর্ব্বপুরুষদিগের মাহাত্ম্য সকল বিস্মৃত হয়, সৈন্যেরা যদি সেনাপতিকে অমান্য করে, তবে তাহাকে কি স্বাধীনতা বলা যাইবে? যে অবস্থায় যেখানে যে সময়ে যাহা কর্ত্তব্য, সেই অবস্থায় সেই খানে সেই সময়ে তাহা করা—ইহারি নাম স্বাধীন ভাব। বাঙ্গালিদের দেশ কাল অবস্থা সমস্ত ভাবিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তটি স্থির হয় যে,স্বজাতীয় ভাব, অর্থাৎ মঙ্গল-প্রধান ভাব অবলম্বন করিয়া চলাই বাঙ্গালিদের মুখ্য কর্ত্তব্য; বিজাতীয় ভাবের (তীব্র স্বাধীন-ভাবের) অনুশীলন আপাতত গৌণ কল্প—কিন্তু ভবিষ্যতে

যখন আমরা মঙ্গলানুষ্ঠানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিব, মঙ্গল-প্রধান স্বজাতীয় ভাবের প্রতি যখন আমাদের ভক্তি প্রেম ও নিষ্ঠা জন্মিবে, তখন স্বাধীনতা মুখ্যরূপে অবলম্বনীয় হইবে।—এটি আপনা আপনি হইবে।

শরৎকালে ব্রহ্মোপাসনা।

পিঞ্জর-মুক্ত হইলে বিহঙ্গ যেমন আনন্দে উড্ডীন হইয়া অরণ্যাভিমুখে গমন করে, যেমন মুক্ত-কণ্ঠে গীত গান করে, বন্ধন-গ্লানি তখন তাহার আর কিছুমাত্র মনে থাকে না, সেইরূপ আনন্দে গৃহ হইতে প্রয়াণ করিয়া অদ্য আমরা এখানে সমাগত হইয়াছি, সেইরূপ মুক্ত-কণ্ঠে আইস আমরা ব্রহ্মের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই, সেইরূপ আইস আমরা সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।

এই হাস্যময় শরৎকালকে যিনি বিষদ জ্যোৎস্না-মাধুর্য্যে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, তিনিই আমাদের মনে পবিত্র আনন্দের সঞ্চার করিতেছেন; প্রকৃতি আপনি বর্ষাকালের বিমল বারিধারাতে স্নান করিয়া মালিন্য-মুক্ত হইয়া বিষদ পরিচ্ছদে শোভমানা হইয়াছেন, এখন তিনি চান যে, আমাদের মন স্বচ্ছ সরিৎ-প্রবাহের ন্যায় প্রসন্ন হয়, এবং বিমল জ্যোৎস্নার ন্যায় পরব্রহ্মের আনন্দ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। প্রকৃতি এই সকল চন্দ্র-তারা লইয়া কাহাকে দীপোপহার প্রদান করিতেছেন, এই পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী লইয়া কাহার চরণ ধৌত করিতেছেন, নদী-তীর-জাত বিকসিত কাশ-স্তবকে কাহাকে চামর ব্যজন করিতেছেন! প্রকৃতি পরব্রহ্মেরই অর্চনাতে দিবারাত্র নিযুক্ত রহিয়াছেন; প্রকৃতি আমাদের পরম গুরু, আইস, তাঁহার নিকট হইতে আমরা পরম পবিত্র ব্রহ্মানুরাগ শিক্ষা করি। হে সূর্য্য! জ্বলন্ত অনুরাগ যে কি, তাহা তুমি আমাদিগকে শিক্ষা দেও; প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সায়াহ্ন পর্য্যন্ত তুমি কাহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিতেছ, কাহার অনুরাগ-জ্যোতিতে তুমি জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছ, তাহা আমাদিগকে বল। ব্রহ্মপ্রীতির যে কি উজ্জ্বল বদন এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনের যে কি অক্ষয় বল, তোমাকে দেখিলে আমরা তাহার কতকটা বুঝিতে পারি। হে চন্দ্র! তোমার মুখ-জ্যোতিতে তারকাগণ যদিও প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তথাপি তুমি ক্ষণকালের জন্যও গর্ব্বিত হও না; যেখানে তুমি অদ্য শ্রী-শোভায় পূর্ণ হইয়া উত্থান করিয়াছ, কিছু দিন পরে যখন তুমি সর্ব্বস্বান্ত হইবে, তখনও তুমি সেই খানে উত্থান করিতে লজ্জিত হইবে না; তোমার দশা-চক্র নিয়তই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সম্পদে তুমি গর্ব্বিত হইতেছ না, দৈন্যে কুণ্ঠিত হইতেছ না, ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছ। তোমার যে এমন মধুর জ্যোতি, তাহা তোমার একবার মনেও হয় না, যাহারা তোমাকে দেখে তাহারাই তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়া যায়, যদি কেহই না দেখে, তথাপি তোমার মাধুর্য্য এমনিই থাকিবে। হে পরমকল্যাণময়ী প্রকৃতি! তুমি আমারদের মাতার স্বরূপ; যিনি মহৎ হইতে মহত্তম, অন্তর হইতে অন্তরতম, তুমি ভিন্ন আর কে আমারদিগকে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় নিকেতনে লইয়া যাইবে; আমরা যতই কেন স্পর্দ্ধা করি না, যতই কেন গর্ব্ব করি না, তোমার নিকটে আমরা কল্যকার শিশু ভিন্ন আর কিছুই নই; মাতার নিকটে পুত্র বয়োবৃদ্ধ হইলেও যে শিশু সেই শিশুই থাকে; কিন্তু তুমি সামান্য মাতা নহ, তুমি সদ্যোজাত পৃথিবীর নগ্ন অবস্থায় তাহাকে স্তন্য দান করিয়াছ, তাহার পর তুমি তাহাকে তরু-রাজি-রূপ নবীন পরিচ্ছদে সাজাইয়া তাহার কৈশোর-শোভা বর্দ্ধন করিয়াছ, তাহার পর, জঙ্গম পশু-পক্ষীর চলা-বলা দ্বারা তাহার

কৌমার বয়সকে অভিনব স্ফূর্ত্তিতে উজ্জীবিত করিয়াছ; তাহার পর তাহার পূর্ণ যৌবন-সময়ে মনুষ্যের আবির্ভাব করিয়া জ্ঞান-প্রেমের স্বর্গীয় মহিমায় তাহার মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়াছ; আমারা (সে দিনকার মনুষ্য) ধনবান্ হইলে কতই না ধন-গর্ব্ব, উচ্চ-পদ হইলে কতই না পদ-গর্ব্ব, বিদ্বান্ হইলে কতই না বিদ্যা-গর্ব্ব, প্রকাশ করিয়া থাকি, ধনে মানে বিদ্যাতে আমারদের অপেক্ষা যাঁহারা অধম তাঁহারদের সহিত আপনাদিগকে তুলনা করিয়াই আমরা গর্ব্বে স্ফীত হই; কিন্তু যখন ঊর্দ্ধমুখ হইয়া অভ্র-ভেদী গিরি-শিখর নিরীক্ষণ করি, যখন সাগরের উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যোমের বিতস্তি তাহার উপরে সন্নমিত দেখি, যখন এ কূল হইতে ও কূল পর্য্যন্ত ভাগীরথীর বিশাল বক্ষঃ প্রসারিত দেখি, তখন আমারদের কোথায় বা ধন-গর্ব্ব, কোথায় বা পদ-গর্ব্ব, কোথায় বা বিদ্যা-বিনয়-গর্ব্ব—তখন আমারদের সে ভাব চলিয়া যায়, তখন যেন আমাদের শৈশব কাল ফিরিয়া আইসে, তখন আমরা যেন পুনর্জাত হই। যখনি আমরা প্রকৃতি-জননীর নিকট গমন করি, তখনই আমরা শিশু হই, তখন স্বর্গীয়-প্রেমের আবির্ভাবে আমারদের জ্ঞানাভিমান দূরে পলায়ন করে; মঙ্গলময়ী প্রকৃতির প্রেমাঞ্জন-শলাকা যখন আমারদের জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত করে, তখনি আমরা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করি। হে পরমাত্মন্! আমারদের মঙ্গলের জন্য তুমি রাত্রিকে ধাত্রী-স্বরূপ করিয়াছ, সূর্য্য-চন্দ্রকে দীপ-স্বরূপ করিয়াছ, নদী-নির্ঝর সকলকে স্তন্য-দুগ্ধের ন্যায় তৃপ্তি-জনক করিয়াছ, প্রকৃতি-মাতার ক্রোড়ে বিন্যস্ত করিয়া তুমি আমারদিগকে দেখিতেছ, তোমাকে আমরা কেমন করিয়া দেখিতে পাইব? তোমাকে যদি আমরা দেখিতে পাই, তবে কি আর প্রলোভনে মুগ্ধ হই, বিভীষিকাতে ভীত হই, হর্ষ-শোকে মুহ্যমান হই, তোমার আলোক আমাদের আত্মাতে নিপতিত হইলে, আত্মা এমনি নির্ম্মল হয় যে, তাহার গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত হয় এবং সেই গভীরতম প্রদেশ হইতে আমারদের সমুদায় কামনা, সমুদায় প্রেম, সমুদায় ভাব, তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অমৃতের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে।

হে পরমাত্মন্! যে পথে গেলে তোমার দর্শন পাই, তোমার সহিত সংযুক্ত হই, তুমি আমাদিগকে সেই পথে লইয়া যাও; আমারদের হৃদয়ের সেই দ্বার উদ্‌ঘাটন কর, যে খান হইতে তোমার মুখজ্যোতি আমারদের মনকে আকর্ষণ করিয়া লয়।

আমি হে তব কৃপার ভিখারী, সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে, কুসুম করে গন্ধদান, মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।

প্রাসাদ-কুটীরে এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার, তেমনি নাথ, তোমার কৃপা হে বিশ্বময়, বিস্তার, অবারিত তোমারি দুয়ার।

খ্রীষ্টবাদ।

যখন কোন জাতি অন্য জাতিকে পরা-জিত করিয়া আপনার অধীনস্থ করে, তখন বিজেতারা জিতদিগের মধ্যে আপনাদিগের ধর্ম্ম ছলে-বলে-কৌশলে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা করে। আমাদিগের ইংরাজ-রাজ-পুরুষেরা ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে আপনাদিগের ধর্ম্ম বল পূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত করিতে কখন চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারদিগের রাজত্বের প্রথমে এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে, ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে ও খ্রীষ্টীয় মিসনরিদিগের অসাধারণ যত্ন ও কৌ-

শলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ভারতবর্ষে বহুল প্রচার হইবে। এরূপ ঘটনা না ঘটিবার কারণ সকলের মধ্যে প্রধান কারণ ব্রাহ্মধর্ম্মের সমুত্থান। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মকে যেরূপ প্রবল শত্রু জ্ঞান করে, তেমন অন্য কোন ধর্ম্মকে জ্ঞান করে না। বস্তুতঃ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম বিজেতাদিগের ধর্ম্ম বলিয়া এতদ্দেশে বহুল প্রচার হইবার এবং তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ অনিষ্ট হইবার সম্ভব জ্ঞান করিয়া, প্রথম হইতেই খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপকদিগের বিশেষ দৃষ্টি আছে। রামমোহন রায় খ্রীষ্টীয় মিসনরিদিগের সঙ্গে খ্রীষ্টের অবতারত্বের সত্যাসত্য লইয়া অনেক বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিডে কোন অবতারের পূজা না হয়, তথায় কেবল একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হয়, অত্যন্ত সতর্কতার সহিত এরূপ বিধান করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন খ্রীষ্টীয় মিসনরিদিগের সহিত ঐ সভার সভ্যদিগের অনেক বাক-যুদ্ধ ও লেখনী-যুদ্ধ হয়। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিরোধ জন্য তাঁহাদিগের যত্ন সফল হইয়াছিল। প্রথমে কিয়ৎ কালের জন্য এদেশে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল তাহার বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইল। লোকে পূর্ব্বে যেমন খ্রীষ্টান হইতেছিল সেই রূপ খ্রীষ্টান হইবার স্রোত বন্ধ হইল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রবলতম শত্রু ক্রমে পরাস্ত হইয়া আসিল। এরূপ অবস্থায় ব্রাহ্মেরা কখন স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, খ্রীষ্ট-বাদ নিজ ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্যে কখন প্রবেশ করিয়া তাহাকে কলুষিত করিবে। যখন শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন "জিজস্ ক্রাইষ্ট, ইউরোপ ও এসিয়া" এ বিষয়ে মেডিকেল কলেজের থিয়েটরে উপদেশ দেন, তখন এ প্রকার উপদেশ প্রদানের বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মেরা চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা সে সময়ে এইরূপ মনে করিয়াছিলেন, যে, কেশবচন্দ্র তাঁহার উপদেশে ব্রাহ্মানুচিত খ্রীষ্টের গুণানুবাদ করাতে, তাঁহার শিষ্যেরা এ বিষয়ে তাঁহাদিগের গুরু অপেক্ষা অগ্রসর হইয়া, একেবারে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্ম নামের প্রতি কলঙ্ক আনয়ন করিবেন। এ আশঙ্কা অন্যায় নহে। উহা সহজে মনে উদিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার শিষ্যেরা এইরূপে খ্রীষ্টবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করাইলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাঁহাদিগকে খ্রীষ্ট-বাদী বলিলে তাঁহারা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেন। পাঁচ বৎসর হইল, যখন প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রাহ্মদিগের সাম্বৎসরিক উৎসব দিবসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে উপদেশ দিতে আহূত হন, তখন ঐ সমাজের সভ্যদিগের খ্রীষ্টবাদ-দোষ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা ন্যায্য কথা হইলেও উল্লিখিত ব্রাহ্মেরা প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে, পূর্ব্বে খ্রীষ্টবাদী বলিলে তাঁহারা যেরূপ ক্রোধান্বিত হইতেন এক্ষণে তাঁহাদিগের সে ভাব নাই, তাঁহারা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন *। যখন আমরা এই স্বীকারোক্তি "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রে প্রথম পাঠ করিলাম তখন আমরা মনে করিলাম, যে, শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন উপযুক্ত সময়ে

* "We were Christians much more than we were Hindus when we joined the Samaj. The subsequent development of this spirit has led us to recognize and accept the truths of Hinduism and especially the faith and devotion of the followers of Chaitanya."

Indian Mirror, October 10th, 1875.

ব্রাহ্মসমাজ হইতে নিষ্কাসিত হওয়াতে ব্রাহ্ম সমাজ কি বিপদ হইতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে রক্ষা পাইয়াছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি তাঁহার নিগূঢ় অনুরাগ আছে ইহা তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজ-প্রবেশ সময়ে আপনা হইতে ব্যক্ত করা উচিত ছিল, তাহা হইলে অনেক পরবর্ত্তী গোলোযোগের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যাইত।

ইণ্ডিয়ান মিররের যে স্থানে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার পূর্ব্বানুরাগ স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, সেই থানে তিনি বলিয়াছেন, যে, তিনি এবং তাঁহার অনুবর্ত্তীরা এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের সত্যসকল স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে হিন্দু হইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের ভাগ্যক্রমে যদি তাঁহারা হিন্দু হইলেন, কিন্তু এপ্রকার আকারে হিন্দু হইলেন যে, তাঁহাদিগের সহিত সাধারণ হিন্দুবর্গের সহানুভূতি হইতে পারে না। চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবেরা হিন্দুদিগের মধ্যে এক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়। অন্য সম্প্রদায় অপেক্ষা এই সম্প্রদায়কে অনুকরণ করিতে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার অনুবর্ত্তীরা অধিকতর উৎসুক। চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের সংকীর্ত্তন-প্রণালী, নামসাধন প্রভৃতি অনেক প্রথা তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহাদিগের বক্তৃতা ও লেখাতে চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণবদিগের ব্যবহৃত অনেক শব্দ ও প্রয়োগ তাঁহাদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইতে দৃষ্ট হয়। এইরূপ করিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে সাধারণ হিন্দুবর্গের উপহাসাস্পদ করিতেছেন। তাঁহারা এইরূপ না করিয়া যদি স্মৃতি পুরাণ বেদ বেদান্ত হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে সমুৎসুক হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা ঐ ধর্ম্মপ্রচারে অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে যেরূপ সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম এক্ষণে তাঁহাদিগকে চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিষয়ে সেইরূপ সাবধান করিয়া দিতেছি; আমরা ভরসা করি, আমাদিগের হিতকর বাক্য একেবারে অগ্রাহ্য হইবে না।

চীন দেশীয় দার্শনিক মেন্‌যস্।

মহাত্মা কংফুচের মৃত্যুর শত বৎসর পরে মেন্‌যস্ জন্ম গ্রহণ করেন। এই শতবৎসরের মধ্যে চীন দেশ নিতান্ত হীন দশায় পতিত হইয়াছিল। তৎকালে যাঁহারা চীনের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলেন তাঁহারা পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। আজ যাঁহার শক্তি ও সাহস আধিপত্য করিতে লাগিল পর দিন তাঁহাকেই আবার হৃতরাজ্য হইতে হইল। এইরূপে বহুকাল যাবৎ কোন নিয়ম ও কোন শাসনই স্থির ও দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিতে পারে নাই সুতরাং দেশের অবস্থা ক্রমশই মলিন হইয়া উঠে।

যখন রাজ্যের এইরূপ দুরবস্থা সেই সময় সুবিজ্ঞ মেন্‌যস্ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশব কালেই পিতৃহীন হন। তাঁহার জননীর নাম চাংসি। এই নারী বুদ্ধিমতী ও পুত্রবৎসলা ছিলেন। তাঁহার যশে চীন দেশ পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি অগ্রে পুত্রকে লইয়া এক সমাধি ক্ষেত্রের নিকট বাস করিতেন। মেন্‌যস্ কৌতূহল পরবশ হইয়া ঐ ক্ষেত্রে যাইতেন, এবং সমাধিস্তম্ভে যে সমস্ত দৃশ্য থাকিত, তদৃষ্টে চিত্ররচনা করিতেন। ফলতঃ শৈশব অবস্থাতেই তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। তখন বুদ্ধিমতী চাংসি পুত্রের এইরূপ উন্নতির লক্ষণ দেখিয়া ভাবিতেন এইস্থান এই বালকের সম্যক উপযোগি নহে। যথায় বাস করিলে মনোবৃত্তি সকল প্রশস্ত হইবে এক্ষণে তথায় গিয়া থাকিব।

অনন্তর তিনি বিপণীর সন্নিহিত কোন এক স্থান আশ্রয় করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার আশানুরূপ ফল লাভ হইল না। বালক মেন্‌ষস্‌ পণ্য-বিক্রয়ীদিগের অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। তিনি কখন পণ্য দ্রব্যের ভূয়সী প্রশংসা কখন বা ক্রেতাদিগের সহিত বচসা করিতেন।

তৎপরে বুদ্ধিমতী চাংসি ঐ বালককে লইয়া একটী বিদ্যালয়ের নিকট গিয়া বাস করিলেন। তথায় মেন্‌ষস্‌ বিদ্যালয়স্থ ছাত্রদিগের সংশ্রবে সদাচার সকল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে চাংসি একান্ত হৃষ্ট হইয়া মনে করিলেন, ইহাই আমার পুত্রের বাসোপযোগি স্থান। তিনি পুত্রের সহিত কখন মিথ্যা কহিতেন না; যদি কখন ভ্রমপ্রমাদে কোন অসত্য কথা তাঁহার ওষ্ঠের বাহির হইত, তজ্জন্য তিনি বিশেষ অনুতপ্ত হইতেন, বলিতে কি, এইরূপ গুণবতী ও বুদ্ধিমতী জননীই যে মেন্‌ষসের ভবিষ্যৎ উন্নতির মূল তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ মেন্‌ষসের বয়োবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় চাংসি পুত্রকে পাঠে বিশেষ মনোযোগী হইবার জন্য নানারূপ কৌশল বিস্তার করিতেন। পাঠাবস্থা হইতে বহুকাল মেন্‌ষসের বিষয় বিশেষ কিছুই আর জানিতে পারা যায় না। পরে যখন তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর, তখন তিনি কোন বিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তৎকালে চীন দেশীয়েরা মহাত্মা কংফুচের সারগর্ভ উপদেশ সকল এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিল। মেন্‌ষস্‌ লোকের মনে তৎসমুদায় জাগরূক করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, এবং বর্ত্তমান রাজমন্ত্রীদিগের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মতের প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। ঐ সময় টিসি প্রদেশে স্বয়েন নামে কোন রাজার সহিত তাঁহার বিশেষ সংশ্রব হইয়াছিল। কিন্তু মেন্‌ষস্‌ সাহঙ্কার বাক্যে আপনার মহিমা প্রচার করিতেন, তজ্জন্য স্বয়েনের সহিত তাঁহার মনোভঙ্গ হয়। স্বয়েন তাঁহাকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য নানারূপ প্রলোভন দেখান, কিন্তু তেজস্বী মেন্‌ষস্‌ তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। স্বয়েন রাজোচিত কর্ত্তব্য প্রতিপালন এবং রাজ্যের দায়িত্ব অনুধাবন করিবেন মেন্‌ষসের ইহাই ইচ্ছা, কিন্তু তিনি রাজার উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা পাইতেন। রাজা রাজপ্রাসাদে তাঁহাকে আহ্বান করিতে পারিবেন না; তিনি মন্ত্রণাকালে স্বয়ংই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবেন, এবং তাঁহার মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার জন্য শিষ্যের ন্যায় অপেক্ষা করিয়া থাকিবেন, মহাত্মা মেন্‌ষসের ইহাই অভিপ্রায় ছিল। এই সূত্রেই উভয়ের মনোভঙ্গ হয়, পরিশেষে মেন্‌ষস্‌ ভগ্নমনোরথ হইয়া মৃদুপদে তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার এইরূপ সগর্ব্ব ব্যবহারে সাধারণে কিছু অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা কিছু মাত্র লক্ষ্য করেন নাই। তিনি সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ কহিতেন, যদি রাজা স্বয়েন আমার উপদেশ অনুসারে চলিতেন, তাহা হইলে কেবল টিসি প্রদেশের নয়, সমস্ত রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি পরিবর্দ্ধিত হইত। এক্ষণে আমি প্রত্যাশা করি, অচিরাৎ রাজার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হউক। আমি কি এক জন সামান্যবুদ্ধি প্রজাসাধারণের অনুরূপ? তাহারা রাজার নিকট কোন একটি বিষয় প্রার্থনা করিবে, প্রার্থনা পূর্ণ না হইলে অবনত মুখে চলিয়া যাইবে, আমি কি সেইরূপ?

অনন্তর মেন্‌ষস্‌ টিসি পরিত্যাগ করিয়া

সাত বৎসর কাল অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বত্রই মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, এবং রাজাদিগের নিকট অর্থ সাহায্য পাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময় হিউহিং নামক এক জন সুবিজ্ঞ দার্শনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই মহাত্মা সর্ব্বাগ্রে শ্রমজীবিগণের সত্ব স্থাপনার্থ সবিশেষ যত্নবান হন। তৎকালে রাজদ্বারে শ্রমজীবিগণ সমবেত হইত। উহাদিগের পরিধান কেশনির্ম্মিত বস্ত্র, স্কন্ধে হল দণ্ড এবং পৃষ্ঠে ফাল; উহারা নানারূপ রাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিতণ্ডা করিবার জন্য উপস্থিত হইত। তখন মেন্‌ষস্ টাঙ্ প্রদেশের রাজমন্ত্রী ছিলেন। একদা বহুসংখ্যক শ্রমজীবি কৃষক তাঁহার নিকটস্থ হইল, এবং একজন মণ্ডলাধিপতি তাঁহাকে কহিতে লাগিল, মহাশয়, বর্ত্তমান রাজা যদিও সুযোগ্য, কিন্তু প্রাচীন ব্যবহার কিছুমাত্র জানেন না। পূর্ব্বতন রাজগণ প্রজাদিগের সহিত ক্ষেত্র কর্ষণ এবং শ্রমজাত দ্রব্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। রাজ্যশাসন তাঁহাদিগের অন্যতর কার্য্য; কিন্তু বর্ত্তমান রাজা প্রধানদিগের সহিত এই চিরন্তনী প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতেছেন। সুতরাং যিনি এই বিষয়ে উদাসীন, তিনি যে রাজোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন, ইহা কোন ক্রমেই বলিতে পারি না।

মেন্‌ষস্ কহিলেন, তোমাদিগের রাজা কি কৃষিকার্য্যের দ্বারা আপনার জীবিকা অর্জন ও বস্ত্র বয়ন করিবেন? মণ্ডলাধিপতি কহিল না, তিনি কৃষিজাত দ্রব্যের বিনিময়ে বস্ত্র পাইবেন। মেন্‌ষস্ কহিলেন, ভাল তবে কৃষি কার্য্যের সহিত এইরূপ বিস্তীর্ণ রাজ্যশাসন কি সম্ভব? দেখ, প্রধান ব্যক্তির কার্য্য সতন্ত্র এবং সামান্য লোকের কার্য্যও স্বতন্ত্র; এক জনের প্রয়োজনোপযোগি যাহা কিছু আবশ্যক তাহা ভিন্ন ভিন্ন হস্ত হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। যদি প্রত্যেককে সকল বস্তু প্রস্তুত করিতে হইত, তাহা হইলে দেখিতে, এই রাজ্যমধ্যে ঘোরতর একটী বিশৃঙ্খলা ঘটিত। মনুষ্যসমাজের নিয়ম এই যে, কতকগুলি লোক মানসিক পরিশ্রম করিবে এবং কতকগুলি লোক শারীরিক শ্রম করিবে। যাহারা মানসিক পরিশ্রমে লিপ্ত, তাহারা অন্যকে শাসন করে, এবং যাহারা শারীরিক শ্রম করে, তাহারা অন্য দ্বারা শাসিত হয়। যাহারা শাসিত হয় তাহাদিগকে অন্যের অন্নবস্ত্রের জন্য শ্রম করিতে হইবে, এই ব্যবস্থা সাধারণেরই সমাদৃত।

মেন্‌ষস্ টাং প্রদেশের রাজার নিকট থাকিতেন। রাজা ইচ্ছাক্রমে বা অন্য কোন কারণেই হউক, এই সুবিজ্ঞ মন্ত্রীর নূতন নূতন মতে অনুমোদন করিতেন বটে, কিন্তু সকল স্থলে তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন না। মেন্‌ষস্ ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠেন এবং উহাঁর সহিত সংশ্রব এককালে পরিত্যাগ করেন।

পরে তিনি একটী ক্ষুদ্র রাজ্যে উপস্থিত হন। তথাকার রাজার নাম হুই। মেন্‌ষস্ রাজসভায় প্রবেশ করিবার কালে হুই এইরূপ কহিয়াছিলেন, মহাশয়, আপনি যখন এইরূপ দূরপথ গণনা না করিয়া আসিয়াছেন, ইহাতেই বোধ হয় আপনার সৎপরামর্শে আমার রাজ্যে সবিশেষ সমৃদ্ধি লাভ হইবে।

মেন্‌ষস্ কহিলেন, মহারাজ! আপনি সমৃদ্ধি লাভ একথা কেন ব্যবহার করিতেছেন। উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা লক্ষ্য করিয়া আমার যাহা কিছু চিন্তা ও পরামর্ষ, এবং এই সংক্রান্তই আমার সকল আলাপ।

ঐ রাজার যুদ্ধে খ্যাতি লাভই বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং তিনি রাজ্যসংক্রান্ত অন্যান্য সৎসংকল্পে এক প্রকার অন্ধ ছিলেন। সন্নিহিত রাজগণের সহিত নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধই

তাঁহার একমাত্র ব্যবসায় ছিল, এই সূত্রে তাঁহার রাজ্যের সকল আশা ভরসাই বিলুপ্ত হয়। দুই অত্যন্ত অসুস্থ, বিপদ ও নৈরাশ্য তাঁহাকে এক প্রকার ক্ষত বিক্ষত করিতেছিল, তথাচ তাঁহার রণকণ্ডু অপনীত হয় নাই। কিন্তু মেন্‌যসের সহিত সংযোগ হইবার অল্প-কাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু ইহাঁর সহিত মেন্‌যসের অল্প দিন সংশ্রব হইয়াছিল। একদা মেন্‌যস্ এই রাজার প্রসঙ্গে স্বীয় বন্ধুবর্গের নিকট এইরূপ কহিয়াছিলেন. আমি যখন এই রাজপুত্রকে দূর হইতে দেখিলাম, তখন ইহাঁকে রাজা বলিয়া বোধ হয় নাই। পরে যখন পরস্পর সন্নিহিত হইলাম, তখন দেখি যে, ইহাঁর আকৃতি প্রকৃতিতে সম্মান করিবার কিছুমাত্র নাই। প্রভাবই রাজাদিগের সর্ব্বস্ব, যিনি সেই প্রভাবশূন্য তাঁহা দ্বারা বিশেষ কোন কার্য্য হইতে পারে না। মেন্‌যস্ এই কারণে বিরক্ত হইলেন এবং তথাকার মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিলেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

১। ঈশ্বরতত্ত্ব। প্রথম ভাগ, বাঁকুড়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায় সংকলিত। হরিনাভি ইস্টইণ্ডিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৭৯৭ শক।

এই গ্রন্থে বেদান্তাদি গ্রন্থ হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপক কতকগুলি শ্লোক সংকলিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্লোকের ভাবার্থ ব্যাখ্যাস্থলে অধুনাতন ধর্ম্মসংস্কারকদিগের মত স্থানে স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। বর্ত্তমানে যাহাতে লোকের ধর্ম্ম বুদ্ধি কলুষিত হয় এইরূপ গ্রন্থ বহুল পরিমাণে প্রস্তুত ও প্রচারিত হইতেছে। এই স্রোত যাহাতে প্রতিরুদ্ধ হয়, কায়মনে সাধারণের তাহাই কর্ত্তব্য। বহুকাল এ দেশ হইতে বেদান্তাদি গ্রন্থের আলোচনা তিরোহিত হইয়াছে। এক্ষণে ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয়ত্ব ও নিরতিশয় মহত্ত্ব বিষয়ে বেদান্তের উপদেশের যতই অনুশীলন হয় ততই মঙ্গল। যিনি ব্রহ্মপরায়ণ তাঁহার কর্ত্তব্যের ভাব কিরূপ, এই গ্রন্থ হইতে তাহার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

গৃহকৃত্যব্যসনিনী যথা সম্যক্ করোতি তৎ
পরব্যসনিনী তদ্বৎ ন করোত্যেব সর্ব্বদা।

২। জেল-দর্পণ নাটক। শ্রী দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২।

৩। চা-কর দর্পণ নাটক। শ্রী দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সমাচার চন্দ্রিকা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮১।

৪। হিতোপাখ্যান মালা। দ্বিতীয় ভাগ। পারস্য পুস্তক বুস্তাঁ হইতে সংকলিত। ইণ্ডিয়ান মিরর যন্ত্রে মুদ্রিত। ইংরাজী ১৮৭৫।

বেদান্তপ্রবেশ, সৃষ্টি, ও বক্তৃতাকুসুমাঞ্জলি—শ্রীচন্দ্রসেখর বসু প্রণীত। এই তিন খানি গ্রন্থ পরে সমালোচন করিবার ইচ্ছা রহিল।

সম্বাদ।

বিগত ৩০ আশ্বিন শুক্রবার কাল্‌না ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এবং পণ্ডিত কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদন করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে দীনদরিদ্রদিগকে অন্ন বস্ত্র প্রদত্ত হইয়াছিল। সায়ংকালে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেদীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উদ্বোধন ও স্বাধ্যায়ান্ত উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটী জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা উপাসকবর্গের বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বিগত ৮ কার্ত্তিক রবিবার শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুর্দ্দশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অপরাহ্নে তথায় একটি সুদীর্ঘ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সায়ংকালের উপাসনা কার্য্য তিনিই সম্পাদন করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল মৈত্রেয় মহাশয় সে দিন সঙ্গীত কার্য্য সমাধা করিয়া লোকসাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৬ অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতঃকাল ৭৷৹ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৫১ শকের ১১ মাঘে প্রতিষ্ঠিত।

সংস্থাপক।

শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়
শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ রায়
শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ

বিশ্বস্ত অধিকারী।

শ্রীযুক্ত রাজা রমানাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু।

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু
শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(পাতুরে ঘাটা)

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারি সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ ১৭৯৭ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ

আয়	...	৩৫২ ।/৹
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৩৩৬ /১৹
সমষ্টি	...	৬৮৮ ।৶১০
ব্যয়	...	২৯১ ৸৶১৫
স্থিত	...	৩৯৬ ।৶১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	.. ...	২ ॥৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	১২৪ ॥৹
পুস্তকালয়	... ...	১২ ৸৹
যন্ত্রালয়	... ...	২০১
গচ্ছিত	... ...	১১ ।১৹
সমষ্টি	...	৩৫২ ।/৹

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	..	১২৮ ৸৶ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		৮৭ ॥৶ ৫
পুস্তকালয়	...	১৯ ॥৶১০
যন্ত্রালয়	...	৪৬ ॥৶ ৫
গচ্ছিত	...	৯ (১০
সমষ্টি	...	২৯১ ৸৶১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন		১
দানাধারে প্রাপ্ত	... ...	১ ॥৶১০
		২ ॥৶১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা।
সম্বৎ ১৯৩২। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬। ১ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার।

Registered No 52.

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
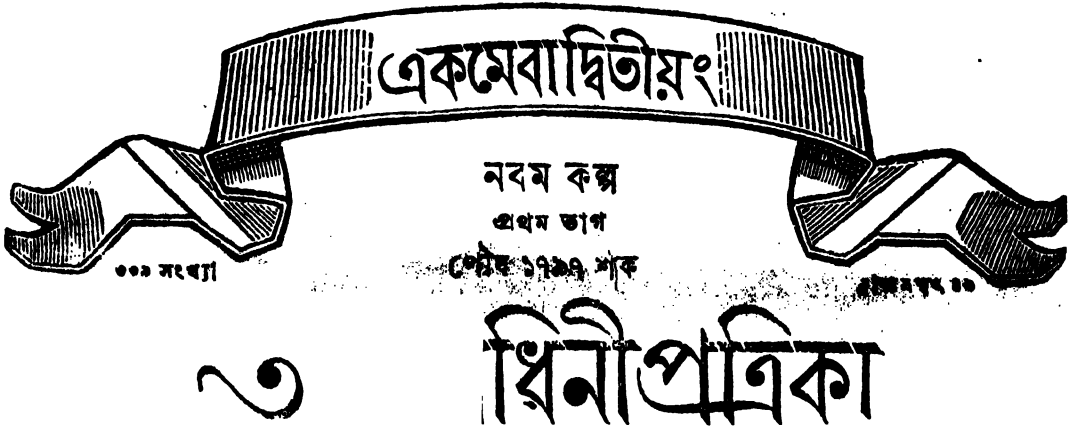
ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী দেবগিরি—তাল চৌতাল।

কনক-ভানু আজি সুধা বরষিছে সুরঞ্জিত শোভে বনরাজি গিরি নদী সিন্ধু।

তেমনি দীন-হৃদয়ে পতিতপাবন দেব তোমার প্রেমানন-জ্যোতি মোহ বিনাশে; আনন্দরূপ তুমি প্রাণের প্রাণ; দেও হে শরণ দীনবন্ধু।

পাইলে তোমারে হৃদয় মাঝে, সব জগত শোভন সাজে, অমঙ্গল দূরে যায়, টুটে পাপবন্ধ।

শুভ দিন শুভক্ষণ শুভ পল শুভ মুহূর্ত্ত শুভ চন্দ্র শুভ নক্ষত্র কি সে আমার, কি সে অমৃতযোগ, উথলিলে হৃদে তব আনন্দ।

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

২ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৭৯৭ শক।

পরব্রহ্মের উপাসনা ব্যতিরেকে আমারদের মনুষ্য জন্ম সার্থক হয় না, পরব্রহ্মের উপাসনা ব্যতিরেকে আমাদের জ্ঞান অজ্ঞান হইতেও অজ্ঞান হয়, পরব্রহ্মের উপাসনা ব্যতিরেকে আমাদের ধর্ম্ম বাণিজ্যের বিষয় হয়, এই জন্য আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। আমরা অতি উচ্চ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, এখনো তাহা আমরা পালন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ক্ষুদ্র নৌকার নাবিক নদী-পথে গমনাগমন করিতে অত্যন্ত কুশল হইলেও সমুদ্রে নৌকা চালনা করিতে হইলে তাহাকে কত ভাবিতে হয়, কত শিখিতে হয়, কত সাধ্য সাধনা করিতে হয়? অদ্য যে ব্যক্তি নদীর নাবিক, কল্য সে ব্যক্তি সমুদ্রের নাবিক হইতে পারে না। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা পৌত্তলিক ছিলাম, এক্ষণে আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি; ব্যক্তির পক্ষে ত্রিশ চল্লিশ বৎসর অল্প না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু জাতি-সাধারণের পক্ষে তাহা এক ঘণ্টাও নহে। অতএব আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, কল্য আমরা পৌত্তলিক ছিলাম অদ্য আমরা ব্রাহ্ম হইয়াছি। ইহারি মধ্যে যে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম-পালনে সবিশেষ পরিপকতা লাভ করিয়াছি, আর যে আমারদের শিক্ষা করিবার কিছুই নাই, চেষ্টা করিবার কিছুই নাই, ইহা কখনই হইতে পারে না। পূর্ব্বে যখন আমরা পৌত্তলিক ছিলাম, তখন

আমারদের কেমন দেবভক্তি ছিল! প্রতিমার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কেমন ভক্তি পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দান করিতাম! যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার পর হইতে কেমন ভক্তি পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতাম! সন্ধ্যা বন্দনের সময় মনে কেমন একটি পবিত্র ভাব উদয় হইত। কিন্তু যখন জানিলাম যে, পরমাত্মা অপ্রতিম তাঁহার প্রতিমা নাই, তখন আমারদের সে দেবভক্তি অভক্তিতে পরিণত হইল, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মকেই সারধর্ম্ম জানিয়া অনুরাগ পূর্ব্বক তাহারি চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম অতি উচ্চ ধর্ম্ম, তাহা আমরা শিক্ষা করিতে বা পালন করিতে অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইব, ইহা অসম্ভব। সত্য বটে যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সহজ ধর্ম্ম, কিন্তু সহজ ধর্ম্ম বলিয়া তাহা যে সহজে আয়ত্ত করা যায়, তাহা নহে। সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ কোন ব্যক্তি যখন গীতালাপ করেন, তখন মনে হয় কি সহজে ইহাঁর কণ্ঠ হইতে স্বর-স্রোত বিনির্গত হইতেছে; কিন্তু তাহা বলিয়া গীত-শিক্ষা সহজ নহে। আমরা যখন পৌত্তলিক ছিলাম, তখন দেব-ভক্তি একপ্রকার সহজ ছিল; ধূপধুনা পুষ্পরাশির সুগন্ধে, প্রতিমার বরদানোদ্যত হস্তে এবং সস্মিত বদনে, আর-তীর দীপমালা-পরিভ্রমণে চামর ব্যজনে এবং বদ্যোদ্যমে আমাদের মন সহজেই ভক্তি-রসে আর্দ্র হইত; কত উপকরণ, কত আড়ম্বর, কত ঘটা, কত প্রকার উদ্যোগে, তবে আমা-রদের মনে উৎসাহ অনুরাগ ভক্তি এবং আনন্দের সঞ্চার হইত; সে সকল উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করা সহজ নহে, অথচ সেই সকল সামগ্রী সহজে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা উদ্দীপন করিত। এক্ষণে সে সকল আড়-ম্বর অলীক বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করি-য়াছি; এক্ষণে আমরা মিথ্যা দেবদেবীর পূজা পরিত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনায় ব্রতী হইয়াছি। নদী পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিলে মনের ভাব যেরূপ হয়, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করিবার সময় সেইরূপ হয়, তখন ভয় বিস্ময় এবং আনন্দ তিন একত্রে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। নদীর উভয়-পার্শ্বে কত লোকালয় কত উদ্যান-রাজি কত বিচিত্র ভাব,—সমুদ্রে কূল নাই, উপরে আকাশ, নিম্নে জলরাশি, বৃহদ্ব্যাপার! পৌত্তলিক ধর্ম্মে, মন্দিরের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ধূপ দীপ নৈবেদ্য সহকারে পূজার্চ্চনা, এইরূপ পরি-মিত উপকরণ সামগ্রী দ্বারা পরিমিত দেবতার উপাসনা-বিধি। পৌত্তলিক ধর্ম্ম কৃত্রিম হই-লেও তাহা আমারদের পরিমিত মনোবৃত্তির অনুকূল, এজন্য তাহা সহজে অবলম্বন করি-তে পারা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মে কোন মন্দির নাই, কোন পরিমিত উপাস্য দেবতা নাই, কোন প্রকার কৃত্রিম ভাব নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নূতন ব্রতী একেবারে যেন অকূলে আসিয়া পড়েন; ক্রমে তবে তাঁহার মন স্থির হয়, ক্রমে তিনি বুঝিতে পারেন যে, সমস্ত জগৎ সংসার সেই দেবদেবের মন্দির, তিনি প্রাণের প্রাণ, চেতনের চেতন, চক্ষুর চক্ষু, জ্যোতির জ্যোতি; জ্ঞানই তাঁহার দীপোপ-হার, প্রীতিই তাঁহার ধূপ, এবং শুভকার্য্যই তাঁহার নৈবেদ্য; ইহা জানিয়া তবে তিনি তাঁহার উপাসনা করিতে সক্ষম হন। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলেই যে আমরা ব্রাহ্ম হইতে পারি তাহা নহে; মিথ্যার প্রতি যেমন আমারদের অভক্তি, সত্যের প্রতি আমারদের তেমনি ভক্তি চাই; কৃত্রিম দেব দেবীর প্রতি যেমন অভক্তি, পরব্রহ্মের প্রতি তেমনি ভক্তি চাই; যাগযজ্ঞের প্রতি যেমন অভক্তি, শুভকার্য্য সাধনে তেমনি ভক্তি চাই; তাহা যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ ব্রাহ্মের শুভ নাই। যখন নদীতে ছিলাম তখন নৌকায়

যাতায়াত করিতাম, এখন সমুদ্রে আসিয়াছি এখন অর্ণবযান আবশ্যক। আমরা নূতন ব্রতী,এজন্য আমরা অনেক বিভীষিকা দেখিব, কিন্তু আমরা ব্রহ্মরূপ ভেলাকে ছাড়িব না। সত্যের যে একটি নৈসর্গিক শোভা তাহার রসাস্বাদন করিতে এখনো আমরা শিখি নাই; আমারদের বুদ্ধি যদিও মিথ্যার প্রতি বিমুখ হইয়াছে, কিন্তু মিথ্যার যে একটা কৃত্রিম শোভা, যাহাকে মোহ বলে, মায়া বলে, আমাদের হৃদয় এখনো তাহারি প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়; অসভ্য লোকেরা যেমন নানাপ্রকার ভারবহ অলঙ্কার দ্বারা শরীরের শোভা বর্দ্ধন করিতে যায়, আমরা সেইরূপ অলীক আমোদ দ্বারা আত্মার আনন্দ সাধন করিতে যাই; পরমাত্মাতেই আত্মার যে একটি নৈসর্গিক আনন্দ, সে রসে আমরা এখনো বঞ্চিত রহিয়াছি। ব্রাহ্মগণের এক্ষণে ইহা অতীব কর্ত্তব্য যে, সত্যের যে কি নৈসর্গিক শোভা তাহা দেখিয়া তাহাতেই আপনারদের মনকে আর্দ্র করেন। কিন্তু "সত্য" এই শব্দটি উচ্চারণ করিবামাত্র আজিকার কালে কঠোর বৈজ্ঞানিক সত্যই মনে উদিত হয়; জলের মূল-বস্তু কি কি, সূর্য্যের আয়তন কত, গ্রহগণের পরিভ্রমণ-পথ কিরূপ, এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে প রার নাম সত্য জানা, এইরূপ অনেকের বিশ্বাস। ঋষিরা যখন সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন,তখন সে সত্যের অর্থই সত্য ছিল। সে সত্যের মাহাত্ম্য সে সত্যের সৌন্দর্য্য বাক্য দ্বারা যদিও ব্যক্ত করা যায় না, তথাপি তাহার নিদর্শন সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে, এবং সকল ধর্ম্মপুস্তক, নীতিপুস্তক, এমন কি বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকেও তাহার ভূরি ভূরি উপদেশ পাওয়া যায়—কি আধ্যাত্মিক কি ভৌতিক সমুদায় প্রকৃতিই আমাদিগকে সেই মহান্ সত্যের উপদেশ দিতেছে। বিজ্ঞানের সত্য সত্যের মানচিত্র স্বরূপ; মানচিত্রে আমরা পর্ব্বত দেখি, নদী দেখি, নগর গ্রাম সকলি দেখি, কিন্তু কাহারো কিছুমাত্র শোভা দেখিতে পাই না; সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির মানচিত্র আঁকা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি সৌর জগতের যথার্থ ভাব ব্যক্ত হয়? তাহাতে কি যথার্থ সত্য জানা হয়? পৃথিবীর মানচিত্র দেখা যখন আবশ্যক হইবে তখন তাহা দেখিও, কিন্তু পৃথিবীর যদি সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও তবে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা দেখ। কোটি কোটি পরমাণু পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া কোথাও বা সংঘাতকঠিন ভাব কোথাও বা বালুকারাশির ন্যায় বিকীর্ণ ভাব, কোথাও বা পেশল লাবণ্যময় ধাতুমূর্ত্তি, কোথাও বা হীরক প্রবাল মরকত প্রভৃতি নয়নানন্দকর মণি রত্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। পৃথিবী এই প্রকার বিচিত্র পরমাণু-সঙ্ঘের সমষ্টি; তাহার উপরে তৃণের আস্তরণ, কি সূক্ষ্ম শিল্প কার্য্য! তাহার উপরে লতা পল্লব পুষ্পের কি সুকোমল গঠন! কি সুকুমার লাবণ্য! কি শোভন কান্তি! মধ্যে মধ্যে আবার বনস্পতি দণ্ডায়মান হইয়া কত পথিককে ছায়া বিতরণ করিতেছে, কত পক্ষীকে আশ্রয় দিয়া পালন করিতেছে, কত কীট পতঙ্গকে বাসাচ্ছাদন দিয়া তাহারদের আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইতেছে। জলের শোভা দেখ। জল কি স্বচ্ছ কি নির্ম্মল কি পবিত্র! শরীরের যেমন রক্ত, পৃথিবীর সেইরূপ জল; অপরিস্কৃত বস্তু জল দ্বারা পরিস্কৃত হয়, জলেতে দ্রবীভূত হইয়া পৃথিবীর আদিম কালের প্রস্তর সকল সংঘাতকঠিন ভাব ধারণ করিয়াছে; জল দ্বারা মণি রত্ন সকল নির্ম্মিত হইয়াছে, বৃক্ষ লতা সকল জীবিত রহিয়াছে; নদী সমুদ্রের শোভা দর্শনে আমারদের মনের মালিন্য প্রক্ষালিত হইয়া যায়। এইরূপ অগ্নি বায়ু আকাশ সকলি সত্য, সকলি সুন্দর, সকলি

মঙ্গল। প্রকৃতির পুস্তক অনুরাগের সহিত পাঠ করিতে শিক্ষা কর, দেখিবে যে ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বর্গ মর্ত্ত্য অন্তরীক্ষ সকলি এক অপ্রমিত অনির্ব্বচনীয় মহান্ সত্য ; সেই সত্যের মধ্য হইতে সৌন্দর্য্য এবং মঙ্গল ভাব শত সহস্র প্রকারে উদ্ভাসিত হইতেছে। কিন্তু কোথায় বা পঞ্চভূতের মাহাত্ম্য, কোথায় বা মণিরত্নের লাবণ্য,কোথায় বা লতা পল্লব কুসুমের শিল্পচাতুরী, কোথায় বা বনস্পতির উদার মহত্ত্ব, কোথায় বা সমুদ্র পর্ব্বতের অপরিমেয় অলৌকিক প্রভাব, মনুষ্যের জ্ঞানময় প্রেমময় মঙ্গলময় আত্মার নিকটে সকলি ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া যায়। পর্ব্বত কত উচ্চ হইবে! সমুদ্র কত গভীর হইবে! আমারদের আত্মা তাহা হইতেও উচ্চ, তাহা হইতেও গভীর! পুষ্প কত সুকুমার হইবে, আমারদের আত্মা তাহা হইতেও সুকুমার! মণিরত্নের কত লাবণ্য হইবে, আত্মার তাহা হইতেও অধিক লাবণ্য; এই প্রকার অমূল্য ধন যে আমারদের আত্মা সেই আত্মাকে আমরা নির্ম্মল করিয়া সত্যের সত্য প্রাণের প্রাণ সকল মঙ্গলের মঙ্গল পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র দেখিব, তাঁহাকে প্রীতি করিব এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব বলিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। আমরা যেমন শ্রেষ্ঠ ব্রত ধারণ করিয়াছি, তাহা রক্ষা করিবার জন্য তেমনি শ্রেষ্ঠ উপায় অবলম্বন করা আমাদের পক্ষে অতীব আবশ্যক, পরব্রহ্মরূপ ভেলাকে আশ্রয় করা অতীব আবশ্যক। পক্ষী যেমন শাবককে উড্ডয়ন শিক্ষা দিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশলে তাহাকে আকাশে আহ্বান করে, পরমাত্মা সেইরূপ নানা সত্য নানা শোভা নানা মঙ্গল প্রদর্শন করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে বিভীষিকা প্রেরণ করিয়া আমারদের আত্মাকে আপনার দিকে আহ্বান করিতেছেন; তাঁহার আহ্বান শুনিয়া চলিলে মায়া মোহের কৃত্রিম শোভা ও বৃথা আড়ম্বর আর আমাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না, যথার্থ সত্য তখন আমরা বুঝিব, যথার্থ সৌন্দর্য্যের তখন আমরা অনুরাগী হইব, যথার্থ মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়া তখন আমরা ধন্য হইব। হে পরমাত্মন্! তুমি আমারদের জন্য কি না করিয়াছ, আমারদিগকে কি না দিয়াছ, তোমার দানের যে কত অসীম মূল্য তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া মনে করি যে, তুমি আমারদিগকে অসহায় ছাড়িয়া দিয়াছ, আমারদের অনন্ত কালের সম্বল হইয়া আমারদের আত্মাতে বর্ত্তমান রহিয়াছ, তথাপি তোমাকে আমরা ভুলিয়া যাই। তোমার মহিমা আমারদের নিকট প্রকাশ কর, তোমার সৌন্দর্য্যে আমারদের মনকে নিমগ্ন কর, তোমার চরণে বারবার প্রণিপাত করিতেছি।

সাংখ্য দর্শন।

মনের সাবয়বত্ব ও সূক্ষ্মত্ব।

জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিপরিণমতে, নশ্যতি, ইতি ষড়্ভাব বিকারাঃ।

ভাব অর্থাৎ জায়মান পদার্থমাত্রেরই জন্ম আছে। কিছুকাল অবস্থিত থাকে, বৃদ্ধি হয় হ্রাসও হয়। প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়, আবার বিনাশও হয়। বস্তুর এইরূপ অদ্ভুত পরিণাম ভাবকে দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভাববিকার শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। ভাববিকার কথিত প্রকারে ষড়্বিধ। উক্ত ষড়্বিধ ভাববিকার প্রত্যেক ভাব অর্থাৎ জন্য বস্তুনিষ্ঠ। সাংখ্যমতে ঈশ্বর বা আত্মাভিন্ন নির্বিকার পদার্থ নাই। পরন্তু দৃশ্য বস্তুতে যে উক্ত বৈকারিক ধর্ম্ম আছে, তাহা দ্রষ্টা মাত্রেরই অনুভবসিদ্ধ; সুতরাং সে পক্ষের বিচার উত্তোলন করিবার আবশ্যক নাই। মন পদার্থটি সাংখ্য মতে জন্য, অতএব মনেতে তাদৃশ বৈকারিক ভাব আছে কি না এক্ষণে তাহাই দ্রষ্টব্য।

প্রাকৃতিক কৌশল কি অনির্ব্বচনীয়! কি চমৎকারজনক! কি মুগ্ধকর! কত বিষয়ই যে মানব-বুদ্ধির অগম্য ও ভ্রামক আছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উপস্থিত বা বক্তব্য প্রস্তাবটি কত ভ্রামক ও কত অ-সূক্ষ্ম বুদ্ধির অধার্য্য, তাহা দেখ। ইতর ইন্দ্রিয় হইতে যাবদীয় অন্তঃপদার্থ, আর সামান্য তৃণ-গুচ্ছ হইতে ব্রহ্মাণ্ডান্ত যে কিছু বাহ্য পদার্থ, সমস্তেরই পরীক্ষক মন; কিন্তু, মনের পরীক্ষক বা নির্ণায়ক কে? যদি বল মন আপনিই আপনার পরীক্ষক, আপনিই আপনার নির্ণায়ক, তাহাও সুসঙ্গত নহে, তৃপ্তিকরও নহে। আপনিই আপনার প্রমাণ, আপনিই আপনার পরীক্ষক, আর আপনি আপনার স্কন্ধারোহণ করা সমস্তই তুল্য। অতএব মন কি? তাহার স্বরূপ কি? সংস্থানই বা কেমন?—এ সকল নির্ণয় করিতে হইলে, আপনি আপনার স্কন্ধে আরোহণ করার ন্যায় দোষ মনের উপরও নিক্ষেপ করিতে হয়; যে হেতু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এবং সাধারণের সিদ্ধান্ত আছে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল বিশিষ্ট বুদ্ধি জন্মায় না, একমাত্র মনই বিশিষ্ট বুদ্ধির জনক। তবে উপায়? উপায় আছে। স্থির চিত্তে অন্বেষণ কর।

এবংবিধ স্থলে, এতাদৃশ বিচারণার সময়, দেখিবে যে, মন ও আত্মার ভিন্নভাব দাঁড়াইতেছে। এমন কি, যাঁহারা বলেন "মন ও আত্মার নাম মাত্রের ভেদ, বাস্তবিক মন ও আত্মা একই পদার্থ" তাঁহারাও এস্থলে আত্মাকে ভিন্ন না রাখিয়া বিচার নিস্পত্তি করিতে পারেন না। তাঁহারা যখন মনের অনুসন্ধান করেন তখন তাঁহাদের আত্মা মন হইতে পৃথক্ হয়। যখন তাঁহারা আত্মার রূপকল্পনা করেন তখন তাঁহাদের মন আত্মা হইতে ভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। ইহা তাঁহারা বিচারাসক্তির প্রভাবে লক্ষ্য করিতে পারেন না, এতজ্জন্যই মুখে বলেন "মনের নামান্তর আত্মা আর আত্মার নামান্তর মন"। আরও বলেন "দীপের ন্যায় মনের স্ব-পর প্রকাশকত্ব শক্তি আছে। দীপ যেমন আপনাকে প্রকাশ করে এবং বস্ত্বন্তরকেও প্রকাশ করে, সেইরূপ মন আপনাকে নির্ণয় করে এবং অন্যকেও নির্ব্বাচন করে—" ফল, বিচারাসক্তদিগের বাক্‌বৈদগ্ধ্য বড়! তাঁহাদিগের ওরূপ মুগ্ধতার কারণ কেবল মন ও আত্মার অবিবিক্ততা। মন ও আত্মার এতদূর সান্নিধ্য যে, স্বতন্ত্র-আত্মাবাদীরাও কখন কখন মনকে আত্মা বলিয়া ফেলেন। এবিষয়ে অনেক বক্তব্য আছে, সে সকল আত্মার স্বরূপ বর্ণন কালেই বলা হইবে, এখন কেবল মনের স্বরূপাব ধারণ সম্বন্ধে যে কিছু কথা আছে তাহাই বলা যাইতেছে।

মন কি?—কিংবিধ দৈহিক পদার্থের নাম মন?—

মন একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য, অহঙ্কার দ্রব্যের বিকার সমুৎপন্ন, অতি সূক্ষ্ম উৎপন্ন বস্তু বলিয়া মন সাধারণ উৎপন্ন বস্তুর ন্যায় ক্ষণ-ধ্বংসী নহে। তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত উহার স্থায়িত্ব আছে। দেহের প্রাণ সংযোগ ধ্বংস হইলে দৃশ্যমান শরীর যে নিপতিত থাকে, মন অস্থি মাংসাদির ন্যায় তন্মধ্যে থাকে না। শরীর বিনাশ নামক বিকারান্তর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মন তাহা হয় না। কি হয়?—তাহা জন্মান্তর-নামক প্রস্তাবে প্রকাশ পাইবে।

মন সাবয়ব কি নিরবয়ব?—

নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্তে মন নিত্য ও নিরবয়ব। মনের কোন অবয়ব নাই—ঔপাদানিক বা উৎপাদক বস্তুও নাই—সুতরাং মনের উপচয় অপচয়ও নাই, তবে যে আহারাদি জনিত মনের (কেবল মনের কেন?—সকল ইন্দ্রিয়ের) হ্রাস বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়—

তাহা মনের বা তত্তৎইন্দ্রিয়ের নহে। গোলক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়স্থানের হ্রাস-বৃদ্ধি নিবন্ধনও তাহা ঘটিয়া থাকে। বালককালে ইন্দ্রিয়স্থানের অপুষ্টতা বশতঃ ইন্দ্রিয় শক্তির অল্পতা থাকে—যৌবনে তত্তৎ স্থান পুষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়শক্তি পূর্ণ হয়—বার্দ্ধক্যে আবার বাল্যানুরূপ হয়। যাহার কোন অবয়ব নাই—তাহার বিনাশও নাই। কারণ, অবয়ব সংযোগের শৈথিল্য বা ধ্বংস বশতঃ বস্তু যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়; তাহারই নাম বিনাশ। সুতরাং নিরবয়বত্ব নিবন্ধন মনের অবিনাশিত্ব নিশ্চয় হইতে পারে।

মন নিরবয়ব হইলেও তাহা দ্রব্য পদার্থ বটে। যে হেতু মনের গুণ বা ধর্ম্ম আছে। দ্রব্য বলিলে আমাদের সহজ জ্ঞানে যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলভাবের উদয় হয়—দ্রব্যের স্বরূপ বস্তুত তাহা নহে। যাহার গুণ বা ধর্ম্ম থাকে, তাহারই দ্রব্য সংজ্ঞা হয়। এ লক্ষণ সাবয়ব ও নিরবয়ব উভয়ত্রই যাইতে পারে।

মন সূক্ষ্ম। এমন কি, মন বায়বীয় পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম। তাদৃশ সূক্ষ্মতা নিবন্ধন মন যুগপৎ দুই বা ততোধিক জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে না। বিবেচনা কর, "অন্যত্রমনা অভূবং নাশ্রৌষম্" আমি অন্যমনস্ক ছিলাম, এজন্য শুনিতে পাই নাই। ফল, মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই। (এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।) অতএব মন যখন এক ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, হইয়া তদিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয়ের বিচারণায় নিমগ্ন থাকে, তখন আর তাহার এমন কোন প্রদেশ থাকে না যে,সেই প্রদেশ অন্য ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে। স্থূল বা সাবয়ব-বস্তুই দুই বা ততোধিক বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইতে পারে; কেন না তাহার অনেক প্রদেশ আছে। মন এত সূক্ষ্ম যে, একের সহিত সংযুক্ত হইবার কালে সে তন্মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়, আর তাহার প্রদেশ থাকে না। এই কারণেই মনুষ্যের এককালে দুই বা ততোধিক জ্ঞান জন্মে না। তবে যে ভোজনাদি কালে যুগপৎ স্পর্শ জ্ঞান, রাসন জ্ঞান ও শ্রাবণ জ্ঞান জন্মে বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা ভ্রম। তাহা ক্রমশই হয়, কদাচ যুগপৎ হয় না। তাদৃশ বহুজ্ঞানের ক্রমিকত্ব অনুভব না হইবার কারণ এই যে, অত্যন্ত শীঘ্রতা এবং সূক্ষ্মতম কালের ব্যবধান থাকা। যেমন এক শত পদ্ম পত্র একটা সূচী দ্বারা এক বেগে বিদ্ধ করিলে তাহা যুগপৎ বিদ্ধ হইয়াছে মনে করা যায়, (বস্তুতঃ তাহা পর পরই বিদ্ধ হইয়াছে) সেইরূপ, শীঘ্রতা এবং সূক্ষ্মতম কালের ব্যবধান বশতঃ ক্রমিকোৎপন্ন বহুজ্ঞানেও যৌগপদ্য বিবেচনা হইয়া থাকে। এই মত ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত। সাংখ্যমত অন্যবিধ।

সাংখ্যকার বলেন, মন অনিত্য; যেহেতু উৎপন্ন বস্তুর চিরনিত্যত থাকে দৃষ্ট হয় না। অনিত্য বলিয়া ঘট পটাদির ন্যায় আশু নশ্বর নহে।

মন সাবয়ব। যেহেতু নিরবয়ব বস্তুর সংযোগ সিদ্ধি হয় না এবং উপচয় অপচয়ও হয় না। যদি বল, হ্রাস বৃদ্ধি মনের হয় না, তদীয় গোলক অর্থাৎ আধার স্থানেরই হ্রাস বৃদ্ধি হয়, তন্নিবন্ধন দর্পণের স্বচ্ছতানুরূপ প্রতিবিম্ব পাতের ন্যায় মনেরও হ্রাস বৃদ্ধি লক্ষ্য হয়,তাহার বিনিগমক (নিশ্চায়ক) কে?

মন সূক্ষ্ম বটে, তাই বলিয়া পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম নহে। ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেই যে পরমাণুবৎ সূক্ষ্ম হইবে, কি নিরবয়ব হইবে, তাহার বিনিগমক কেহ নাই। বায়ু যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু, তাই বলিয়া কি বায়ুর অবয়ব নাই?—নৈয়ায়িক মতেও

বায়ু সাবয়ব বস্তু, উহা পুঞ্জীভূত পরমাণু মাত্র*।

জ্ঞান সকল ক্রমিক হয়, যুগপৎ হয় না, ইহাও নিয়মিত নহে। কদাচিৎ বহুজ্ঞানেরও যৌগপদ্য দৃষ্ট হয়। "ক্রমশোঽক্রমশশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ।" ইন্দ্রিয়বৃত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োত্থ জ্ঞান ক্রমশঃ হয়, অক্রমশও হয় অক্রমশ ঘটনার কারণ উপস্থিত থাকিলে অক্রমশই হয়, নচেৎ ক্রমশঃ হয়। তবে ক্রমশঃ হওয়াই প্রায়িক।

এই এরূপ মনের সাবয়বত্ব নিরবয়বত্ব লইয়া, জ্ঞানের প্রতি কারণ ভাব লইয়া ও নিত্যানিত্য ভাব লইয়া শাস্ত্রের তত্তৎ স্থানে অনেক প্রকার তর্ক (যুক্তি) আছে। সে সকল উদ্‌ঘাটন না করিয়া কেবল সিদ্ধান্ত গুলি অনুবাদিত হইল।

নৈয়ায়িকেরা অনেকাংশে যুক্তির উপর নির্ভর করেন; আর সাংখ্যাচার্য্যেরা প্রায় বেদের উপরই নির্ভর করেন, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তিও প্রদর্শন করেন। বৈদিক মতে মন সাবয়ব, সুতরাং সাংখ্যেরও সিদ্ধান্ত মন সাবয়ব। মনের সাবয়বত্ব সম্বন্ধে যে বেদের সম্মতি আছে, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত ছান্দোগ্য ষষ্ঠের একটি আখ্যায়িকার কিঞ্চিদংশ অনুবাদ করিলাম।

শ্বেতকেতু নামক ঋষিপুত্রের পিতা, শ্বেতকেতুকে সর্ব্বজ্ঞ করিবার মানসে প্রতি দিন বিবিধ সোদাহরণ প্রশ্নের অবতারণা করিতেন। একদিন বলিলেন "ন নোঽদ্য কশ্চনাশ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতি" অস্মৎ কুলীন কোনো ব্যক্তিই অশ্রুত, অমত ও অবিজ্ঞাত পদার্থের উদ্বোধন করেন না (অর্থাৎ সকলেই সর্ব্বজ্ঞ)

তৎশ্রবণে শ্বেতকেতু বলিলেন "তাহা কি প্রকারে হয়?"—

এই কথার উত্তরে শ্বেতকেতুর পিতা, প্রথমতঃ বাহ্য ভৌতিকের রহস্য উপদেশ করিয়া, আধ্যাত্মিক ভৌতিকের তত্ত্ব কথন কালে বলিলেন "অন্নময়ং হি সৌম্য! মন, আপোময়ঃ প্রাণ, স্তেজোময়ী বাক।" মন অন্নময়, (অন্নবিকারজন্মা) প্রাণ জলময় (জলবিকারজন্মা) বাক তেজোময়ী (তেজ অর্থাৎ স্নেহ দ্রব্যের পরিণাম)।

শ্বেতকেতু এই কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না, কহিলেন, "ভূয় এব মা ভগবান্ বিজ্ঞাপয়তু"—আমি ভাল বুঝিতে পারিলাম না, পুনশ্চ দৃষ্টান্ত দ্বারা আমায় বুঝান।

শ্বেতকেতুর বোধের নিমিত্ত ঋষি, ঐ কথা বিস্তার করিয়া বলিতে লাগিলেন। "পৃথিবীধাতু, অপ্‌ধাতু ও তেজোধাতু।" ধাতুর নামান্তর ভূত আর পৃথিবীর সংজ্ঞান্তর অন্ন। ঐ ত্রিবিধ ভূতের সম্মিশ্রণেই সমস্ত বাহ্য জগতের উৎপত্তি। উক্ত ধাতুত্রয় আত্মা ভিন্ন সমস্ত আধ্যাত্মিক পদার্থেরও উপাদান বা পরিপোষক। বাহ্য অন্নাদি ধাতু আধ্যা-

* অনেকে মনে করেন যে, বায়ু ত্বাচ-প্রত্যক্ষের বিষয়। বস্তুতঃ তাহা নহে। বায়ু ত্বগিন্দ্রিয়ের গোচর হয় না, স্পর্শলিঙ্গক অনুমান হয় মাত্র। বায়ু যদি ত্বগিন্দ্রিয়ের গৃহীতা হইত, তাহা হইলে নিরন্তরই অন্য দ্রব্যের ন্যায় বায়ু স্পর্শ হইত; যে হেতু কস্মিন্ কালে বা কোন প্রদেশে বায়ুর অভাব দৃষ্ট হয় না। এ জগৎ বায়ুপরিব্যাপ্ত।

অপিচ, বায়ুর স্বরূপতঃ স্পর্শ গুণ নাই। ত্বগিন্দ্রিয়েরও স্বরূপতঃ স্পর্শগ্রাহকত্ব নাই। বেগই বায়ুতে স্পর্শগুণের উদ্রেক করে, আঘাতই ত্বকের স্পর্শ গ্রাহিকা শক্তির উত্তেজনা করে। বায়ুতে বেগ উপস্থিত হইলে, সেই বেগিত বায়ু ত্বক্‌কে চাপিয়া ধরে। সেই চাপ প্রাপ্তি দশায় ত্বক্ তন্নিষ্ঠ স্পর্শকে গ্রহণ করে। বায়ুতে যদি স্বরূপতঃ স্পর্শ গুণ থাকিত, আর ত্বকের যদি স্বরূপতঃ স্পর্শ গ্রাহিকা শক্তি থাকিত, তাহা হইলে আর ব্যজনের আবশ্যক হইত না। ফল, স্পর্শকালে ত্বকে চাপ পাওয়া আবশ্যক। অতএব যাঁহারা চাপা-স্পর্শকে পৃথক্ করিয়া স্পর্শজ্ঞানসাধক দুই ইন্দ্রিয়ের কল্পনা করেন, তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম।

ত্মিক ধাতুর সহিত সংযুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক তত্তৎ পদার্থের স্থিতি ও পুষ্টি করে। তাহার প্রণালী এইরূপ,—

ভুক্তান্ন জাঠরাগ্নি দ্বারা পচ্যমান হইয়া ত্রিধা বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে স্থূলতম ধাতু (অন্নমল) পুরীষভাবে পরিণত হয়। যাহা মধ্যম ধাতু, তাহা রসাদিক্রমে মাংস পর্য্যন্ত উৎপাদন করে। যাহা অণিষ্ঠ অর্থাৎ সূক্ষ্মতম ধাতু, তাহা হৃদয়প্রাপ্ত হইয়া তত্রত্য নাড়ী পথ দ্বারা উদ্গত হইয়া ইন্দ্রিয়গণের পোষণ করে। এইরূপ, পীয়মান অপ্‌ধাতুও (জলীয় দ্রব্য) ত্রিধা বিভক্ত হয়। তাহার স্থূলতম অংশ মূত্র, মধ্যতর অংশ রক্ত ও অণুতম অংশ প্রাণ। তেজ অর্থাৎ স্নেহময় ধাতুরও ঐ রূপ গতি। উপযুজ্যমান স্নেহ দ্রব্যের স্থবিষ্ঠ ভাগ অস্থি, মধ্যম ভাগ মজ্জা ও অনুতম ভাগ বাক্ (ইন্দ্রিয়) পরিপুষ্ট করে। যেমন মথ্যমান দধি হইতে তদন্তর্গত সূক্ষ্ম ধাতু সকল সম্ভূয়ভাবে উদ্গত হইয়া নবনীত বা ঘৃতের উৎপাদক হয়, সেইরূপ— তেজ অপ্ ও অন্ন,—এই ত্রিবিধ দ্রব্য ভুক্ত হইলে তাহা ঔদর্য্য অগ্নি, ঔদর্য্য বায়ুর সহযোগে মথিত করিয়া তদন্তর্গত সূক্ষ্মতম ধাতু সকল সম্ভূয়ভাবে উদ্গত করে এবং সূক্ষ্মতম নাড়ীপথ দ্বারা তত্তদিন্দ্রিয় স্থানে উপনীত করিয়া তাহাদিগকে পুষ্ট করে। উদান নামা বায়ু উদ্গত করায়—অপান নামা বায়ু নিম্নে নিঃসারিত করে—আর ব্যান নামা বায়ু তীর্য্যক্ অতীর্য্যক্ শরীরের সর্ব্বত্রই রস রক্তাদি লইয়া সঞ্চরণ করে। হে সৌম্য! শ্বেতকেতু! এই জন্যই বলিয়াছি মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, আর বাক্ তেজোময়ী। "যদি ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাও—তবে পঞ্চদশ দিন কি অন্ন, কি জল, কি তেজ, কিছুই উপযোগ করিও না। ষোড়শ দিনে আমার নিকট আসিও।"

শ্বেতকেতু পঞ্চদশ দিন অনাহারের পর পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। কহিলেন "কি করিব?"—পিতা কহিলেন "ঋচঃ সৌম্য! যজূংষি সামানি চ—" ঋক্ অধ্যয়ন কর, যজুঃ অধ্যয়ন কর, সাম অধ্যয়ন কর"— তখন শ্বেতকেতু কহিলেন "ন চৈমা প্রতিভান্তি ভো!" আমার কিছুই প্রতিভাত হইতেছে না। ঋষি কহিলেন "যেমন ইন্ধনাভাবে মহৎ পরিমাণ অগ্নিও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, আবার খদ্যোতমাত্র পরিমিত জ্বলদঙ্গারে ইন্ধনযোগ করিলে তাহা হইতে মহৎ প্রজ্বলন উপস্থিত হয়, সেইরূপ, আহারাভাবে তোমার ইন্দ্রিয় সকল নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছে, কিছু উপযোগ কর, পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে, বেদ সকল প্রতিভাত হইবে।"

মনের স্থান কল্পনা।

মনের স্থান কোথায়? কোথায় থাকিয়া মন কার্য্য করে? শাস্ত্রকারেরা এবিষয়েরও চিন্তা করিয়াছেন (ইহা পূর্ব্বে কতক বলা হইয়াছে) তান্ত্রিক ও পৌরাণিক মতে মনের স্থান ভ্রূযুগলের অভ্যন্তর। দেহব্যাপিনী অনন্ত নাড়ীর মধ্যে তিনটি প্রধানা নাড়ী। যাহাদের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুশম্না। সেই নাড়ীত্রয় নাভি বা হৃৎপিণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রথমত মূলাধারে গিয়াছে। তথা হইতে ত্রিধারাক্রমে তিন দিকে অর্থাৎ উভয় পার্শ্ব এবং মধ্যাস্থি বা মেরুদণ্ডের মধ্য আশ্রয় করিয়া মস্তক পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঐ প্রধানা নাড়ীর অনেকশত শাখা নাড়ী আছে। তাহাদিগের আবার শাখা নাড়ী ও প্রশাখা নাড়ী আছে। সমস্ত দেহটাই শিরাব্যাপ্ত। অশ্বত্থপত্র জীর্ণ হইলে সেটি যেমন শিরাময় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ, শরীরও শিরাময়। উক্ত প্রধানা নাড়ীর মধ্যে মৃণালতন্তুর ন্যায় স্নেহময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু আছে। আশ্রয়ীভূত শিরার সহিত সেই সকল সূক্ষ্ম তন্তুর ব্রহ্মরন্ধ্রের

নিম্নে শেষ হইয়াছে। যে খানে তন্তু সকলের শেষ হইয়াছে, সেই স্থানটি গ্রন্থিল। মস্তিষ্ক বা মস্তক-ঘৃতে সেই সমস্ত গ্রন্থিল তন্তু ডুবিয়া আছে। ঐ তন্তুগ্রন্থির বৃন্তস্থানের নাম আজ্ঞাচক্র। তদূর্দ্ধে সহস্রার চক্র। ঐ আজ্ঞাচক্রেই মনের স্থান। মানসিক কার্য্য করিবার সময় মনঃস্থানের স্পন্দন হয়। তন্নিমিত্ত তৎসংযোগী ভ্রুত্বক্‌ প্রভৃতি স্থান ক্রিয়াযুক্ত হয়। দার্শনিক পণ্ডিতেরাও এই মতে মত দিয়া গিয়াছেন, তবে স্পষ্ট করিয়া নহে।

বৈদিক উপাসকদিগের মধ্যে, কাহার কাহার মতান্তর দৃষ্ট হয়। তাঁহারা বলেন, মনঃস্থান মস্তকে নহে, হৃদয়ই মনঃস্থান। হৃদয়াভ্যন্তরে যে অপূপাকার মাংসখণ্ড আছে, যাহাকে হৃদ্‌পদ্ম বলে, অন্তশ্ছিদ্র সেই মাংসখণ্ডই মনের স্থান। তাঁহাদের অনুভব এই যে, যে কিছু ধ্যেয় বস্তু নাকি সেই হৃদয়াকাশেই বিম্বিত হয়।

সমাজসংস্কার।

তৃতীয় প্রস্তাব।

৩৮৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৩৮ পৃষ্ঠার পর।

আমরা পূর্ব্ব-প্রস্তাবে বলিয়াছি যে জাতিবিভেদ প্রথা এবং স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার প্রণালী আমাদিগের হিন্দুসমাজের ভিত্তিভূমি। ঐ প্রস্তাবে জাতিবিভেদ প্রথার বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে; বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমাদিগের সমাজ দ্বারা ব্যবহৃত স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার প্রণালী আলোচনা করা যাইতেছে।

উদ্বাহের পবিত্র নিয়ম মনুষ্য-সমাজের পত্তনভূমি। উহা যেমন মনুষ্য-সমাজের পত্তনভূমি তেমনি তাহার সেতুস্বরূপ। ঐ নিয়ম না থাকিলে মনুষ্য-সমাজ কি পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত হয় তাহা বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু স্ত্রীলোকের সতীত্বই এই নিয়মের জীবনস্বরূপ। উহার উপর এই নিয়মের শুভকারিতা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতেছে। স্ত্রীলোকের সতীত্বের রক্ষার উপযোগী কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। সেই সকল নিয়ম পালন কর, তাহা রক্ষা পাইবে ও সমাজ কুশল অবস্থায় থাকিবে। আর যদি সে সকল নিয়ম অবহেলা কর, তাহা হইলে ইউরোপ ও স্বাধীন প্রণয়ের* স্থান আমেরিকার সমাজের ন্যায় সমাজ ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। আমাদিগের সমাজ-নিয়ামক মুখ্যভাব কোন মতে স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা, আর গৌণ ভাব স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত সম্মান। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার সমাজ-নিয়ামক মুখ্য ভাব স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও গৌণ ভাব স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে স্ত্রীলোকেরা "পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ" "পূজার উপযুক্ত ও গৃহের দীপ্তিস্বরূপ"। কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রতি সম্মান অপেক্ষা তাহাদিগের চরিত্রের প্রতি তাঁহাদিগের অধিকতর দৃষ্টি ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডে ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়। স্ত্রীলোকের সচ্চরিত্রতা রক্ষা অপেক্ষা তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত সম্মানের প্রথা পালনের উপর ঐ খণ্ডের লোকদিগের অধিকতর দৃষ্টি। পরন্তু আমাদিগের সমাজ-নিয়ামক মুখ্য ভাব ধর্ম্ম এবং গৌণ ভাব সাংসারিক সুখ; আর ইউরোপের সমাজ-নিয়ামক মুখ্য ভাব সাংসারিক সুখ এবং গৌণ ভাব ধর্ম্ম। এই দুই প্রকার সমাজ-গঠনের মধ্যে কোনটি সমাজের অধিকতর শুভসাধক, তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন।

* Free Love.

আমাদিগের হিন্দুসমাজের সংস্থাপকেরা স্ত্রীলোকের সতীত্বের সংরক্ষণ নিমিত্ত নানা বিধ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা উহার নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় সাধনের বিশেষ উপযোগী।

আমাদিগের সমাজের যে সকল নিয়ম স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার বিশেষ উপযোগী নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) স্ত্রীলোকের অল্প বয়সে বিবাহ।
(২) পিতামাতা দ্বারা বর নির্ব্বাচন।
(৩) স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরবাস
(৪) অনেক স্ত্রীলোকের একত্রবাস।
(৫) স্ত্রীলোকদিগের কায়িক পরিশ্রমের অভ্যাস।

আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। ইউরোপ খণ্ডে তাহা হয় না। ইহা যথার্থ বটে যে, ইউরোপ খণ্ডে শত শত কুমারী অনূঢ়াবস্থায় সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু সহস্র সহস্র কুমারী সক্ষম হয় না। ভারতবর্ষে এই বাল্যবিবাহ প্রথার অনিষ্টকারিতা দ্বিরাগমন রীতি দ্বারা নিরাকৃত হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই প্রকার নিয়ম প্রচলিত আছে যে, বিবাহের পর যে পর্য্যন্ত না কন্যা ঋতুমতী হয় সেই পর্য্যন্ত সে স্বামীর আলয়ে আগমন করে না। বঙ্গদেশেও পূর্ব্বে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা নাই। হয় এই নিয়ম পুনঃপ্রচলিত হউক, কিম্বা কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে বিবাহ দেওয়া হউক। এক্ষণে অনেক প্রগাঢ় হিন্দু আপন কন্যাদিগকে দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ বৎসরে বিবাহ দিতে দৃষ্ট হয়েন। দ্বিরাগমন প্রথা পুনঃপ্রচলন অপেক্ষা যে শুভকর নিয়ম আপনা হইতে সৃষ্ট হইতেছে তাহাই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। চতুর্দ্দশ বৎসরে কন্যার বিবাহ দিলে নিতান্ত অধিক বয়সে বিবাহের অনিষ্ট এবং নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহের অনিষ্ট উভয় প্রকার অনিষ্টই নিবারিত হয়। নিতান্ত অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ না দিলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব রক্ষা করা দুষ্কর হয়, আর নিতান্ত অল্প বয়সে বিবাহ দিলে ঐ প্রকার বিবাহের অনিষ্টজনক ফল হইতে কষ্ট পাইতে হয়। ব্রাহ্ম-বিবাহের আন্দোলনের সময় কতকগুলি ব্রাহ্ম, কত বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে চিকিৎসকদিগের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কোন কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক এই দেশের প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর স্ত্রীলোকের বিবাহ-কাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। এই মত সর্ব্বোপরি গ্রাহ্য। আমাদিগের শাস্ত্রকারেরা ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের বাল্যকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ বৎসরে বিবাহ দিলে তাহাও অল্প বয়সে বিবাহ বলিতে হইবে, কিন্তু এরূপ অল্প বয়সে বিবাহ না দিলে বিলক্ষণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

ইউরোপ খণ্ডে কন্যা আপনি বর মনোনীত করে। আমাদিগের মধ্যে সে প্রথা প্রচলিত নাই। আমাদিগের দেশে পিতামাতা বর নির্ব্বাচন করিয়া দেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদিগের দেশে দাম্পত্য প্রেম ইউরোপ অপেক্ষা অধিক। ইউরোপ খণ্ডে মধুপক্ষ* অতীত না হইতে হইতেই স্ত্রী ও পুরুষের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু এ প্রকার বিরোধ আমাদিগের দেশে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা যথার্থ বটে যে, ইউরোপে বর মনোনীত করিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা সত্ত্বে শত শত কুমারী আপনাদিগের সতীত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু সহস্র সহস্র

* Honeymoon.

কুমারী সক্ষম হয় না। অতএব আমাদিগের দেশে পিতামাতা দ্বারা বর নির্ব্বাচনের প্রথা যাহা প্রচলিত আছে তাহা ইউরোপীয় প্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিতে হইবে। বিশেষতঃ, যখন স্ত্রীলোকের অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইল, তখন বর নির্ব্বাচন বিষয়ে আমাদিগের দেশে প্রচলিত প্রথা রক্ষা করাই উচিত। অল্পবয়স্ক স্ত্রীলোক আপনার জন্য উপযুক্ত বর মনোনীত করিতে অক্ষম। পিতা মাতা তাহার ভাবী মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাহার জন্য যেরূপ বর নির্ব্বাচন করিতে পারেন, তাহারদিগের নিজে সেরূপ পারা অসম্ভব। বালিকা আসক্তি-জনিত-মোহ-পরতন্ত্র হইয়া নির্ব্বাচন করিবে; পিতা মাতা ধীর বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া নির্ব্বাচন করিবেন। বিবাহ অতি গুরুতর কার্য্য। বিবাহের উপর বালিকার ভাবী মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। অতএব বর নির্ব্বাচনের ভার পিতামাতার হস্তে ন্যস্ত থাকাই কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাবলেখক কোন কোন উচ্চ পদান্বিত বিজ্ঞ ইংরাজকে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃপুরবাসের প্রণালীর প্রশংসা করিতে স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। আমরা এই সংখ্যার অপর স্তম্ভে এই বিষয়ে দুই একটী প্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তার উক্তিও উদ্ধৃত করিলাম। তাঁহারা এশিয়াখণ্ডবাসী লোকদিগের রীতির উৎকর্ষতা কি উজ্জ্বলরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা *ঐ উক্তি পাঠ করিলে পাঠক*বর্গ প্রতীতি করিতে সক্ষম হইবেন। সতীত্ব রক্ষার সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা যতদূর থাকিতে পারে, সেরূপ স্বাধীনতা তাহাদিগের থাকা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উপলব্ধি হয়। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে অন্তঃপুরবাসের নিয়ম ছিল, অথচ স্ত্রীলোকেরা পতিসঙ্গে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারিত। পূর্ব্বকালে স্বামী ও স্ত্রী তীর্থপর্য্যটন, দেবালয়ে দেবোপাসনা, যজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মক্রিয়া একত্র প্রকাশ্যরূপে সম্পাদন করিত ও এখনও অনেক পরিমাণে করিয়া থাকে। পুরাণ ও নাটকে দেখা যায়, যে ধর্ম্ম-ক্রিয়া ব্যতীত অন্যান্য উপলক্ষেও স্বামী ও স্ত্রী একত্র প্রকাশ্য রূপে ভ্রমণ করিত। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে অন্তঃপুরবাসের সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতা যতদূর সুঙ্গত হইতে পারে তাহা বিদ্যমান আছে। ইহা প্রকৃত হিন্দু নিয়ম। মুসলমানদিগের রাজত্ব ঐ সকল দেশে বদ্ধমুল হয় নাই, এই জন্য তথায় এই প্রকৃত হিন্দুনিয়ম অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মুসলমানদিগের অত্যাচার বশতঃ আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকের আপেক্ষিক অনবরোধের প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও পল্লীগ্রামে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে। এই প্রকার স্ত্রীস্বাধীনতাই শ্রেয়স্কর। ঈশ্বর না করুন যে, স্বামী কার্য্যালয়ে গিয়াছেন, স্ত্রীর যুবক বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে বেড়াইতে লইয়া গেলেন এবং স্বামী পীড়িত, স্ত্রী পল্‌কা ও ওয়াল্‌জ নৃত্যে সমস্ত রাত্রি অতিবাহন করিতেছেন, এরূপ স্বাধীনতা আমাদিগের মধ্যে যেন কখন প্রবেশ না করে।

স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা জন্য অন্তঃপুরবাস যেমন আবশ্যক তেমনি বহুস্ত্রীলোকের সহিত একত্রবাস আবশ্যক। আমাদিগের সমাজে স্বসম্পর্কীয় অনেক লোক একত্রবাস করে, এ প্রথার অনিষ্ট যাহা থাকুক, স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার জন্য ইহা বিশেষ উপযোগী বলিতে হইবে। যে মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা বলিয়া গিয়াছেন যে, যে স্ত্রী আপনি আপনাকে রক্ষা করে সেই যথার্থ সুরক্ষিতা, সেই মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা আবার অন্তঃপুরবাস ও স্বজনপ্রতিপালন

বিধান করিয়াছেন। অপ্রাসঙ্গিক না হইলে আমরা এই স্থলে সবিস্তরে দেখাইতাম যে, বহু পরিবারের একত্র বাসের প্রথা নিতান্তই ইষ্টশূন্য নহে। বিলাতে অনাহারে প্রাণ বিয়োগের সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত যাহা শুনা যায়, তাহা এই প্রথা নিবন্ধন আমাদিগের দেশে শুনা যায় না।

কায়িক পরিশ্রম অভ্যাস স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ইংরাজদিগের মধ্যে একটী কথা প্রচলিত আছে যে, শয়তান অলস ব্যক্তির মনে প্রবেশ করিবার অধিকতর সুযোগ পায়। আলস্য যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে পরিপোষণ করে এমন আর কিছুতে করেনা। এক বংশ পূর্ব্বে ধনাঢ্য ও মধ্যমাবস্থ লোকের স্ত্রীরা যেরূপ শারীরিক পরিশ্রমে তৎপর ছিলেন, এক্ষণে আর সেরূপ দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বে পল্লীগ্রামে কোন ক্রিয়া উপলক্ষে ভোজ জন্য পাক করিতে স্ত্রীলোকে যেরূপ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিত, এক্ষণে আর সেরূপ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে দেখা যায় না। ইহা দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। বিলাতে সম্পন্নাবস্থ লোকের স্ত্রীরা মধ্যে পাকক্রিয়ার প্রতি অমনোযোগী হইয়াছিল, এক্ষণে সেখানে কতকগুলি বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া সূপশাস্ত্রের অনুশীলন ও ভদ্র রমণীদিগের মধ্যে পাকক্রিয়া প্রচলন জন্য এক সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং রাজ্ঞীর একটী কন্যাকে সেই সভার প্রধানা পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। যখন বিলাতে এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদত্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন এখানেও সেইরূপ হইবার সম্ভাবনা। বিলাতে কোন শুভানুষ্ঠান আরম্ভ না হইলে এখানে তাহা হয় না। হায়! আমাদিগের দেশের কি দুর্দ্দশা!

আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষার জন্য কি সুন্দর নিয়ম সকল সংস্থাপিত আছে! যদি স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা লোক সমাজের ভঙ্গ নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হয়—"যদি" শব্দে কেন ব্যবহার করিতেছি? ইহা নিশ্চয় সত্য—তবে এই নিয়ম গুলি কত যত্নের সহিত পালন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের সতীত্ব ভারতবর্ষের প্রধান গৌরব স্থল।

"রূপবতী সাধ্বী সতী ভারতললনা।
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিরতা
অতুলনা ভারতললনা"।

এই প্রধান গৌরবের কারণ আমরা যেন না হারাই। আমাদের গৌরবের সকল বিষয়ই গিয়াছে। এই একটী মাত্র অবশিষ্ট আছে। এইটী প্রাণপণে রক্ষা করা আমাদিগের অতীব কর্ত্তব্য। বিলাতের কোন কোন বিবি এ দেশকে সভ্য করিতে আইসেন, কিন্তু ভারতবর্ষে অনেক বিষয় আছে যাহা তাঁহারা নিজে শিক্ষা করিতে পারেন। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা অন্য দেশীয় স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে পাতিব্রত্য, ব্রীড়া ও স্বজন জন্য শারীরিক কষ্ট সহিষ্ণুতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইতে পারে।

মুখ্য এবং গৌণ।

৩৮৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৪৫ পৃষ্ঠার পর।

যাহা বলা হইল তাহা এই;—প্রথমতঃ সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং জাতীয় ভাব দুয়ের সামঞ্জস্য করিয়া চলা উচিত; দ্বিতীয়তঃ মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করাই সেই সামাঞ্জস্য সাধনের উপায়; তৃতীয়তঃ বঙ্গসমাজের এইরূপ একটা বিকৃত ভাব দাঁড়াইতেছে যে, বঙ্গীয় যুবকেরা ইংরাজদিগের অনুকরণকেই সার জ্ঞান করেন; ইংরাজেরা বাস্তবিক স্বাধীন জাতি,—বাঙ্গালিরা তাঁহারদের দেখা

দেখি স্বাধীনতার ভান করিয়া থাকেন— স্বাধীনতার ভান করিলেই যদি স্বাধীন হওয়া যাইত, তাহা হইলে শুক পক্ষীও বক্তৃতা-বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারিত। স্বাধীনতার ভান না করিয়া, স্বাধীনতা লাভের উপায় অবলম্বন করা তাঁহারদের আবশ্যক। সে উপায় মঙ্গল-ভাবের অনুশীলন। কেন না আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা, তাহাতেই লোকের মধ্যে ঐক্য হয়, তাহাই সকল স্বাধীনতার মূল। মঙ্গল ভাবের অনুশীলন করিলে, হিন্দুদিগের স্বজাতীয় ভাবেরই অনুশীলন করা হয়, কেন না হিন্দুজাতি মঙ্গল-প্রধান। এই প্রকার মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাব এবং গৌণরূপে বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করিলেই বাঙ্গালিদের মঙ্গল হইবে।

লক্ষ্য এবং উপায়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ, মুখ্য এবং গৌণের মধ্যে সেই সম্বন্ধ। লক্ষ্য যদি, আমাদের, স্বাধীনতা হয়, তবে তাহার উপায় মঙ্গলের অনুষ্ঠান। লক্ষ্য যদি, আমারদের, সার্ব্বভৌমিক ভাব হয়, তবে তাহার উপায় মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাবের অনুশীলন। এই শেষোক্ত বিষয়টি বিশদরূপে বুঝা আবশ্যক। যাঁহারা সার্ব্বভৌমিক ভাবে উঠিবার জন্য নানা জাতীয় ভাব সংগ্রহ করিয়া বেড়ান, তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে, স্বজাতীয় ভাবের মুখ্য আলোচনা-রূপ সোপান ব্যতিরেকে কোন রূপেই সার্ব্বভৌমিক ভাবে উত্থান করিতে পারা যায় না। অগ্রে যে মুখ্যরূপে আপনাকে বা স্বজাতিকে জানে, সেই-ই গৌণরূপে অন্যকে বা অন্য জাতিকে জানিতে পারে, এবং মুখ্যরূপে আপনাকে আর গৌণরূপে অন্যকে জানিলে তবেই উভয়ের মধ্যে কি সার্ব্বভৌমিক এবং কি ব্যক্তি-গত তাহা জানিতে পারা যায়। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, "শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি। মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ" ইহার অর্থ এই যে, যে দানক্ষম ব্যক্তি দুঃখজীবী স্ত্রীপুত্র স্বজনকে অবহেলা করিয়া পরজনকে দান করে, তাহার সে দানক্রিয়া ধর্ম্মের প্রতিরূপ মাত্র (অর্থাৎ ভান মাত্র) বাস্তব সে ধর্ম্ম নহে; তাহা আপাততঃ মধু কিন্তু পরিণামে বিষ। এইরূপই বলা যাইতে পারে যে, যে ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বজাতীয় ভাব অবহেলা করিয়া বিজাতীয় ভাব অনুশীলন করেন, তাঁহার সে যে ভাব, তাহা সার্ব্বভৌমিক ভাবের ভান মাত্র, বাস্তব তাহা সার্ব্বভৌমিক ভাব নহে। স্বজাতীয় ভাব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্বজাতীয় ভাষা সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে, কেন না, ভাষা ভাবের দর্পণ-স্বরূপ। যথা—যে কৃতবিদ্য ব্যক্তি স্বজাতীয় ভাষা অবহেলা করিয়া বিজাতীয় ভাষার অনুশীলন করেন, তাঁহার সে বাগ্‌বিদ্যা বিদ্যার প্রতিরূপমাত্র—ভানমাত্র—বাস্তব, তাহা বিদ্যা নহে। সার্ব্বভৌমিক ভাবের সহিত সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তব্যের কিরূপ সম্বন্ধ ইহা না জানা বশতঃ অনেকে নানা জাতীয় ভাবে সংগ্রহ করাকেই সার জ্ঞান করেন। সার্ব্বভৌমিক ভাব এবং সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তব্য, উভয়ের মধ্যে কিরূপ অবয়ব-সাদৃশ্য তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

সার্ব্বভৌমিক ভাব	সার্ব্বভৌমিক কর্ত্তব্য
(১) হিন্দু জাতীয় ভাব	(১) হিন্দু জাতি মুখ্যরূপে হিন্দু ভাব এবং ভাষা, গৌণরূপে অন্য জাতীয় ভাব এবং ভাষা অনুশীলন করিবেক।
(২) মুসলমান জাতীয় ভাব	(২) মুসলমান জাতি মুখ্যরূপে মুসলমান ভাব এবং ভাষা, গৌণরূপে অন্য জাতীয় ভাব এবং ভাষা আলোচনা করিবেক।
(৩) ইংরাজ জাতীয় ভাব	(৩) ইত্যাদি

উপরে দৃষ্টিপাত করিলেই বিচক্ষণ ব্যক্তি

সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবেন যে, মুখ্যরূপে স্বজাতীয় ভাবের অনুশীলন এবং উন্নতিসাধন সার্ব্বভৌমিক ভাবের অনুপযোগী হওয়া দূরে থাকুক, তাহাই আরো সার্ব্বভৌমিক ভাবের তাৎপর্য্য। যদি বল যে, স্বদেশীয় ভাষা অবহেলা করিয়া বিদেশীয় ভাষার চর্চ্চা করা উচিত, তবে তাহাতে ইহাই প্রকাশ করা হয় যে, বিদেশীয় ভাষাতেই ভাব ব্যক্ত করা যায়, স্বদেশীয় ভাষাতে ভাব ব্যক্ত করা যায় না; সুতরাং তাহাতে ইহাই প্রকাশ করা হয় যে, ভাষা দ্বারা ভাব ব্যক্ত করা সকল জাতীয় ধর্ম্ম নহে, উহা একটি বিশেষ জাতীয় ধর্ম্ম। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, আপনার ভাষা অবহেলা করিয়া পরের ভাষা অনুশীলন করিলে, সার্ব্বভৌমিক ভাবের একটা ভান মাত্রই করা হয়, একটা আড়ম্বর মাত্রই করা হয়, কিন্তু বাস্তবিক সার্ব্বভৌমিক ভাবের ঠিক যাহা বিপরীত তাহাই করা হয়। যাঁহারা কথা-ভক্ত এবং আড়ম্বর-ভক্ত তাঁহারদের যুক্তি এইরূপ,—"দেখ দেখি ও ব্যক্তি কেমন উদারচরিত্র, উহাঁর জাতি-বিচার নাই, আপনার জাতিকেও যেমন চক্ষে দেখেন, অন্য জাতিকেও তেমনি চক্ষে দেখেন, পরের প্রতি উহাঁর এমনি অলৌকিক প্রেম, এবং আপনার প্রতি উহাঁর এমনি উপেক্ষা যে, আপনার ভাষা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন, এবং পরের ভাষা শিক্ষা করিয়াও ক্ষান্ত নহেন, তাহার উন্নতি-সাধন পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! কি চমৎকার ধীশক্তি!" যাঁহারা কার্য্যভক্ত এবং অকৃত্রিম ভাবের ভক্ত তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ;—"উনি আপনার ভাষাই ভাল জানেন না, অন্যের ভাষা জানিতে যা'ন! তাহা হইলেও পদে থাকিত—তাহার আবার উন্নতি-সাধন করিতে যা'ন! কি মূর্খতা! উহাঁর কার্য্যের সম্বলমাত্র অনুকরণ, এবং কথার সম্বল মাত্র অনুবাদ, কার্য্যে বানরত্ব, কথায় শুক-পক্ষিত্ব, এই উহাঁর ধীশক্তি!" যদি বল যে, আপনার ভাষাকে অবহেলা করিতে বলি না, বিদেশীয় ভাষা হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া আপনার ভাষার পুষ্টি-সাধন করা অতীব আবশ্যক, আমি তাহাই করিতে বলি; তবে তাহার প্রতি বক্তব্য এই যে, অগ্রে যদি তুমি স্বদেশীয় ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী হও, তবেই বিদেশীয় ভাষা দ্বারা তাহার পুষ্টি-সাধনে সমর্থ হইবে; অগ্রে পাকস্থলীতে বলাধান হইলে তবেই গুরুপাক সামগ্রী জীর্ণ করিতে পারিবে। পরন্তু তুমি যদি তোমার চিরাভ্যস্ত লঘু অন্নই জীর্ণ করিতে না পার, তবে তুমি তোমার অনভ্যস্ত গুরু অন্ন কি রূপে জীর্ণ করিবে? আপন রুচির ব্যাঘাত করিয়া অন্যের রুচি অনুসারে আহার করিলে যেমন রোগে পড়িতে হয়; সেইরূপ স্বদেশীয় রুচির ব্যাঘাত করিয়া, ভিন্ন দেশীয় রুচি অনুসারে ভাষা ব্যবহার করিলে ভাষার নিতান্তই অনিষ্ট সাধন করা হয়। ইহার একটি উদাহরণ—মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিলোত্তমা সম্ভবের এক স্থানে আছে।

> "যথা পক্ষরাজ বাজ (নির্দয় কিরাত
> লুটিলে কুলায় তার) শোকে অভিমানে
> মনে প্রমাদ গণিয়া" ইত্যাদি।

বাজ পক্ষীকে পক্ষরাজ বলা এ দেশীয় রুচিসঙ্গত নহে।

এস্থলে ইগল্ পক্ষী মনে করিয়া বাজ পক্ষী বলা হইয়াছে। এরূপ করিলে স্বজাতীয় ভাষার উন্নতি-সাধন দূরে থাকুক, তাহার বিলক্ষণ অপকর্ষ সাধন করা হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধ ভাব এবং স্বাধীন ভাব এখনো বুঝিতে পারেন নাই, তাঁহারা অনুকরণ এবং অনুবাদ-পরায়ণ হইয়া "স্বর্গরাজ্য" প্রভৃতি ঈহুদীয় শব্দ সকল ব্যবহার করিয়া থাকেন, এরূপ

করিলে বঙ্গ ভাষার নিতান্তই অগৌরব করা হয়।

উন্নতিশীলতা এই আর একটি কথা বালকদিগের মন আকর্ষণ করে। বালকেরা কোথায় উন্নত ভাব শিক্ষা করিবে, তাহা না করিয়া কেবল উন্নতিশীলতাই শিক্ষা করিতেছে। উন্নতিশীলতার আভিধানিক অর্থ যাহা হউক্ না কেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহার অর্থ উদ্ধত স্বভাব। প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে, এবং কিরূপেই বা উন্নতি সাধিত হয়, ইহা যদি স্থির চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা যায়, তবে অনেক বিষয়, যাহা এক্ষণে উন্নতি এবং তৎসাধনের উপায় বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা অধোগতি এবং তৎসাধনের উপায় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যাহাতে দেশের প্রকৃত উন্নতি হয়, তাহাতে লোকের বিরাগ জন্মিয়াছে; বাঙ্গালি সমাজের এইরূপ একটি বিকারের দশা উপস্থিত হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকেরা উন্নতিও বুঝেন না, শ্রেয়ও বুঝেন না, আড়ম্বরই বুঝেন, উন্নতিসাধনের অর্থই এক্ষণে আড়ম্বরসাধন। ভাষার উন্নতি সাধন কি? না শব্দাড়ম্বর! মনুষ্যের উন্নতি সাধন কি? না বাহ্যাড়ম্বর! যাহাতে পদার্থ আছে তাহাই এক্ষণে অপদার্থ, যাহাতে চাকচিক্য আছে, যাহাতে ধ্বনি উত্থিত হয়, তাহাই এক্ষণে মস্তকের মণি!

যাঁহারদের বাস্তবিক উন্নত ভাব আছে, তাঁহারা কৃত্রিম ভাবে কোন কার্য্য করেন না, তাঁহারদের যেটি মুখ্য মনের ভাব সেইটিই তাঁহারা কার্য্যে প্রকাশ করেন। এমন একটি কোন মহদ্ভাব যাহাতে তাঁহাদের নিজের মন অভিভূত হইয়াছে, তাহাই তাঁহারা আপনার অভ্যন্তরে পরিস্ফুট করেন, তাহাই তাঁহারা অন্যের নিকটে প্রচার করেন। পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে এমন সকল মহৎব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা গৌণরূপে পূর্ব্বপুরুষদিগের মহদ্ভাব এবং মুখ্যরূপে সত্যের বা ধর্ম্মের বা ন্যায়ের বা মঙ্গলের মহদ্ভাব প্রচার করিয়া জাতি-বিশেষ বা সমাজ-বিশেষকে উন্নতি-সোপানের এক ধাপ উচ্চে উঠাইয়া দেন। আবার এমনও সকল ব্যক্তি দেখা যায়, যাঁহাদের মনে তাদৃশ মহদ্ভাব নাই, অথচ মহদ্ব্যক্তিশ্রেণীতে গণ্য হইবার জন্য নিতান্তই অভিলাষ। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এ প্রকার কৃত্রিমতা অপর ব্যক্তিদিগের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করুক্, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের চক্ষে অবশ্যই ধরা পড়ে। কিন্তু এ কৃত্রিমতা সেরূপ নহে; এ কৃত্রিমতা অপর-সাধারণের মনোহরণ করিতে পারে না, ইহা বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগেরই মনশ্চক্ষুতে ধূলিনিক্ষেপ করে। এরূপ যে করে তাহার কারণ এই;—বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া থাকেন, এবং যেখানে যাহা কিছু ঘঠনা হয় তাহা পুরাবৃত্তের সঙ্গে ঐক্য করিয়া দেখেন, এবং পুরাবৃত্ত অনুসারে সকল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন। অমুক দেশের অমুক প্রকারে উন্নতি সাধন হইয়াছিল, অতএব এ দেশেও সেই প্রকারে উন্নতি সাধন হইবে; অমুক সময়ে এই প্রকারে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, অতএব এ সময়েও সেই প্রকারে উন্নতি সাধিত হইবে, এই তাঁহারদের যুক্তি। মহদ্ভাব ব্যতিরেকেও যাঁহারা মহৎব্যক্তি হইতে চাহেন, তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, পুরাবৃত্তের অমুক মহৎ ব্যক্তি কিরূপ আচরণ করিত, কিরূপ কথা বার্ত্তা কহিত, তাঁহার আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, যেমনটি দেখেন সেই প্রণালী অনুসারে চলিতে অভ্যাস করেন। পুরাবৃত্তজ্ঞ কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মহৎ ব্যক্তি বিশেষের আদর্শের সহিত তাঁহার কার্য্যের অবিকল ঐক্য দেখিয়া, মহৎ ব্যক্তি-বিশেষের কথার সহিত তাঁহার কথার অবিকল ঐক্য দেখিয়া, মনে করেন

যে, ইনি একজন তেমনিই মহদ্ব্যক্তি। এই প্রকার কৃত্রিমতা কৃতবিদ্য ব্যক্তির চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করুক, কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকটে অতি সহজে ধরা পড়ে। যদি বল “কিসে ধরা পড়ে?” এইরূপে;—মহদ্ব্যক্তি মাত্রেই অকৃত্রিম ভাবে কার্য্য করেন; সকল ব্যক্তিই সকল বিষয়ে মহৎ নহেন; যিনি যে বিষয়ে মহৎ, তিনি সেই বিষয়ে অকৃত্রিম ভাবে চলেন। বাল্মীকি কবিতাতে মহৎ ছিলেন; নেপোলিয়ন যুদ্ধকৌশলে মহৎ ছিলেন, নিউটন বিজ্ঞানে মহৎ ছিলেন; যে-যে বিষয়ে যিনি মহৎ, সেই সেই বিষয়ে তিনি অকৃত্রিম ভাবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ অন্যের অনুকরণে প্রবৃত্ত হ’ন নাই, আপনার মনের ভাবানুসারে চলিয়াছেন। কিন্তু ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে, যাঁহারা আপনার মনের ভাবানুসারে চলেন তাঁহারাই মহদ্ব্যক্তি, বালকেরা আপনারদের মনের ভাবানুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, উন্মত্ত ব্যক্তিরাও তাহাই করিয়া থাকে। কোন একটি মহদ্ভাবে যাঁহাদের মন অভিভূত হইয়া যায়, তাঁহারা যখন আপন ভাবানুসারে কার্য্য করেন, সেই কার্য্যই তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। বাল্মীকি কবিতাতে মহৎ ছিলেন, কালিদাসও কবিতাতে মহৎ ছিলেন, বাল্মীকিও রামায়ণ লিখিয়াছেন, কালিদাসও রামের ইতিহাস লিখিয়াছেন, অথচ, কালিদাসের কবিতাকে বাল্মীকির কবিতার অনুকরণ বলা যাইতে পারে না, বাল্মীকি আপনার মনের ভাবানুসারে লিখিয়াছেন, কালিদাসও আপনার মনের ভাবানুসারে লিখিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা কৃত্রিম মহদ্ব্যক্তি, তাঁহারা অনুকরণ এবং অনুবাদ ব্যতীত এক পদও চলিতে সাহসী হন না। এই জন্য এক জন বিচক্ষণ ব্যক্তি তাঁহাদের কথা বার্ত্তা শুনিলেই তাঁহাদের মনের ভাব গতি বুঝিতে পারেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের দেশের উন্নতির প্রধানতম সোপান। ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে কোন প্রকার কৃত্রিমতা প্রবেশ না করে, এ বিষয়ে আমারদের অতীব সাবধান হওয়া উচিত। খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এক্ষণকার রাজধর্ম্ম, সাবধান, আমরা যেন তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত না হই। অনেকের বিশ্বাস আছে, খ্রীষ্ট এক জন অতীব মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি কতক অংশে মহৎ ব্যক্তি ছিলেন ইহা স্বীকার করি; কিন্তু খ্রীষ্ট যদি মূসার অনুকরণ করিতেন, তবে কি তিনি মহৎ ব্যক্তি হইতেন? নানক একজন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি যদি খ্রীষ্ট বা মহম্মদের অনুকরণ করিতেন, তবে কি তিনি মহৎ ব্যক্তি হইতেন? অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, অকৃত্রিম মহত্ত্ব ব্যতিরেকে মনুষ্যের উন্নতি সাধন হইতে পারে না। আপনি না অকৃত্রিম হইলে অন্যকে যথার্থ পথ প্রদর্শন করা যায় না, যে ব্যক্তি লাভালাভ গণনা করিয়া, পুরাবৃত্ত পাঠ করিয়া, চারি দিক্ দেখিয়া শুনিয়া ভাবোন্মত্ত হন, তাঁহার সে উন্মত্ততা নাটকাভিনয় মাত্র—তাহা বাহ্য। অকৃত্রিম আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যতিরেকে কিছুতেই আমারদের দেশের উন্নতি হইবে না, ইহা আমারদের বিশ্বাস। এজন্য উন্নতির কথা উত্থাপন হইলেই আধ্যাত্মিক উন্নতি কিসে হয়, ইহাই অগ্রে আমারদিগের জিজ্ঞাস্য।

এই জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উচিত মীমাংসা করিতে হইলে, মুখ্যগৌণ বিবেচনা নিতান্তই আবশ্যক। মনুষ্যের উন্নতি দুইটির উপরে নির্ভর করে; সে-দুটিই কি? না দেব-প্রসাদ এবং আত্ম-প্রভাব।

কিন্তু বাস্তবিক যাঁহারা জগতের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাঁহারদের কথার ভাবে ইহাই প্রতীতি হয়, দেব-প্রসাদই মুখ্য, আত্ম-প্রভাব গৌণ। নিউটনের প্রসিদ্ধ খেদোক্তি (“আমি কেবল সমুদ্রের ধারে কতক গুলি লোষ্ট কুড়াইতেছি”) কাহারো অবি-

দিত নাই। "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং" এরূপ আত্মলাঘব এবং দেব-মহিমা কীর্ত্তন আমারদের শাস্ত্রে ভূরি ভূরি আছে। এমন কি খ্রীষ্টও বলিয়াছেন যে "আমাকে ভাল বলিও না, ভাল কেবল পরমেশ্বর।" যাঁহারা কোন একটা মহদ্ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই ভাবেরই প্রাধান্য মুখ্যরূপে অনুভব করিয়া থাকেন, আপনার প্রাধান্য গৌণ রূপেই অনুভব করিয়া থাকেন; অর্থাৎ যেমন কোন রাজার অনুচর রাজারই গৌরবে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে, সেইরূপ অপৌরুষের ভাব বিশেষের গৌরবেই মহদ্ব্যক্তি বিশেষ আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, মুখ্যরূপ আপনার গৌরব কিছুই দেখিতে পান না। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আধুনিক বঙ্গীয় যুবকেরা ব্যক্তি-মাহাত্ম্য যেমন বুঝেন, ভাব-মাহাত্ম্য তেমন বুঝেন না। ইহাতে সমাজের কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

রঙ্গভূমি।

নট মানব-প্রকৃতির আদর্শ; উহাদিগের কাপট্য বা আত্ম-গোপন সম্পূর্ণ নির্দোষ, জীবন এক প্রকার স্বাধীন স্বপ্ন, অথবা উহাকে অভ্যস্ত বাতুলতা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। উহাদিগের আশা অস্বতন্ত্র; সে একবার রাজাধিরাজ, পরক্ষণেই আবার চীরধারী দরিদ্র, একবার আনন্দের উৎসঙ্গে ক্রীড়া করিয়া সকলকে হাসাইয়া গেল, আবার দুঃখের ক্রীড়নক হইয়া সকলকে কাঁদাইতে লাগিল। ফলতঃ উহারা যা কিছু ভাবে, এবং যা কিছু করে, সমস্তই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ও শিক্ষার আয়ত্ত। আমরা নিজের অবস্থার প্রতিবিম্ব উহাদিগের মধ্যে দেখি; বর্ত্তমানে আমরা যাহাতে আছি, ভবিষ্যতে যাহাতে থাকিতে ইচ্ছা করি, এবং যাহা আমাদিগের স্পৃহনীয় নয়, আমরা এই সমস্তই তাহাদিগের মধ্যে দেখি।

রঙ্গভূমি জনসমাজের একটী সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ; ঘনিষ্ট সাদৃশ্য এই যে, উহা আমাদের অনুকরণ করে, এবং আমরাও উহার অনুকরণ করি। রঙ্গভূমির নিকট আমরা কত আদর্শ-চরিত্র সাধুর জন্য ঋণী। রাম একটী ধীর ও উদার নায়ক; তাঁহার পিতৃমাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবাৎসল্য, স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম প্রণয়, গুরু জনে গৌরব, মিত্রস্নেহ, দীনে দয়া, সত্যনিষ্ঠা, বীরত্ব, অধ্যবসায় ও সরলতা প্রভৃতি বিস্তর সদ্‌গুণ আছে। এইরূপ নায়কের অভিনয়-ক্রিয়া অকৃতাত্মাকেও জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারে। জানকী পতিপ্রাণা; তিনি সজল-নয়নে অশোক বনে বশিয়া আছেন; তাঁহার বস্ত্র মলিন ও মুখ অত্যন্ত দীন, কিন্তু হৃদয় ভর্ত্তৃপ্রভাব স্মরণে অতিশয় ওজস্বী। তাঁহার সম্মুখে রাক্ষসরাজ রাবণ, সে মণিরত্নের প্রলোভন দেখাইতেছে, পৃথিবী সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হইবার অনুরোধ করিতেছে, কিন্তু জানকী পাতিব্রত্য ধর্ম্মে রক্ষিত, তিনি রাবণকে তৃণতুল্য তুচ্ছ বোধ করিয়া অবনত মুখে অগ্নিময় বাক্যে কহিতেছেন, পামর! আমি তোর রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই চাহি না, আমার স্বামী রাম আমার প্রাণারাম, আমি তাঁহার সহিত বনবাসের কষ্ট সহিব এবং বনের সামান্য ফলমূলে তৃপ্তি লাভ করিব। রঙ্গস্থলে জানকীর ন্যায় পতিব্রতার সুদীর্ঘ দুঃখ-নিশ্বাসে কাহার কোমল হৃদয় না স্ফীত হয়? পবিত্রতা ও ধর্ম্মের দিকে কাহার মন না আকৃষ্ট হয়?

কখন্ কাঁদিতে হইবে, কখন্ হাসিতে হইবে, কখন্ প্রীতি করিতে হইবে এবং কখনই বা ঘৃণা করিতে হইবে, রঙ্গভূমি এই সমস্ত আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। ইহা যে কেবল

আমাদের আচার ব্যবহার সংস্কৃত করে তাহা নহে, প্রত্যুত আমরা ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মনীতি শিক্ষা পাই; ইহা মানবজীবনের একটী প্রকৃত ও বিশদ চিত্র। যে মন পাষাণবৎ কঠিন, তাহার দুর্ভেদ্য উপাদান কোমল করিয়া, তাহাতে আমোদ ও উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা কেমন নীতির বীজ বপন করিয়া দেয়! ইহা দুষ্প্রবৃত্তি সকল নিয়মিত করে, স্বার্থপরতাকে ঘৃণার অধীন করিয়া রাখে, এবং সুশীলকে প্রশংসা করিতে অবসর দেয়। ইহা অতীত কালকে জীবন্ত ভাবে স্মৃতিপথে আনিবার একটী উৎকৃষ্ট উপায়। ইহা পূর্ব্বতন ধর্ম্মানুরাগ, ধর্ম্মকার্য্য, ঋজুতা, নিস্পৃহতা, দাম্পত্য প্রণয়, আতিথেয়তা, আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ, কৃষি ও বাণিজ্য এই সমস্ত স্মৃতিপথে আনিয়া দেয়। যখন ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিরা সরস্বতীতীরে সমস্বরে সামগান করিতেন, যখন বীতরাগ ব্রাহ্মণেরা তরুতলে বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক শীতোত্তাপ সহ্য করিয়া অহোরাত্র মুকুলিতনেত্রে ব্রহ্ম ধ্যান করিতেন; যখন বার্দ্ধক্যের বিকাশই গৃহবাস পরিত্যাগের কারণ ছিল; যখন লোকে সত্য রক্ষার্থ স্বদেহ ও স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া অন্যের দাসত্বে নিযুক্ত হইত; যখন পিতৃমর্য্যাদা পালনার্থে মনুষ্যও পশুবৎ স্বশোণিতে দেবতার তৃপ্তি সাধন করিত; যখন লোকে সরলতাকেই জীবন ও কপটতা মহাপাপ বলিয়া জানিত; ইহা সেই কালকে স্মৃতিপথে আনিয়া দেয়।

পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিরা যাহাতে আত্মোন্নতি হয় এইরূপ বিষয়েই ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহারা কাব্য শাস্ত্রকে দৃশ্য ও শ্রব্য এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। দৃশ্য কাব্য রঙ্গভুমিতে অভিনীত হইত। এক সময়ে নাট্যাচার্য্য মহর্ষি ভরত রঙ্গভূমির যথেষ্ট উন্নতি করিয়া ছিলেন। পূর্ব্ব কালে প্রধান প্রধান রাজসভায় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে উৎকৃষ্টের নাটকের অভিনয় হইত। কবিগণ উৎসাহিত হইয়া নানারসোদ্দীপক নাটকাদি প্রণয়ন করিতেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থে তাৎকালিক জনসমাজের নানা রূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়; সংস্কৃত ভাষার উন্নতি এবং কবিত্বের যথেষ্টই শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। ফলত রঙ্গভূমির আমোদ এতদ্দেশে নূতন প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে ইহা যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই দুঃখিত হইবেন।

এক্ষণে অধিকাংশ বিদ্যালয়ের ছাত্রই নট। যাহাদিগের বুদ্ধি বিকাসোন্মুখী হইয়া জ্ঞানের উচ্চ অংশ গ্রহণ করিবে, যাহাদিগের সুকোমল মুখশ্রী আত্মীয় স্বজনের মনে ভাবী শুভাশার সঞ্চার করিতেছে, যাহাদিগের বিচারশক্তি সম্পূর্ণ অস্বতন্ত্র, তাহারা বিদ্যানুশীলন তুচ্ছ করিয়া নাটক কণ্ঠস্থ করিতেছে। সাভিনিবেশ অভ্যাস কোমলপ্রকৃতি বালকদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তের মূল; বিশেষতঃ এখনকার অধিকাংশ নাটকই কুরুচিকৃত, সেই সমস্ত নাটক পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিয়া বালকদিগের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হইতেছে। বলিতে কি, যে সমস্ত মনে প্রাচীন কবিদিগের রসপ্রসবিনী রচনা এবং ভাবোদ্দীপক জীবন্ত বাক্য সকল প্রবেশ করিয়া কখন মানবপ্রকৃতিকে সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবে, কখন বিশুদ্ধ প্রেমের আদর্শ দেখাইবে, কখন পৌরুষের বীজভুত বীরভাব উদ্দীপন করিবে, কখন সংসারভারহর শান্তি, কখন প্রীতিকর ভক্তি রোপণ করিবে, এবং কখন বা বিষয়ের নশ্বর ভাব বুঝাইয়া বৈরাগ্য বর্দ্ধিত করিয়া দিবে, সেই সমস্ত মনই বর্ত্তমান অধিকাংশ নাটকের দোষে কলুষিত হইতেছে, ধর্ম্মনীতির দুরতিক্রমনীয় শাসন হইতে স্খলিত হইতেছে এবং চিরাভ্যস্ত লজ্জায় জলাঞ্জলি দিতেছে।

নাট্যশালায় অসম্মানিত স্ত্রীলোকের অধিকার ; ইহা একটী বহুল অনর্থের মূল হইয়া উঠিয়াছে। যে দূষিত বায়ু দূর হইতে পরিহার্য্য তাহাই অতি যত্নে ব্যবহার্য্য হইতেছে। মানিলাম, সুশীলতার দৃষ্টান্তে দুঃশীলতা যাইতে পারে এবং পুণ্যের দৃষ্টান্তে পাপ পলায়ন করিতে পারে, কিন্তু যিনি দয়ার্দ্র হইয়া ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের উপকারের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তিনি অন্য কোনরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া উহাদের উদ্ধার সাধন করিতে পারেন, কিন্তু যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ মাত্রে বিশ্ব দগ্ধ করিবার শক্তি ধারণ করে, বিশ্বাস করিয়া তাহা বস্ত্রাঞ্চলে বন্ধন করা উচিত নহে।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্ত্রীলোকদিগকে যাত্রা উৎসবাদি দর্শন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ফলতঃ যে বিষয়ে কেবল আমোদই লক্ষ্য, কি ধর্ম্ম কি নীতি কি জনসমাজ কোন বিষয়েরই শ্রীবৃদ্ধি নাই, তাহাতে যোগ দিলে তরলমতি স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ অনিষ্ট সম্ভাবনা। কিন্তু এক্ষণে অনেক স্ত্রীস্বাধীনতাপ্রিয় যুবক রঙ্গভূমিতে আপনাদিগের স্ত্রী পাঠাইয়া দেন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতই আমোদে অনুরাগী, কিন্তু এই আমোদের যত বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হয় ততই মঙ্গল। বিশেষতঃ যে স্থানে নির্ব্বিশেষে লোকের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই জনসম্মর্দে প্রবেশ করিলে নানারূপ কুদৃষ্টান্ত কোমল মনে সহজেই অঙ্কিত হইতে পারে।

বঙ্গকামিনীগণ! তোমরা কোন্ প্রত্যাশায় রঙ্গস্থলে যাও? যদি প্রাচীন ভারতের কোন উৎকৃষ্ট ছবি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাহা সেখানে নাই, যদি নাট্যোক্ত পাত্রের একবিধ ভাব দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাহা সেখানে নাই, যদি বৈচিত্রে ভাষার পুষ্টি দেখিবার ইচ্ছা থাকে তাহাও সেখানে নাই, যদি এ সমস্ত দেখিবার মানস হয় তবে তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষয় ভাণ্ডার খুলিয়া দেখ, অনন্ত রত্নজ্যোতি তোমাদিগকে চমকিত করিবে।

FEMALE SECLUSION.

If the purity of domestic manners be, as it undoubtedly is, the great source of both public grandeur and private happiness, a powerful antidote to the numerous evils by which they are oppressed has, in every age, been found from this cause in the East. Notwithstanding the immense advantages which Europe has long enjoyed from the energy of its character, the freedom of its institutions, and the superiority of its knowledge, it may be doubted whether the sacred fountain of domestic life has been preserved so pure among the poor and needy of its crowded kingdoms, as in the seclusion of the East. The unrestrained social intercourse of the sexes, the incessant activity which prevails, the close proximity in which the poor men and women in great cities are accumulated together, and the general license of manners, which has flowed from the liberty that prevails and the passion for ardent spirits which is so common among the working classes, have produced a far greater degree of general vice and misery in Europe, than has ever obtained, at least among the middle and lower ranks, in the East.

The enormous mass of female profligacy, which overspreads all our towns, is there almost unknown. From the seclusion of the harem have in the middle classes, flowed purer manners and a more elevated character than has resulted from the constant intermixture of the sexes, and the vehement passions to which it gives rise. It is this simplicity and honesty of disposition joined to the unaffected devotion and martial qualities by which they are distinguished, which has blinded so many European travellers of the highest talents and discernment to the devastating effects of Asiatic government, and the ruinous consequences, which have *flowed, particularly during the decline* of the Persian and Turkish empires, from the weakened authority of the throne, the deplorable contests between the princes of the same family, and the general oppression which the pashas

have exercised in the independent sovereignties which they have erected in many of the provinces of these vast empires.

ALISON.

Oh ! what a pure and sacred thing,
Is beauty curtained from the sight
Of the gross world, illumining
One only mansion with her light !
Unseen by man's disturbing eye,
The flower that blooms beneath the sea
Too deep for sunbeams, doth not lie
Hid in more chaste obscurity.

MOORE.

বিজ্ঞাপন

ষট্‌চত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ সোমবার ষট্‌চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১ মাঘ শুক্রবার
শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২ মাঘ শনিবার
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র
৩ মাঘ রবিবার
শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
৪ মাঘ সোমবার
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৫ মাঘ মঙ্গলবার
শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি
৬ মাঘ বুধবার
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন
৭ মাঘ বৃহস্পতিবার
পাতুরেঘাটা নিবাসী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮ মাঘ শুক্রবার
শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
৯ মাঘ শনিবার
শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু
১০ মাঘ রবিবার
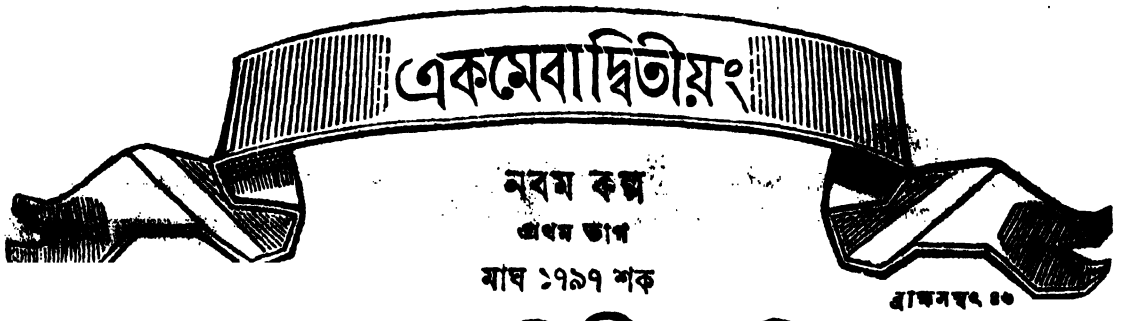
সম্বৎ ১৯৩২। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬। ১ পৌষ বুধবার।

Registered No 52.

নবম কল্প
প্রথম ভাগ
মাঘ ১৭৯৭ শক
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৬

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

ষট্‌চত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ সোমবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১৩ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৭৯৭ শক।

সমুদয় পৃথিবীর মধ্যে সমুদয় সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? জড় হইতে প্রাণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ; জ্ঞান সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। সৃষ্টির মধ্য হইতে জ্ঞানকে যদি পৃথক্ করা যায়, তবে সৃষ্টির প্রাণ সংহার করা হয়। মনুষ্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর, মনুষ্য জ্ঞান-রূপী আত্মা। জ্ঞান সকল-হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া, জ্ঞানের প্রতিই মনুষ্যো[illegible]াপেক্ষা অধিক প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়। কি গুণ থাকাতে জ্ঞান সকল হইতে শ্রেষ্ঠ হইল? জ্ঞানের প্রথম গুণ এই যে, সত্য কেবল জ্ঞানেতেই প্রকাশ পায়, আর কিছুতেই প্রকাশ পায় না। যে-সকল সত্য সৃষ্টির মধ্যে বর্ত্তমান, তাহা জ্ঞানের আদর্শে বিরচিত, যে সত্য সৃষ্টির অতীত তাহা স্বয়ং জ্ঞান স্বরূপ। জ্ঞানের দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাহার প্রতি প্রেম সমর্পন করিলে তাহার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়। চন্দ্র সূর্য্য পুষ্পলতা আমারদের প্রেম আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু তাহারা প্রেমের প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ। মনুষ্যে মনুষ্যেই প্রেমের উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে পারে। জ্ঞানে জ্ঞানেই প্রেমের উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে পারে। জ্ঞানের তৃতীয় গুণ, কার্য্যের অধ্যক্ষতা; অজ্ঞানদ্বারা কার্য্য হইতে পারে, কিন্তু কার্য্যের অধ্যক্ষতা জ্ঞান-সাপেক্ষ। জ্ঞানের অসংখ্য

গুণ—কে বা তাহার বর্ণনা করিতে পারে—কে বা তাহার গণনা করিতে পারে—জ্ঞানাৎ পরতরং নাস্তি। যে তিনটি গুণ সংক্ষেপে বলা হইল, তাহা এই যে, জ্ঞান সত্যের আদর্শ এবং দর্পণ, প্রেমের আকর, মঙ্গলের অধ্যক্ষ। পরমাত্মার মহান্ জ্ঞানের সহিত জীবাত্মার পরিমিত জ্ঞানের যখন সংযোগ হয়, তখন জীবাত্মা প্রেমের উত্তরে প্রেম, ভক্তির উত্তরে স্নেহ, বিশ্বাসের উত্তরে আশ্বাস, প্রার্থনার উত্তরে ফল-লাভ, পূজার উত্তরে প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়। সমুদয় জড় জগতের সমষ্টি যেমন প্রকৃতি শব্দে উক্ত হয়, সেইরূপ সৃষ্টির অন্তর্ভূত সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টি আমারদের শাস্ত্রে মহান্ বলিয়া উক্ত হয়; আবার সমুদয় জগতের সমষ্টির মধ্যে যে এক মূল শক্তি নিহিত আছে তাহাও যেমন প্রকৃতি শব্দে উক্ত হয়, সেইরূপ সৃষ্টির অন্তর্ভূত জ্ঞান-সমষ্টির মধ্যে যে এক অদ্বিতীয় মূল জ্ঞান বর্ত্তমান আছেন তিনিও মহান্ শব্দে উক্ত হন, কিন্তু তিনি প্রকৃতির অধীনে নহেন, প্রকৃতিই তাঁহার অধীন, এজন্য তিনি "মহান্ পুরুষ" বলিয়া উক্ত হন। অজ্ঞান প্রকৃতিকে যদিও "জগতের মূল" উপাধি দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু জগতের অধ্যক্ষ উপাধি দেওয়া যাইতে পারে না, কেন না জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুতেই অধ্যক্ষতা সম্ভবে না। অতএব সমুদয় জগতের যে মূল প্রকৃতি এবং সমুদয় জ্ঞানের যিনি মূল জ্ঞান, যিনি একমেবাদ্বিতীয়ং, যিনি মহান্ পুরুষ, উভয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ যে, একমেবাদ্বিতীয়ং জ্ঞানস্বরূপ মহান্ পুরুষই প্রকৃতির অধ্যক্ষ। একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ। এক যে পরমেশ্বর তিনি সর্ব্বভূতেতে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সকল ভূতের অন্তরাত্মা, তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ, ও সকল ভূতের আশ্রয়, তিনি সাক্ষী চৈতন্য স্বরূপ, তিনি সঙ্গরহিত এবং সৃষ্ট পদার্থের যে সকল গুণ তাহার কিছুই তাঁহাতে নাই। জীবাত্মা সৃষ্ট জ্ঞান, জীবাত্মা প্রকৃতির অভ্যন্তরস্থিত জ্ঞান। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা যেমন অগ্নি উত্থিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মার জ্ঞান এবং তাহার অনন্ত উন্নতি চেষ্টা-সাপেক্ষ। জগতের মধ্যে জ্ঞানের উদ্দীপন হয়, ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়, এজন্য সমুদয় প্রকৃতির তাহাই চেষ্টা। যাহা সমুদয় প্রকৃতির চেষ্টা তাহাই আমারদের নিজের নিজের চেষ্টা হওয়া উচিত, কেন না তদ্ভিন্ন আর সকল চেষ্টাই কোন না কোন কালে ব্যর্থ হইবে। আমারদের জ্ঞান উদ্দীপন ইহারি জন্য যে, মূলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি যাইবে, পরমাত্মার প্রতি প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রবাহিত হইবে, এবং পরমাত্মার অপার আনন্দে মিলিত হইয়া আমরা অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিব। জ্ঞান আপনি যে কি সামগ্রী তাহা যতক্ষণ না বুঝিতে পারে ততক্ষণ সে বাহিরে বাহিরে সুখাশ্বাসে বিচরণ করে, কিন্তু যখন আপনার মূল্য বুঝিতে পারে তখন সে আপনার মধ্যে সকলের আদি মধ্য এবং অন্ত, অনাদি এবং অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাকে অবলোকন করিয়া, কামনার সমুদয় বিষয় প্রাপ্ত হয়। আমারদের প্রতি-জনের যে জ্ঞান, দর্শন-শাস্ত্রে তাহা ব্যষ্টিজ্ঞান শব্দে উক্ত হয়, এবং সৃষ্টির মধ্যস্থিত সমুদায় জ্ঞানের যে সমষ্টি তাহা সমষ্টি জ্ঞান শব্দে উক্ত হয়। ব্যষ্টি জ্ঞান যেমন প্রতি জনের সার সম্পত্তি, সমষ্টি জ্ঞান সেইরূপ জগতের সার সম্পত্তি; ব্যষ্টি জ্ঞান শরীরকে ছাড়িয়া গেলে শরীরের মূল্য একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যায়, কেহই আর তাহাকে আদর করে না; শরীরের যত আদর সকলই জ্ঞানের উদ্দেশে, অর্থাৎ জ্ঞান

পদার্থকে উদ্দেশ করিয়াই আমরা শরীরের শোভা, শরীরের কৌশল, শরীরের যাহা কিছু সদ্গুণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকি, এবং জ্ঞান পদার্থ নিরুদ্দেশ হইলেই শরীরের মধ্যে যাহা অপবিত্র যাহা অস্পৃশ্য যাহা ঘৃণিত তাহাই অবশিষ্ট থাকে। ইহারি মত জগৎ হইতে যদি সমষ্টি জ্ঞান তিরোহিত হয়, তবে জগৎ মৃত শরীরের ন্যায় শ্রীহীন ভাব ধারণ করে, জগতের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়। নব-প্রসূত শিশুর মনে কত দিনে জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়, ইহা দেখিবার জন্য পিতা মাতা যেমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সমস্ত প্রকৃতির মধ্য হইতে সমষ্টি জ্ঞান অঙ্কুরিত দেখিবার জন্য পরমাত্মা সাক্ষীস্বরূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন। পুত্রের জ্ঞান অঙ্কুরিত হইলে যেমন পিতা মাতা তাহার মুখ হইতে স্নেহের প্রত্যুত্তর শুনিতে পান, সেইরূপ জগতের সমষ্টি জ্ঞান হইতে পরমাত্মার প্রেম এবং আনন্দের প্রতিধ্বনি তাঁহার অভিমুখে উত্থিত হইতেছে। সেই সমষ্টি জ্ঞানের সহিত যোগ দিয়া, দেব মনুষ্য সকলের সহিত যোগ দিয়া সমস্বরে আমরাও পরমাত্মার গুণ কীর্ত্তন করি। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, সেই আনন্দ স্বরূপ হইতেই এই সকল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, উৎপন্ন হইয়া সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত রহিয়াছে, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, প্রলয়কালে সেই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে—তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, সে আনন্দস্বরূপ কে তাহা জানিতে চাহ? তদ্ব্রহ্ম, তিনি ব্রহ্ম। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, তিনি সেই অনন্ত পরব্রহ্ম, মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আইসে। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন, পরব্রহ্মের আনন্দ জানিলে কোথাও আর ভয় থাকে না। ন বিভেতি কদাচন, কখনই আর ভয় থাকে না।

মুখ্য এবং গৌণ।

ভাব-মাহাত্ম্যের প্রতি উপেক্ষা এবং ব্যক্তি-মাহাত্ম্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে আমারদের দেশে কিরূপ অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা একবার দেখা যাউক। মহত্ত্ব, উপার্জ্জন করিতে হইবে, শিক্ষা করিতে হইবে—মহদ্ভাবে কার্য্য করিতে হইবে—ইহা এক্ষণে আর নাই, এক্ষণে কেবল মহদ্ব্যক্তি হইতে পারিলেই হইল। এক্ষণে মহদ্ভাবের কার্য্য নাই—মহদ্ভাবের শিক্ষা নাই—অথচ মহদ্ব্যক্তি না হইলেই নয়! এমন কি, অতীব নীচ আদর্শ অনুসারে কার্য্য করিব, নীচ পথ অবলম্বন করিবার উপদেশ দিব, যাহাতে পুরুষানুক্রমে নীচত্ব প্রচলিত হয়, তাহার চেষ্টায় দিবারাত্র নিযুক্ত থাকিব—অথচ মহদ্ব্যক্তি হইব—এইরূপ যাহা কোন প্রকারেই হইবার নহে—যাহা দেবতারদেরও অসাধ্য—সেই মৃগতৃষ্ণিকার প্রত্যাশায় সকল প্রকার বাস্তবিক মহত্ত্ব জলাঞ্জলি দিলে তবেই "আমি একজন মহদ্ব্যক্তি" এই উপাধিটি ললাট-দেশে পরিস্ফুট হইয়া উঠে! এক্ষণে যেমন উকিল চিকিৎসক এবং সংবাদ পত্র দিন দিন সুলভ হইতেছে, সেইরূপ মহদ্ব্যক্তিও সুলভ হইতেছে! কিন্তু উকিলের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ বিবাদ কলহের বৃদ্ধি হইতেছে, চিকিৎসকের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাধির বৃদ্ধি হইতেছে, সংবাদ পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাক্যাড়ম্বর বৃদ্ধি হইতেছে, মহদ্ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীচ আচার ব্যবহার বৃদ্ধি হইতেছে; এরূপ বৃদ্ধি পরম্পরাকে শ্রীবৃদ্ধি উপাধি না দিলে আজিকার কালের রীতি-বহির্ভূত আচরণ করা হয়! অদ্যকার কালে উপাধিই সর্ব্বস্ব

—আর সকলই অলীক! সুতরাং উপাধি প্রদানে কার্পণ্য করিলে আধুনিক "সুসভ্য আচার ব্যবহার" লঙ্ঘন করা হয়। কেবল যে-কার্য্য আড়ম্বর-শূন্য, তাহাই "ঊনবিংশতি শতাব্দীয়" উপাধি লাভে বঞ্চিত হয়, এবং যে ব্যক্তি সে কার্য্যের কর্ত্তা তিনিই "উন্নতি-শীল" উপাধি লাভে বঞ্চিত হন। বালক-দিগকে রাজা উপাধি দিয়া নৃত্য করাইলে, তাহারা যেমন ক্রন্দনে ক্ষান্ত হয়, ও বাস্তবিক আপনাদিগকে রাজা মনে করে, সেইরূপ আধুনিক মহদ্ব্যক্তিগণ কেবল উপাধিটি পাই-লেই আর কিছুই প্রার্থনা করেন না। এক্ষণে আবার উপাধি লাভের এমনি সুবিধা হইয়াছে যে, যত তুমি দেশীয় রুচির বিরুদ্ধাচরণ করিবে, যত তুমি দেশের বাস্তবিক উন্নতির প্রতি খড়্গ-হস্ত হইবে, ততই তোমার মস্তকে উচ্চ প্রদেশ হইতে উপাধি-পুষ্প বর্ষিত হইবে। সে দিনকার সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজি নাটকের একটি কিম্ভূত কিমা-কার অনুবাদ আমারদের দেশীয় সাধু রুচিকে একেবারে নিঃশেষে দলিত করিয়া পরাকাষ্ঠা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কোথা হইতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে? যেখানে বাঙ্গালা ভাষার ক অক্ষরও বিদিত নাই সেই প্রদেশ হইতে! দেশীয় রুচি-বহির্ভূত ভাষা ব্যবহার করিলে যেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, সেইরূপ আবার দেশীয় রীতি-বহির্ভূত আচরণ করিলে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। আমারদের দেশীয় রীতি এই যে, যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহারা আড়ম্বর-শূন্য, বিচক্ষণ, অচঞ্চল-স্বভাব, জ্ঞান-পরায়ণ, নম্র, ভক্তিমান্, ঋজু, সত্য-পরায়ণ, অকৃত্রিম হইবেন। কিন্তু এক্ষণে এ সকল সদ্গুণ অতীব নিন্দনীয় হইয়াছে।—আড়ম্বর শূন্য? তবে ত নিষ্কর্ম্মা! বিচক্ষণ? তবে ত কুটিল-বুদ্ধি! অচঞ্চল-স্বভাব? তবে ত স্থাবর! জ্ঞান-পরায়ণ? তবে ত শুষ্ক তার্কিক! নম্র?—তবে ত কাপুরুষ! ভক্তিমান্? তবে ত ভ্রান্ত! ঋজু? তবে ত কাজের বাহির! সত্য-পরায়ণ? সন্দেহ-স্থল! সত্য যে একটা আছে এ বিষয়ে এক্ষণকার লোকের মনে বাস্তবিক সন্দেহ জন্মিয়াছে। মুখে সত্যের জয়-ঘোষণা করিতে হইবে, কিন্তু মিথ্যা দ্বারা কার্য্য আদায় করিতে হইবে, ইহাই এক্ষণকার আন্তরিক কথা। সত্যের যে বাস্তবিক বল আছে ইহা মুখে বলেন সকলেই, বিশ্বাস করেন অতি অল্প লোক। এক্ষণে আড়ম্বর-কারিতা হিতাহিত-বিবেচনা-শূন্যতা, প্রতি-ধ্বনি-পটুতা, পাকচক্রিতা, জ্ঞানদ্বেষিতা, উদ্ধত-স্বভাব, উপাধি-লুব্ধতা, এই সকল গুণের আধার না হইলে, লোকে মহৎ নামের যোগ্য হইতে পারে না; এইজন্য ঐ সকল গুণ ক্রমশই সাধারণের আদর-ভাজন হইতেছে। এই যে-সকল দেশের অনিষ্ট, ইহার মূল কেবল ব্যক্তি-গৌরব এবং ভাব-লাঘব। যাঁহা-দের লঘু ভাব, তাঁহারা গুরু ব্যক্তি হইতে চান; এবং এক্ষণকার সমাজের যেরূপ দুর্দশা, তাঁহারা মনে করিলেই গুরু ব্যক্তি হইতে পারেন। ইংরাজদিগের নিকটে কোন প্রকারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিলেই কল্য যে ব্যক্তি কিছুই ছিল না, অদ্য সে ব্যক্তি একজন মহা প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে। এই সকল প্রতাপান্বিত ব্যক্তির কার্য্য এই যে, আমারদের সমাজের ভাবগতি বিষয়ে যাঁহারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকটে কিসে একজন মহামহোপাধ্যায় সংস্কারক বলিয়া বিখ্যাত হইবেন ইহারি কেবল চেষ্টা; তাহাতে যে বাস্তবিক সমাজের কি অনিষ্ট হইতেছে, এবং তাহার ফল যে তাঁহা-দিগকেই অধিক পরিমাণে ভুগিতে হইবে, ইহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। উচ্চ প্রদেশ হইতে বৃহৎ একটি ফল-লাভের প্রত্যাশায়

প্রথমে তাঁহারা সমাজের প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হন, অথচ এইরূপ ভান করেন যেন তাঁহারা নিতান্তই ফল-কামনা শূন্য—সত্যই যেন তাঁহারদের সর্ব্বস্ব ধন! ইহাঁরা যে শাখায় বসিয়া আছেন সেই শাখা কাটিতেছেন, ইহাঁদের ভরসা কেবল একমাত্র এই যে, অধিষ্ঠান-শাখা যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িবে অমনি উচ্চ প্রদেশীয় একটি শাখা ঝটিতি ধরিবেন। ইহাঁরদের জানা উচিত যে, আপনার বাস-গৃহ ভাঙ্গিয়া অন্যের বাস-গৃহে যে ব্যক্তি স্থান যাচ্ঞা করে এবং স্বদেশীয় সমাজ ভাঙ্গিয়া যে ব্যক্তি বিদেশীয় সমাজের আশ্রয় যাচ্ঞা করে উভয়েই তুল্য নির্ব্বোধ। অন্যেরা তোমাকে তাহারদের গৃহে স্থান দিবে কেন? এবং তুমিই বা এমন অন্যায় প্রার্থনা করিবে কেন? ইহা না বুঝিয়া, এক্ষণকার নব্য অনুকারক-সম্প্রদায় নিজের অনেকগুলি দোষ রাজ-পুরুষদিগের স্কন্ধে আরোপ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের যুক্তি এইরূপ—"আমরা তোমারদেরি অনুকরণ করিতেছি, তোমারদেরই পরিচ্ছদ পরিতেছি, তোমারদেরই ভাষা ব্যবহার করিতেছি, যেরূপ বলাও সেইরূপ বলি, যেরূপ চলাও সেইরূপ চলি, অথচ তোমরা আমারদিগকে আদর কর না, ইহাতে বোধ হয় যে, তোমরা আমারদের দেশীয় লোকের ভাল দেখিতে পার না।" এক ত—অনুকারক ব্যক্তিগণকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করিতে হইবে—ইহা কোন শাস্ত্রেই লেখে না, তাহাতে আবার যাচিয়া মান ভিক্ষা করা, এবং কাঁদিয়া প্রেম ভিক্ষা করা! আপনারদের এইপ্রকার নীচ আচরণে আপনারদের কোথায় লজ্জিত হওয়া উচিত—না তজ্জন্য অন্যের উপরে দোষারোপ! জানা উচিত যে, যেমন চাটুকারী ব্যক্তিকে আদর না করাই জ্ঞানবানের কার্য্য এবং তাহাকে আদর করাই মূঢ় ব্যক্তির কার্য্য, সেইরূপ অনুকারী ব্যক্তিদিগকে প্রশ্রয় দেওয়াই অনুচিত, না দেওয়াই উচিত। "সুসভ্য আচার ব্যবহার" এই একটি কথা অনুকারক সম্প্রদায়ের স্পর্শমণি স্বরূপ। শত শত কুৎসিত আচরণ কর—দেশের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ কর—স্ত্রীগণকে নিলর্জ্জতা শিক্ষা দেও, বালকদিগকে নাস্তিকতা শিক্ষা দেও, পূর্ব্ব পুরুষদিগের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ দূরে প্রক্ষেপ করিয়া—নানা প্রকার কিম্ভূত কিমাকার উপাধির ভারে নত-মস্তক হইয়া—ভূতল লেহন কর, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু "সুসভ্য আচার ব্যবহার" এই বীজমন্ত্রটিকে উচ্চারণ করিতে ছাড়িও না! ঐ শব্দটি ধ্বনিত হইলেই অতি যে হেয় সামগ্রী তাহা উপদেয় হইবে—অতি যে নিন্দনীয় বিষয় তাহা প্রশংসনীয় হইবে—অতি যে মর্ম্মভেদী নিদারুণ নিষ্ঠুর আচার তাহা ধর্ম্মের অনুমোদিত হইবে—অতি যে দুর্ব্বিনীত ব্যবহার তাহা যৎপরোনাস্তি ভদ্র হইবে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

আখ্যায়িকা।

জগৎপুর নামক নগরে নর নামে এক ব্যক্তি থাকিত। নরবর নামক তাঁহার এক পুত্র ছিল। জগৎপুরের সকল ব্যাপারই বিস্ময়কর ছিল। জগৎপুরস্থ সকল ব্যক্তিরই একটি মাত্র পিতা ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি সন্তানোৎপাদন না করিয়া, জগৎপুরস্থ পিতা পুত্র পৌত্র সকল ব্যক্তিরই পিতা ছিলেন। তিনি জগৎপুরস্থ সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তা ছিলেন। তিনি অদৃশ্য ভাবে থাকিয়া জগৎপুরের কার্য্য চালাইতেন, কিন্তু কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। তাঁহার সকল সন্তানেরা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়াও তাঁহার কথা শুনিতে পাইত ও তাঁহার আজ্ঞা বুঝিতে পারিত। জগৎপুরস্থ কোন ব্যক্তির

ঔরসজাত পুত্র ছিল না। ঐ আশ্চর্য্য নগরের ব্যক্তিরা আশ্চর্য্য রূপে সন্তান লাভ করিত। কোথায় কিছু নাই; জগৎপুরস্থ ব্যক্তি হঠাৎ একদিন আপনার আলয়ে একটি শিশু সমাগত দেখিতেন। এই প্রকার শিশুগুলি জগৎপুরের অদৃশ্য কর্ত্তার দ্বারা গুপ্তভাবে তথায় প্রেরিত হইত। জগৎ পুরস্থ ব্যক্তি এইরূপ শিশুকে পাইয়া পরমানন্দ চিত্তে তাহাকে সন্তানস্বরূপ লালন পালন করিত। নরও এইরূপে তাঁহার পুত্র নরবরকে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে লাভ করিয়া পরম স্নেহের সহিত তাহাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। নরবর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর বৃদ্ধ নর একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন আমি তোমার পিতা নহি। আর এক জন তোমার যথার্থ পিতা, তিনি আমাদিগের সকলেরই পিতা। পিতা আমাকে অদ্য আহ্বান করিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকটে যাইতেছি। আমি জগৎপুরের আমোদে নিমগ্ন হইয়া, তাঁহাকে বিস্মৃত ছিলাম এবং তাঁহার আদেশ পালন করি নাই, এই জন্য এক্ষণে আমার অত্যন্ত অনুতাপ হইতেছে। আমি তাঁহার নিকট আমার কার্য্যের কি বিবরণ দিব ইহা ভাবিয়া অস্থির হইয়াছি। জগৎপুরের এই নিয়ম যে, নগরের ব্যক্তিদিগের পিতা ও কর্ত্তা যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহার সন্তানদিগকে একে একে দূত দ্বারা আহ্বান করেন। সেই দূত মহিষারূঢ়, ধূম্রবর্ণ ও আরক্ত-লোচন। যে ব্যক্তিকে পিতা আহ্বান করেন, কেবল সেই ব্যক্তিই সেই দূতকে দেখিতে পায়,অন্য কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। এই অদৃশ্য দূত জগৎপুরস্থ ব্যক্তিকে অদৃশ্য করিয়া পিতার নিকট লইয়া যায়। আমি অদ্য সেই দূতকে দেখিতে পাইয়াছি। ঐ দেখ,সে আমার নিকট নিঃশব্দে আগমন করিতেছে। আমি আর থাকিতে পারি না, চলিলাম, কিন্তু কম্পিত চিত্তে চলিলাম। তোমাকে একটি শেষ কথা বলিয়া যাইতেছি; আমার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবে না,বিষয়-মোহে নিমগ্ন হইয়া পিতাকে ভুলিবে না। তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতি করিবে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিবে। আমাদিগের জন্য অন্য পথ দৃষ্ট হইতেছে না।" (১) এই বলিতে বলিতে বৃদ্ধ নর অদৃশ্য হইলেন; কেবল তাঁহার পরিচ্ছদ মাত্র পড়িয়া রহিল। নরবর তাঁহার পোষক পিতার অন্তর্ধানে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তিনি আশৈশব তাঁহার দ্বারা লালিত পালিত হওয়াতে তাঁহাকেই পিতা বলিয়া জানিতেন। বৃদ্ধ নর তাহাকে যে পিতার কথা বলিয়াছিলেন তাঁহাকে তিনি জানিতেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে জগৎপুরের নিয়মানুসারে পোষক পিতার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদটি দাহ করিলেন। জগৎপুরের সকল নিয়মই আশ্চর্য্য ছিল। জগতপুরস্থ ব্যক্তিরা একাম্বর ছিল। জগৎপুরস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি জগৎপুরে নিজের উদয়াবধি তথা হইতে আপনার অন্তর্ধান পর্য্যন্ত এক বস্ত্রই পরিয়া থাকিত। আশ্চর্য্য এই যে, সেই বস্ত্র তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া, পরে আরো বয়োবৃদ্ধি সহকারে অধিকতর দৃঢ়ীভূত হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা না হইয়া তাহা ক্রমে জীর্ণ দশা প্রাপ্ত হইত। প্রত্যহ এক বস্ত্র পরিহিত হওয়াতে তাহা অত্যন্ত দুর্গন্ধ হইবার আশঙ্কায় জগৎ পুরস্থ ব্যক্তিরা তাহাকে প্রত্যহ ধৌত ও নানা সুগন্ধদ্রব্যে বিলেপিত করিত। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ বস্ত্র পরিহিত অবস্থাপেক্ষা পরিত্যক্ত অবস্থায় আরো দুর্গন্ধযুক্ত হইত, এই জন্য জগৎপুরস্থ ব্যক্তিরা পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ গুলি দগ্ধ করিয়া ফেলিত।

১) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ।

নরবর পোষক পিতার অন্তর্ধানের পর বিষয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বহু পরিশ্রম দ্বারা যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করিলে পর বিষয়-কর্ম্ম হইতে অবস্থত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবেন। কিন্তু যখন যথেষ্ট ধন লাভ হইল তখন অকস্মাৎ কোন দুঃর্ঘটনা ক্রমে তিনি তাঁহার সমস্ত ধন হারাইলেন। কেবল সমস্ত ধন হারাইলেন এমত নহে, তাঁহার একমাত্র পুত্রেরও বিয়োগ হইল এবং তিনি নিজেও অত্যন্ত রোগগ্রস্থ হইলেন। লোকে বিপদে পতিত হইলে পিতাকে ডাকে; নরবর বিপদে পতিত হইয়া, তাঁহার অদৃশ্য পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন। জগৎপুরে এই কঠিন নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, পিতা স্বেচ্ছানুসারে দূত দ্বারা আহ্বান না করিলে, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারিত না। বল-পূর্ব্বক দূতকে আহ্বান করিলে দূত আসিত ও আহ্বান-কর্ত্তাকে লইয়া যাইত, কিন্তু পিতা তাঁহার সেই পুত্রকে আদোবে দেখা দিতেন না ও তাহার সহিত কথা কহিতেন না। ভৃত্য যেমন নির্দ্দিষ্ট বেতনের কাল প্রতীক্ষা করে, সেই রূপ তাঁহাকে পিতার স্বেচ্ছানুসারে দূত প্রেরণের কাল প্রতীক্ষা করিতে হইত(২)। নরবর বলপূর্ব্বক দূতকে আহ্বান করিতে না পারিয়া পিতৃ সহবাসের জন্য আরো ব্যাকুল হইলেন। সম্পদের সময় তিনি পিতাকে বিস্মৃত ছিলেন, বিপদের সময় তাঁহার জন্য তাঁহার মন কি পর্য্যন্ত অস্থির হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না। কে তাঁহাকে জানে এবং কোথায় গেলে তাঁহার দর্শন পাইবেন তিনি সর্ব্বদা ইহারই তত্ত্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন হইতে সর্ব্বদা এই আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতে লাগিল,

"বল কে তাঁরে জানে? কোথা গেলে দরশন পাব প্রাণের প্রাণে? আমি তোমার চিরকাল, তুমি আমারই নাথ; কোথায় রহিলে রাখিয়ে অনাথে বিজন গহনে?"। পিতৃ সহবাসের জন্য যখন তাঁহার মনের ব্যাকুলতার একশেষ হইল, তখন উমা নাম্নী হেমালঙ্কারভূষিতা শোভনা বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী(৩) তাঁহাকে দর্শন দিলেন এবং দিব্য জ্ঞানরূপ অঞ্জন দ্বারা তাঁহার চক্ষু লেপন করিলেন। সেই অঞ্জন-প্রভাবে নরবর দেখিলেন যে, তিনি যে পিতার অনুসন্ধান করিতে ছিলেন, তিনি সর্ব্বস্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার অন্তরে বিরাজিত হইয়া আছেন! তিনি ইহা অনুভব করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং সর্ব্বদাই "হা! বুহা! বু!"(৪) বলিতে লাগিলেন। তিনি সেই "মোদনীয়কে"(৫) প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পিতৃপ্রেরিত দূত যখন তাঁহাকে লইয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন যে, যে পিতা জগৎপুরে বর্ত্তমান তিনি সেই নূতন স্থানেও বিদ্যমান আছেন। কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, জগৎপুরে তাঁহাকে যেমন উজ্জ্বল-রূপে ও নিকট রূপে প্রতীতি করিতেন তাহা অপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে ও নিকটরূপে তাঁহাকে তথায় অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ পিতৃসহবাসজনিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সম্ভোগে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

দুঃখ ও ক্লেশ মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করে। ঈশ্বর যাহার প্রতি দুঃখ প্রেরণ করেন তাহার প্রতি তিনি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।

(২) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ

(৩) তলবকারোপনিষৎ।

(৪) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

(৫) কঠোপনিষৎ।

ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

দেহীর এই দেহে যেমন কৌমার যৌবন ও জরা প্রাপ্তি হয়, আত্মার দেহান্তর লাভও তদ্রূপ। সুতরাং ধীর ব্যক্তি স্থূল দেহের বিনাশে মুগ্ধ হন না।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং তিতিক্ষস্ব ভারত॥

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের যে সম্বন্ধ তাহাই শীত উষ্ণ সুখ ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, সেই সম্বন্ধ অনিত্য, কখন উৎপন্ন হয়, কখনও বিনষ্ট হয়, তুমি তাহা সহ্য কর।

যং হি ন ব্যথয়স্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে॥

বিষয় সম্বন্ধ যে সমদুঃখসুখ ধীর ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই মুক্তি লাভের অধিকারী।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

অসৎ পদার্থের সত্তা হয় না, এবং সৎপদার্থের অভাব হয় না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সৎ ও অসতের এইরূপই নির্ণয় করিয়াছেন।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহী জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ গ্রহণ করিয়াথাকে।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

আত্মা শস্ত্রে ছিন্ন অগ্নিতে দগ্ধ জলে ক্লিন্ন ও বায়ু দ্বারা শুষ্ক হন না।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

জাত ব্যক্তির মৃত্যু ও মৃত ব্যক্তির জন্ম অবশ্যম্ভাবী, অতএব অপরিহার্য্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত হয় না।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং
আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ॥

কেহ আত্মাকে বিস্ময়ের সহিত দর্শন করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত বর্ণনা করেন, কেহ বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, এবং কেহ শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে পারেন না।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

ঈশ্বরোপাসনারূপ কর্ম্মযোগে নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি একমাত্র, কিন্তু ঈশ্বরোপাসনাশূন্য ব্যক্তির বুদ্ধি অনন্ত ও বহুশাখাবিশিষ্ট।

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥

যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত, এবং ভোগ ও ঐশ্বর্য্যপ্রদ বাক্যে যাহাদের মন আকৃষ্ট হইয়া থাকে, সমাধি বিষয়ে তাহাদিগের নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি জন্মে না।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

হে অর্জ্জুন! তুমি আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই তুল্য জ্ঞান করত যোগী হইয়া কর্ম্ম কর। পণ্ডিতেরা সিদ্ধি ও অসিদ্ধি এই উভয়ের সমজ্ঞানকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যদাতে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

যখন তোমার বুদ্ধি মোহগহন অতিক্রম করিবে তখন শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের কিছুমাত্র জিজ্ঞাস্য উপস্থিত হইবে না।

প্রজহাতি যদা কামান সর্ব্বান পার্থ মনোগতান।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

অর্জুন! যিনি মনোগত কামনা সকল সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন এবং আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

যিনি দুঃখে অক্ষুব্ধচিত্ত, সুখে নিস্পৃহ এবং যিনি অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ শূন্য, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনি।

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

যত্নশীল বিবেকী পুরুষের মনও উদ্দাম ইন্দ্রিয়গণ বল পূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকে।

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

জিতেন্দ্রিয় ও যোগী হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হইবে। ইন্দ্রিয় সকল যাঁহার বশীভূত, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

চিন্তাবলেই পুরুষের বিষয়াসক্তি জন্মে। বিষয়াসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয়।

ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতেই বিনাশ হইয়াথাকে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈ র্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥

যিনি স্বাধীনচিত্ত, তিনি স্ববশীভূত রাগদ্বেষবিমুক্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় উপভোগ করিয়াও আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥

মনঃপ্রসাদ থাকিলে সকল দুঃখ দূর হয় এবং প্রসন্নমনার বুদ্ধিও আশু স্থির হইয়া থাকে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তি রশান্তস্য কুতঃ সুখং॥

চপলেন্দ্রিয় পুরুষের বুদ্ধি নাই, সে কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে না, চিন্তাশীলতা ব্যতীত শান্তি নাই, শান্তিশূন্য ব্যক্তির সুখই বা কোথায়।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

যখন মন অনিয়ন্ত্রিত ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তখন পুরুষের বুদ্ধিকে সমুদ্রে বায়ু কর্ত্তৃক ঘূর্ণমান নৌকার ন্যায় বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে।

তস্মাৎ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

অতএব যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে সম্যকরূপ নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই বুদ্ধি স্থির হইয়াথাকে।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

সকল লোকের পক্ষে যাহা রাত্রি, সংযমী তাহাতে সজাগ থাকেন, এবং সকল লোকের পক্ষে যাহা দিবা, তত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে তাহা রাত্রি। (অজ্ঞানী মনুষ্যের পক্ষে ব্রহ্মনিষ্ঠা রাত্রিস্বরূপ, সংযমী তাহাতে জাগরিত থাকেন এবং বিষয়নিষ্ঠা মোহাক্রান্ত জীবের পক্ষে দিবাস্বরূপ, তত্ত্বদর্শী তাহাতে নিদ্রিত থাকেন।)

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তি মাপ্নোতি ন কামকামী॥

যেমন নদ নদী সকল পরিপূর্ণ অনুদ্বেল সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগ সকল যে নিরাকুলচিত্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করে, তিনিই শান্তি লাভের যোগ্য, কিন্তু যিনি ভোগ কামনা করেন, তাঁহার কদাচই শান্তি লাভ হয় না।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥

যে নিস্পৃহ নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি ভোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত ভ্রমণ করেন, তিনিই শান্তিলাভ করিতে পারেন।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥

অতএব নিস্কাম হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যিনি নিস্কাম হইয়া কার্য্য করেন, তিনি মোক্ষ লাভে সমর্থ হন।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥

মূর্খ যেমন অভিনিবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করে, সেইরূপ বিদ্বান্, লোকের স্থিতির উদ্দেশে আসক্তিশূন্য হইয়া কার্য্য করেন।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণং॥

এই কামই ক্রোধরূপে পরিণত রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন দুষ্পূরণীয় ও অতিশয় উগ্র, ইহাকে মুক্তিপথের বৈরী বলিয়া জানিবে।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভ স্তথা তেনেদমাবৃতং॥

যেমন ধূম দ্বারা অগ্নি, মল দ্বারা দর্পণ এবং জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ এই কাম দ্বারা জ্ঞান আচ্ছন্ন হয়।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ॥

এই জ্ঞানিগণের চিরবৈরী দুষ্পূরণীয় অনলস্বরূপ কাম দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়।

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
সর্ব্বৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং॥

ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই কামের আবির্ভাব স্থান। ইহা আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে।

তস্মাত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং॥

অতএব তুমি অগ্রে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া এই জ্ঞানবিজ্ঞাননাশন পাপরূপ কামকে বিনাশ কর।

পিথগোরসের জীবন চরিত।

পিথগোরস কোন্ সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিত লেখকদিগের মধ্যে কেহই নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। তৎসম্বন্ধে সকলের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, খৃষ্টজন্মের ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন টার্কুইন নামা রাজা রোমের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন, তখন পিথগোরসের কীর্ত্তি-কলাপ চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়াছিল। সামস্ দ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়; তাঁহার পিতার নাম নিসারকস্। কেহ বলেন, নিসারকস্ হীরকাদি মণি সকল কর্ত্তন ও খোদন কার্য্য দ্বারা এবং কেহ বলেন তিনি টায়ার নগরে বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। যাহাই করুন, তিনি মধ্যমরূপ সম্পন্ন লোক বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি পিথগোরসকে তৎকালপ্রচলিত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা সকল অভ্যাস করাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই।

পিথগোরসের বাল্যাবস্থা ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কাহারই বিশেষ করিয়া কিছুমাত্র অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে, তৎকাল সম্বন্ধে এই মাত্র নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তিনি প্রথমতঃ তাঁহার স্বদেশে ক্রিওফাইলাস্ নামক পণ্ডিত দ্বারা পরে সাইরস্ দ্বীপে বিখ্যাতনামা ফেরিসাইডিস্ (১) পণ্ডিত দ্বারা নানা বিষয়ে শিক্ষিত

(১) কথিত আছে, গ্রীস দেশে ফেরিসাইডিসই সর্ব্বাগ্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুশীলন করিয়া তাহাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

হইয়াছিলেন। গ্রীসের তৎকালপ্রচলিত রীত্যনুসারে পিথগোরস্ কাব্য ও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষরূপে শিক্ষিত হয়েন। জ্যোতিষ্ শাস্ত্র ও বাগ্মিতা বিষয়ে তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, তিনি স্বয়ংই তত্তৎ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া, তাহাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি অবকাশ সময়ে ব্যায়াম চর্চ্চায় এরূপ মনোনিবেশ করিতেন যে, অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যেই শারীরিক বল ও অঙ্গসঞ্চালন নৈপুণ্য বিষয়ে সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়া উঠিয়া ছিলেন। গ্রীস্ দেশীয় বিখ্যাত অলিম্পিক ক্রীড়াতেই তাঁহার ব্যায়ামপটুতার প্রথম প্রচার হয়। উক্ত ক্রীড়ায় তিনি যে, কেবল পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, কথিত আছে, তাহাতে ঐ দেশের যত লোক উপস্থিত হইয়াছিল, সকলেই তাঁহার শরীরের গঠনসৌষ্ঠব ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ হইয়া ছিল।

অলিম্পিক ক্রীড়ায় এইরূপ খ্যাতি লাভের কিয়ৎকাল পরেই পিথগোরস্ জ্ঞানোন্নতির অভিপ্রায়ে বিবিধ দেশ পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হয়েন। প্রথমে, তিনি মিসর দেশে উপনীত হইয়া, অল্প কালের মধ্যে পলিক্রেটিস্ নামক এক ব্যক্তির সাহায্যে মিসরাধিপতি আমাসিসের অনুরাগভাজন হয়েন। আমাসিস্ অচিরাৎ তাঁহার উৎসাহ, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্গুণ সমুদায়ের পরিচয় পাইয়া, তথাকার যাজক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাকে এরূপ পরিচিত করিয়া দিলেন যে, তিনি অনতিবিলম্বেই তাঁহাদিগের বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিলেন। তিনি দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া, যাজকদিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রাদির দুর্ভেদ্য রহস্য এবং সর্ব্ববিধ সাংকেতিক বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি এই দেশেই ক্ষেত্রতত্ত্ব ও জ্যোতিষ্ শাস্ত্রীয় সৌর জগতের প্রকৃত বিবরণ শিক্ষা করেন।

পিথগোরস্ মিসর পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে পারস্য ও কালডিয়া দেশে গমন করেন এবং তত্রত্য মেগাই (২) সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের নিকট হইতে তিনি জ্যোতিষ্ শিক্ষা করেন। তাঁহারা যে সকল বিদ্যা দ্বারা স্বপ্নাদির ফলাফল ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী সকল কহিতেন, তাহাও তিনি শিক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। উক্ত দুই দেশ হইতে তিনি এই ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং বিনয় ও অধ্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক এদেশের কতিপয় সুপণ্ডিত ব্যক্তির সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট হইতে এদেশে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র, জ্যোতিষ্ শাস্ত্র এবং ব্রহ্মযোগসাধন শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিধ শ্রেষ্ঠ বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি এদেশীয় আহার ব্যবহারাদিরও বিলক্ষণ সন্ধান লইয়া ছিলেন।

এতদ্ভিন্ন, সিসিরো বলেন যে, তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি অনেকানেক সমুদ্রপারস্থ অসভ্য দেশে যাইয়াও তত্রত্য রীতি নীতি সকল অবগত হইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

এইরূপে পিথগোরস্ বহুকাল পর্য্যন্ত নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, বিবিধ শাস্ত্র সম্বন্ধে

(২) উক্ত দুই দেশে পুরাকালে মেগাই সম্প্রদায়স্থ লোকেরাই বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে অপরাপর সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহাদের মতের সারাংশ এই যে, এই জগৎ মঙ্গল আর অমঙ্গল এই দুইটি পদার্থের কর্তৃত্বে নিয়ত ঘূর্ণমান হইতেছে। অগ্নিকে মঙ্গলের এবং অন্ধকারকে অমঙ্গলের প্রতিকৃতি স্বরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা তদুভয়েরই সেবা করিতেন।

যে জ্ঞান উপার্জন করিয়া ছিলেন, তাহা স্বদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে জন্মভূমি সামস্ দ্বীপে প্রত্যাগত হয়েন। তিনি তথায় একটি বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন মতেই তাহাতে সফলমনোরথ হইতে না পারিয়া, অগত্যা ডেলস্ নগরে গমন করিলেন। তথায় স্বীয় ধর্ম্মমত সকল সাধারণের গ্রহণোপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রচার করিয়া দিলেন যে, তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমুদায় শিক্ষা এপলো দেবের সেবকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই স্থান হইতে তিনি ক্রুট দ্বীপে গমন করিয়া, তথায় গ্রীস দেশে তৎকালপ্রচলিত গুহ্যতম ধর্ম্ম-মত সকল শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি স্পার্টা ও এলিস্ প্রদেশে গমন করিয়া, পুনর্ব্বার অলিম্পিক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হওয়ায় তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রকাশ্য সভায় "জ্ঞানী-প্রবর" এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

গ্রীস দেশের প্রধান প্রধান স্থান পর্য্যটন দ্বারা তত্তদ্দেশপ্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের রহস্য সকল অবগত হইয়া, তিনি আপনাকে এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলীয়ান বোধ করত সামসে প্রত্যাগমন করিয়া, পুনর্ব্বার তথায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তিনি গ্রীসের তাৎকালিক রীতি অনুসারে উক্ত বিদ্যালয়ে কখন সাংকেতিক ভাষায়, কখন ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার বিদ্যালয়ের প্রতি সাধারণের মন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত কি সেই বিদ্যালয়, কি তাঁহার নিজের অবস্থা কিছুই অধিক কাল উন্নত হইতে পারিল না। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে কতিপয় প্রতারণা প্রকাশিত হইয়া পড়ায়, তিনি অচিরাৎ সামস্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রীসের অন্তর্গত ক্রোটোনা নগরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

ক্রোটোনায় তিনি প্রথমে ইটালিক নামক একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। লোকসাধারণে তাঁহার শারীরিক ও মানসিক গুণ-গৌরব, তাঁহার দূর দেশ পর্য্যটন-খ্যাতি এবং তাঁহার অলিম্পিক ক্রীড়ালব্ধ মুকুট-মাহাত্ম্য অনতিশীঘ্রকাল মধ্যেই প্রচারিত হইয়া পড়ায়, চতুর্দ্দিক্ হইতে লোক সকল আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তিনি এখানে যে সকল বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, তাহার অনুপম মাধুরী, প্রভাব ও সারবত্তা নিবন্ধন ক্রোটোনার অধিবাসীগণের ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে অচিরাৎ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতে লাগিল। এমন কি, যাহারা অতিশয় পাপাচারী, তাহারাও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত না হইয়া থাকিতে পারিল না। তিনি সকল বিষয়ে অত্যন্ত নিয়মাচারী ছিলেন, এবং তিনি অন্য ব্যক্তিকে যে সকল উপদেশ দিতেন, আপনিও তদনুসারে কার্য্য করিতেন। তাঁহার এইরূপ স্বভাব দেখিয়া, সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ মনুষ্য মনে করিতে লাগিল। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে দেবমন্দিরে গমন করিয়া উপাসনা কার্য্য সমাধা করিতেন, যে সকল সামগ্রী পবিত্রতম, অর্থাৎ যাহা সম্পূর্ণরূপে হিংসাপাপবিবর্জ্জিত, তাহাই তিনি ভোজন করিতেন, মিসর দেশীয় যাজকের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, সতত অন্তর্বাহ্য শুচি রাখিতেন এবং নিয়মিতরূপে দেবোদ্দেশে দানাদি করিতেন। তিনি যে, সর্ব্ব-সাধারণের নিকটে অসামান্য ও পবিত্রতম ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, তাঁহার এবম্বিধ কার্য্যকলাপই তাহার মূল। তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গের নীচ প্রবৃত্তি সকল খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে জ্ঞান-গর্ভ পদ্য সকল শ্রবণ এবং তাঁহাদিগের

মনকে গণিত শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত করাইতেন। তাঁহার নিজের মনকে একাগ্রতা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি প্রত্যহ প্রাতে বীণা বাদন সহযোগে থেলিস্ রচিত গীত সকল গান করিতেন। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার নিজের এবং শিষ্যবর্গের মন হইতে সর্ব্বপ্রকার ব্যসনাসক্তি বিদূরিত করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহাদিগের সহিত দিবসের বিশেষ সময়ে শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চায় অত্যন্ত মনোনিবেশ করিতেন।

ইটালিক সম্প্রদায় ভিন্ন পিথগোরস্ ক্রোটোনাতে সাধারণ জনগণের হিতার্থে একটি বিদ্যালয়ও স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি ছাত্রদিগকে সাধারণতঃ স্ব স্ব কর্ত্তব্য এবং বিশেষরূপে সামাজিক কর্ত্তব্যাবলী শিক্ষা দিতেন। অপরন্তু, তিনি তাহাদিগের সম্মুখে সর্ব্বদাই পাপের যথোচিত নিন্দা এবং পুণ্যের যথোচিত প্রশংসা করিতেন। এই বিদ্যালয় ব্যতীত তিনি আবার নিজ বাটীতে একটি শ্রেষ্ঠতর বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতর বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে দুইটি মাত্র শ্রেণী ছিল। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ দিবসাবধি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত নিম্ন শ্রেণীতে এবং পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর উচ্চ শ্রেণীতে ভুক্ত হইত। নিম্ন শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগকে যথাসম্ভব মৌনব্রত ও চরিত্র বিষয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা দিতে হইত। ছাত্রদিগকে পাঁচ বৎসররূপ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বী করিয়া রাখিবার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে নানা ব্যক্তি নানারূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এপিউলিয়স্ বলেন যে, তিনি নম্রতা ও মনের একাগ্রতা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়েই ছাত্রদিগকে মৌনাবলম্বন করাইয়া রাখিতেন, কিন্তু ক্লিমেন্স আলেক জাণ্ড্রিনস্ বলেন যে, তাহাদিগের মনকে ক্রমশঃ বাহ্য বস্তুর আকর্ষণ হইতে বিমুক্ত করিয়া, পরম পরিশুদ্ধ ব্রহ্মের ধ্যান ধারণার উপযোগী করিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে দেওয়া হইত। এই শেষোক্ত সিদ্ধান্তই আমাদিগের নিকটে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অপরন্তু, এই বিদ্যালয়ের যে সকল ছাত্র উচ্চ শ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ যাহারা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত নানারূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত, তাহাদিগকেই তিনি অতি গূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব সকল এবং পরস্পর আলাপ ব্যবহার করিবার জন্য মিসর দেশীয় সাঙ্কেতিক ভাষার শিক্ষা প্রদান করিতেন।

পিথগোরসের অসামান্য প্রাধান্য বিষয়ে তদীয় শিষ্যমণ্ডলীর হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারা যে কোন সময়েই হউক, তাঁহার কোন প্রকার বাক্যের প্রতিবাদ করা ভয়ানক পাপ বলিয়া জ্ঞান করিত। এমন কি, তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ উপলক্ষে বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে, যদি কেহ আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ এরূপ বলিত যে, “গুরু এইরূপ বলিয়াছেন” তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় বিবাদ মীমাংসিত হইয়া তাহারই জয় লাভ হইত। পিথগোরসের এবংবিধ অসাধারণ প্রভুত্ব শুদ্ধ যে তাঁহার বিদ্যালয়েই বদ্ধ ছিল এমত নহে, অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে তাহা দেশ বিদেশেও বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে শিষ্যগণও গুরুর ন্যায় সাধারণের অনুরাগ ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং তাঁহারাই ক্রমে গ্রীস, সিসিলি ও ইটালির প্রধান প্রধান নগরের অধিপতি ও ব্যবস্থাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়া গুরুর মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

পিথগোরসের অলোকসামান্য শক্তি সম্বন্ধে কোন কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে,

তিনি সময়ে সময়ে ভূভাগের অভ্যন্তরস্থ খনিত গহ্বরে একাদি ক্রমে কতিপয় মাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া, পুনর্ব্বার লোকালয়ে প্রত্যাগত হইতেন এবং বলিতেন, তিনি নরক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। যত দিন তিনি গহ্বরে অবস্থিতি করিতেন ততদিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে পৃথিবীর সমুদয় সংবাদ প্রেরণ করিতেন(১)। তাঁহারা আরও বলেন যে, তিনি শুদ্ধ মনের শক্তিবিশেষ দ্বারা একদা একটি ভল্লুককে বশীভূত, অন্য সময়ে একটি উড্ডীয়মান শকুনকে হঠাৎ স্তব্ধ করিয়া ভূমিতে পাতিত করিয়াছিলেন এবং অপর এক সময়ে যে দিনের যে মুহূর্ত্তে ক্রোটোনায় ছিলেন, সেই দিনের সেই মুহূর্ত্তেই আবার মেটাপণ্টাম স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন, তাঁহারা ইহাও লিখিয়া গিয়াছেন যে, পিথগোরস্ একখণ্ড দর্পণের যে কোন অংশে হউক শোণিতাক্ষরে কোন বিষয় লিখিয়া,তাহা পূর্ণ চন্দ্রের দিকে তুলিয়া ধরিলে চন্দ্ররন্ধ্রোপরি সেই সকল অক্ষর প্রজ্বলিত ভাবে প্রকাশ পাইত (২)।

পরিশেষে, পিথগোরসের ধর্ম্মমত সকলের বিশেষত্ব নিবন্ধন, এবং তিনি যে গ্রীসের নানা প্রদেশীয় অত্যাচারী শাসনকর্ত্তা দিগের অন্যায়াচরণের বিরুদ্ধে প্রজাদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেন, এই জন্য, অল্প দিনের মধ্যেই দেশের অনেক গুলি পরাক্রমশালী লোক হিংসাপরতন্ত্র হইয়া, তাঁহার এরূপ ভয়ানক বিপক্ষ হইয়া উঠিল যে, তাঁহাকে প্রাণভয়ে ক্রোটোনা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হইল। তাঁহার আত্মীয় স্বজন রিজিয়মে এবং তিনি নিজে অন্যত্র আশ্রয় না পাইয়া মেটাপণ্টামে পলায়ন করিলেন। এই স্থানে অসহায় হইয়া তিনি অগত্যা একটি দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং কিম্বদন্তী এই যে, খৃষ্ট জন্মের ৪৯৭ বৎসর পূর্ব্বে তিনি তথায় অনাহারে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি কিরূপে কোথায় কোন্ সময়ে প্রাণত্যাগ করেন তাহার কিছু মাত্র নিশ্চয় নাই। যাহা হউক, তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় শিষ্যবর্গ অমর দেবগণের ন্যায় তাঁহার প্রতি অসামান্য ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তাঁহারা তাঁহার স্মরণার্থে নানা স্থানে তাঁহার মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার ক্রোটোনাস্থ বাসগৃহের উপাদান দ্বারা সিরিস্ নামক স্থানে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে তাঁহার নিকটে মনোগত ভাব সকল জ্ঞাপন করিতেন এবং বিশেষ রূপে কোন শপথ করিতে হইলে তাঁহারই নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহা করিতেন।

পিথগোরস্ ক্রোটোনানিবাসিনী থিয়ানো নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার টেলজেস্ ও নিফার্কাস্ নামক দুইটি পুত্র এবং ডামো নামে একটি কন্যা ছিলেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর তাঁহার পুত্রেরাই তদীয় বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন।

পিথগোরস্ কোন প্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে অনেকরূপ মতামত আছে। বিজ্ঞ জনগণের অনুমান এই যে, তিনি কোন রূপ গ্রন্থই প্রণয়ন

(১) বোধ হয় ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি যোগ শাস্ত্র অভ্যাস ও তাহার উপদেশানুসারেই সময়ে সময়ে ভূগর্ভে বাস করিয়া পরব্রহ্মের ধ্যানে নিরত হইতেন। ভূগর্ভ অস্মদ্দেশীয় যোগীদিগের প্রিয় আবাস।

(২) ইউরোপ ও আমেরিকায় এক্ষণে মেস্‌মারিজম্ (Mesmerism) বিদ্যার প্রভাবে এতৎসদৃশ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সকল ঘটিতে দেখা যাইতেছে। যদি পিথগোরসের এই কার্য্য সত্য হয়, তবে তিনি অবশ্যই ভারতবর্ষীয় যোগীদিগের অনুষ্ঠান অনুকরণ করিয়া ঐরূপ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। যোগীদিগেরও ঐ বিদ্যা ছিল।

করিয়া যান নাই। সুতরাং যে সকল গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে,তৎসমুদয়-ই তাঁহার শিষ্যগণের বিরচিত। একে তাঁহার রচিত কোন পুস্তক নাই, তাহাতে আবার তিনি শিষ্যবর্গকে যার পর নাই গুপ্ত ভাবে সমুদয় বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিতেন; সুতরাং তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মমত ও দর্শন-শাখা যিনি যতদূর অবগত আছেন, সমুদায়ই অসম্পূর্ণ ও কিছু অনিশ্চিত। তবে, যে সকল বিষয় এক রূপ নিশ্চিত বলিয়া সং-গৃহীত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের উল্লেখ করা আবশ্যক।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সংবাদ।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু

মহাশয়! গত ৪ঠা পৌষ শনিবার পূজ্যপদ প্রধান আচার্য্য মহাশয় জলপথে ভ্রমণ করিতে করিতে রামপুর বোয়ালিয়ায় উপস্থিত হয়েন। তাঁহার আগমনে এখান-কার ব্রাহ্মমণ্ডলী মহা উৎসাহিত হইয়া, গত ৫ই পৌষ রবিবার প্রাতঃকালে অত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। উপাসনাসমাজে প্রায় তিন শতেরও অধিক ভদ্রলোকের সমাগম হয়। তন্মধ্যে এখানকার ছোট আদালতের জজ, সুবর্ডিনেট জজ, মুন্সেফ, হাইস্কূল ও নর্ম্মাল স্কূলের প্রধান শিক্ষক এবং এখানকার প্রধান প্রধান অধিবাসীরা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় বেদী গ্রহণ করেন। উপাসনা কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। যতক্ষণ উপাসনা হইয়াছিল ততক্ষণ সেই লোকপরিপূরিত সমাজগৃহটী চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থির ও নিস্তব্ধ ছিল। স্বাধ্যায়ের পর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুমধুর স্বরে একটী মনোহর ব্রহ্মসঙ্গীত করেন। অনন্তর প্রধান আচার্য্য মহাশয় একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সাধারণ শ্রোতৃবর্গ ও ব্রাহ্মমণ্ডলীর হৃদয়ে ঈশ্বরের সত্যভাব সুস্পষ্টরূপে নিহিত করিয়া দেন। নিম্নে সেই বক্তৃতার সার মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করা গেল।

ঈশ্বর সত্যের সত্য—পূর্ণ সত্য;—সেই সত্য স্বরূপকে জানিতে পারিলেই আমরা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হই। তাঁহাকে জানিবার জন্য দেশবিদেশ ভ্রমণ করিবার প্রয়োজন নাই.বাহিরে বাহিরে তাঁহাকে দেখি-বার প্রয়োজন নাই, তিনি আমাদের আত্মার অন্তরেই বিদ্যমান আছেন। অনন্ত আকাশ যাঁহার সিংহাসন, তিনি আমাদের এই আত্মাতেই বিদ্যমান। তিনি সূর্য্যের অন্তরাত্মা; কিন্তু সূর্য্যকে না দেখিলে, সূর্য্যের অন্তরাত্মাকে কি প্রকারে দেখিবে? তিনি চন্দ্রের অন্তরাত্মা, কিন্তু চন্দ্রকে না দেখিলে চন্দ্রের অন্তরা-ত্মাকে কি প্রকারে দেখিবে? তিনি বায়ুর অন্তরাত্মা; কিন্তু বায়ুকে না জানিতে পারিলে বায়ুর অন্তরাত্মাকে কি প্রকারে জানিবে? তিনি আত্মার অন্তরাত্মা; কিন্তু আত্মাকে না জানিলে, আত্মার অন্তরাত্মাকে কি প্রকারে জানিবে? আমাদের শরীরে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই আছেন। জীবাত্মা এই পরমাত্মাকে না জানিয়া মুহ্যমান হইয়া নিয়ত শোক করেন, কিন্তু তাঁহাকে জানিলেই সমস্ত শোক দুঃখ হইতে মুক্ত হয়েন। আমাদের পুরাতন ঋষিরা আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখি-বার জন্য কত না কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন! "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এটী আজিকার কথা নয়, সেই পুরা-তন ঋষিরা এককালে পর্ব্বতগুহায় বসিয়া এই মহ-দ্বাক্য উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন। আজি আমরা এখানে বসিয়া সেই পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করিতেছি, ইহা কি আমাদের সৌভাগ্য নহে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আজিকার ধর্ম্ম নহে—অতি প্রাচীনকালে আমাদের সেই প্রাচীন ঋষিদিগের হৃদয় হইতে ইহা প্রসূত হইয়াছে। সমুদয় ভারতভূমি যখন অধীনতায় আচ্ছন্ন হইল, যখন মোহান্ধকার এই বঙ্গভূমিকে গ্রাস করিল, ধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; তখন মহাত্মা রামমোহন রায় আবার সেই প্রাচীন ধর্ম্ম—"সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই উদার বাক্য এই বঙ্গভূমিতে প্রচার করিলেন। আমাদের বঙ্গভূমির গৌরবের বিষয় আর কিছুই নাই, কেবল এই ব্রাহ্মধর্ম্মই ইহার গৌরবস্থল। অতএব আইস, আমরা প্রাণপণে এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করি।

৬ই পৌষ
বোয়ালিয়া } কস্যচিৎ দর্শকস্য

আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে সুপ্র-সিদ্ধ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র গত ৪পৌষে মান-বলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি একজন ধর্ম্মপরায়ণ বিদ্বান ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রাথমিক সংখ্যা সকলে তাঁহার ও তাঁহার কার্য্যের অনেক বার উল্লেখ আছে। ইহাঁরই যত্ন চেষ্টা ও উৎসাহে পূর্ব্ববাঙ্গলায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সূত্রপাত ও ব্রাহ্ম-সমাজ সংস্থাপিত হয়। সদালোচনা সদনুষ্ঠান এবং দেশহিতকর কার্য্যমাত্রেই ইহাঁর অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। ইনি অনেক নিরুপায় বালকের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয়ভার লইতেন এবং স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কএকটী স্কূল স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে ইনি বিলক্ষণ মুক্তহস্ত ছিলেন। ইনি অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী ও শিষ্ট ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে ইহাঁর বন্ধুবান্ধব সকলেই শোকার্ত্ত হইয়াছেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর হইয়াছিল। এইরূপ ব্যক্তির

মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজ একটী অভাবগ্রস্ত হইলেন, সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপন

ষট্‌চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথাক্রমে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

১ মাঘ শুক্রবার
শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ মাঘ শনিবার
শ্রীযুক্ত ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৩ মাঘ রবিবার
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ মিত্র

৪ মাঘ সোমবার
শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

৫ মাঘ মঙ্গলবার
শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৬ মাঘ বুধবার
শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি

৭ মাঘ বৃহস্পতিবার
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

৮ মাঘ শুক্রবার
পাতুরেঘাটা নিবাসী
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯ মাঘ শনিবার
শ্রীযুক্ত নীলমণি চট্টোপাধ্যায়

১০ মাঘ রবিবার
শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

ব্রাহ্ম মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান বর্ত্তমান মাঘ মাসের মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন।

আয় ব্যয়।

ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৭৯৭ শক,
আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৩৫১৷৷০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩৯৬।৶১৫
সমষ্টি	১৭৪৭৸৶১৫
ব্যয়	১৩৩১৷৷৵৫
স্থিত	৪১৬।/১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৩৯/০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৩০৫৸/১০
পুস্তকালয়	২২
যন্ত্রালয়	৬৮৯৸৶১০
গচ্ছিত	১৯৪৷৷৵০
সমষ্টি	১৩৫১৷৷০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৪৫৫৸৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪১৭৷৷৶০
পুস্তকালয়	৮৬।৶১০
যন্ত্রালয়	৩৪৮।০
গচ্ছিত	২৩।০
সমষ্টি	১৩৩১৷৷৵৫

দান প্রাপ্তি।

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দিননাথ অধ্যেতা ...	২
" " কানাইলাল পাইন .	১
" " রমণীমোহণ রায় চৌধুরি ...	২৫
" " ঠাকুরদাস সেন ...	১
	২৯

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৫
" " শিবচন্দ্র নন্দী ..	১০
" " দুর্গাবর মিত্র ...	৫
" " লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	৪
	৪৪

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস হালদার ...	৩২
" " শ্রীকণ্ঠ সিংহ ...	৫
" " যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ...	২
" " জানকীনাথ ঘোষাল ...	৫
	৪৪

দানাধারে প্রাপ্ত	২২/০
	১৩৯/০

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
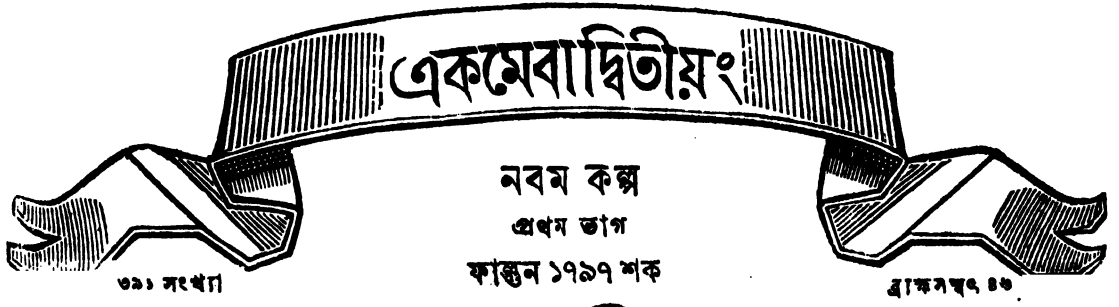
সম্বৎ ১৯৩২। কলিগতাব্দ ৪৯৭৭ ১ মাঘ শুক্রবার।

Registered No 52.

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নতন ব্রহ্ম-সঙ্গীত

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

জগত-বন্দনে ভজ পবিত্র হবে জীবন, পাইবে অনন্ত ফল, লাভ হবে পরম ধন।

অন্ধতম কে এমন তাঁরে যে কভু দেখে না, ধিক্ সে জীবন তার, পাপে তাপে মগন।

পরম করুণাধার সেই পতিতপাবন, তাঁর পদে প্রণম, নাহি রহিবে মোহাবরণ।

অন্ধকার নিশীথে, চন্দ্র সুন্দর মধুর, শো-ভয়ে যাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনহরণ।

রাগিণী মেঘমল্লার—তাল সুরফাঁকতাল।

বিশ্ব-ভুবন-রঞ্জন, ব্রহ্ম পরম জ্যোতি, অনাদি দেব জগপতি, প্রাণের প্রাণ।

কতই কৃপা বরষিছ, প্রাণ জুড়ায় সুমধুর প্রেম-সমীরে, দুঃখ তাপ সকলি হয় অবসান।

সবাকার তুমি হে পিতা বন্ধু মাতা, অনন্ত লোক করে তব প্রেমামৃত পান।

অনাথশরণ এমন আর কে বা তোমা হেন, ডাকি তোমারে, দ্যাখা দাও প্রভু হে কৃপানিধান।

রাগিণী কানেড়া—তাল ঝাঁপতাল।

চমৎকার অপার জগত-রচনা তোমার, শোভার আগার বিশ্বসংসার।

অযুত তারক চমকে রতন-কাঞ্চন-হার, কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।

শোভে বসুন্ধর ধনধান্যময়, হায় পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার।

হে মহেশ! অগণন লোক গায় ধন্য তুমি ধন্য এই গীতি অনিবার।

রাগিণী মিশ্র—তাল ফেরতা।

দ্যাখা দেও হে রাখিব হে অতি যতনে হৃদি মাঝারে।

তুমি মম জীবন, তুমি মম ভূষণ, তুমি নয়নাঞ্জন, বিতর কৃপা পরমেশ।

সম্পদ বিপদে সঙ্গের সঙ্গী, ভবার্ণবে কাণ্ডারী এক তুমি হে।

জগজন তাই হে ডাকে হরি হরি।
জ্যোতির জ্যোতি প্রাণের প্রাণ,
তোমা বিহনে নাহি ত্রাণ রে॥

রাগিণী খোরিয়া—তাল আড়াঠেকা।

ও হৃদয়নাথ! এস হে হৃদয়াসনে; আ-কুল প্রাণে ডাকি হে তোমারে, দরশন দেও হে।

তব পদ ছায়িব প্রেমের কুসুমে, কি দিব আর তোমায় হে।

রাগিণী গৌড় মল্লার—তাল চৌতাল।

গাও রে পর ব্রহ্মের মহিমা ত্রিভুবন চরাচর, তিনি হে সবার প্রাণদাতা।

সুরনর গাও রে সবে গাও রে বিশ্বপতি মহান্ দেব, অমৃত ললিত সঙ্গীতে; ভূলোক দ্যুলোকে ঘোষ রে তাঁর নাম।

বন-বিহঙ্গ গাও সেই সুখদাতা মনের পুলকে, বিজন গহন ছায়ি তানে তানে।

চঞ্চল চপলা ঘন ঘন চমকি, ঘন গরজি, তাঁর নাম গাও; কেহ থেকো না নীরব।

শ্যামবাজারের ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

২০ অগ্রহায়ণ রবিবার ১৭৯৭ শক।

ঈশ্বর এই শরীরের মধ্যে আত্মাকে স্থাপিত করিয়াছেন। তিনি আমারদের আত্মাকে শরীরের মধ্যে রাখিয়া এই পৃথিবীতে পালন করিতেছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ইহাকে আরো উন্নত করিয়া—জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নত করিয়া তাঁরি পদ-তলে অর্পণ করি। এই আত্মাকে তাঁরি পদতলে প্রত্যর্পণ করিব, ইহারই জন্য আত্মা প্রাপ্ত হইয়াছি। যদি এই মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া এই অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্তে, কল্যাণের নিমিত্তে, আত্মাকে পরিপোষণ না করি, তবে মনুষ্য-জন্ম বৃথা হইল। সুখ-দুঃখ সংসারে চিরকালই বিচরণ করিতেছে। সুখ-দুঃখ সংসারে চিরকালই বিচরণ করিবে। সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন চিরদিনই আছে, সমুদ্র কখনো নিস্তরঙ্গ হইবে না, তেমনি সুখ-দুঃখ চিরদিনই থাকিবে। সুখ-দুঃখ কেবল মনুষ্যের ভাগ্যে নাই, পশু পক্ষীর মধ্যেও আছে। যেখানে সুখ-দুঃখ দেখিতে পাই, সেইখানে বুঝিতে পারি, মন আছে—সুখ-দুঃখের আয়তন মন। পশু পক্ষীরা সুখ-দুঃখ ভোগ করে বলিয়া তাহারদের মন আছে; ওষধি বনস্পতিরা সুখ-দুঃখ ভোগ করে না বলিয়া তাহারদের মন নাই। মন কেবল সুখের আয়তন নহে, কেবল দুঃখেরও আয়তন নহে; মন সুখ-দুঃখ উভয়েরই আয়তন। ওষধি বনস্পতির মন নাই প্রাণ আছে; ইহা মূল দ্বারা ভূমির রস আকর্ষণ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, অবশেষে শুষ্ক হইয়া মরিয়া যাইতেছে। তেমনি শরীর অন্ন-রস পরিপাক করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার জরা-জীর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইতেছে। ওষধি বনস্পতির সঙ্গে আমারদের শরীর সমান, ইহাদের সাধারণ লক্ষণ প্রাণ। মনুষ্যে, পশুতে, ওষধি বনস্পতিতে সামান্যরূপে প্রাণ বর্ত্তমান আছে। ইহার উপর শ্রেণীতে মন। বৃক্ষ-লতা অতিক্রম করিয়া মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। মনের বিদ্যমানতা বিষয়ে পশু পক্ষী মনুষ্য সমান। যেমন বৃক্ষ লতা হইতে পশু পক্ষী মন দ্বারা উন্নত, তেমনি পশু পক্ষী হইতে মনুষ্য আবার আত্মা দ্বারা উন্নত। সূর্য্য-চন্দ্রে প্রাণ নাই, বৃক্ষ লতাতে মন নাই, পশু পক্ষীতে আত্মা নাই, ইহারদের হইতে মনুষ্যের বিশেষ এই যে, তাহার আত্মা আছে। মনুষ্য শরীর মন দ্বারা জড় ও উদ্ভিজ্য ও পশুর সঙ্গে সমান; কেবল আত্মার দ্বারা এই সাধারণ শ্রেণী হইতে সে সমুন্নত হইয়াছে। এ আত্মা অন্নময় জড়েতে নাই, প্রাণময় বৃক্ষলতাতে নাই, মনোময় পশু পক্ষীতে নাই—এ আত্মা কেবল মনুষ্যেতেই আছে, ইহাতেই মনুষ্যের উচ্চতা, ইহাতেই মনুষ্যের মাহাত্ম্য। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা অস্তিত্ব আছে বলিয়া নহে, প্রাণ আছে বলিয়া নহে, মন আছে বলিয়াও নহে—আত্মা আছে বলিয়া মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ হইয়াছে। পরি-

পাক প্রভৃতি প্রাণের ভাব, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মনের ভাব। আত্মার ভাব কি? আত্মার ভাব পুণ্য পাপ। পুণ্য-পাপ বৃক্ষ-লতাতে নাই, পুণ্য-পাপ পশু-পক্ষীতে নাই, পুণ্য পাপ মনুষ্যেরই সাধ্য। যেমন সুখদুঃখের আয়তন মন, তেমনি পুণ্য-পাপের আয়তন আত্মা। মনুষ্য পুণ্য-পাপের হস্ত হইতে এড়াইতে পারে না, কারণ আত্মার-ভাব পুণ্য-পাপ। সে সহস্র কুতর্ক করুক, সে পুণ্য পাপ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে চেষ্টা করুক, সে পুণ্য-পাপকে অতিক্রম করিতে পারে না, পুণ্য-পাপকে ছাড়াইতে পারে না, পুণ্য-পাপ তাহাকে অনুসরণ করিবেই; যে হেতু পুণ্য-পাপ আত্মার ভাব। আত্মার ভাব যে পুণ্য-পাপ,এ কোথা হইতে আসিতেছে? ইহা ধর্ম্ম হইতে আসিতেছে। বিষয়ের সঙ্গে যেমন সুখের যোগ, ধর্ম্মের সঙ্গে তেমনি পুণ্যের যোগ। বিষয়াভাবে দুঃখ, ধর্ম্মের অভাবে পাপ। যাহারা পাপ করিয়াছে, তাহারাই জানে যে দুঃখ হইতে পাপ-গ্লানি কত তীব্রতর; যাঁহারা পুণ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, বিষয়-সুখ অপেক্ষা পুণ্যের আনন্দ কত মধুরতর। সুখ-দুঃখ মানসিক ধর্ম্ম, এ বিষয়ে মনুষ্য পশুদের সঙ্গে সমান। পশু পক্ষী পুণ্য-পাপ অনুভব করে না, পুণ্য-পাপ আত্মাই জানে। মনুষ্য দুঃখেতে যত না বিমর্ষ হয়, পাপেতে সে একেবারে ম্রিয়-মাণ হয়; আবার সুখে সে যত না স্ফীত হয়, পুণ্যে তদপেক্ষা সান্দ্রানন্দ উপভোগ করে। মনের ভাব অপেক্ষা আত্মার ভাব যখন উৎকৃষ্ট, তখন প্রাণ-পণে সেই পুণ্যকে উপার্জ্জন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। যদি সুখ চাও, তবে সুখের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ রাখিও, যেখানে সুখের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ, সেখানেই বাস্তবিক সুখ ভোগ করি; আর অধর্ম্ম করিয়া যখন সুখ অর্জ্জন করিতে যাই, তখন চোরের ন্যায় দণ্ড ভোগ করি। ধর্ম্মের সঙ্গে যে সুখের যোগ, আমরা সেই সুখ ঈশ্বরের স্নেহময় হস্ত হইতে ভোগ করিতে পাই; যখন চোরের ন্যায় সুখ ভোগ করিতে উদ্যত হই, তখন রাজদণ্ড মস্তকে পতিত হয়—সমুদায় সুখ আত্ম-গ্লানিতে দগ্ধ হইয়া যায়। বিষয়-লাভের পুরস্কার সুখ; কিন্তু যদি ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ না দিই, সে সুখ পাইতে পারি না—সুখ শত যোজন দূরে পলায়ন করে। বিষয় লাভে সুখ আছে, কিন্তু সর্ব্বদা নয়—যখন অধর্ম্মের সঙ্গে সুখ, তখন সে দুঃখ-রূপে পরিণত হয়। অতএব যাহারা অধর্ম্মাচরণ দ্বারা সুখ চায়, তাহারা সুখ পায় না—এই জন্য সুখাবধারণে মনুষ্যের বিপর্য্যয় ঘটে। বিষয়ের পুরস্কার সর্ব্বদা সুখ নহে, কিন্তু ধর্ম্মের পুরস্কার সর্ব্বদাই পুণ্য—ইহা একেবারে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে গ্রথিত। ধর্ম্ম দ্বারা যদি প্রাণ যায়, তবুও ধর্ম্মের ফল পুণ্য হইবেই হইবে—কেহ তাহা কাটাইতে পারে না। বিষয়-লাভে সুখ হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে পুণ্যের নিয়ত সম্বন্ধ। ধর্ম্মের পথে থাকিয়া যে কীর্ত্তি লাভ করি, তাহাও পুণ্য, ধর্ম্মের অনুরোধে যদি লোকাপবাদ সহ্য করিতে হয় তাহাও পুণ্য। ধর্ম্ম-পথে থাকিয়া যদি শ্রীসম্পত্তি উপার্জ্জন করি, তাহাতেও পুণ্য, ধর্ম্মের অনুরোধে যদি শিরশ্ছেদ হয়, তাহাতেও পুণ্য। ধর্ম্মের পুরস্কার পুণ্য, আবার পুণ্যের পুরস্কার ঈশ্বর। যখন পাপমলা প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়া পুণ্য-জ্যোতিতে আত্মাকে জ্যোতিষ্মান্ করি, তখনি আবার এই আত্মার মধ্যে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমাত্মাকে দেখিতে পাই। বাহিরে যে "সত্যং শিবং সুন্দরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" লিখিত আছে তাহা হইতে স্পষ্টাক্ষরে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখিতে পাই যে "সত্যং শিবং

সুন্দরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং” স্বীয় আত্মাতে বিরাজ করিতেছেন। এই ব্রহ্ম-দর্শনই ধর্ম্মের ও পুণ্যের শেষ পুরস্কার। এই ব্রহ্ম-দর্শনেই স্বর্গ হয়,—এই ব্রহ্ম-দর্শনেই মুক্তি হয়। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।” সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন—তদ্ভিন্ন মুক্তি-প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। এই আদেশ, এই উপদেশ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১ মাঘ শুক্রবার ১৭৯৭ শক।

“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” এই কয়টি বচন দ্বারা পরব্রহ্মের সত্তা ব্রাহ্মধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে। সত্য কি না ধ্রুব অস্তিত্ব, জ্ঞান কি না সেই অস্তিত্বের স্বপ্রকাশ ভাব, অনন্ত কি না সেই অস্তিত্বের হ্রাস নাই বৃদ্ধি নাই অবধি নাই এইরূপ অপরিচ্ছিন্ন মহান্ ভাব। ঈশ্বরের এই মহান্ গম্ভীর সত্তা, সংশয়ের বিষয় নহে, প্রত্যুত যৎপরোনাস্তি নির্ভরের বিষয়। সংশয় তত্ত্বানুসন্ধানের উত্তেজক, এই মাত্র, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, সংশয় জ্ঞানলাভের উপায়; রোগ-যন্ত্রণা ঔষধ সেবনের উত্তেজক বলিয়া তাহাকে আরোগ্য-লাভের উপায় বলা সঙ্গত নহে। ঔষধ সেবনই আরোগ্য লাভের উপায়, তত্ত্বানুসন্ধানই জ্ঞানলাভের উপায়। সংশয় জ্ঞানের অলঙ্কার নহে, তাহা জ্ঞানের কণ্টক স্বরূপ। সংশয় জ্ঞানের বল নহে, তাহা জ্ঞানের দুর্ব্বলতা। যাহারা সংশয়কে জ্ঞানের সারাংশ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা কণ্টককেও পুষ্পের সারাংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। জ্ঞানের বল কি? জ্ঞানের বল নিশ্চয়তা। জ্ঞান দ্বারা যদি কিছুই নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি না হইত, তাহা-হইলে তাহার কোন বল থাকিত না। যেমন বর্ষণ-বিহীন মেঘ, যেমন ফলহীন পাদপ, যেমন তরু-হীন ভূমিখণ্ড, যেমন অর্থহীন বাক্য, তেমনি নিশ্চয়তা-বিহীন জ্ঞান। “ইহা ঠিক” এইরূপে সত্য নিশ্চয় করিতে পারিলেই জ্ঞান সুসিদ্ধ হয়; “হইলেও হইতে পারে, না হইলেও না হইতে পারে” এরূপ বিমর্ষ জ্ঞানের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে। শরীরের কম্পন যেমন দুর্ব্বলতা-জ্ঞাপক জ্ঞানের সংশয় সেইরূপ দুর্ব্বলতার চিহ্ন। কিন্তু এখানে এই একটি কথা উঠিতে পারে যে, জ্ঞানের অভ্যন্তরে যেমন নিশ্চয়তা আবশ্যক, জ্ঞানের বাহিরে তেমনি তদুপযোগী বিষয়ের আবশ্যক; বাহ্য বিষয়াভাবে আন্তরিক নিশ্চয়তার মূল্য কিছুই নাই। আমি নিশ্চয় করিলাম যে চন্দ্রলোকে জীব আছে, কিন্তু আমি তাহা চক্ষেও দেখি নাই, কর্ণেও শুনি নাই, এ প্রকার নিশ্চয়তা কোন কার্য্যেরই নহে। নিশ্চয়তা তখনই ফলদায়ক হয়, যখন তাহা সবিষয়ক (অর্থাৎ বিষয়ের সহিত বর্ত্তমান) হয়। তত্ত্ব জ্ঞানের নিশ্চয়তা যদি অবিষয়ক হয়, তবেই তাহা অকার্য্যকর অলীক সুতরাং অগ্রাহ্য, কিন্তু তাহা যদি সবিষয়ক হয় তবে তাহা অকাট্য। জ্ঞান আপনি আপনার বিষয়; এজন্য জ্ঞান আপনার বিষয়ে যাহা কিছু নিশ্চিতরূপে জানে তাহা সবিষয়ক ভিন্ন অবিষয়ক হইতে পারে না। “জ্ঞান আপনি আপনার বিষয়” ইহার অর্থ এই যে, জ্ঞান আপনি আপনাকে জানে। “আমার জ্ঞান নাই অথচ আমি জানিতেছি” ইহা যেমন অসম্ভব, “আমার জ্ঞান আছে অথচ তাহা আমি জানি না” ইহাও সেইরূপ অসম্ভব। আপনার অস্তিত্ব যাহার নিকটে প্রকাশ নাই, এমন জ্ঞান মূলেই অসম্ভব। জ্ঞানেতে যদিও

চন্দ্রলোকাদি বহির্বিষয়ের অভাব হইতে পারে, কিন্তু আত্মবিষয়ের অভাব তাহাতে কোনরূপেই সম্ভবে না। জ্ঞানের এই যে আত্মবিষয়ক নিশ্চয়তা তাহাকে আত্মপ্রত্যয় কহে। জ্ঞান আপনি আপনার বিষয়, এজন্য জ্ঞানের অভ্যন্তরে যে সকল মূলতত্ত্ব আছে তাহাও জ্ঞানের বিষয়; রত্ন-সম্বলিত কৌটা পাইলে যেমন রত্ন পাওয়া হয়, সেইরূপ জ্ঞান যখন আপনাকে উপলব্ধি করে তখন আপনার অভ্যন্তরে যে সকল মূলতত্ত্ব রহিয়াছে তাহাও সেই সঙ্গে উপলব্ধি করা হয়। জ্ঞান নিজে যখন আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় হইল তখন জ্ঞানের মধ্যে যে-সকল তত্ত্ব আপনা আপনি রহিয়াছে, যে তত্ত্বগুলিকে জ্ঞান হইতে পৃথক্ করা যায় না, তাহাও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয়-স্বরূপ। মূলতত্ত্ব-সকলের আলোকে পরব্রহ্মের সত্তা আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাসিত হয়; তাই আমরা ধ্রুবরূপে জানিতে পারি যে, পরব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ। একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যের ভাব জ্ঞানের আছে কি না? ইহা জিজ্ঞাসিত হইলে "আছে" ভিন্ন তাহার আর দ্বিতীয় উত্তর হইতে পারে না, কেন না, একমাত্র সত্যের আলোকেই জ্ঞান আপনাকে এবং সমুদায় জগৎকে সত্য বলিতেছে। যিনি একমাত্র মূলসত্য তিনি জ্ঞান-স্বরূপ ইহা দ্বিরুক্তি মাত্র। মূলসত্য যদি আপনার নিকট অপ্রকাশ থাকেন তবে অন্য কাহারো নিকট তিনি প্রকাশ পাইতে পারেন না। এবং যাহা কাহারো নিকটে প্রকাশ পাইতে পারে না তাহার অস্তিত্ব মুখের কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পর্ব্বত আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে না—আর এক জনের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। চন্দ্রলোকের পর্ব্বত আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে না, কিন্তু আমি যদি চন্দ্রলোকে যাইতে পারি তবে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে—অথবা দূরবীক্ষণ দ্বারা তাহা প্রকাশ পাইতে পারে। এইরূপ আপাততঃ যাহা প্রকাশ না পাইলেও যাহার প্রকাশ দেশ কাল পাত্র সাপেক্ষ তাহার অবশ্য অস্তিত্ব থাকিতে পারে—কিন্তু যাহা কাহারো নিকট প্রকাশ পাইতে পারে না, মূলেই যাহা প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহার অস্তিত্ব আছে ইহার যে অর্থই হয় না। যেমন গোল চতুষ্কোণ কাহারো নিকট প্রকাশ পাইতে পারে না—মূলেই তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না, সেইরূপ, যাহা মূলেই প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহার অস্তিত্ব কেবল একটা কথার কথা মাত্র। যাঁহার অস্তিত্ব সকল অস্তিত্বের মূল—তিনি যদি আপনার নিকট অপ্রকাশ হ'ন, তবে অন্য কাহারো নিকট প্রকাশ পাইতে পারেন না, কেন না মূলে তিনি আপনি ভিন্ন আর কেহই বর্ত্তমান্ নাই। কাহারো নিকটে যাহা মূলেই প্রকাশ পাইতে পারে না তাহা "আছে" ইহা বলা অসঙ্গত। সুতরাং যদি মূল সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয় তবে তিনি স্বপ্রকাশ ইহাও বিশ্বাস করিতে হয়। মূল সত্য অপ্রকাশ এবং মূল সত্য নাই ইহা একই কথা। মূল-সত্য আছেন এবং তিনি স্বপ্রকাশ; তিনি আছেন অতএব সত্যস্বরূপ; তিনি স্বপ্রকাশ অতএব জ্ঞানস্বরূপ। তিনি যখন সকল সত্যের মূলবর্ত্তী এক অদ্বিতীয় সত্য, তখন তিনি অন্য কিছু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন। তিনি অপরিচ্ছিন্ন অতএব অনন্ত-স্বরূপ। পরমেশ্বর যেমন জ্ঞানস্বরূপ তেমনি তিনি আনন্দস্বরূপ। যেমন তিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, তেমনি তিনি আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সত্যস্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্তস্বরূপ সেই যে অগম্য অচিন্ত্য অপার পরব্রহ্ম তিনি আনন্দ রূপে অমৃত

রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। ঈশ্বর কেবল যে বাক্য মনের অগোচর অচিন্ত্য অনন্ত সত্যস্বরূপ তাঁহার সহিত যে আমারদের কোন সম্বন্ধ নাই এমন কখনই নহে, তিনি সেই আনন্দস্বরূপ, যে আনন্দ হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যে আনন্দের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত জগৎ জীবিত রহিয়াছে, যে আনন্দ সমুদায় জগতের গম্য নিকেতন স্বরূপ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয় ইহা শুনিবা মাত্র আমারদের মনে ভয় হয়, মনে হয় যে, তবে ত তিনি দূরাৎ সুদূরে—দূর হইতেও বহু দূরে, কিন্তু তাহার পরেই যখন শুনি "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" পরব্রহ্মের আনন্দ জানিলে কোথাও আর ভয় থাকে না তখন আমারদের মন সুস্থির হয়, তখন মনে হয় "তিনি দূরাৎ সুদূরে" নহেন "তদিহান্তিকে চ" তিনি এই নিকটেই বর্ত্তমান। মাতা লুক্কায়িত হইলে শিশুর যেমন ভয় হয়, ঈশ্বরকে "দূরাৎ সুদূরে" বলিয়া জানিলে আমারদের সেইরূপ ভয় হয়, এবং মাতার হাস্যবদন নিকটে দেখিলে শিশুর যেমন কোন কিছুতেই ভয় হয় না, সেইরূপ পরব্রহ্মের আনন্দ জানিলে আমারদের আর কিছুতেই ভয় হয় না। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই বচনটি পরমেশ্বরের গম্ভীর অস্তিত্বের দিকে আমারদের মনকে লইয়া যায়। ঈশ্বরের আদি নাই অন্ত নাই মধ্য নাই, সেই নিরবলম্বের মধ্যে মন কোথায় অবলম্বন পাইবে, এই জন্য কথিত হইয়াছে মনের সহিত বাক্য তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহা হইতে ফিরিয়া আইসে। প্রথমে ঈশ্বরের মহান্ অপরিমেয় ভাব জানিয়া মন উদাস হয়, পরে তাঁহার আনন্দ উপলব্ধি করিয়া মন নির্ভয় হয়। সমস্ত জগৎসংসার এক কেবল তাঁহার আনন্দের উপরে স্থাপিত রহিয়াছে। আমারদের প্রাণ মন সমস্তই তাঁহার সেই আনন্দের উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এজন্য উপাসনাকালে তাঁহাকে আমরা প্রাণের প্রাণ বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকি। ভক্তি পূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করিলে তাহা হইতে যে কি মধুময় ফল উৎপন্ন হয় তাহা না জানাতে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বনে বিরত হন। অনেকে উপাসনার ফল-দায়িতা স্বীকার করিয়াও তাহার মূলে অবিশ্বাস করেন; ইহাঁরা বলেন, অলৌকিক পুরুষের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলে অজ্ঞ লোকের মনের ক্ষোভ নিবৃত্তি হয়, অতএব তাহা উপকারী, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তির তাহাতে কোন ফল দর্শে না। যাঁহারা আমোদ প্রমোদে সর্ব্বদাই বিহ্বল থাকেন, তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনা কঠিন বোধে পরিত্যাগ করেন; এবং যাঁহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া কেবল কুতর্কেরই আন্দোলন করেন, তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনা অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করেন। এক দিকে আমোদপ্রিয় নব্য সম্প্রদায় আর একদিকে কুতর্কপ্রিয় প্রাচীন সম্প্রদায়, দুয়ের মধ্যে পড়িয়া আমারদের দেশ দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। ঈশ্বরোপাসনা ব্যতিরেকে দেশের যে কিরূপ দুরবস্থা ঘটে দুর্ভাগ্য ক্রমে আমারদের দেশই তাহার একটি প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইয়া উঠিতেছে। ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মন সরস না হইলে কেবল স্বার্থেরই আদর বৃদ্ধি হয়, প্রীতি ভক্তির আর আদর থাকে না। "দেশ উচ্ছিন্ন যাউক্ ক্ষতি নাই আমার মান হইলেই হইল" এভাব কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? "ভ্রাতা কষ্টে দিনপাত করুক ক্ষতি নাই, আমার ধনসম্পত্তি লাভ হইলেই হইল,"

এভাবই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? "কার্য্য হউক্ বা না হউক্ নাম হইলেই হইল" এভাবই বা কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? "কথা সত্য হউক্ বা না হউক্ লোকের মনোরঞ্জন হইলেই হইল" এভাবই বা কোথা হইতে উৎপন্ন? ঈশ্বরোপাসনার অভাব হইতেই এই সকল কদর্য্য ভাব উৎপন্ন হয়। যিনি আমারদের প্রাণের প্রাণ তাঁহাকে কি আমরা প্রাণতুল্যও প্রীতি করিব না? এবং যিনি জ্ঞানের জ্ঞান তাঁহাকে কি আমরা গুরু-তুল্যও ভক্তি করিব না? ঈশ্বর অন্ধকার সত্যমাত্র নহেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ; জড়েতে জড়েতে নহে, জড়েতে জ্ঞানেতে নহে, কেবল জ্ঞানেতে জ্ঞানেতেই ভাবের উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে পারে। আমি যাহাকে প্রীতি করি সেও আমাকে প্রীতি করুক্, আমি যাহাকে স্নেহ করি সেও আমাকে ভক্তি করুক, আমি যাঁহাকে ভক্তি করি তিনিও আমাকে স্নেহ করুন, এরূপ ইচ্ছা কাহার না হয়? অল্পজ্ঞের সহিত যদি অল্পজ্ঞের প্রীতি ভক্তি চলিতে পারে তবে মহান্ জ্ঞানের সহিত অল্প জ্ঞানের কেন-না প্রীতি ভক্তি চলিতে পারিবে? পরমেশ্বর "আনন্দরূপমমৃতং" তিনি "প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।" যেমন তিনি আনন্দস্বরূপ অমৃতস্বরূপ তেমনি তিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতং, শান্ত অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপ। মঙ্গলের প্রতি মনুষ্যের এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি যে, মনুষ্য কেবল মঙ্গল ভোগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না, মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রাণপণ যত্ন করে। মঙ্গল অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মঙ্গলস্বরূপের প্রসাদ কেমন প্রার্থনীয়? একটা কোন মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করিতে গেলে প্রথম উদ্যমে আমারদের মনে মহা একটি ক্ষোভের উদ্রেক হয়; একে শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি, তাহাতে আমি দুর্ব্বল মনুষ্য, কখন্ কাহার কি হয় কিছুই বলা যায় না! দৃঢ়তার সহিত একটা কর্ম্মে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হইলাম, পথিমধ্যে নানা বিঘ্ন বিপত্তিতে আক্রান্ত হইয়া মন একেবারে ভগ্নোদ্যম হইয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিল! এই সকল ভাবনাতে মন যখন বিক্ষিপ্ত হয় তখন তদ্দ্বারা কোন শুভ কার্য্যের সম্যক্ অনুষ্ঠান হইতে পারে না; মন যখন ইতস্ততঃ হইতেছে তখন কোন শুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা পরামর্শসিদ্ধ নহে। মদোন্মত্ত অশ্বে আরোহণ করিবার সময় মন যদি ইতস্ততঃ হয় তবে আরোহণ কেবল পতনেরই সোপান। কার্য্য করিবার সময় একাগ্র এবং প্রশান্ত মনে কার্য্য করা উচিত, চঞ্চল মনে কার্য্য করা ভাল নহে। পরমেশ্বরের প্রসাদ দ্বারা মনকে অগ্রে প্রশান্ত না করিয়া আমরা যদি সহসা কোন ভারবহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি, তবে অন্ধকারে ইষ্টক নিক্ষেপ করি। কিন্তু তাঁহার প্রসাদবারিতে বলী হইয়া আমরা যখন মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠান করি, তখন আমারদের অন্তঃকরণে যে এক প্রশান্ত গম্ভীর বলের সঞ্চার হয়, তাহা যদিও অলক্ষ্য ভাবে কার্য্য করে, তথাপি তাহার কার্য্য কেহই রোধ করিতে পারে না। পরমাত্মাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আনন্দস্বরূপ বলিয়া যখন আমরা আত্মপ্রত্যয়ে উপলব্ধি করি, তখন তাঁহার সত্তা বিষয়ে আর আমারদের কোন সংশয় থাকে না; যখন তাঁহাকে আনন্দরূপমমৃতং বলিয়া আরাধনা করি তখন আমারদের মন প্রীতিরসে আর্দ্র হয়; যখন তাঁহাকে শান্তং শিব মদ্বৈতং জানিয়া তাঁহার অপার করুণা স্মরণ করি এবং তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করি, তখন তাঁহার নিকট হইতে আমরা অমোঘ বল প্রাপ্ত হই। তিনি শান্ত, বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ বৃক্ষের ন্যায় অটলভাবে তিনি

আকাশে বর্ত্তমান আছেন, তিনি কিছুতেই ক্ষুব্ধ হন না, কিছুতেই চঞ্চল হন না, তাঁহার শক্তি অব্যর্থ। তিনি মঙ্গলস্বরূপ, তিনি আমারদের পিতা মাতা বন্ধু, তিনি অদ্বিতীয়, একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্, একা যিনি অনেকের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, সেই মঙ্গলস্বরূপের উপাসনা ব্যতিরেকে আমারদের নিজের আমারদের পরিবারের আমারদের দেশের কিছুরই মঙ্গল নাই, কুত্রাপি মঙ্গল নাই। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, আমারদের এই মুমূর্ষু অবস্থায় যে একটি অব্যর্থ মহৌষধি তাহা সেবন করিতে কাল-ব্যয় করিও না—ঈশ্বরোপাসনাই সেই মহৌষধি।

ষট্‌চত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ সোমবার ১৭৯৭ শক।

সায়ংকাল।

শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই আমারদিগের এই ব্রহ্ম যজ্ঞের একমাত্র হোতা। আমরা সকলে প্রবৃত্তির দাস হইয়া—প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যে জলাঞ্জলি দিয়া বহির্বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত ছিলাম, অন্তর্যাগের প্রতি উদাসীন হইয়া কেবল হোম-যাগ প্রভৃতি বাহ্য ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলাম, ব্রাহ্মধর্ম্ম—পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়া জীবের প্রকৃত উপাস্য দেবতা যে ব্রহ্ম, তাহা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। যে পুরাণ পর-ব্রহ্ম আর্য্য জাতির কুলদেবতা, যে মধুর ব্রহ্ম নাম আর্য্য সন্তানদিগের দেশ কাল পাত্রের সঙ্গে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতর প্রদেশে "হিরণ্ময়ে পরে কোষে" অর্থাৎ আত্মরূপ উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে নির্দ্দেশ করিয়া আমারদের সকল ব্যাকুলতা তিরোহিত করি-লেন। সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত, সেই ব্রহ্মমুহূর্ত্ত, সেই ব্রহ্মোপাসক ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মণ নামের প্রকৃত গৌরব বর্দ্ধন করিয়া ভারতের অবনত মস্ত-ককে উন্নত করিয়া দিলেন। যে বেদ উপ-নিষদ্ সমুদয় পৃথিবী মধ্যে প্রাচীনতম ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলিয়া নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে; পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহার মধ্য হইতে স্বীয় দেবতা ব্রহ্মকে লইয়া বহির্গত হওত আপনার প্রাচীনত্ব এবং ভারতের প্রকৃত মহত্ত্ব প্রতি-পন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য পৃথিবীর সকল স্থানের কি পুরাতন, কি আধুনিক সকল প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন বা পরিস্ফুটভাবে নিহিত আছে সত্য বটে, কিন্তু সমগ্র ভূমণ্ডলের প্রাচী-নতম, ভারতবাসীদিগের শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেই তাহার প্রথম প্রকাশ। ভারত-বর্ষে তাহার আদিম অনুশীলন, আর্য্য বংশের মধ্যেই তাহার প্রথম অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মধর্ম্ম—উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণের সম্পত্তি, সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম হইলেও আমারদের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ়তম সম্বন্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদিগের পৈতৃক সম্পত্তি, আমারদের নিজস্ব ধন, আবার সাধারণের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমারদের অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। পৃথিবীতে কালে কালে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, কোন ধর্ম্মই সাম্প্রদায়িক দোষশূন্য নহে; ধর্ম্মপ্রচারকদিগের নামানুসারে সকল ধর্ম্মই পৃথ্বীতলে পরিচিত হইয়া আপন আপন অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। যখন জাতি-ভেদের সূত্রপাত হয় নাই, তখন হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের আবরণ স্বরূপ বেদ শ্রুতি সকল আর্য্য-ঋষিগণ দ্বারা নানাবিধ ছন্দোবন্ধে রচিত

হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীয় নাম প্রভাবেই সকলের নিকটে আপনার উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিতেছেন।

বাল্য জীবনের খাদ্য যুবার শরীরকে পোষণ করিতে পারে না, যুবার পুষ্টিকর তেজস্কর অন্ন পান বৃদ্ধের বলবর্দ্ধনে সমর্থ হয় না—পুরাকালের রীতি পদ্ধতি অধুনাতন সময়ের সম্যক্ উপযোগী হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, জনসমাজের সেই শৈশবাবস্থায় ভারতে যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মহারত্ন আবিস্কৃত হইয়াছিল, তাহার সৌন্দর্য্য সেই প্রথম প্রাতঃকালের সূর্য্যের ন্যায় অদ্যাপি সমান ভাবে সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। চির দিনই সকল দেশের বালক যুবা বৃদ্ধ সকলের আত্মাকে পোষণ করিবে।

পৃথিবীতে বেদ পুরাণ, বাইবল কোরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র সকলই অপৌরুষেয় আপ্ত বাক্য বলিযা অভিহিত হইতেছে; পরিদৃশ্যমান জ্ঞান বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ জ্যোতিতে তাহারদের বহু অংশই এখন লোক-সমাজে হীনপ্রভ ও হতাদর হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু জীবন্ত ধর্ম্ম যে কোন গ্রন্থেতে নাই, ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই যে পুরাতন সত্য,তাহা জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যেও কেমন অসঙ্কুচিত ভাবে দীপ্তি পাইতেছে। "অপরা ঋগ্বেদোযজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পোব্যাকরণং নিরুক্তং ছান্দোজ্যোতিষমিতি। অথ পরা যযা তদক্ষরমধিগম্যতে।" "ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ্; এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। যাহার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।" ব্রাহ্মধর্ম্মের এই তেজোময় অমৃতময় উপদেশ কেমন উদার অসাম্প্রদায়িক ভাব প্রচার করিয়া,সমগ্র মানবকে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করাইয়া ধর্ম্মশিক্ষার জন্য সেই ধর্ম্মরাজ মহান্ ভূমা ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতে উপদেশ দিতেছেন। সকলের চক্ষুর আবরণ অন্তরিত করিয়া কেমন সরল ভাবে সকল আত্মাকে জ্ঞান-পিপাসু সত্যসন্ধ এবং ধর্ম্মানুরাগী হইবার প্রশস্ত পথ প্রদর্শন করিতেছেন।

প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব, যথার্থ ঈশ্বরের ভাব, প্রতি মনুষ্যের সহজ জ্ঞানেই প্রকাশ পায় বলিয়া, সভ্যতম প্রদেশের বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নূতন সত্য আবিস্কার করিয়াছেন বলিয়া যতই দম্ভ আস্ফালন করুন না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকটে তাহা পুরাতন বাক্য—চর্ব্বিত চর্ব্বণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। "অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্।" "পরমেশ্বর চক্ষুর অগোচর, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য এবং অব্যবহার্য্য হয়েন। তিনি কোন লক্ষণ দ্বারা গম্য নহেন, তিনি কোন শব্দ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তিনি অচিন্ত্য। এক আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ হইয়াছে। তিনি সমুদয় সংসার ধর্ম্মের অতীত; তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়।" এই মহাবাক্যে তাঁহার অচিন্ত্য স্বরূপ কি সুন্দররূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে! তিনি কোন পরিমিত বস্তু নহেন যে, কোন না কোন লক্ষণ দ্বারা আমরা তাঁহাকে বুদ্ধি-যোগে বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিব, তিনি আমারদের মনের ন্যায় কোন পদার্থ নহেন, যে তাঁহার জ্ঞান শক্তি, চিন্তার আয়ত্ত করিয়া বাক্যেতে তাহা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিব। সেই ভূমা ঈশ্বরের সমান আর দ্বিতীয় বস্তু বিশ্বসংসারে বিদ্যমান নাই, সুতরাং তিনি সংসার ধর্ম্মের অতীত; তিনি মহান্, তিনি অদ্বিতীয়। "কেবল নির্ম্মল সহজ জ্ঞানে তিনি প্রকাশিত হন এবং এক

আত্মপ্রত্যয়ের বলে সেই জ্ঞানগোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষের অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাস করি। জ্ঞান যে অক্কৃত অমৃত অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করে, আত্মা সেই পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্বে প্রত্যয় করে। জ্ঞানেতে সত্য প্রকাশ পায়, এবং সেই সত্যেতে আমারদের আত্মার প্রত্যয় হয়। অতএব এই স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ই তাঁহার অস্তিত্বের প্রামাণ্য স্থাপনের একমাত্র হেতু।" "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্তুতস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। "জ্ঞান-শুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়া নিরবয়ব ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন।"

পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার উচ্চ প্রকৃতি, উন্নত আশার অনুরূপ ধর্ম্মসাধনের যে সুধাময় অক্ষয় পুরস্কার লাভের সম্বাদ প্রচার করিতেছেন, তাহা আর কুত্রাপি শ্রুত হওয়া যায় না। তাহা শ্রবণ করিলে কোন্ মৃতবৎ অসাড় আত্মাতে না আশা আনন্দের সঞ্চার হয়? কোন্ বিষয়-বিমুগ্ধ হৃদয় না জাগ্রত হইয়া উঠে? "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" যিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে স্বীয় শরীরের পরমাকাশে আত্মস্থ করিয়া জানেন; তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করেন।" সংসারের ক্ষুদ্রতম কীট হইয়া সেই ভূমা মহান্ ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের অনুকরণ করিতে পারিব, যে দিকে তাঁহার ইচ্ছার স্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, আমারও ইচ্ছা তাহারই অনুবর্ত্তী হইতে থাকিবে; আমার অন্তশ্চক্ষু তাঁহার সেই উদার মঙ্গল দৃষ্টি উপলব্ধি করিয়া জীবের ভদ্র কল্যাণ দর্শনে সস্পৃহ হইবে—তাঁহার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগ করিব, আপ্তকাম হইয়া, তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া তাঁহার পবিত্র সহবাসে পরিতৃপ্ত হইব, ইহার পর মর্ত্ত্য জীবের অধিকতর সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?

ভবিষ্যত্ আশার প্রতি নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকেও ব্রহ্ম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে প্রলোভন প্রদর্শন করিতেছেন না। ব্রহ্মসাধনের প্রত্যক্ষ ফল এখনই সকলে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর যে পরিমাণে কল্যাণ বর্দ্ধিত হইতেছে, প্রতি ব্রহ্মোপাসক সেই পরিমাণেই আনন্দ অনুভব করিতেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে পরিমাণে সংসিদ্ধ হইতেছে, আমরা সেই পরিমাণেই এখানে আপ্তকাম হইতেছি। লোকের যে পরিমাণে হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইতেছে, ব্রহ্মানুরাগ বৰ্দ্ধিত হইতেছে; আমরা সেই পরিমাণেই বিশদ আত্মপ্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছি। এই যজ্ঞভূমি—উৎসব-ক্ষেত্রই তাহার অমোঘ সাক্ষ্যস্থল। দেখ, সকলে প্রত্যক্ষ দেখ, কত শত সহস্র আত্মা ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায় সংসিদ্ধি বিষয়ে যোগ দিয়া—তাঁহার সহিত যুক্তমনা যুক্তআত্মা হইয়া আজ মর্ত্তের কি অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছেন! আজ্ এখানে যোগানন্দ প্রেমানন্দ অমৃতানন্দের শত সহস্র উৎস প্রমুক্ত করিয়া দিয়া, এই উৎসব-ভূমিকে স্বর্গের অনুরূপ স্থল করিয়া তুলিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদয় ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইলে—সকল নরনারী ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলে, যে এই পৃথিবী কিরূপ ভাব ধারণ করিবে, আমারদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি এখন তাহা অনুভব করিতে পারে না!

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি তোমার বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত কর। সকল আত্মাকে তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মের মধুর আহ্বান শ্রবণে উন্মুক্ত কর। সমুদয় মনুষ্য জাতিকে

তোমার পূজার্চ্চনায় নিযুক্ত কর। সকলকে তোমার সহিত কামনার সমুদয় বিষয় উপভোগে সমর্থ করিয়া কৃতার্থ কর, বিনীতভাবে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

মুখ্য এবং গৌণ।

সভ্যতার কথা-উত্থাপন হইলেই বসন ভূষণের পরিপাট্য প্রভৃতিকে অনেকে মুখ্য পদে বরণ করিয়া থাকেন; সভ্যতার বহিরঙ্গকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন; তদ্ভিন্ন সদ্ভাব সদাচার বিনয় নম্রতা ভ্রাতৃভাব কৃতজ্ঞতা পরোপকারিতা দেশহিতৈষিতা আতিথ্য যথাযোগ্য সম্মান, যথাযোগ্য সমাদর, কর্ত্তব্য কার্য্যে যত্ন, ঔদার্য্য ক্ষমা আর্জ্জব তিতিক্ষা সন্তোষ, উচিত অথচ প্রিয় ভাষণ, ভাবগ্রাহিতা ইত্যাদি সভ্যতার যে গুলি মুখ্য অঙ্গ, এ সকলের প্রতি সমুচিত আদর অতি অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। ইংরাজি সভ্যতাই সভ্যতা,এই এক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকেরা স্বজাতীয় উচ্চতর সভ্যতার প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন। "ইংরাজি সভ্যতাই সভ্যতা" পূর্ব্বে এই মাত্র শুনা যাইত; এখন আমাদের দেশে সভ্যতার এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছে যে, "ইংরাজি গৃহই গৃহ, বাঙ্গালিদের গৃহ নাই" এই এক আশ্চর্য্য অদ্ভুত নূতন কথার আন্দোলন কোথাও কোথাও শুনা যাইতেছে। "বাঙ্গালিদের গৃহ নাই" ইহার অর্থ এই যে, প্রকৃত গার্হস্থ্য ভাব যে কি তাহা বাঙ্গালিরা জানে না। কি হাস্য-জনক কথা।—অথচ ঐ কথা, ধীর গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত হইয়া থাকে, ধীর গম্ভীর ভাবে শ্রুত হইয়া থাকে, কেহ তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, সকলেই সাধুবাদ এবং ধন্যবাদ বর্ষণ পূর্ব্বক ঐ অসার অপদার্থ বচনকে অতীব গুরুতর করিয়া তুলেন। যে হিন্দুরা পিতা মাতাকে গৃহদেবতা বলে, স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী বলে, বালকশূন্য গৃহকে শ্মশানসমান বলে, যে হিন্দুরা ভদ্রাসন বাটী হস্তান্তর করিতে হইলে মৃত্যুতুল্য মনে করে,যে হিন্দুরা গৃহকে আশ্রম বিশেষ বলিয়া ভক্তি করে, সেই হিন্দুরা গার্হস্থ্য-রসে বঞ্চিত! কি সে অপূর্ব্ব সভ্যতা যাহার সংস্পর্শে গৃহ অগৃহ হয়, পিতা অপিতা হয়, ভ্রাতা অভ্রাতা হয়!—এরূপ হৃদয়-শূন্য জীবন-শূন্য কাষ্ঠ-সভ্যতা যাঁহারদের প্রয়োজন, তাঁহারা হিম-প্রধান দেশের তুষার রাশির মধ্যে গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের মনস্কামনা চরিতার্থ করুন। আমাদের এই ভারতবর্ষে, এই প্রাচীন পুণ্য ভূমিতে, সেই সভ্যতাই জন্ম জন্ম বিরাজ করুক, যে সভ্যতা জননী এবং জন্ম ভূমিকে স্বর্গ হইতেও গরীয়সী বলিয়া হৃদয়ে পোষণ করে।

"অপরের গৃহ আছে আমাদের গৃহ নাই, এ বাক্য যে ব্যক্তি মুখে উচ্চারণ করিতে পারে, সে ব্যক্তি কি না বলিতে পারে? আপনার গৃহের প্রতি অভক্তি হয় কাহার? মাতা পিতার প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, বন্ধু বান্ধবের প্রতি যাহার অভক্তি হইয়াছে, যাহার অন্তঃকরণ দ্বেষ হিংসাদি কালসর্পের আবাস স্থান, প্রীতি ভক্তির যেখানে নাম গন্ধ নাই, এমনি মরুভূমি-তুল্য যাহার হৃদয়, এমন ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহার? গৃহ কুটীর হইলেও কি তাহা রাজঅট্টালিকা নহে! গৃহের ন্যায় পবিত্র সামগ্রীকে যাঁহারা অপরের সহিত তুলনা করিতে যান তাঁহারদের রুচিকে ধন্য! অন্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে গৃহের প্রতি যাঁহাদের অভক্তি জন্মে, তাঁহারদের হৃদয়কে ধন্য!! এবং

আপনার গৃহের কি ভাল কি মন্দ ইহা যাঁহারা পরের নিকটে শিক্ষা করিতে যান তাঁহারদের বুদ্ধিকে ধন্য (১) !!!.

হৃদয়ের যে সভ্যতা তাহাই মুখ্য সভ্যতা—আর যত প্রকার সভ্যতা তাহা গৌণ সভ্যতা। গৃহ ইংরাজী রীতি অনুসারে সজ্জিত না হইলে কি তাহা গৃহ হয় না? সভ্যতা ইংরাজি রুচি-সম্মত না হইলে কি তাহা সভ্যতা হয় না? হিন্দু জাতির রীতি নীতি আচার ব্যবহারে যেমন একটি অকৃত্রিম সহজ শোভন ভাব প্রকাশ পায়; তেমন আর কোথায়? মুখ্য সভ্যতা তাহাকে বলে যাহা হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হয়, অন্য যত প্রকার সভ্যতা তাহা মৌখিক এবং কৃত্রিম। দেশীয় প্রথানুসারে নমস্কার বা প্রণাম করাতে যেমন শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করা হয়, ইংরাজি প্রথানুসারে শুদ্ধ কেবল মস্তক নত করিলে তাহার অর্দ্ধাংশও হয় না। দেশীয় প্রথানুসারে সাদরে আহ্বান করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করাতে যেমন প্রীতি এবং সদ্ভাব প্রকাশ করা হয়, ইংরাজি প্রথানুসারে চটুলভাবে হস্তালোড়ন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তেমন কখনই হয় না। ইংরাজেরা বলেন যে "থ্যাঙ্ক্" এই শব্দ যেমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশক, আমাদের দেশে সেরূপ কোন শব্দ প্রচলিত নাই; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, আমারদের জাতি বড়ই অকৃতজ্ঞ জাতি। "থ্যাঙ্ক্" শব্দের মূল-ধাতু "থিঙ্ক্" শব্দ; "থ্যাঙ্ক" শব্দের অর্থ এই তুমি আমার মনে রহিলে; অথবা তুমি আমার যে উপকার করিলে তাহা আমার মনে রহিল। "কৃতজ্ঞ" এ শব্দেরও অর্থ ঐরূপ। আমারদের দেশে উপকৃত ব্যক্তি কোন স্থলে নমস্কার করে, কোন স্থলে জয়ী হও, সুখে থাক, চিরজীবী হও, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন, এইরূপ শব্দ সকল ব্যবহার করে। মৌখিক একটা কথা ঝটিতি উচ্চারণ করিয়া, দ্রুতগতি ঋণমুক্ত হইবার প্রথা আমারদের দেশে নাই বলিয়াই প্রামাণ হইতেছে যে, আমারদের জাতি মৌখিক কৃতজ্ঞ নহে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। দ্রুতগতি দুই একটি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরস্পরকে মৌখিকরূপে আপ্যায়িত করাকে যদি সভ্যতা বল, তবেই যাহা হউক, নচেৎ আমারদের দেশের সভ্যতা উৎকৃষ্টতর তাহাতে আর সংশয় নাই। যন্ত্রাদি বিষয়ে ইংরাজদিগের অশেষ পারদর্শিতা আছে, ইহা মানিলাম, কিন্তু ঈশ্বর-বিরচিত যন্ত্র যে হৃদয় তাহার নিকটে আর তাবৎ যন্ত্রকেই

(১) কোন একটি আমেরিকান্-মিসনরি-স্কুলের বালকের সহিত তত্রত্য সাহেবের নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল। বালক আপনিই লেখকের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিয়াছে।

সাহেব—তোমারদের স্ত্রীলোকেরা বড় নিষ্কর্ম্মা—আমাদের স্ত্রীলোকেরা দেখ দেখি কেমন কর্ম্মঠ।

বালক—আমাদের স্ত্রীলোকেরা ত সর্ব্বদাই কাজ করে—রন্ধন করে, অতিথিসেবা করে, গৃহকার্য্য সমস্তই ত তাহারা করে।

সাহেব—ও সকল কাজ আমরা কাজের মধ্যেই ধরি না। আমাদের স্ত্রীলোকেরা নেবু হইতে রস বাহির করিয়া ফেলিয়া তাহার অবশিষ্ট অংশে লবণ সংযোগ করিয়া একরূপ আচার প্রস্তুত করে—তাহা তোমাদের স্ত্রীলোকেরা পারে?

বালক—না তাহা পারে না।

সাহেব—তোমাদের স্ত্রীলোকেরা যদি তাহা শিখিতে ইচ্ছা করে তবে আমি তাহার সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছি।

সাহেবের এই কথা শুনিয়া বালকের মনে অবশ্য ইহা ধ্রুবজ্ঞান হইল যে, বাস্তবিক অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা বড়ই নিষ্কর্ম্মা! কেন? না যে হেতু তাহারা উক্তরূপ আচার প্রস্তুত করিতে জানে না! কি চমৎকার যুক্তি! দেশীয় প্রথানুসারে যে যত কার্য্য করুক, তাহা কার্য্যই নহে। রাশি রাশি উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তুত করুক, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। সাহেবি প্রথানুসারে যৎসামান্য নেবুর আচার প্রস্তুত করিলেই আমারদের স্ত্রীলোকেরা ধন্য ধন্য এবং কৃতকৃতার্থ হইবেন! বাল্যকাল হইতে এই সকল শিক্ষা লাভ হইলেই বঙ্গদেশ অচিরেই এক অপূর্ব্ব "স্বর্গরাজ্যে" পরিণত হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। নিতান্ত বালকের মনে এরূপ পরমুখাপেক্ষিতা শোভা পায়, কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা পরের মনোরঞ্জনার্থে বা পরের বুদ্ধি শুনিয়া আপনার গৃহের প্রতি অভক্তি প্রদর্শন করেন ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয়।

নতশির হইতে হয়, ইহা কখনই আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমারদের দেশের সভ্যতা হৃদয়-প্রধান, ইংরাজদিগের সভ্যতা যন্ত্র-প্রধান। ইহার মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য কোন্‌টি গৌণ, সহৃদয় লোকই তাহা বিবেচনা করিবেন।

পিথগোরসের জীবন চরিত।

৩৯০ সংখ্যক পত্রিকার ১৮৫ পৃষ্ঠার পর। •

দর্শন-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য বিষয়ে পিথগোরসের মত এই যে,যাহা দ্বারা মন সর্ব্ব প্রকার বিষয়-জঞ্জাল হইতে বিমুক্ত হইয়া যাহা অপরিবর্ত্তনীয় সত্য তাহার চিন্তায় উত্থিত হইতে পারে এবং আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক বিষয় সকলের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে দর্শন-শাস্ত্র বলা উচিত। মনকে এবম্বিধ উন্নতাবস্থায় উত্থাপিত করা কিঞ্চিৎ কঠিন ব্যাপার; সুতরাং তাহার নিমিত্ত বিবিধরূপ সোপান আবশ্যক। তাঁহার মতে মনের জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে হইলে গণিত শাস্ত্রকে তাহার প্রথম সোপান স্বরূপ জানিয়া আশ্রয় করা বিধেয়। কারণ গণিতালোচনা দ্বারা মন চিন্তাপরায়ণ হয় এবং ইহা দ্বারা ভৌতিক ও অভৌতিক বিষয় সমূহের মধ্যবর্ত্তি যে সকল বিষয় তাহার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়। তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্রকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতেন, যথা, সংখ্যা বিজ্ঞান ও আয়তন বিজ্ঞান। তাঁহার মতে সংখ্যা বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত— পাটীগণিত ও সঙ্গীত। আয়তন বিজ্ঞান দুই ভাগে বিভক্ত, যথা, অচল আয়তন বিজ্ঞান ও সচল আয়তন বিজ্ঞান। অচল আয়তন ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতির বিষয় এবং সচল আয়তন জ্যোতিষ্ শাস্ত্র প্রভৃতির বিষয়। তিনি পাটীগণিতকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং সংখ্যা সম্বন্ধীয় ব্যুৎপত্তিকে পরম মঙ্গলকর সামগ্রী জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন, সংখ্যাই যাবতীয় বিষয় ও পদার্থের মূল স্বরূপ। তাহা দ্বিবিধ যথা, বৈজ্ঞানিক সংখ্যা ও অনুমেয় সংখ্যা। যে সংখ্যা এক হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহা এক এই মূল সংখ্যায় পুনর্ব্বার পরিণত হইতে পারে, তাহাই বৈজ্ঞানিক সংখ্যা। মূল সংখ্যা অসীম নহে বটে, কিন্তু সমুদয় পদার্থই যে অসীম তুল্য অংশে বিভক্ত হইতে পারে, তাহা আবার সেই সংখ্যা ভিন্ন আর কিছুতেই নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। অপরন্তু, যে রূপ সংখ্যার ভাব সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের মনে ছিল,তাহাকেই অনুমেয় সংখ্যা বলা যাইতে পারে। তিনি বলেন, ঈশ্বরে প্রথমতঃ সংখ্যা বোধ উদিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই যাবতীয় পদার্থের বীজ উৎপন্ন হইল। জগতে এক দুই প্রভৃতি কোন সংখ্যক অণু বা পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত না হইলে কিছুই হইতে পারে নাই। এইরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত চিন্তা করিয়া দেখিলেই পিথগোরসের মতের সূক্ষ্মতা অনুভূত হইতে পারে। অপরন্তু, তিনি আবার সংখ্যা দ্বারা সমুদায় বিষয় সঙ্কেতে প্রকাশ করিতেন। ঈশ্বরকে তিনি এক এই সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিতেন; কারণ, এক এই সংখ্যা হইতে যেমন আর আর সমুদায় সংখ্যা উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ ঈশ্বর হইতেও যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে!

পিথগোরসের মতে ব্রহ্মসাধকদিগের সংখ্যা-গণিত অধ্যয়নের পর সঙ্গীতানুশীলন করা বিধেয়; তদ্দ্বারা মন নীচ প্রবৃত্তি সমুদায়ের অধীনতা হইতে প্রমুক্ত হইয়া শান্ত সমাহিত হইতে পারে। পিথগোরস্ সঙ্গীতকে বিজ্ঞান শাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া গণিতের ন্যায় তাহার বিবিধরূপ সূত্র ও মান নির্দ্ধারণ করিবার সঙ্কল্প করেন। কথিত আছে, তিনি কয়েক ব্যক্তিকে এক খণ্ড তপ্ত

লৌহ নিয়ালির উপর রাখিয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিতে দেখিয়া সঙ্গীত যন্ত্রের বিবিধ তারের সুরের মান নির্দ্ধারণ করেন। ডাক্তার বার্লী এইরূপ প্রবাদের যাথার্থ্য অস্বীকার করিয়া প্রাচীন ও আধুনিক চরিতলেখকদিগের মতানুসারে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,তিনি সুরমান যন্ত্রের আবিস্ক্রিয়া করিয়াছিলেন (১)।

পিথগোরস্ মিসর দেশে যাইয়া ক্ষেত্রতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিই তৎসম্বন্ধীয় অনেক নূতন প্রতিজ্ঞা সাধন এবং তাহার নিয়মগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহাকে প্রকৃত বিজ্ঞানের পদে অভিষিক্ত করেন। তিনি ক্ষেত্রতত্ত্বীয় বিন্দুকে একাত্মক, রেখাকে দ্ব্যাত্মক, সমতল ক্ষেত্রকে ত্র্যাত্মক এবং ঘন বস্তুকে চতুরাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে মহামতি ইউক্লিডের ক্ষেত্রতত্ত্বে যে সমুদয় প্রতিজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ই বস্তুতঃ তাঁহার নিজাবিস্কৃত নহে। পিথগোরস্ তন্মধ্যে কতিপয় প্রতিজ্ঞা সাধন করেন। কথিত আছে যে, তিনি প্রথম পুস্তকের ৪৭ প্রতিজ্ঞা অবিস্কার করিয়া দেবতাদিগের সন্তোষার্থ পশুবলী প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কিংবদন্তীর যাথার্থ্য বিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বীকার করেন না। কারণ, তাঁহারা বলেন, যখন পিথগোরস্ জীব হিংসার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তখন তিনি কখনই এরূপ কার্য্য করেন নাই।

পিথগোরস্ শুদ্ধ যে গণিত, সঙ্গীত ও দর্শন শাস্ত্রেরই যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এমত নহে, তাঁহার দ্বারা জ্যোতিষ্ শাস্ত্রেরও অল্প উন্নতি হয় নাই। তিনি জ্যোতিষ্ শাস্ত্র সম্বন্ধে তদীয় ছাত্রদিগকে যেরূপ সমুদায় উপদেশ দিতেন, তাহার সারাংশ এস্থলে সংগৃহীত হইল। জগৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এই চারি প্রকার রূঢ় পদার্থে নির্ম্মিত। সূর্য্য সমুদায় গ্রহ, উপগ্রহাদির কেন্দ্ররূপে স্থিতি করিতেছে। পৃথিবীর আকার গোল এবং তাহার উপরি ভাগের যে অংশ আমাদিগের সম্বন্ধে নিম্ন দিকে স্থিত, তাহাতেও আমাদিগের ন্যায় লোকের বসতি আছে। সূর্য্যকিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয়, তাহাতেই আমরা চন্দ্রের প্রতিভা উপভোগ করিতে পাই। নক্ষত্রগণ পৃথিবীর ন্যায় অবয়ব-বিশিষ্ট; তাহাতে মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি সকলই আছে। পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রেও লোকের বসতি আছে। ধূমকেতু সকল ভ্রাম্যমান নক্ষত্র বিশেষ, যখন তাহারা তাহাদিগের কক্ষার নিম্ন-ভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই তাহারা আমাদিগের দর্শনগোচর হয়, আর যখন তাহারা স্ব স্ব কক্ষার ঊর্দ্ধভাগে গমন করে, তখনই অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ছায়াপথের যে শুভ্রবর্ণ, তাহা তদন্তর্গত অসংখ্য নক্ষত্রের কিরণ জাল হইতেই সমুৎপন্ন হয়। তিনি অনুমান দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও গ্রহাদির দূরতার পরিমাণ সকল পরস্পর বিশেষরূপ নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ। তিনি সেই প্রাচীন কালে একটি গোলক নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা রাশি-চক্রের মধ্য দিয়া সূর্য্যমণ্ডলের তির্য্যক গতি সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। প্রভাত ও সায়ংকালে যে উজ্জলতম নক্ষত্রটি নভোমণ্ডল-পার্শ্বে উদিত হয়, তাহা যে বুধ-গ্রহ, তাহা গ্রীশ দেশে তিনিই প্রথমে সপ্রমাণ করেন (২)।

পিথগোরসের মত এই যে, যে সকল

(১) স্বরমান যন্ত্রের ইংরাজী নাম Harmonical Canon বা Monochord উহাতে একটিমাত্র তার থাকে এবং যে স্থানের উপর দিয়া সেই তারটি বিস্তৃত, তাহাতে স্বরের মান নিরূপণার্থে একাদি সংখ্যা সন্নিবেশিত থাকে।

(২) পণ্ডিতবর কোপার্নিকাস গ্রীসদেশীয় প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণের মধ্যে পিথগোরসের মত গুলির প্রতিই বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতেন।

বিষয় স্বভাবতঃ অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য ও অবিনশ্বর, মানবজ্ঞান স্বভাবতঃ তৎসমুদায়েরই তত্ত্বগ্রাহী এবং মনকে ব্রহ্মেতে নিয়োগ দ্বারা আমাদিগকে দেবতাদিগের সহবাসোপযোগী করাই সেই জ্ঞানের একমাত্র চরম লক্ষ্য। যে নীতিবিজ্ঞান দ্বারা আমাদিগের জীবন নিয়মিত হয় এবং যাহার দ্বারা নীত হইয়া আমরা স্বকীয় ও সমাজ সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যাবলী সম্পাদন করিয়া থাকি, তৎসম্বন্ধে পিথগোরসের অনেক গুলি উপদেশ অতীব চমৎকার। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে তাঁহার কতকগুলি উপদেশের আবার কেহই কোন তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পিথগোরস্ বলিতেন যে দর্শন শাস্ত্র দ্বারা এই জগতের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নিরূপিত হয় বলিয়া তাহা মানবগণের অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠতম বিষয়। তিনি সেই দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে শিষ্যদিগকে যে সমুদায় শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কেহই অদ্যাপি প্রায় কিছুমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই।

ব্রহ্ম বিষয়ে পিথগোরসের সিদ্ধান্ত এই, —ব্রহ্ম এই জগতের যাবতীয় পদার্থ-ব্যাপ্ত মন ও চৈতন্যস্বরূপ, প্রতি মানবাত্মা তাঁহারই অংশ বিশেষ। সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি অসংখ্য অচেতন ভৌতিক পদার্থ-বীজের সহিত জড়িত ছিলেন, পরে যখন সেই বীজসমষ্টি দ্বারা সৃষ্টি ক্রিয়া সমাধা করিলেন, তখন তিনি আপন শক্তিতে তাহা হইতে স্বতন্ত্র হইলেন এবং তদবধি সেই স্বতন্ত্রাবস্থাতেই আছেন। কড্ওয়ার্থ নামক জনৈক পণ্ডিত বলেন যে, পণ্ডিতবর প্লেটোর ন্যায় পিথগোরস্ও ব্রহ্মকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া স্বীকার করিতেন। কড্ওয়ার্থ বলেন যে, প্লেটো যে সকল দেশ পর্য্যটন করিয়া ব্রহ্মকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পিথগোরস্ তাঁহার বহুকাল পূর্ব্বে সেই সকল দেশপর্য্যটন করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি যে ত্রিগুণাত্মক মত কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

পিথগোরস্ আরো বলেন যে, এই জগতে জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে দেবতা দৈত্য ও অসুর, এই ত্রিবিধ জীব আছেন। তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন এবং সকলেরই বিভিন্নরূপ গুণগৌরব ও পদমর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহার মত এই যে, এই ত্রিবিধ জীব এবং মানবাত্মা সকলেই একমাত্র নিরবয়ব ব্রহ্মের স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। ইহার মধ্যে যিনি তাঁহা হইতে যতদূরে অবস্থিত, তিনি তত স্থূল প্রকৃতি সম্পন্ন এবং যিনি যত সন্নিকটস্থ তিনি তত সূক্ষ্ম প্রকৃতি সম্পন্ন (১)।

তাঁহার মতে মনুষ্য দুইটি উপাদানে নির্ম্মিত। একটি উপাদান তাঁহার ভৌতিক শরীর এবং আর একটি উপাদান তাঁহার প্রজ্ঞাবান আত্মা। তাঁহার নিত্যচৈতন্যবিশিষ্ট আত্মা আবার দুই ভাগে বিভক্ত, যথা জ্ঞান ভাগ ও প্রবৃত্তি ভাগ। জ্ঞান ভাগ মস্তিস্ক এবং প্রবৃত্তি ভাগ হৃদয়স্থিত। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, অপরাপর প্রাণীর আত্মাতেও এইরূপ দুইটি বিভাগ আছে, কিন্তু তাহাদিগের শারীরিক গঠন প্রকৃতি মনুষ্যের ন্যায় নহে বলিয়া তাহাদিগের প্রবৃত্তি ভাগ যেরূপ স্ফূর্ত্তি পায়, জ্ঞান ভাগ তদ্রূপ স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। মনুষ্যের দেহ পতনের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় আত্মার প্রবৃত্তি ভাগেরই বিনাশ হয়, কিন্তু তদীয় জ্ঞান ভাগ শরীর হইতে মুক্ত হইয়া, আকাশ আশ্রয় পূর্ব্বক পরলোকে বিচরণ করে। সেই জ্ঞান ভাগ যতদিন ঈশ্বরেচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া

(১) হাইরোক্লিস্ অসুরদিগের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—অসুরেরা প্রজ্ঞাবান জীব, তাহাদিগের দেহ জ্যোতির্ম্ময়।

পুনর্ব্বার কোন জীব শরীরে অবস্থিতি করিবার জন্য সংসার-ক্ষেত্রে প্রত্যাগত না হয়, তত দিন তাহা সেই পরলোকেই থাকে।

পিথগোরসের জীবন চরিত লেখকদিগের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের আত্মা সম্বন্ধে তাঁহার এবংবিধ সিদ্ধান্ত ছিল বলিয়াই তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ মাংস ভোজন করিতেন না। শুদ্ধ যে মাংস ভোজন করিতেন না এমত নহে, তাঁহারা আবার প্রাণী মাত্রের প্রতি যার পর নাই সদয় ব্যবহার করিতেন।

পিথগোরসের সাঙ্কেতিক উপদেশ গুলি শিষ্যমণ্ডলীতে গোপ্য ছিল ; তাহার বিশেষ কিছুই জানা যায় না, কিন্তু নিম্নে তাহার কিয়দংশ সংগৃহীত হইল।

যে বায়ু মৃদুভাবে বহিতে থাকে, তজ্জনিত শব্দকে ভজনা করিবে। তরবারি দ্বারা অগ্নিকে আলোড়িত করিও না। শাণিত অস্ত্র হইতে দূরে থাকিবে। তুলাযন্ত্রের (মান যন্ত্র) উপর দিয়া গমন করিও না। কোন স্থানে যাইবার জন্য বাহির হইয়া ফিরিয়া আসিও না, কারণ উদ্যম-বেগ সকল তোমার সহিত ফিরিয়া আসিবে। যে সকল জীবের নখ বক্র তাহাদিগকে পালন করিও না। সোয়ালো পক্ষিকে তোমার বাটীতে আহ্বান করিও না। বাতির আলোকে দর্পণে মুখ দেখিও না। বলিদান সময়ে তোমার নখাগ্র কর্ত্তন করিও না। কাহারও হৃৎপিণ্ড বা মস্তিস্ক ভক্ষণ করিও না। যাহা টেবল হইতে পতিত হইয়াছে তাহা আর ভোজন করিও না। রোটিকা ভাঙ্গিও না। মধ্যাহ্নে নিদ্রা যাইও না। যখন বজ্রপাত হয় তখন ভূমি স্পর্শ করিও। দাঁড় কাককে পাতিত করিও না। অগ্নিসংস্কৃত দ্রব্যকে আর অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিও না। ভূমির উপর দিয়া নৌকায় পাইল তুলিয়া যাইও না। তাল বৃক্ষ রোপণ করিও না। কুক্কুট পালন করিবে, কিন্তু তাহা বধ করিবে না, কারণ তাহা সূর্য্য চন্দ্রের নিকট অতীব পবিত্র জীব বলিয়া পরিগণিত। তোমার উদ্যানে ম্যালো বৃক্ষ রোপণ করিবে, কিন্তু তাহা ভক্ষণ করিবে না। বৃক্ষ লতাদির সিম ভক্ষণ করিও না। বিশেষ বিবেচনা না করিয়া পিথগোরসের মত সকল লইয়া বিতর্ক করিও না। সর্ব্বোপরি তোমার জিহ্বাকে শাসন কর। অঙ্গুরীয়োপরি ঈশ্বরের মূর্ত্তি খোদিত করিও না। সৈন্যাধ্যক্ষের আজ্ঞা বিনা তোমার স্থান ত্যাগ করিও না। স্মরণ রাখিবে যে, পাপ ও পুণ্যের দুইটি পথ Y এই অক্ষরটির ন্যায়।

তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ ও আদর্শ-যোগ্য। কিন্তু অনেকেই তাঁহার দর্শন ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মতগুলির অস্পষ্টভাব ও সাংকেতিক উপদেশ গুলির আপাতত অনর্থকতা দেখিয়া, তাঁহাকে প্রবঞ্চক বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি যে কালে জন্ম গ্রহণ করিয়া যেরূপ বিপক্ষবাদী লোকদিগের সংস্কার চেষ্টায় জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয় কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ঐরূপ কারণে তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ করিতে পারেন না। তাঁহার সময়ে গ্রীসের লোকেরা নব পরিবর্ত্তন মাত্রের প্রতি যার পর নাই বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন, সুতরাং তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই দর্শন ও ধর্ম্ম মত গুলিকে রহস্যপূর্ণ এবং উপদেশ গুলিকে সাংকেতিক ভাষায় প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৩ ফাল্গুন রবিবার বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাসুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩২। কলিগতাব্দ ৫০১১। ১ ফাল্গুন শনিবার।

Registered No 52.

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
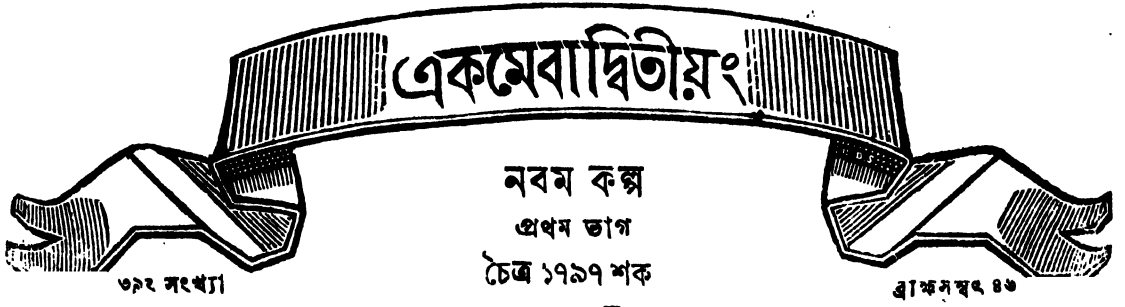
নূতন ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর-
ভূমি, মঙ্গলের তুমি মূলাধার॥
নানা-রস-যুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়।
মহা কবি! আদি কবি! ছন্দে উঠে
শশি-রবি, ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়॥
তারকা কনক-কুচি জলদ-অক্ষর-রুচি,
গীত-লেখা নীলাম্বর-পাতে।
ছয় ঋতু সংবৎসরে মহিমা কীর্ত্তন-করে,
সুখ-পূর্ণ চরাচর-সাথে॥
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার
শান্তি, বজ্র-রবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগ-যুগান্ত অসীম॥
আনন্দে সবে আনন্দে তোমার চরণ বন্দে,
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র-তারা।
তোমারি এ রচনারি ভাব লয়্যে নর-নারী
হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা॥
মিলি' সুর-নর-ঋভু, প্রণমি' তোমায় বিভু,
তুমি সর্ব্ব-মঙ্গল-আলয়।
দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও
ক্ষেম, দেও দেও ও-পদ-আশ্রয়॥

চটামহেশতলা সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ

২ ফাল্গুন ১৭৯৭ শক।

আমারদের দেশের পূর্ব্বকালীন ভাব সকলই যে ভাল ছিল এমন নয়, সকলই যে মন্দ ছিল এমন নয়। যাহা মন্দ ছিল তাহা বিদ্যার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতেছে, এবং এমন আশা হয় যে কাল-স্রোতের প্রবল-বেগে তাহা সমূলে উন্মূলিত হইয়া যাইবে। কিন্তু যাহা ভাল ছিল, তাহাকে আমরা আদরের সহিত গ্রহণ না করিলে; তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে। আমরা আপনার ভাল আপনারা করিব, ঈশ্বরের এই উদ্দেশ্য; আমারদের দেশের যে-সকল শুভজনক রীতি নীতি আচার ব্যবহার, তাহা মঙ্গলময় পরমেশ্বর স্বয়ং আমাদিগকে দিয়াছেন; তাঁহার সে দানের

প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা কি সামান্য স্পর্দ্ধার কথা? "হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন, শুকাশ্চ হরিতীকৃতা, ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন," যিনি হংসদিগকে শুক্লবর্ণ প্রদান করিয়াছেন, শুকদিগকে হরিৎবর্ণ প্রদান করিয়াছেন এবং ময়ূরদিগকে বিচিত্র বর্ণ প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আমারদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন। আমারদের দেশের প্রতি ঈশ্বরের এই যে অমূল্য দান ইহা মাথায় করিয়া লওয়া উচিত। হংস যদি বলে যে, আমি শুকপক্ষীর ন্যায় হরিৎবর্ণ চাই, কিংবা যদি শুকপক্ষী বলে যে, আমি হংসের মত শ্বেতবর্ণ চাই, অথবা আমারদের দেশীয় লোকেরা যদি বলে যে, আমরা আরব দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র চাই, অথবা আরব দেশীয় লোকেরা যদি বলে যে আমরা ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মশাস্ত্র চাই, তবে তাহাতে ইহাই প্রকাশ পায় যে, শ্বেত-বর্ণতে হংসের যে কি শোভা হয় হংস তাহা বুঝে নাই, হরিৎবর্ণে শুকের যে কি শ্রী সৌন্দর্য্য হয় শুক তাহা বুঝে নাই, আরবীয় এবং ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র তৎতৎ দেশীয় লোকের পক্ষে যে কেমন উপযোগী তাহা তাঁহারা বুঝেন নাই; যদি তাহা বুঝিতেন তবে বলিতেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" অবশ্য ঈশ্বরের যাহা দান, তাহাকে মালিন্য হইতে মুক্ত করিয়া তাহার নৈসর্গিক শোভাকে সর্ব্বদা সমুজ্জ্বল রাখা উচিত। শ্রেয়সী ব্রহ্মবিদ্যা ভ্রম প্রমাদ ও কুসংস্কারে জড়িত না হয়, স্বচ্ছ ব্রাহ্মধর্ম্ম পৌত্তলিকতাতে কলঙ্কিত না হয়, শুভ আচার ব্যবহার রীতি-নীতি-সকল অনার্য্য আচার ব্যবহার দ্বারা দূষিত না হয়, ইহাতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। কিন্তু আমারদের পূর্ব্বপুরুষদিগের হস্ত হইতে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-সমন্বিত যে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অমূল্য এবং অমোঘ দান প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমারদের সংসার-সাগরের ভেলা, পাপ তাপের মহৌষধি, তাহা আমারদের আত্মার অতি যত্নের ধন, তাহা যেন আমরা পরিত্যাগ না করি; তাহার শুভ্র শ্বেতবর্ণের উপর আমরা যেন মিশ্র বর্ণের সংযোগ দ্বারা তাহাকে চিত্র-বিচিত্র করিতে না যাই; ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিবার বস্তু, চিত্র-বিচিত্র করিবার সামগ্রী নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হ্রাস বৃদ্ধি করিবার চেষ্টাতে যে সময় ক্ষেপণ করিতেছ, তাহাকে পালন করিবার চেষ্টাতে সেই সময় ক্ষেপণ কর, আপনিই বলিবে যে, পূর্ব্বে কি বৃথা কার্য্যে লিপ্ত ছিলাম, এক্ষণে আমার শ্রম সার্থক হইল, আমার মন তৃপ্ত হইল! ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ সুধা যখন পাইয়াছ তখন তাহা পান কর, সুধাকে মিষ্ট করিবার জন্য তাহাতে শর্করা সংযোগ করিতে হইবে না, সুধা পান কর। ব্রাহ্মধর্ম্মকে উপাদেয় করিবার জন্য তাহাতে মিশ্রধর্ম্মের সংযোগ করিতে হইবে না, ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন কর।

কিন্তু শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। ব্রাহ্মধর্ম্ম যেমন শ্রেয়স্কর, তেমনি তাহার বিঘ্ন অনেক। আশ্চর্য্য এই যে, বিদ্যা কোথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বার খুলিয়া দিবে, না তাহাই আরো ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বার রোধ করিয়া দিতেছে। বিদ্যার কোন দোষ নাই। অবিদ্যা-রূপ মায়াবিনী বিদ্যার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, বিদ্যা নামে আপনার পরিচয় দিয়া, জনসমাজে অকুতোভয়ে বিচরণ করিতেছে। বিদ্যার গম্ভীর ভাব, বিদ্যার মহত্ত্ব, ভাবিয়া দেখিলে কি কখন এমন বিশ্বাস হইতে পারে, যে, বিদ্যা নাস্তিকতার জননী। অবিদ্যাই নাস্তিকতার প্রসূতি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া যাঁহারা মনে করেন যে ইহার ঊর্দ্ধে আর কিছুই নাই, তাঁহাদের সেই বিদ্যাভিমান যেন বিদ্যা নামে উক্ত না হয়, অবিদ্যাই তাহার যথার্থ নাম। তাহা কি বিদ্যা নহে যাহা সমুদায় জগতের তত্ত্ব আমারদের নিকট

প্রকাশ করে? পৃথিবীর আদিম কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত যে কেবল এক অবিশ্রান্ত উন্নতির ব্যাপারই চলিয়া আসিয়াছে তাহা যাহা দ্বারা জানা যায় তাহা কি বিদ্যা নহে? সমুদায় জগতের মধ্যে পরস্পর কেমন একটি সৌসাদৃশ্য সুশৃঙ্খলা এবং যোগাযোগ রহিয়াছে, তাহা যাহা-হইতে শিক্ষা পাওয়া যায় তাহা কি বিদ্যা নহে? যাহাতে নাস্তিক্য বুদ্ধি দৃঢ় হয়, যাহাতে মনের স্বাস্থ্য দূরে পলায়ন করে, যাহাতে সংশয়ান্ধকার ঘনীভূত হয় তাহাই কি বিদ্যা? অবিদ্যাই কি বিদ্যা? জ্ঞানের প্রশস্ততা এবং জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য এ দুটি যেখানে আছে, সেই. খানেই প্রকৃত বিদ্যার বসতি জানিবে। এবং যেখানে জ্ঞানের সঙ্কোচ ভাব, এবং চটুলতা দেখিবে, সেই খানেই অবিদ্যার প্রাদুর্ভাব জানিবে। অনেক বিষয় এমন আছে যাহা আমরা বুঝিতে পারি না, অনেক বিষয় এমন আছে যাহা আমরা বুঝিতে পারি। যাহা বুঝিতে পারি না, তাহার জন্য এত আক্ষেপ করা উচিত হয় না যে, যাহা বুঝিতে পারি তাহার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করি। এক জন কেন ধনী হইল, আর এক জন কেন দরিদ্র হইল, ইহার বিশেষ মর্ম্ম আমরা জানিতে পারি না—ইহা সত্য, কিন্তু সামান্যত আমরা জানিতেছি যে, উভয়েরই মঙ্গল উদ্দেশ্য। চক্রকে চতুষ্কোণে পরিণত করা একটি অতীব দুরূহ ব্যাপার; গণিত বিদ্যা অদ্যাপি তৎসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; তাহা বলিয়া কি গণিত বিদ্যা মূলেই কিছুই নহে? সেইরূপ ঈশ্বর বিষয়ক কতকগুলি তত্ত্ব আমরা সবিশেষে জানি না বলিয়া কি ব্রহ্মবিদ্যা কিছুই নহে? এরূপ কথা-সকল জ্ঞানবিদ্বেষী অবিদ্যার মুখেই শোভা পায়। অতএব ইহা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে বিদ্যা কখনই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপক্ষতা করিতে পারে না, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপক্ষতা যে করে সে অবিদ্যা। ব্রাহ্মধর্ম্ম অতীব পুরাতন কালের বটে, কিন্তু বিদ্যা-জ্যোতি যতই উদ্ভাসিত হইবে ততই তাহার সৌন্দর্য্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাসিত হইতে থাকিবে। অতএব পূর্ব্বপুরুষদিগের অমায়িক স্নেহ স্মরণ করিয়া, বর্ত্তমানে আমাদের দেশের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া এবং ভবিষ্যতে বিদ্যার স্বকীয় মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিবার জন্য সকলে কৃতসংকল্প হও। আমারদের দুর্ভাগ্য দেশের প্রতি ঈশ্বরের অমূল্য দান এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা মাথায় করিয়া লও, বুকে করিয়া রাখ, ইহার ন্যায় অমূল্য বস্তু আর নাই। ইহার পালনে যত যত্ন করিবে ইহা হইতে ততই মধুময় ফল উৎপন্ন হইবে, ইহার প্রতি যতই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিবে ততই দুর্ভিক্ষ হইতে দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে ক্লেশে, ভয় হইতে ভয়ে, পদ নিক্ষেপ করিবে, ইহা অমোঘ বাক্য জানিও। পরমাত্মন্! সেই আদিম কাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মকে তুমি যে এমন করিয়া সঞ্চিত করিয়া রাখিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? সেই তুমি যএষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ আমরা যখন নিদ্রাতে অভিভূত থাকি তুমি তখন জাগ্রত থাকিয়া আমারদের জন্য নানা অর্থ সকল নির্ম্মাণ করিতে থাক। তোমার প্রদত্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন এবং পালন করি আমারদের মনে এইরূপ শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রেরণ কর। হে পরমাত্মন্! তোমার প্রেমসমন্বিত দান যে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহা আমারদের মস্তকের মণি হউক্, পথের সম্বল হউক্, হৃদয়ের বন্ধু হউক্। তোমার প্রসাদে আমরা যে অমূল্য ধন প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা যেন আমরা আপন দোষে না হারাই তুমি এইরূপ প্রসন্নতা বিতরণ কর এবং আমাদের সকল দোষ

মার্জ্জনা কর তোমার চরণে বার বার নমস্কার করি।

আখ্যায়িকা।

(কোন গ্রীক্ গ্রন্থকর্ত্তা হইতে ভাব লইয়া প্রণীত।)

কোন রাজার আত্মা (১) নামে রূপ-লাবণ্য-বিশিষ্ট এক কন্যা ছিল। এক দিন রাত্রিতে যখন তিনি দুগ্ধফেননিভ পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত ছিলেন, তখন দীপ নির্ব্বাণ হইলে, তিনি জাগরিত হইয়া তাঁহার নিকটে একটী যুবা পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন, এমৎ উপলব্ধি করিলেন। গৃহ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকাতে তাহাকে চক্ষে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাহা স্বর্গীয় সৌরভ দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে অনুভব করিলেন এবং যখন সেই যুবক তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার কথার ভাবের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া বিমোহিত হইলেন। সেই যুবকটী মনুষ্য ছিলেন না। তিনি একটী দেবতা। স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া রাজকন্যার নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম প্রেম। রাজকন্যার নিকট দেব-যুবক প্রত্যহ রাত্রিতে গমনাগমন করেন। কিন্তু দেবযুবক রাজকন্যাকে এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত প্রণয়ের সঞ্চার হইল। যে দিন তিনি দীপ ধরিয়া তাঁহাকে দেখিবেন, সেই দিন হইতে তিনি একবারে অন্তর্হিত হইবেন। তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবেন না। কিছুদিন এই রূপে যাইল। রাজকন্যা পরিশেষে স্বকীয় কৌতূহল নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া এক দিন মধুখ-বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দেবযুবককে দেখিলেন। দেখিবার সময় গলিত উষ্ণ মধুথ দু এক বিন্দু দেবযুবকের শরীরের উপর পতিত হওয়াতে তিনি জাগরিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেই অবধি তাঁহার শয়নাগার স্থগিত হইল। রাজকন্যা প্রিয়তম-বিরহে দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, শয়নে উপবেশনে কিছু মাত্র সুখ অনুভব করিতে পারেন না। পরিশেষে, বিরহানলে অস্থির হইয়া প্রিয়তমের অন্বেষণে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। সুকুমারাঙ্গী রাজকন্যা যখন নানা কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ ক্লেশে ম্রিয়মাণ হইলেন তখন দেবরাজ জিউস, তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া স্বর্গে লইয়া গেলেন, এবং প্রেমের সঙ্গে তাঁহাকে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ করিলেন। যেখানে চির দিবা এবং সূর্য্য অস্তমিত হয় না; সেই অনন্ত স্বর্গে সেই দম্পতি পরম সুখে চিরকাল যাপন করিতে লাগিলেন।

(১) গ্রীক্ ভাষাতে যে শব্দ (সাইকি) আত্মা বুঝায় সেই শব্দ প্রজাপতিও বুঝায়। গ্রীকেরা মৃত্যুর পর আত্মার নবতর কল্যাণতর রূপ ধারণ ও প্রজাপতির একটী জঘন্য দৃশ্য কীট হইতে পুষ্প হইতে পুষ্পে বিচরণকারী অতি সুন্দর পতঙ্গের আকার ধারণ এই দুয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য এমন সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিল যে,তাহারা আত্মা ও প্রজাপতিকে এক নাম দ্বারা ডাকিত।

তাৎপর্য্য।

যখন মনুষ্য মোহান্ধকারে অভিভূত হইয়া মর্ত্ত্যলোকের প্রতি প্রেম স্থাপন করে, তখন তাহার প্রেম অবিশুদ্ধ থাকে। যখন তাহার মনে জ্ঞানালোকের এতদূর সঞ্চার হয় যে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা অনুভব করে, কিন্তু ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, তখন তাহার মনের অবস্থা অতি ভয়ানক হয়। সে সংসারের অসারতা বুঝিয়াছে কিন্তু ঈশ্বরকে পায় নাই, এরূপ অবস্থার কষ্ট আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি। যখন ঐ রূপ ঈশ্বরশূন্য বৈরাগ্যের অবস্থায় প-

তিত হইয়া অত্যন্ত যাতনা অনুভব করে, তখন ঈশ্বর কৃপা পূর্ব্বক স্বর্গীয় প্রেম অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমের সহিত তাহার আত্মাকে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ করিয়া, তাহাকে অপার আনন্দ প্রদান করেন। সে আনন্দের অমর জ্যোতি কখন নির্ব্বাণ হয় না।

বেদান্ত প্রবেশ।

(শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু কৃত)

ইতিপূর্ব্বে আমারদের বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের এইরূপ একটি সংস্কার ছিল যে, ইংরাজি ভাষার পরিচ্ছদ ব্যতিরেকে বিদ্যানুশীলন হইতে পারে না। অনতিপূর্ব্বে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ সরস্বতী স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে কলিকাতাবাসীদিগকে চমকিত করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মধ্যে অনেকেই কেবল শাস্ত্রের বচন লইয়া বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে নিপুণ, কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম ভাব এবং তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইলে, তাঁহারা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখেন। বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা মূল শাস্ত্র-সকল একেবারে বিস্মৃত হইয়া কেবল দেশাচার এবং লোকাচারকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া থাকেন। এইরূপ করাতে অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বুদ্ধি ক্রমশই লোপ পাইয়া আসিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে যে ব্যক্তির বিদ্যা যত অধিক তাহার বুদ্ধি বিবেচনা এবং বিচারশক্তি তত অল্প। তাঁহাদের এমনি দুরবস্থা যে, ন্যায় যদি পড়িলেন তবে অমুকাবচ্ছিন্ন অমুক ইত্যাদি পুঁথির বচন সকলই ক্রমাগত চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সত্যাসত্য বা ন্যায়ান্যায় বিচার-স্থলে তাঁহারা এমনি প্রলাপোক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন যে, ন্যায় তাহার ত্রিসীমায় স্থান পাইতে পারে না। যদি বেদান্ত পড়িলেন তবে ঘটপটাদি প্রভৃতি কতক-গুলি বচন তাঁহার মুখে অনর্গল ফুটিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু কোন সত্য-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির প্রশ্ন মীমাংসা করিবার সময় এমনি ভ্রান্তি-জাল বিস্তার করেন যে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির কোথায় জ্ঞানোদয় হইবে, না যেটুকু জ্ঞান ছিল তাহা পর্য্যন্ত অস্ত হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া শুনিয়া অনেকের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, সংস্কৃত ভাষায় প্রকৃত বিদ্যা যাহাকে বলে তাহা মূলেই নাই, সংস্কৃত ভাষা কেবল জল্পনা এবং কল্পনাতেই পরিপূর্ণ। এমন কি, যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মিল্‌টন পড়ি, তখন, আমার স্মরণ হয় যে দুই এক জন সহাধ্যায়ী "Palpable Darkness" মিল্‌টনের এই পদ-বিন্যাসটির যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহারদের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম এই যে ইংরাজি ভাষার ন্যায় ভাষা আর জগতে নাই। সেই সময়ে কালিদাসের এই কবিতাটি আমার মনে উদিত হইল "রুদ্ধালোকে নরপতি-পথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।" মিল্‌টন যে স্থলে বলিয়াছেন "স্পর্শক্ষম অন্ধকার" কালিদাস সে স্থলে বলিয়াছেন "সূচি দ্বারা বিদ্ধ করা যায় এমন অন্ধকার" আমার বোধ হইল যে কথিত স্থলে কালিদাসের ভাবের গাঢ়তা মিল্‌টন অপেক্ষাও অধিক; ইহা জানিয়াও আমি আমার মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ পাইলাম না। কারণ, সকলেরই তখন বিশ্বাস যে সংস্কৃত ভাষা কেবল অনুস্বর, বিসর্গ, বৃথা-পাণ্ডিত্য এবং বৃহৎ বৃহৎ উপন্যাসের একটা ব্রহ্মাণ্ড কাণ্ড। তখন সবে কেবল দুই এক খানি নাটকের বাঙ্গালা অনুবাদ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা দেখিয়াও সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে যে কি-সকল রত্ন আছে তাহার প্রতি কাহারো চক্ষু পড়ে নাই। এই পত্রিকাতেই পূর্ব্বে কতবার সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্য হইতে কত প্রকার রত্ন বাহির

করিয়া দেখান হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের চক্ষু ফুটে নাই। তখন ব্রাহ্মগণকে কেহ বা ব্রাহ্ম-সভার দল, কেহ বা ওঁতৎসতের দল, বলিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিতেন। কিছুকাল পরে মোক্ষ-মূলার সাহেবের ভাষা-বিষয়ক একটি ইংরাজি গ্রন্থ যেমন বাহির হইল, অমনি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের কথাবার্ত্তার ভাব ফিরিয়া যাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে "আর্য্য আর্য্য" এইরূপ এক শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেন আমরা কতই অনার্য্য ছিলাম, ভট্ট মোক্ষ সাহে-বের একটি মন্ত্রোচ্চারণ মাত্রে আমরা আর্য্য হইয়া উঠিলাম। আমারদের ভাষা আর্য্য ভাষা হইল, আমারদের দেশ আর্য্য দেশ হইল, আমারদের শরীরে আর্য্য-শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল, ইত্যাদি। আশ্চর্য্য এই যে, বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ান-গণও আমাদের দেশের শাস্ত্রীয় বচন সকল ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "মূল কাটিয়া অগ্রভাগে জল-সিঞ্চন" ইতর ভাষায় এই মর্ম্মে একটি প্রবাদ আছে,—তাহাই তাঁহারা করিতে-ছেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের কি যে উপকার হইতেছে বলা যায় না। বঙ্গদেশ-বাসীরা যে কেবল এক একটি বচনের পশ্চাতে মূঢ় জীবের ন্যায় ধাবিত হন, ভাব তাৎপর্য্য মর্ম্ম অভিষন্ধি উদ্দেশ্য ইহার কিছুরি প্রতি দৃষ্টি করেন না, এ লক্ষণটি বড় ভাল বোধ হয় না। অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্প্র-দায় যেমন শাস্ত্রের বচন-পাণ্ডিত্যে সুনি-পুণ, কৃতবিদ্য সম্প্রদায় সেইরূপ ইংরাজি শাস্ত্রের বচন-পাণ্ডিত্যে সুনিপুণ হইয়া উঠি-য়াছেন; ইহা অতীব আক্ষেপের বিষয়। এই যে আক্ষেপ করিলাম ইহাতেই প্রমাণ হইবে, কত আনন্দের সহিত, কত শ্রদ্ধার সহিত, "বেদান্ত প্রবেশ" গ্রন্থ খানিকে আমরা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলাম। এই গ্রন্থপাঠে বোধ হয় যে, বঙ্গীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ চিরশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি-তেছেন। ধরিতে গেলে এ প্রকার পুস্তক-সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়াই উচিত। কিন্তু সে আশা বৃথা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কেবল দলাদলির ব্যাপারেই আবদ্ধ থাকিবেন, শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া দেখিবার তাঁহাদের সময় নাই। বেদ-বিহিত ক্রিয়া-কলাপ লইয়াই তাঁহাদের উপ-জীবিকা অথচ বেদ উচ্চারণ করিতেও তাঁহারা অসমর্থ। বেদ কেন, সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করিতেও তাঁহারা জানেন না। বঙ্গ-দেশের মধ্যে এখন কেবল ব্রাহ্মসমাজেই সংস্কৃত যথাবৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে। ইংরাজ রাজপুরুষেরা নাকি কিছু দিন হইল সংস্কৃত উচ্চরণ প্রচলিত করিবার পক্ষে মনোযোগী হইয়া ছিলেন, তাই যা কৃতবিদ্য-গণের লেখনী হইতে ইংরাজি বেশে বৈধ সংস্কৃত উচ্চারণ বাহির হইয়া থাকে। এত দিন ব্রাহ্মসমাজে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ পদ্ধতি চলিয়া আসিয়াছে, তথাপি দুই চারিটি পণ্ডিত ব্যতিরেকে প্রকৃত সংস্কৃত উচ্চারণ অস্মদ্দেশীয় কাহারো মুখে শুনিতে পাওয়া যায় না। এই সকল ভাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই করিতেছেন না। তাঁহারা যদি দলাদলি ও পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া এবং জনসমাজের প্রকৃত-রূপ হিতার্থী হইয়া শাস্ত্রের যথাবৎ উচ্চারণ ভাব মর্ম্ম এবং তাৎপর্য্য প্রচার করেন, তবে তাহাতে লোকের বিস্তর উপকার হয়, কিন্তু তেমন ব্যক্তি তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প; এবং যাঁহারদের ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের তাদৃশ সামর্থ্য আছে কি না সন্দেহ স্থল। বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে যাহা বলা হইল তাহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হইতেছে। যে যে গুণ থাকিলে

শাস্ত্রীয় রত্ন সকলের পুনরুদ্ধার কার্য্যে অধিকার জন্মে, বর্ত্তমান গ্রন্থকারের সে গুণ গুলি প্রচুর পরিমাণে আছে। সে গুলি কি? না, স্বদেশ-হিতৈষিতা,সত্যপরায়ণতা,অকৃত্রিমতা, ভাব-গ্রাহিতা, ঔদ্ধত্য-বিহীনতা, শ্রমশীলতা, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞতা, ভক্তিমত্তা অথচ স্বাধীনতা। বর্ত্তমান গ্রন্থে এই গুণ-গুলির পরিচয় পাওয়াতেই আমরা ইহার এত অনুরাগী।

গ্রন্থকার বেদান্ত বিষয়ে হস্তার্পণ করিবার পূর্ব্বে তাহার ভূমিকা স্বরূপে বেদ বেদাঙ্গ এবং ন্যায়াদি দর্শন-শাস্ত্রের স্থূল মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এই, যথা; বেদাঙ্গ এবং দর্শন উভয়েরই মূলে কেবল কতকগুলি সাঙ্কেতিক বচন সূত্রাকারে গ্রথিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে যে বেদাঙ্গটি কল্প নামে প্রসিদ্ধ তাহা হইতে আমারদের দেশের যাবতীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রসূত হইয়াছে। ধর্ম্ম-শাস্ত্র এবং দর্শন-শাস্ত্র এই দুই প্রকার শাস্ত্র আমারদের দেশে দুই প্রকারে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্বর্গ-নরকের ভয়-লোভ প্রদর্শন দ্বারা আমারদিগকে শাসন করিতেছে। দর্শন-শাস্ত্র যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা আমারদিগকে মুক্তির পথে আহ্বান করিতেছে। ধর্ম্ম-শাস্ত্র আমাদের সমাজের বন্ধন-সেতু নির্ম্মাণ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। দর্শন-শাস্ত্র মুক্তি-সোপান নির্ম্মাণ করিবার জন্যও যত্নের ত্রুটি করেন নাই। বেদান্ত-দর্শন গ্রন্থকারের আলোচ্য বিষয়। প্রসঙ্গাধীন তিনি অন্যান্য দর্শনেরও সংক্ষেপ বিবরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌতমের মূল সূত্র অবলম্বন করিয়া ন্যায়সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমারদের মতে অসম্পূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থকার যে উদ্দেশে ন্যায়-শাস্ত্রের সংক্ষেপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা তিনি আপনিই ব্যক্ত করিয়াছেন। ন্যায় শাস্ত্রের ষোড়শ পদার্থ উল্লেখ করিয়া পরিশেষে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন—"এই ষোড়শ পদার্থ সমুদয়ই বিচারের উপকরণ মাত্র। সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র যে কেবল তর্ক ও বিচারের এক প্রণালী মাত্র তাহার সন্দেহ নাই। বেদান্ত বিচারে পারিভাষানুরোধে ঐ সকল তর্ক প্রণালীর জ্ঞান সামান্যতঃ প্রয়োজনীয়।" এস্থলে বক্তব্য এই যে, ন্যায়ের তর্কপ্রণালী কিরূপ তাহা গ্রন্থকার আদৌ উল্লেখ করেন নাই,কেবল পদার্থগুলিই উল্লেখ করিয়াছেন। আমারদের মতে ন্যায়ের অনুমান-খণ্ড যাহা বঙ্গদেশে বিশেষরূপে আদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহার স্থূল মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করিলে ভাল হইত। কেন না ন্যায়ের তর্কপ্রণালী কেবল অনুমান-খণ্ডেতেই প্রকাশিত আছে। আমারদের মতে ন্যায়ের সিদ্ধান্ত জানা বেদান্ত পাঠের পক্ষে আবশ্যক হউক্ বা না হউক্, ন্যায়ের তর্কপ্রণালী জানা আবশ্যক বটে। কেবল বেদান্ত-দর্শনের সম্বন্ধে নহে, কিন্তু সকল দর্শনের সম্বন্ধেই তাহা আবশ্যক। গ্রন্থকার যদি ন্যায়ের আর কোন বিষয় নাও উল্লেখ করিতেন, শুদ্ধ যদি কেবল তর্কপ্রণালীটি স্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত, পাঠকেরও বিশেষ উপকার দর্শিত। বোধ হইতেছে যে বাহুল্যভয়ে গ্রন্থকার এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহা অবশ্য তিনি জানেন যে, ন্যায়ের তর্কপ্রণালী জানা পাঠকের পক্ষে আবশ্যক, নচেৎ তিনি এ কথা বলিবেন কেন যে, "বেদান্ত বিচারে পারিভাষানুরোধে ঐ সকল তর্কপ্রণালীর জ্ঞান সামান্যতঃ প্রয়োজনীয়।" এই বিষয়ে গ্রন্থকারের তাৎপর্য্য বোধ হইতেছে এই যে, "বেদান্ত ভিন্ন অন্য দর্শন গুলির কেবল মূলাংশই প্রদর্শন করিব, বিশেষ বিবরণের

দিকে যাইব না।" এ প্রকার সংকল্প "স্থান-বিশেষে যেমন উপকারী স্থানান্তরে তেমনি অপকারীও হইতে পারে। যেরূপ সংকল্প করিলে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাহাই সর্ব্বস্থানে উপকারী। অতএব গ্রন্থকারের যদি অভিপ্রায় হয় যে "তর্কপ্রণালীর জ্ঞান সমান্যতঃ প্রয়োজনীয়" তবে সংক্ষেপতঃ তর্কপ্রণালী প্রদর্শন করা তাঁহার পক্ষে উচিত ছিল। যাহা হউক্ গ্রন্থকারের পুস্তকের যেরূপ আয়তন, তাহা দেখিলে গ্রন্থকারকে দোষ দিতে পারা যায় না। বরং তাঁহার স্বপক্ষে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, প্রকৃত প্রস্তাব যখন বেদান্ত, তখন ন্যায়বিষয়ে গ্রন্থকার যতটুকুই বলুন না, তদতিরিক্ত বলিবার জন্য তিনি দায়ী নহেন। এই মাত্র আমারদের বক্তব্য যে, ন্যায়বিষয়ে আর একটু অধিক বলিলে পাঠকের পক্ষে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইত। বৈশেষিক এবং ন্যায় এ দুই দর্শন একই আদর্শে বিরচিত। উভয়ের মধ্যে যে ভেদাভেদ তাহার সহিত বেদান্ত দর্শনের বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না। পরমাত্মা, জীবত্মা, সৃষ্টি, মুক্তি, ইত্যাদি সম্বন্ধে উক্ত দর্শন দ্বয়ের কিরূপ মত, বর্ত্তমান গ্রন্থে তৎসমস্তই সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতঃপর গ্রন্থকার সাংখ্যের মত সংক্ষেপে আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করিয়াছেন। সাংখ্য মত বিষয়ে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "যদিও সাংখ্য-দর্শন নিত্য জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর না স্বীকার করুন কিন্তু আত্মার নিত্যত্ব ও পরলোক বেদের নিত্যতা ও যোগসাধন সমস্তই স্বীকার করিয়াছেন"। ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ সাংখ্যের এই সূত্রটি উপলক্ষে অনেকে সাংখ্যশাস্ত্রকে নিরীশ্বর উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, সাংখ্যের অভিপ্রায় কেবল এই মাত্র যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের যুক্তিমূলক কোন প্রমাণ নাই, ইহা ব্যতীত ঈশ্বরের অসত্তা প্রতিপন্ন করা সাংখ্যের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু সাংখ্যের যেরূপ মত তাহাতে ফলে ঈশ্বরের অসত্তাই দাঁড়াইতেছে। কেন না সাংখ্যমতে তত্ত্ব পঞ্চবিংশতিটি, তদ্‌ভিন্ন আর তত্ত্ব নাই। পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব তিনটি মূল তত্ত্বের অন্তর্ভূত। কি? না ব্যক্ত অব্যক্ত এবং জ্ঞ। ব্যক্ত শব্দের অর্থ কার্য্য-কারণ রূপিণী প্রকৃতি। অব্যক্ত শব্দের অর্থ মূলকারণ-রূপিণী প্রকৃতি। জ্ঞ শব্দের অর্থ পুরুষ কি না আত্মা। অতএব সাংখ্যের ভিতর হইতে কেবল দুইটি মাত্র মূলতত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে,—প্রকৃতি আর আত্মা। সাংখ্য যেমন প্রকৃতিকে মূল এবং বৈকারিক, অব্যক্ত এবং ব্যক্ত, এই দুই ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, আত্মাকে তেমনি পূর্ণ এবং অপূর্ণ এই দুই রূপে দেখাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। সাংখ্য-দর্শন, মূল-প্রকৃতি এবং তদীয় কার্য্য পরম্পরাকে, বস্তুতঃ অভেদ-ভাবে দৃষ্টি করেন। কিন্তু আত্মা এবং প্রকৃতি এ দুইকে সর্ব্বতোভাবে পরস্পর বিভিন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সাংখ্য-মতে উভয়ের (প্রকৃতি এবং পুরুষের) পরস্পর সান্নিধ্য বশতঃ, ইহার ছায়া উহাতে এবং উঁহার ছায়া ইহাতে সংক্রমিত হয়। প্রকৃতিতে আত্মার ছায়া পড়াতে বুদ্ধি অহংকারাদি বিকার পরম্পরা ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হয়, এবং আত্মাতে প্রকৃতির ছায়া পড়াতে আত্মা সুখদুঃখমোহে বিচলিত হয়। আত্মা এবং প্রকৃতির যে সান্নিধ্য বা সংযোগ তাহাই বন্ধনের কারণ, আত্মা এবং প্রকৃতির পরস্পর বিয়োগেই মুক্তি। আত্মার কৈবল্যই (অর্থাৎ কেবল মাত্র আত্মা এই ভাবই) আত্মার মুক্তি। মূলকারণ যে প্রকৃতি তাহা হইতে আত্মা একান্তই বিভিন্ন,

অথচ আত্মার উপকারার্থেই প্রকৃতি ক্রমাগত বিচেষ্টিত হইতেছে, প্রকৃতির আর কোন উদ্দেশ্য নাই; ইহা সাংখ্য স্বীকার করেন। প্রথমে প্রকৃতি আত্মার ভোগ-সাধনের জন্য চেষ্টিত হয়, পশ্চাতে উহা আত্মার মোক্ষ-সাধনের জন্য চেষ্টিত হয়। প্রকৃতি এই যে এক প্রভূত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপারে দিবরাত্র ব্যাপৃত রহিয়াছে, ইহা কেবল অন্যের জন্য (আত্মার জন্য), আপনার জন্য নহে। প্রকৃতির এই প্রকার নিঃস্বার্থ ভাবকে সাংখ্য বিস্তর সাধুবাদ করিয়াছেন। প্রকৃতি নিঃস্বার্থ হইলে হইবে কি— প্রকৃতি অজ্ঞান। প্রকৃতি স্বার্থও জানে না নিঃস্বার্থও জানে না, মনে করিয়া কোন কার্য্য করে না, কেবল কার্য্য করে এই মাত্র। কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ মূল প্রকৃতিকে আত্মার ভোগ-মোক্ষ সাধনার্থে চালনা করিতেছেন— এরূপ হইলে তাঁহারই স্তুতি-বাদ-চ্ছলে নিঃস্বার্থ উপাধির সার্থকতা হয়। নচেৎ নিঃস্বার্থ শব্দটি অর্থ-শূন্য একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। কাকতালীয় ভাবে যদি কোন ব্যক্তির উপকার করা যায় তাহাকে নিঃস্বার্থ বলা যেমন অসঙ্গত, প্রকৃতির অন্ধ অচেতন কার্য্যকে নিঃস্বার্থ বলাও সেই রূপ। জগৎকারণ প্রকৃতিকে পরমাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করাতে সাংখ্য এমনি এক বিপদে পড়িয়াছেন যে, একটুকু মন খুলিয়া প্রকৃতির যে স্তুতিবাদ করিবেন তাহাতেও তাঁহাকে বাধাগ্রস্ত হইতে হইতেছে। জ্ঞান এবং কার্য্য-শক্তি এ দুই তত্ত্ব পৃথক্-ভাবে আলোচিত হইতে পারে বলিয়া উভয়ে যে বস্তুতই সম্পূর্ণ পৃথক্, এটি বলিতে পারা যায় না। জ্ঞান এবং শক্তি উভয়ই আত্মার ধর্ম্ম। মূল-শক্তি এবং মূল জ্ঞান উভয়ই (ভর্গঃ) পরমাত্মার উপাধি। মূল জ্ঞান হইতে মূল শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শেষোক্তকে সর্ব্বোচ্চ পদবী প্রদান করিলে তাহা কখন টেঁকিতে পারে না। এক জন কর্ম্মচারীর স্কন্ধে সাম্রাজ্য-ভার বিন্যস্ত হইলে কতক্ষণ সে তাহা বহন করিতে পারে? গ্রন্থকার সাংখ্যের মত-গুলি যথাবৎ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দোষ-গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। অস্মদ্দেশীয় দর্শন-শাস্ত্রের মত-সকল বিশদরূপে বিবৃত হওয়া আপাততঃ প্রয়োজনীয়, তদীয় দোষ গুণ নির্ব্বাচন করা পশ্চাতের কার্য্য, এই ভাবিয়া গ্রন্থকার সাংখ্য-দর্শনকে বিনা প্রতিবাদে ছাড়িয়া দিয়াছেন। যাহা হউক্, সাংখ্য-দর্শন বেদান্ত-দর্শন নহে, সাংখ্য-দর্শন সম্বন্ধে গ্রন্থকার চাই বাহুল্য করিয়া বলুন চাই সংক্ষেপ করিয়া বলুন, সে তাঁহার নিজের বিবেচনা এবং অভিপ্রায়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বর্ত্তমান গ্রন্থের ন্যায় সার-গর্ভ গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার একটি বিশেষ গুণ এই যে, গ্রন্থকার যত-মাত্রা জ্ঞান-সুধা প্রদান করিতে সঙ্কল্প করেন, তদপেক্ষা অধিক মাত্রা তাহা হইতে দোহন করিয়া পাওয়া যায়। অতএব এমন সুবিধা আমরা বিনা-লভ্যে ছাড়িয়া দিতে পারি না।

প্রকৃত প্রস্তাব সম্বন্ধে গ্রন্থকার যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই এক্ষণে প্রদর্শন করা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রধান প্রধান কয়েকটি উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞানের মূল উপদেশ গুলি বিদ্যমান আছে। কিন্তু সকল উপদেশ এক প্রকারের নহে। উপদেষ্টা ঋষিগণ কখন বা আপন আপন মনের ভাব, কখনও বা প্রগাঢ় চিন্তার ফল, কখনও বা হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, অবাধে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন! জ্ঞান বিতরণের সময় সম্মুখ দিকেই তাঁহাদের লক্ষ ছিল, পশ্চাতে তাঁহারা ফিরিয়া দেখিতেন না। অর্থাৎ "যাহা বলিলাম তাহা সঙ্গত হইল কি অসঙ্গত হইল" এ আশঙ্কা তাঁহাদের ছিল না; সহজ-জ্ঞানের

আলোকে এবং হৃদয়ের বলে তাঁহারা প্রথম উদ্যমেই সত্যের যথার্থ পথটি পাইয়াছিলেন। এক জন এক ভাবে, তাঁহারদের মধ্যে আর এক জন আর এক ভাবে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ করিলেন; বিষয় একই, কিন্তু দেশ কাল পাত্র এবং অবস্থা ভেদে তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। যেমন কোন একটি উদ্যান দেখিলে, আতপক্লান্ত ব্যক্তি তদীয় ছায়ার দিকে আকৃষ্ট হয়, ক্ষুধিত ব্যক্তি ফলের দিকে আকৃষ্ট হয়, তৃষিত ব্যক্তি পুষ্করিণীর দিকে আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ ঋষিগণ আপন আপন মনের ভাব এবং অবস্থানুসারে যিনি যখন যে ভাবের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি তখন সেই ভাব অবাধে অকুতোভয়ে ব্যক্ত করিয়াছেন। "এ যে কথা উক্ত হইল, এ অদ্বৈতবাদ!" "এ যে কথা উক্ত হইল, এ দ্বৈতবাদ!" এরূপ বলিবার লোক তখন জন্মে নাই। তখন দ্বৈত-বাদও ছিল না, অদ্বৈতবাদও ছিল না। তখন লক্ষ্য বিষয়েরই প্রতি দৃষ্টি ছিল, কে কি বলিল না-বলিল তাহার প্রতি দৃষ্টি ছিল না। ব্রহ্মকে তাঁহারা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে আমি বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই, তুমি বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই, সর্ব্বস্ব বলিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহাদের সে অবস্থা প্রাপ্ত না হইয়া পরব্রহ্ম বিষয়ে অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিবে তাহাই কেবল দূষ্য। যে অবস্থায় আমরা আপনি ব্রহ্মেতে মগ্ন না হইয়া অন্যকে ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ দিই সে অবস্থায় অতীব সাবধানে কথা কহা উচিত; কিন্তু যে অবস্থায় আমরা আপনারা ব্রহ্মের সহবাসের আনন্দ উপভোগ করি, সে অবস্থায় আমরা সরলভাবে তাঁহাকে যাহা বলি তাহাই শোভা পায়। শেষোক্ত অবস্থায় উপনিষদ্‌-কর্ত্তারা অমায়িক ভাবে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার যথার্থ ভাব গ্রহণ করিতে হইলে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। এখন কথা এই যে, "আমি ভাব-গ্রহণ করিতে পারিলাম না" এরূপ কথা লোকে সহজে বলিতে চাহে না; প্রগাঢ় ভাবের কথা না বুঝিতে পারিলে—"কি কতকগুলা প্রলাপোক্তি করিতেছে!" এই কথাটাই সহসা শ্রোতার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহা যে, প্রলাপোক্তি নহে, তাহার ভিতরে যে নিগূঢ় ভাব আছে, ইহা বুঝাইবার জন্য তৃতীয় ব্যক্তির আবশ্যক হয়।

প্রথম ব্যক্তি—ব্রহ্মবাদী ঋষি;

দ্বিতীয় ব্যক্তি—প্রতিবাদী (পূর্ব্বপক্ষ)

তৃতীয় ব্যক্তি—প্রশ্ন মীমাংসক (উত্তরপক্ষ)

প্রথম ব্যক্তি যাহা সরলভাবে, সহজভাবে, ব্যক্ত করেন, তাহার মধ্যে অবশ্যই সত্য লুকাইত থাকে। কিন্তু সে সত্যটি সাধারণের উপযোগী নহে। কেন না, অপরিচিত সত্যের পরিচয় লইতে, তাহার পর তাহাকে ব্যবহারে পরিণত করিতে কিছু দীর্ঘ সময় আবশ্যক করে। বাদানুবাদের পর তবে তাহা প্রচারোপযোগী হয়। অতএব প্রথম ব্যক্তির উদ্ভাবিত সত্য সাধারণে প্রচার করিতে হইলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন বশতই বেদান্ত-দর্শনের সৃষ্টি হইয়াছে। বেদান্ত শাস্ত্র এবং বেদান্ত-দর্শন, এ দুয়ের আলোচ্য বিষয় যদিও একই, কিন্তু আলোচনা-প্রণালী বিভিন্ন প্রকার। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রণালী কি? না সত্যের মূল আকর হইতে সত্য উপার্জ্জন করা। বেদান্তদর্শনের প্রণালী কি? উপার্জ্জিত সত্য সকলের সমন্বয় করা। উপনিষদের বাক্য সকলের পরস্পর সমন্বয় করিতে গিয়া শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতে উপনীত হইয়াছেন। অন্য আচার্য্য তাহাই করিতে গিয়া অন্যমতে উপনীত হইয়াছেন। গ্রন্থকার আরো অধিক বলেন; তিনি বলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের মতও

ঠিক্ অদ্বৈতবাদ নহে; তাঁহার প্রসিদ্ধ শারীরিক ভাষ্যেও দ্বৈতমত প্রকারান্তরে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। দ্বৈতভাবকে শঙ্করাচার্য্য ব্যবহারিক সত্যও ত বলেন, দ্বৈতভাব সর্ব্বপ্রকারেই যে অসত্য ইহা ত তিনি বলেন না, ইহাই গ্রন্থকারের প্রধান যুক্তি। দ্বৈত এবং অদ্বৈত এই দুই মতের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা গ্রন্থকারের মুখ্য একটি মনোগত অভিপ্রায়। এই অভিপ্রায়ে তিনি শারীরিক ভাষ্য হইতে দ্বৈতভাব-সূচক অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। হয় ত এমন হইতে পারে যে, গ্রন্থকার এত পরিশ্রম সহকারে যে সকল দ্বৈত-সূচক বচন সংগ্রহ করিয়াছেন, এক জন অদ্বৈতবাদী সে-সকল "ব্যবহারিক মাত্র বলিয়া" এক কথায় সমস্ত উড়াইয়া দিবে। বেদান্ত দর্শনে যাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে, এমন এক জন ব্যক্তির সহিত তর্ক বিতর্ক হইলে, তিনি কিরূপ বলেন তাহা না শুনিলে বর্ত্তমান বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে আমরা সাহসী হইতেছি না।

পরিশেষে গ্রন্থকার রামমোহন রায়ের মতের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন। রামমোহন রায় যে পদ্ধতি অনুসারে বেদান্ত শাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন তাহা দার্শনিক পদ্ধতি হইতে ভিন্ন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সত্যের মূল আকর হইতে সত্য উপার্জ্জন করাই বেদান্ত শাস্ত্রের পদ্ধতি, এবং সেই উপার্জ্জিত সত্য সকলের সমন্বয় সাধন করাই দর্শন-শাস্ত্রের পদ্ধতি। রামমোহন রায় আর এক পদ্ধতিতে গিয়াছেন; সে পদ্ধতি কি? না পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত সেই যে সকল মহান্ সত্য, তাহাকে ব্যবহারে পরিণত করা। বেদান্তশাস্ত্রকে যেরূপে আলোচনা করিলে তাহা ব্যবহারে পরিণত হইতে পারে, যেরূপে আলোচনা করিলে তাহা হইতে প্রকৃষ্টরূপে ফল লাভ করা যাইতে পারে, তিনি সেইরূপে আলোচনা করিতে বলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে আদি ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায়ের সেই অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করাতে বঙ্গসমাজ নানা বিপত্তি হইতে এতাবৎ কাল রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম, নাস্তিকতা, পৌত্তলিকতা, এই সকল শত্রুর হস্ত হইতে কে আমারদিগকে রক্ষা করিতেছে? স্বদেশীয় বেদান্ত শাস্ত্রের উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া কে আমাদিগকে স্বাধীন বুদ্ধি শিক্ষা দিতেছে? রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত আদিব্রাহ্মসমাজ। অতএব রামমোহন রায়ের গুণ-কীর্ত্তনে গ্রন্থকারের সহিত আমরা পরম আহ্লাদ সহকারে যোগ দিতেছি। গ্রন্থকারের যেরূপ সাধু অভিপ্রায়, এবং নির্ব্বাণ-প্রায় শাস্ত্র-সকলের পুনরুদ্দীপনে তাঁহার যেরূপ যত্ন, তাহা কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। তবে বিষয়টা দার্শনিক; বেদান্ত প্রবেশ নাম হইলেও তাহার মধ্যে যে, সকলে প্রবেশ করিতে পারিবেন এমন বোধ হয় না। কিন্তু একটু যাঁহাদের জানা শুনা আছে অথবা যাঁহারা সহৃদয় ব্যক্তি, তাঁহারদের প্রবেশের পক্ষে কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। তাঁহারদের প্রতি আমারদের অনুরোধ এই যে, তাঁহারা প্রবেশ করুন, তাহা হইলে বহু প্রাচীন বেদান্ত কল্পতরু হইতে অবশ্যই অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইবেন।

প্রকৃতরূপে ধরিতে গেলে উপনিষদ্ই মূল বেদান্ত শাস্ত্র। বেদান্ত এবং সাংখ্য-দর্শন উভয়ই উপনিষদ্‌কে মূল করিয়া তাহারই উপর স্ব স্ব মতের গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বেদান্ত এবং সাংখ্য উভয়-দর্শনের সন্ধিস্থলে যে সকল সার সত্য বিদ্যমান আছে, তাহারদিগকে একত্র সংগ্রহ করিয়া যদি পুস্তকাকারে গ্রথিত করা যায়, তবে তাহাকেও

বেদান্ত-দর্শন বলিবার কোন বাধা থাকে না। কেন না উপনিষদ্‌ই মূল বেদান্ত-শাস্ত্র; সেই মূল বেদান্ত-শাস্ত্রের উপরে যে কোন দর্শন-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক্ না কেন, তাহাই বেদান্ত-দর্শন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। আম্র বৃক্ষ হইতে যে কোন শাখা বিনির্গত হয়, তাহাকেই যেমন আম্র-শাখা বলা উচিত; সেইরূপ মূল বেদান্ত হইতে যে কোন দর্শন বিনির্গত হয় তাহাই বেদান্ত-দর্শন নাম পাইবার অধিকারী। সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয় দর্শনই যে, একই বৃক্ষের শাখাদ্বয়মাত্র, ইহার অনেক উদাহরণ দেখান যাইতে পারে; কিন্তু এখানে তত বাহুল্যের স্থানও নাই প্রয়োজনও নাই, এ জন্য নিম্নলিখিত একটিমাত্র উদাহরণ উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। কঠোপনিষদে আছে "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্ত পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ মহতঃ পর মব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" যে পঞ্চবিংশতিটি তত্ত্ব সাংখ্যের মূল আলোচ্য বিষয়, তাহা সমস্তই বেদান্ত শাস্ত্রের উক্ত শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। "মহতঃ পরমব্যক্তং" উপনিষদের এই "অব্যক্ত" ই সাংখ্যে প্রধান পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে। এই "অব্যক্ত প্রকৃতি" সুখ-দুঃখ-মোহের সাম্যভাব বলিয়া সাংখ্য-দর্শনে উক্ত হইয়াছে, এবং সুষুপ্তি, আনন্দময় কোষ, ইত্যাদি শব্দে বেদান্ত-দর্শনে উক্ত হইয়াছে। উপনিষদের "মহৎ" ই সাংখ্যে মহৎ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উপনিষদের বিজ্ঞানময় কোষই বেদান্ত-দর্শনে বিজ্ঞানময় কোষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মূলের প্রতি দৃষ্টি করিলে সাংখ্যের "মহৎ" ও যা', বেদান্তের "বিজ্ঞানময় কোষও তা'; দার্শনিক মত-ভেদের প্রতি দৃষ্টি করিলেই সৃষ্টি-প্রকরণ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয়। "মহৎ" এ শব্দটির অর্থ বড়; বড় ত অনেক বিষয় আছে—তবে কেন শুদ্ধ কেবল বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া "মহৎ" শব্দ ব্যবহৃত হইল? ইহার তাৎপর্য্য সহজে বুঝিতে হইলে ভাষান্তরে একবার দৃষ্টি নিযোগ করা বিধেয়। ইংরাজিতে বুদ্ধি-প্রকরণের মূল অবলম্বন-স্থলকে "Major Premiss" বলে। সেই মূল-স্থানে কোন একটু সংকোচ ভাব থাকিলেই তাহা দোষের হয়। সেই মূলটিকে অসংকোচে স্বীকার না করিলে, বুদ্ধি-কার্য্য মূলেই চলিতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধির ঐ মূল-প্রকরণে কোন প্রকার সঙ্কোচ ভাব থাকিতে পারে না। এই জন্যই ইংরাজিতে তাহাকে Major Premiss (মহৎ আশ্রয়) বলা হইয়া থাকে। এই ভাবেই, বিজ্ঞানের মূল প্রকরণস্বরূপ যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্রে "মহৎ" শব্দে উক্ত হইয়াছে। আপনাকে অন্যান্য বিষয় হইতে বিশেষ-করিয়া (অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া) জানা সাংখ্য-দর্শনে অহংকার শব্দে উক্ত হইয়াছে। অহংকার হইতে তন্মাত্র, তন্মাত্র হইতে ইন্দ্রিয়গণ ইত্যাদি-ক্রমে বুদ্ধি উত্তরোত্তর সংকোচ ভাবে পরিণত হইয়া, চরমে স্থূল বিষয় সকলে পর্য্যবসিত হয়। এখানে এ বিষয়ের আর বাহুল্য না করিয়া এই পর্য্যন্ত বলিতে চাই যে, ভগবদ্গীতার অভিপ্রায়ানুসারে যদি সাংখ্য এবং বেদান্ত উভয় দর্শনকে একযোগে আলোচনা করত উভয়ের মধ্য হইতে সার সংগ্রহ করা যায়, এবং একই বেদান্ত শাস্ত্র উভয়ের মূল হওয়া প্রযুক্ত উভয়েরই সারাংশকে যদি বেদান্ত বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে গ্রন্থকার যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে অনেক বল পৌঁছিতে পারে।

ভগবদ্গীতা হইতে শ্লোক সংগ্রহ।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥

যাঁহারা অনুরাগ ভয় ও ক্রোধশূন্য ও ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন তাঁহারা জ্ঞান ও তপ দ্বারা পূত হইয়া ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন।

যে যথা সংপ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

হে অর্জ্জুন! যে, যেরূপে ঈশ্বরকে ভজনা করে ঈশ্বর তাহাকে সেইরূপই ফল দান করিয়া থাকেন। যে, যে কোন পথে প্রয়াণ করে তাহা ঈশ্বরেরই পথ।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীদিগকে প্রণিপাত প্রশ্ন ও শুশ্রূষা করিলে তাঁহারা যে জ্ঞান উপদেশ করিবেন তুমি তাহা জান।

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি॥

তুমি সেই জ্ঞান অবগত হইলে পুনরায় এইরূপ বিমোহিত হইবে না এবং এই জ্ঞান প্রভাবে প্রাণিগণকে আত্মতুল্য বোধ করিবে এবং আপনাকে ঈশ্বরেতে প্রতিষ্ঠিত দেখিবে।

অপিচেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥

যদিও তুমি সর্ব্বাপেক্ষা পাপী হও তাহা হইলে এই জ্ঞানবলে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

যেমন প্রদীপ্ত অনল কাষ্ঠ সকল ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥

তপস্যা যোগ ইত্যাদির মধ্যে জ্ঞান অপেক্ষা পবিত্র কিছুই নাই। বহুকালের পর যোগসিদ্ধ হইলে সেই আত্মজ্ঞান সহজেই লব্ধ হইয়া থাকে।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি তৎপর ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া জ্ঞান লাভ করেন এবং জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরাৎ উৎকৃষ্ট শান্তি অধিকার করিয়া থাকেন।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

অজ্ঞ, বীতশ্রদ্ধ, ও সংশয়ী ব্যক্তি স্বার্থভ্রষ্ট হয়। যে ব্যক্তি সংশয়ী তাহার ইহ লোক পর লোক ও সুখ নাই।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥

যিনি ঈশ্বরসেবায় সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার সংশয় জ্ঞানবলে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, স্বাভাবিক কার্য্য সেই অপ্রমাদী ব্যক্তির কোন ব্যাঘাত দিতে পারে না।

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥

অতএব হে অর্জ্জুন, অজ্ঞানসম্ভূত হৃদয়স্থ সংশয় জ্ঞান-অসি দ্বারা ছেদন করিয়া যোগানুষ্ঠান কর, উত্থান কর উত্থান কর।

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥

যিনি যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার আত্মা সকলপ্রাণির আত্মস্বরূপ তিনি কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হন না।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

যিনি ব্রহ্মে কর্ম্ম অর্পণ এবং কর্ম্মফলে

আসক্তি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি, পদ্মপত্রে জল যেমন লিপ্ত হয় না সেই রূপ কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হন না।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে শক্তোনিবধ্যতে॥

ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্যন্তিকী মুক্তি প্রাপ্ত হন, এবং যে ব্যক্তি ঈশ্বরনিষ্ঠ নহে সে ফলাভিসন্ধি হেতু ফলে আসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়।

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবৎ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরং॥

আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদিগের অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের সেই আত্মজ্ঞান, সূর্য্য যেমন বস্তু সকল প্রকাশ করে, সেইরূপ পরিপূর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥

যাঁহাদিগের ঈশ্বরেতে বুদ্ধি, তাঁহাতে আত্মা, তাঁহাতে নিষ্ঠা, এবং তিনি আশ্রয়, তাঁহারা জ্ঞানবলে পাপ বিনাশ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হন।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ং।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥

যিনি ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মতে অবস্থান করেন তিনি প্রিয় লাভে হৃষ্ট হন না এবং অপ্রিয় লাভেও বিষণ্ণ হন না, তিনি স্থিরবুদ্ধি ও অবিমোহিত।

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখং।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥

যাঁহার মন বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয় সকলে অনাসক্ত তিনি অন্তঃকরণে সাত্ত্বিক সুখ লাভ করেন এবং সমাধি দ্বারা ব্রহ্মে যুক্তাত্মা হইয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥

ইন্দ্রিয়োত্থিত ভোগ-সকল দুঃখের কারণ। তৎসমুদায়ের উৎপত্তি ও ক্ষয় আছে, সুতরাং বিবেকী পুরুষ তাহাতে আসক্ত হন না।

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥

যিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত কাম ও ক্রোধের বেগ নিরোধ করিতে সমর্থ হন তিনিই সমাহিত ও সুখী।

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধোযঃ সদা মুক্তএব সঃ॥

যাঁহার ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত, মুক্তিই যাঁহার লক্ষ্য এবং যিনি সতত ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধশূন্য সেই মুনিই মুক্ত।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি॥

ঈশ্বর তপ ও যজ্ঞের রক্ষক, সকল লোকের মহেশ্বর ও সকল ভূতের সুহৃদ, তাঁহাকে জানিয়া লোকে শান্তি লাভ করে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনোবন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

আপনা দ্বারাই আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে, আপনাকে অবসন্ন করিবেক না। আপনিই আপনার বন্ধু এবং আপনিই আপনার রিপু।

জিতাত্মানঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ॥

যিনি জিতাত্মা ও প্রশান্ত তাঁহার আত্মা শীতোষ্ণ সুখদুঃখ ও মানাপমান সত্ত্বেও সমাহিত হয়।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্তইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥

যাঁহার আত্মা জ্ঞানবিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত, যিনি নির্ব্বিকার ও জিতেন্দ্রিয় এবং যাঁহার নিকট লোষ্ট পাষাণ ও স্বর্ণ সমান তিনিই যোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপিচ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে॥

যিনি হিতৈষী, সুহৃৎ, উপকারক, মিত্র, নিরপেক্ষ, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, স্বসম্পর্কীয়, সাধু ও অসাধুর প্রতি সমদর্শী তিনিই বিশিষ্ট ব্যক্তি।

AN ADDRESS.

Read by BABU SATYENDRA NATH TAGORE, C. S. on the occasion of the inaugural ceremony of the Brahmo Mandir at Hyderabad Sind, on Sunday the 19th September 1875.

WE are met together to worship our common Father, to pay Him our tribute of prayer and praise. We have dedicated this building to-day to the God of love, that we may meet together from time to time to offer Him our thanks-givings for all the blessings we enjoy, to pray to Him for our spiritual welfare and to sing to His Glory and praise. This is a place where we can all meet upon a common platform. Here we have a common bond of union. We are all united in common brother-hood. We meet as brothers and there is with us the common Father of us all who is listening to our prayers. All distinctions of caste, color and creed vanish in his presence. In society we take pride in our wealth, our rank, our nationality but in the sight of Him who is our Heavenly Father, the rich and the poor, the learned and the unlearned, the weak and the powerful are all equal, all equal objects of his care. We each and all obtain even-handed justice at His doors. His blessings like the rain in heaven descend equally to the humble cottage of the peasant and the towering palace of the king. This is one great idea which a place of public worship is calculated to foster and develope. The Fatherhood of God and the Brotherhood of Man; beautiful idea! Let us try to realize it for a moment. If a banner emblazoned with this great Truth were to be unfurled in this world, there would be an end to all strifes and quarrels and bloodshed; war would vanish with all its attendant horrors and peace would reign supreme. It is not, however, absolutely necessary that we should confine our worship to a particular place or time. God is omnipresent. He dwells in the heart of our hearts and knows all the secrets there-of. It is not that external pomp and ceremonies are acceptable to him. The prayer of the recluse in his closet is not less efficacious, not less acceptable to the Lord than a chorus of hymns sent forth from the most Gorgeous Cathedral in the world. It is our own imperfections, the necessities of Human Nature that give rise to a place of public worship like this. Man is pre-eminently a social being and as we are forced to associate with each other for various other purposes, as we enjoy, sharing our bread with friends better than taking a solitary meal; so in regard to prayer: it is a demand of our sympathetic nature that we should assemble in public worship. There is the secret communion between the soul and its maker, and there are also the out-pourings in prayer and thanks-giving of hearts beating under a common impulse. But, Brethren I warn you, let us not lose the substance in the shadow, let us not fling away the reality in pursuit of a phantom, of a mere form. It is not lip-worship that our Father wants. We must not flatter ourselves that we have done every thing to please Him by meeting together at stated times for purposes of worship. No. We must love and worship the Lord our God with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength, and serve Him—"Keyena manasa Vacha," কায়েন মনসা বাচা

with our body, mind and speech, in a word with our whole life. We must undergo sacrifices and privations at the call of duty. As members of society we must do our duties to our neighbours, assist the needy, feed the hungry, clothe the naked, disseminate konwledge to the best of our ability and do all to elevate and enlighten those who may be placed under our influence. As members of a family we have various duties to perform as father son and brother, husband and wife and the right performance of these duties is part of our worship. Then again we must not lose sight of the fact that it is the duty of every man to educate himself, to maintain in health and develope all the powers of his body to bring out all the faculties of his mind, to cultivate his intellect, to seek knowledge with diligence and earnestness and to accept the Truth unflinchingly and uncompromisingly where-ever he many find it. Again let us not forget that to merit the Divine love, we must follow the precept, "Love thy neighbour as thyself" for unless thou lovest thy brethern thou hast seen, canst thou love thy Father in Heaven thou hast not seen. We pray for the forgiveness of our sins but to merit the Divine forgiveness, of we must ourselves learn to forgive, for if we forgive not the trespasses of our neighbours against us, can we expect our own trespasses to be forgiven by the just and Righteous God ?

I hope, my dear brethern, I have now sufficiently explained the nature ef true worship. It does not consist in the observance of forms, repetition of words or chanting of hymns. We must set the high ideal ever before our eyes. What if we meet daily and hourly in churches, chapels and temples ? What if we repeat our prayeıs five times a day and neglect our solemn duties, turn a deaf ear to the behests of our conscience ? Fastings and prayers avail not when the heart is impure ; God is hidden from our sight when it is the world we really set up as our Divinity. No, we cannot serve two masters. Choose between the world and thy God. Be of the Earth earthy and you distance yourself from God. If your object be to approach Him, fling away the tempatations and debasing influences of this world—not fly from it but conquer it. What though the opposing forces are strong, we must combat them with all our strength—come out victorious or die in the struggle. It is in this frame of mind that we must seek God if we wish to find Him.

How can we venture to approach Him with our hearts full of sin and selfishness ? In one sense he is indeed inaccessiblo to us, blind, sinful mortals. Infinite in power, goodness and wisdom! How can man venture to approach Him ? The sun rises daily to illumine the heavens and fulfils his appointed task with the regularity of clock-work—we ask him if he knows anything about the Creator. No answer is returned. We ask the budding flower, the running stream, the mighty sea, the hoary peaks of the Himalayas but they know him not. It is of no use questioning the external nature. We enquire of our nnderstanding, but alas is vain : our intellect is too weak to fathom the Infinite. We are involved in numberless doubts and dilemmas, we then seek God in our inmost heart, we seek him with the aid of prayer, we pray to him for light and knowledge and what is the result ? It is then that we find the treasure we are in search of, a treasure which the world cannot give and the world cannot take away. Where a thousand arguments fail, a ray of Faith enlightens